আফাক আল-মারিফাহ
শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির সারসংক্ষেপ

শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির সারসংক্ষেপ

ড. ফাহাদ বিন সালেহ আল-আজলান

পৃষ্ঠা 1

শরিয়তের রাজনৈতিক নীতিমালা বিষয়ক সংকলন

ড. ফাহাদ বিন সালেহ আল-আজলান

পৃষ্ঠা 2

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
দ্বিতীয় সংস্করণ
১৪৪৪ হিজরি - ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

জমার নম্বর
মিশরীয় ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও আর্কাইভসে ২০২৮১ / ২০২১

পৃষ্ঠা 3

""

পৃষ্ঠা 4

আল-মুহাররার
শরয়ী রাজনীতি প্রসঙ্গে

পৃষ্ঠা 5

""

পৃষ্ঠা 6

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

পৃষ্ঠা 7

সূচিপত্র

শিরোনাম .... পৃষ্ঠা
ভূমিকা ১১
প্রথম অধ্যায়: শরয়ি রাজনীতির মৌলিক পরিচিতি ১৫
প্রথম সূচনা: পূর্ববর্তীদের নিকট রাজনীতির সংজ্ঞা ১৭
দ্বিতীয় সূচনা: সমকালীনদের নিকট শরয়ি রাজনীতির সংজ্ঞা ৩৬
তৃতীয় সূচনা: শরয়ি রাজনীতির আওতাভুক্ত বিষয়সমূহের সীমানা ৪২
চতুর্থ সূচনা: শরয়ি রাজনীতিতে পর্যালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রভাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৪৭
পঞ্চম সূচনা: জনস্বার্থভিত্তিক ইজতিহাদ ও শরয়ি দলীলের মধ্যকার সম্পর্ক ৫৩
ষষ্ঠ সূচনা: সদৃশ পরিভাষাসমূহের সাথে শরয়ি রাজনীতির সম্পর্ক ৭৬
সপ্তম সূচনা: রাজনীতি ও শরিয়তের মধ্যকার সম্পর্ক ৭৯

অষ্টম সূচনা: শরয়ি রাজনীতির পরিচ্ছেদসমূহ ৮৬
নবম সূচনা: শরয়ি রাজনীতি অনুযায়ী আমল করার বৈধতা ৮৮

পৃষ্ঠা 8

---

৯৩ .... দশম ভূমিকা: সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ
১০০ .... একাদশ ভূমিকা: সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর ফলাফল
১০৭ .... দ্বাদশ ভূমিকা: ফিকহি ঐতিহ্যে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর উৎসসমূহ

১১৫ .... **দ্বিতীয় অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সিয়াসাহ (রাজনীতি)**
১১৭ .... প্রথম পরিচ্ছেদ: নববী পদক্ষেপসমূহ
১২৫ .... দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নববী সিয়াসাহ

১৪৯ .... **তৃতীয় অধ্যায়: খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে সিয়াসাহ**
১৫১ .... প্রথম পরিচ্ছেদ: আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ
১৫৫ .... দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ
১৮৬ .... তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ
১৯৯ .... চতুর্থ পরিচ্ছেদ: আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ
২০৭ .... পঞ্চম পরিচ্ছেদ: খুলাফায়ে রাশিদীনের রাজনীতিতে জনকল্যাণ (মাসলাহাত)

২১৯ .... **চতুর্থ অধ্যায়: সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর মূলনীতিসমূহ**
২২২ .... প্রথম মূলনীতি: মুবাহ (বৈধ) বিষয়কে সীমাবদ্ধকরণের বৈধতা
২৩১ .... দ্বিতীয় মূলনীতি: শাসকের মাধ্যমে মতভেদ নিরসন
২৫০ .... তৃতীয় মূলনীতি: শাসকের পদক্ষেপ জনকল্যাণের ওপর নির্ভরশীল
২৬৪ .... চতুর্থ মূলনীতি: কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার বৈধতা
২৭৮ .... পঞ্চম মূলনীতি: নেতৃত্বের মাধ্যমে বাধ্য করার ক্ষমতা

পৃষ্ঠা 9

পঞ্চম অধ্যায়: সিয়াসাত শারইয়্যাহর প্রয়োগসমূহ ২৯৩

প্রথম পরিচ্ছেদ: ঐতিহ্যবাহী ফিকহী প্রয়োগসমূহ ২৯৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সমসাময়িক প্রয়োগসমূহ ৩৫৩

""

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এমন প্রশংসা যা অগণিত, পবিত্র ও বরকতময়; যা আসমানসমূহ পূর্ণ করে দেয়, যা যমিন পূর্ণ করে দেয় এবং এরপর আমাদের প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা পূর্ণ করে দেয়। আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বন্ধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর উপর, এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ, পত্নীগণ এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পদ্ধতির উপর চলবে ও তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করবে তাদের উপর। অতঃপর:

বর্তমান যুগে 'সিয়াসা শারইয়্যাহ' (শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি) সবচেয়ে প্রচলিত শরয়ী ধারণাগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। এই শরয়ী পরিভাষাটি এখন আর কেবল ফিকহ শাস্ত্রের একটি অধ্যায় হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই, এবং এটি শুধু ফিকহী গবেষণায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের মাঝেও সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং এর প্রতি আগ্রহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, যেখানে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণও শরিক হচ্ছেন। এর প্রতি আগ্রহ এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এটি সমকালীন মুসলিমদের চেতনায় স্থান করে নিয়েছে; ফলে তারা সিয়াসা শারইয়্যাহর কথা স্মরণ করে এবং সামগ্রিকভাবে এর তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

এই আগ্রহ মূলত শরীয়াহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, এর বিধানাবলি পালনে সচেষ্ট থাকা এবং এর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক মতাদর্শের নিকট নতি স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানানোরই একটি ফসল। সমকালীন চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এর বিশাল পরিবর্তনগুলোর মাঝে এই লক্ষ্য অর্জনে সিয়াসা শারইয়্যাহ ছিল একটি সুগম পথ এবং এর দিকে ধাবিতকারী ইজতিহাদী ক্ষেত্র।

এই আগ্রহ বর্তমান যুগে সিয়াসা শারইয়্যাহর ক্ষেত্রে একটি লক্ষ্যণীয় ইলমী বা জ্ঞানতাত্ত্বিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। ফলে এই বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র রচিত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অসংখ্য বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ইলমী ধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা সিয়াসা শারইয়্যাহ সংক্রান্ত গবেষণাকে এতটাই বিস্তৃত করেছে যে, এটি এখন একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান বা শাস্ত্র হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

এই গবেষণালব্ধ কর্মতৎপরতা বিশাল এক ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত। ফলে সিয়াসাহ শরইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি) সংবলিত পূর্ববর্তী ফকীহগণের কিতাবসমূহ সম্পাদিত হয়েছে এবং তাঁদের আলোচনার মাঝে ছড়িয়ে থাকা রাজনৈতিক বিষয়াবলির প্রতি যত্ন নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে উদ্ভূত নতুন সমস্যাসমূহ (নাওয়াযিল) নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে এবং আধুনিক সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশেষ আইনসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশাল এই ইলমী কাজের শক্তি, পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা, বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা, সমসাময়িক পরিবর্তনসমূহ উপলব্ধি এবং এর ব্যবহারিক প্রভাবের ক্ষেত্রে স্বভাবতই ভিন্নতা রয়েছে। সঠিক দিকনির্দেশনা, নসিহত এবং যথাযথ সংশোধনের নিমিত্তে এটি একটি সামগ্রিক পরীক্ষা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে।

এই লিখনশৈলীর একটি চমৎকার দিক হলো: সিয়াসাহ শরইয়্যাহর সহজবোধ্য ইলমী প্রবেশদ্বারসমূহ, যা সিয়াসাহ শরইয়্যাহর ধারণাকে সহজ করে তুলে ধরে এবং এই ধারণা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান মৌলিক উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করে। এই বিষয়ে বেশ কিছু ভালো কিতাব রয়েছে যা থেকে আমি উপকৃত হয়েছি; আল্লাহ তাআলা সেগুলোতে বরকত দান করুন এবং এদের লেখকদের সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমি তাঁদের সাথে এই পুণ্যের কাজে শরিক হতে চেয়েছি, ফলে আপনার হাতের এই কিতাবটির অবতারণা। এতে আমি সিয়াসাহ শরইয়্যাহ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তু উপস্থাপনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, যা এই বিষয়টি আত্মস্থ করতে এবং এর মৌলিক বিষয়গুলো অনুধাবন করতে আগ্রহীদের জন্য একটি প্রবেশদ্বার হিসেবে গণ্য হতে পারে। সেই সাথে এতে সিয়াসাহ শরইয়্যাহর ফিকহ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদানসমূহ সংযোজন করা হয়েছে।

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি কিতাবটিকে পাঁচটি প্রধান পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি:

প্রথম পরিচ্ছেদ: আমি সিয়াসাহ শরইয়্যাহর মৌলিক প্রস্তাবনাসমূহ আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট করেছি, যা এই ইলমের প্রবেশদ্বারস্বরূপ। এতে আমি একে উন্মোচনকারী প্রধান দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছি: যেমন এর সংজ্ঞা, অধ্যায়সমূহ, মূলনীতিসমূহ, এর শরয়ী ভিত্তি, বৈশিষ্ট্যসমূহ, এর সুফল... ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এখানে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাজনীতিকে দুটি প্রধান দিক থেকে উপস্থাপন করেছি: প্রথমটি হলো রাজনীতি ও ইমামতের দাবি অনুযায়ী তাঁর কার্যাবলি, এবং দ্বিতীয়টি হলো সিয়াসাহ শরইয়্যাহ সংশ্লিষ্ট দিকগুলোর পথপ্রদর্শক নিয়মাবলি।

তৃতীয় অধ্যায়ে: খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনীতে শরয়ী রাজনীতির (সিয়াসাহ শারইয়্যাহ) স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এতে আমি

প্রত্যেক খলিফার যুগে সংঘটিত প্রধান রাজনৈতিক ইজতিহাদসমূহ এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনায় তাঁদের জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছি। পরিশেষে খোলাফায়ে রাশেদীনের মাসলাহাতভিত্তিক ইজতিহাদ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে অধ্যায়টি সমাপ্ত করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে: জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী পরিচালনায় শরয়ী রাজনীতির যে সকল মূলনীতির ওপর নির্ভর করা হয়, তা বর্ণিত হয়েছে। আমি একে পাঁচটি মৌলিক মূলনীতিতে সীমাবদ্ধ করেছি, সেগুলো হলো: বৈধ (মুবাহ) বিষয়কে সীমিতকরণ, শাসকের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মতভেদ নিরসন, জনকল্যাণ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, উপকার ও অপকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং শাসনকর্তৃত্বের আনুগত্য আবশ্যক করা। আমি প্রতিটি মূলনীতির ওপর কিছুটা বিস্তারিত আলোকপাত করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে: শরয়ী রাজনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগগুলো উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাই আমি শরয়ী রাজনীতি সংক্রান্ত ঐতিহ্যবাহী একগুচ্ছ প্রয়োগ নির্বাচন করেছি, যার মাধ্যমে শরয়ী রাজনীতি সংশ্লিষ্ট মাসলাহাতভিত্তিক ইজতিহাদের প্রকৃত রূপ গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এরপর আমি এর সাথে কিছু সমসাময়িক প্রয়োগ যুক্ত করেছি, যার মাধ্যমে শরয়ী রাজনীতির মূলনীতি অনুযায়ী সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি কাঠামো তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি আশা করি, পাঠক এই গ্রন্থে এমন জ্ঞানতাত্ত্বিক উপকারিতা খুঁজে পাবেন যা শরয়ী রাজনীতির উচ্চ মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি অগ্রিম ধন্যবাদ জানাই সেই সকল কল্যাণকামী সমালোচককে, যারা কোনো ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করবেন অথবা সঠিক পথের দিশা দেবেন। মুমিন এককভাবে দুর্বল, কিন্তু তার ভাইদের সহযোগিতায় সে শক্তিশালী। তাঁদের পক্ষ থেকে আগত সংশোধনকে আমি কৃতজ্ঞতা ও দোয়াসহ গ্রহণ করছি।

আমি আদিতে ও অন্তে, প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহর প্রশংসা করছি। আমি মহান রবের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন এই প্রচেষ্টাকে উপকারী করেন এবং এতে বরকত দান করেন। আমি তাঁর নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাই, যেন তিনি একে তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতায় এমন এক বরকতময় ও উপকারী ইলম হিসেবে কবুল করেন যা পরকালের পাথেয় ও সওয়াব হিসেবে সঞ্চিত থাকে। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো সামর্থ্য ও শক্তি নেই।

""

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিয়াসা শারঈয়াহর মৌলিক ভূমিকাসমূহ

পৃষ্ঠা 16

""

পৃষ্ঠা 17

প্রথম ভূমিকা

প্রাচীন পণ্ডিতদের নিকট রাজনীতির (সিয়াসাহ) সংজ্ঞা

অভিধান অনুযায়ী রাজনীতি (সিয়াসাহ): যখন কেউ কোনো বিষয়ের দায়িত্ব পালন করে, তখন বলা হয় 'সাসা আল-আমারা সিয়াসাতান'। আর কোনো ব্যক্তিকে মানুষের বিষয়াবলির দায়িত্ব দেওয়া হয় যখন সে তাদের বিষয়ের পরিচালক হয়। 'সিয়াসাহ' বা রাজনীতি হলো কোনো বিষয়কে এমনভাবে পরিচালনা করা যা তার সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য সহায়ক। (১)

কোনো কোনো আধুনিক গবেষক আল-মাকরিজীর প্রতি এই বক্তব্যটি আরোপ করেছেন যে, 'সিয়াসাহ' শব্দের মূল উৎস আরবি নয়। তবে তারা এমন প্রমাণাদিও উপস্থাপন করেছেন যা শব্দটির বিশুদ্ধ আরবি হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করে। (২)

এর কারণ হলো আল-মাকরিজী বলেছিলেন: "এটি কেবল একটি মাগলিয়া [অর্থাৎ মঙ্গোলীয়] শব্দ, যার মূল হলো 'ইয়াসা'। অতঃপর মিসরীয়রা শব্দটিকে পরিবর্তিত করে এর শুরুতে 'সীন' যুক্ত করে 'সিয়াসাহ' বলতে শুরু করে এবং এর সাথে আলিফ-লাম যুক্ত করে দেয়। ফলে যাদের এ বিষয়ে জ্ঞান নেই তারা ধারণা করে যে এটি একটি আরবি শব্দ। অথচ প্রকৃত বিষয়টি কেবল তা-ই যা আমি আপনাকে বললাম।" (৩)

তবে অধিকতর স্পষ্ট বিষয় হলো, আল-মাকরিজী এটা বোঝাতে চাননি যে 'সিয়াসাহ' শব্দটি আরবি নয়। কেননা তিনি এর পূর্বেই এর আরবি শব্দমূল উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছিলেন: "বলা হয়: 'সাসা আল-আমারা সিয়াসাতান', যার অর্থ হলো তিনি বিষয়টির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি হলেন 'সায়েস' (পরিচালক), যারা 'সাসাহ' ও 'সুস' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর জনগণ যখন কাউকে 'সাওওয়াসাহু' করে, তখন এর অর্থ তারা তাকে তাদের পরিচালক নিযুক্ত করেছে। আর 'সুস' হলো স্বভাব ও প্রকৃতি। যেমন বলা হয়: বাগ্মিতা তার স্বভাবজাত (সুস) এবং মহানুভবতা তার মজ্জাগত (সুস), অর্থাৎ এটি তার প্রকৃতি বা স্বভাব থেকে উৎসারিত।" (৪)

(১) দেখুন: আল-সিহাহ লিল-জাওহারি ৩/৯৩৮, বিষয়: (সুস), এবং লিসানুল আরব ৬/১০৮, বিষয়: (সুস)।
(২) দেখুন: আল-মাদখাল ইলাস সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, আব্দুল আল-আতওয়াহ ১৪; ইলমুস সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ইনদা ইবনিল কাইয়্যিম ২৬৮-২৬৯; আল-কাওয়াইদ ওয়াল দাওয়াবিত আল-ফিকহিয়্যাহ ওয়া তাত্ত্বিকাতুহা ফিস সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ফাওজি উসমান সালেহ ৭৮-৭৯। ইতিপূর্বে আব্দুল কাদির আল-বাগদাদি 'সিয়াসাহ' শব্দটিকে অনারবি ভাষার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করার ভুলটি ধরিয়ে দিয়েছেন, যেমনটি খুযানাতুল আদাব এবং লুব্বু লুবাবি লিসানিল আরবে (৭/৬৪-৬৫) উল্লেখ করা হয়েছে।
(৩) আল-মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বি-যিকরিল খুতাত ওয়াল আসার ৩/৩৮৩; আরও দেখুন: আন-নুজুম আয-যাহিরা ফী মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা, ইবনে তাগরি বারদি ৬/২৬৮।

(৪) আল-মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতিবার বি-যিকরিল খুতাত ওয়াল আসার ৩/৩৮৩।

এখানে তাঁর উদ্দেশ্য হলো তাঁর সমসাময়িক ‘সিয়াসা’ বা রাজনীতির সেই বিশেষ ব্যবহার, যা শরিয়ত বহির্ভূত নির্দিষ্ট পন্থায় মানুষের বিষয়াদি পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত এবং তারা একে ‘সিয়াসা’ বলে অভিহিত করত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই অর্থটি তারা মঙ্গোলদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে; তার মানে এই নয় যে শব্দটি মূলত আরবি নয়।

ফেকহি পরিভাষায় ‘সিয়াসা’ (রাজনীতি):

যখন আমরা ‘সিয়াসা’ এবং ‘সিয়াসা শারইয়্যাহ’ পরিভাষাটির ফেকহি ব্যবহারের দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমরা লক্ষ্য করি যে, ফকিহগণের নিকট এটি কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং এটি প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই; কারণ এই পরিভাষাটির কঠোর ব্যবহারের তখন কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করার কোনো বিশেষ ফলও ছিল না। ফকিহগণের নিকট এই পরিভাষাটির ব্যবহারসমূহ অনুসন্ধান করলে আমরা এর দ্বারা উদ্দেশ্যকৃত অর্থগুলোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি অর্থে সীমাবদ্ধ করতে পারি:

প্রথম অর্থ: জনকল্যাণের সাধারণ ধারণা।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ‘সিয়াসা’ একটি ব্যাপক ধারণা যা মানুষের কল্যাণ সাধনকারী সবকিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, চাই তা কোনো সাধারণ বিষয়ে হোক বা বিশেষ কোনো বিষয়ে।

ইমাম গাজালি বলেন: (সৃষ্টিজগতের সংশোধন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তিদানকারী সঠিক পথের দিকে তাদের পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে সিয়াসা বা রাজনীতি চারটি স্তরে বিভক্ত:

প্রথম স্তর: এটি সর্বোচ্চ স্তর, যা হলো নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) সিয়াসা। তাদের শাসন ছিল সাধারণ ও বিশেষ সকল শ্রেণির মানুষের ওপর—তাদের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই।

দ্বিতীয় স্তর: খলিফা, রাজা ও সুলতানগণের শাসন। তাদের শাসনও সাধারণ ও বিশেষ সকল শ্রেণির মানুষের ওপর কার্যকর, তবে তা কেবল তাদের বাহ্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে, অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ক্ষেত্রে নয়।

তৃতীয় স্তর: মহান আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীন সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমগণের সিয়াসা, যারা নবীগণের উত্তরাধিকারী। তাদের শাসন কেবল বিশেষ শ্রেণির মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষের অনুধাবন ক্ষমতা তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার স্তরে পৌঁছে না এবং আলেমদের শক্তি মানুষের বাহ্যিক কার্যাবলীর ওপর বাধ্যবাধকতা, নিষেধ ও বিধান জারি করার মতো পর্যায়ে পৌঁছায় না।

চতুর্থত: ওয়াজকারীগণ; তাঁদের কর্তৃত্ব বা প্রভাব শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ (১)।

এই ব্যাপকতার নিকটবর্তী সংজ্ঞা আল-মাকরিজীর নিকট পাওয়া যায়, যেখানে তিনি বলেছেন: (রাজনীতি হলো: শিষ্টাচার ও জনকল্যাণ রক্ষা এবং পরিস্থিতির শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রণীত আইন) (২)।

যেমনটি ইবনে আকীল রাজনীতির সংজ্ঞায় বলেছেন: (রাজনীতি হলো এমন কাজ যার মাধ্যমে মানুষ সংশোধনের নিকটবর্তী হয় এবং বিপর্যয় থেকে দূরে থাকে, যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নির্ধারণ করেননি এবং এ বিষয়ে কোনো ওহীও নাজিল হয়নি) (৩)।

এই ব্যাপক সংজ্ঞার কাছাকাছি হলো ইবনে তাইমিয়্যাহ-এর বক্তব্য, যেখানে তিনি রাজনীতিকে বর্ণনা করেছেন এভাবে: (দুনিয়া থেকে ক্ষতি দূর করার এবং এর উপকারিতা অর্জনের জ্ঞান) (৪)।

এর ওপর ভিত্তি করে, যা কিছু ধর্মীয় বা পার্থিব বিষয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করে—তা বিশেষ হোক বা সাধারণ—সবই রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই ফকীহগণের নিকট—বিশেষ করে মালিকি ও শাফেয়ীগণের কাছে—জনকল্যাণ (মাসলাহাত) অর্থে রাজনীতির ব্যবহার অধিক প্রচলিত। এর কিছু প্রমাণ হলো:

- কোনো কোনো ফকীহ নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তিকে নিজ মাযহাব বহির্ভূত বিচার করতে নিষেধ করেছেন, যাতে তার ওপর কোনো অভিযোগ না আসে: (মাযহাবগুলো সুসংহত হওয়ার পর এবং এর অনুসারীরা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়ার পর রাজনীতির দাবি যদিও এটাই ছিল, তবে শরীয়তের বিধান এটিকে আবশ্যক করেনি) (৫)।

---

(১) ইহয়াউ উলুমিদ দীন ১/১৩; এবং সংক্ষেপে সংজ্ঞাটি দেখুন: হাশিয়া ইবনে আবিদীন ৪/১৫; আল-কুল্লিয়াত, আল-কাফাওয়ী ৫১০; কাশশাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনুন ১/৯৩৩।
(২) আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ই'তিবার বিযিকরিল খুদাত ওয়াল আসার ৩/৩৮৩; এবং আত-তুফী রাজনীতির এই সংজ্ঞার ওপর নির্ভর করে ফিকহকে 'শরয়ী রাজনীতি' বলেছেন। দেখুন: আল-ইশারাতুল ইলাহিয়্যাহ ইলাল মাবাহিছিল উসুলিয়্যাহ ১/১৬০; এবং তাঁর নিকট এই ব্যাপক অর্থে রাজনীতির ব্যবহার বারবার এসেছে। দেখুন: আল-ইশারাতুল ইলাহিয়্যাহ ১/১৯০ এবং ১/৪৬১।
(৩) আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/২৯; এবং দেখুন: আল-ফুরু ১০/১১৯; ইবনে আকীলের এই উক্তিটি মূলত সেই ব্যক্তির প্রতিবাদে এসেছিল যিনি বলেছিলেন যে, শরীয়ত সম্মত হওয়া ছাড়া কোনো রাজনীতি নেই। এটি হয়তো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ শাসকদের কার্যকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে, তবে তাঁর সংজ্ঞাটি ছিল সাধারণ ও ব্যাপক, তাই এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হয়েছে।
(৪) মাজমুউল ফাতাওয়া ১৪/৪৯৩।
(৫) আল-হায়িউল কাবীর ১৬/২৪; আরও দেখুন: আল-হায়িউল কাবীর ১৬/১২৬; মাওয়াহিবুল জালীল ৬/৯৯; শারহুয যুরকানী ৭/৩৯১; আল-মুখতাসারুল ফিকহী, ইবনে আরাফা ১১০।

– কতিপয় ফকীহ একটি শহরে দুইজন বিচারকের একত্র হওয়াকে নিষেধ করেছেন যদি তারা প্রত্যেকেই সকল বিচারকার্যে স্বাধীনভাবে রায় প্রদানের ক্ষমতা রাখেন। আর এটি করা হয়েছে প্রশাসনিক নীতির প্রয়োজনে, বিবাদমান পক্ষসমূহের মধ্যে কে

তাদের বিচার করবে—তা নিয়ে কলহ সৃষ্টির আশঙ্কায় (১)।

– কতিপয় ফকীহ কিছু হাদীসের ক্ষেত্রে উমর (রা.)-এর অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন: উমর (রা.) প্রশাসনিক কারণে সে বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন, অর্থাৎ জনস্বার্থের বিবেচনায় (২)।

– এছাড়া আরও অন্যান্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে (৩)।

এই ব্যাপক অর্থে ‘প্রশাসনিক নীতি’ বা রাজনীতি বিষয়টি ‘রব্বানী’ (আল্লাহওয়ালা জ্ঞানী) ধারণার অন্তর্ভুক্ত, যেমন ইমাম তবারী বলেছেন: **(রব্বানী হচ্ছেন তিনি যিনি ইলম ও ফিকহের পাশাপাশি প্রশাসনিক প্রজ্ঞা, সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রজাদের তদারকি করার যোগ্যতাসম্পন্ন; আর তিনি তাদের দুনিয়া ও দ্বীনের কল্যাণ নিশ্চিত করার কাজে সচেষ্ট থাকেন)** (৪)।

এই অর্থটি মুসলিম দার্শনিকগণ রাজনীতির যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন তার সদৃশ। রাজনীতি বলতে তাদের উদ্দেশ্য একটি সাধারণ অর্থ, অর্থাৎ: **(এমন সব রাজনৈতিক নিয়মনীতি উল্লেখ করা যার উপকারিতা সেই সকল মানুষের জন্য ব্যাপক হবে যারা তাদের নিজ স্তরের লোকদের সাথে অথবা তাদের চেয়ে উচ্চ বা নিম্ন স্তরের লোকদের সাথে আচার-ব্যবহারে তা প্রয়োগ করে)** (৫)। সুতরাং রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হলো আত্মার নিয়ন্ত্রণ, যা মানুষের জন্য রাজনীতির প্রথম পাঠ হওয়া উচিত (৬)। আর ‘নাগরিক রাজনীতি’ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি মানুষের নিজের ব্যক্তিগত বিষয় ও চরিত্রের ক্ষেত্রে কেমন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা, যাতে করে তারা শাসকবর্গের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। যে সমাজ এটি অর্জন করতে পারে তাকে তারা ‘আদর্শ নগরী’ বলে অভিহিত করেন এবং এতে অনুসৃত নিয়মগুলোকে ‘নাগরিক রাজনীতি’ বলেন। তাদের নিকট রাজনীতির উদ্দেশ্য জনকল্যাণমূলক কার্যাদি সম্পাদন করা নয়। একারণেই তাদের কাছে এই ধারণাটি বিরল অথবা বাস্তবে ঘটা প্রায় অসম্ভব, বরং তারা এ বিষয়ে কেবল তাত্ত্বিক ও কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আলোচনা করেন (৭)।

(১) দেখুন: শিফাউল গালীল ফি হাল্লি মুখতাসারি খালীল ২/৯৯১; আরও দেখুন: শারহুয যুরকানী ৭/২৩৫।
(২) দেখুন: আত-তাহবীর শারহুত তাহরীর ৪/১৮৪৬; এবং এটি সুলতানি প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হতে পারে।
(৩) দেখুন: আল-হাউয়িল কাবীর ৮/৪৬১; নিহায়াতুল মাতলাব ১৬/২৮২।
(৪) তাফসীরে তবারী ৬/৫৪৪।
(৫) আস-সিয়াসাহ, আল-ফারাবী ৮।
(৬) আস-সিয়াসাহ, ইবনে সিনা ৮৭।
(৭) দেখুন: মুকাদ্দিমাহ ইবনে খালদুন ১/৫০১।

দ্বিতীয় অর্থ: শাসকের কার্যাবলি এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়াবলি পরিচালনা।
এটি প্রথম ব্যবহারের চেয়েও অধিকতর সুনির্দিষ্ট অর্থ; যা 'সিয়াসত' (রাজনীতি বা শাসননীতি) শব্দের প্রয়োগকে কেবল শাসক এবং তার শাসনকার্য পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে।

কোনো কোনো ফকিহ 'সিয়াসত'-এর সংজ্ঞায় বলেছেন: প্রজাসাধারণের অবস্থার সংশোধন এবং তাদের বিষয়াবলির সুষ্ঠু পরিচালনা। (১)

অতএব, (ওয়ালি বা শাসক প্রজাসাধারণকে 'সিয়াসত' বা শাসননীতির মাধ্যমে পরিচালনা করেন; অর্থাৎ: তিনি তাদের বিষয়াবলির দায়িত্ব পালন করেন)। (২)

আর উলিল আমর বা শাসকের দায়িত্ব হলো: (শাসনতান্ত্রিক আইন বা সিয়াসতের কানুন সংরক্ষণ করা)। (৩)

(একারণেই ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান ভোগবিলাস কিংবা ইবাদতে মশগুল হয়ে শাসনভার অন্যের হাতে ন্যস্ত করে তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করবেন না; কেননা বিশ্বস্ত ব্যক্তিও খিয়ানত করতে পারে এবং হিতাকাঙ্ক্ষীও প্রতারণা করতে পারে। যদিও দ্বীনি বিধান এবং খিলাফতের পদের দাবি অনুযায়ী এটি তার ওপর অর্পিত একটি আবশ্যিক দায়িত্ব, তথাপি এটি শাসিত জনগণের প্রত্যেকের শাসনতান্ত্রিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত)। (৪)

এই ক্ষেত্রটিকে অনেক সময় 'সিয়াসতে আম্মাহ' বা সাধারণ রাষ্ট্রনীতি বলা হয়। কারণ, (ইমামই হলেন সেই ব্যক্তি, যার ওপর সৃষ্টির সাধারণ শাসন পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়েছে)। (৫)

ফকিহগণ সাধারণ রাষ্ট্রনীতিতে বিচারকের হস্তক্ষেপের বিধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইমাম আল-কারাফি উল্লেখ করেছেন যে, বিচারকের দায়িত্ব হলো (বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিচার সুনিশ্চিত করা, সাধারণ রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করা নয়)। (৬) ইবনে ফারহুন এই মতের পর্যালোচনা করে বলেছেন যে, এটি নিরঙ্কুশ নয়; বরং বিচারকেরও রাজনীতির বহু বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে। (৭)

(১) দ্রষ্টব্য: হাশিয়াতুল জামাল আলা শারহিল মানহাজ ৩/২৬, হাশিয়াতুল বুজাইরামি আলা শারহিল খাতিব ৩/১০।
(২) আল-বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ ৩/৩৯৩।
(৩) আল-মিয়ারুল মু'রাব ৭/১০ এবং দ্রষ্টব্য: মুকাদ্দিমাহ ইবনে খালদুন ১/৫০১।
(৪) কিফায়াতুন নাবিহ ১৮/৩২।
(৫) আল-ইহকাম ফি তামিযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম ১০৫, এবং দ্রষ্টব্য: আল-ইহকাম ১৬৩, এবং আয-যাখিরাহ ১০/৩২।
(৬) আল-ইহকাম ফি তামিযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম ১০৫।
(৭) দ্রষ্টব্য: তাবসিরাতুল হুক্কাম ১/১৮, এবং দ্রষ্টব্য: মুঈনুল হুক্কাম ১৭৬, এবং আর-রাসসা শারহু হুদুদি ইবনি আরাফাহ-তে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল-কারাফির কথাটিকে এভাবে বুঝা যেতে পারে যে সাধারণ শাসননীতির কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিচারকের এখতিয়ার নেই, তবে এর অর্থ এই নয় যে কোনো ক্ষেত্রেই নেই। দ্রষ্টব্য: শারহু হুদুদি ইবনি আরাফাহ ৪৩৬।

এই অর্থের প্রচলিত অভিব্যক্তিসমূহ হলো: রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা, এর নির্দেশনার অধীনে আসা, এর বিষয়াবলির দায়িত্ব অর্পণ এবং যারা রাজনীতির জন্য উপযুক্ত তাদের শর্তাবলি(১)... এবং এ জাতীয় বিষয়সমূহ যা দ্বারা মানুষের কার্যাবলি ব্যবস্থাপনায় ইমাম বা খলিফার দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়সমূহকে বোঝানো হয়। আর (সেই রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যা মূলত রাজা ও ইমামগণের মাধ্যমে তাদের প্রজাদের এমন সব প্রশংসনীয় ও সন্তোষজনক কাজ এবং সঠিক ও শক্তিশালী পথের দিকে পরিচালনা করা, যারা তাদের অনুগত ও আনুগত্যশীল)(২)।

আরেকটি প্রচলিত ব্যবহার হলো 'পুলিশ প্রধান' (সাহিবুশ শুরতাহ)-এর ক্ষেত্রে রাজনীতি শব্দের প্রয়োগ(৩); আর এটি দৃশ্যত একারণে যে, জনগণের সাধারণ বিষয়াবলি পরিচালনায় তার কর্তৃত্ব রয়েছে। কেননা অপরাধ ও ফৌজদারি বিষয়াবলি এবং চোরদের হাত থেকে শহর রক্ষা করার দায়িত্ব পুলিশ প্রধানের ওপর ন্যস্ত ছিল; আর তাকে 'ওয়ালি' (গভর্নর) নামেও অভিহিত করা হতো(৪)।

শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট এই অর্থে রাজনীতির ব্যবহারের মধ্যে অন্যতম হলো যা ইবনে তাইমিয়্যাহ তার 'আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রাঈ ওয়া আর-রাইয়্যাহ' গ্রন্থে লিখেছেন। তিনি যদিও 'শরয়ি রাজনীতি'র (সিয়াসাহ শারইয়্যাহ) এমন কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেননি যা স্পষ্টভাবে এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে, তবে বইটির উপস্থাপনা পদ্ধতিই এর উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোলে। গ্রন্থটি মূলত শাসকদের সংক্রান্ত আয়াতের ওপর ভিত্তি করে রচিত, আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: **"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করো তখন ইনসাফের সাথে বিচার করো।"** [আন-নিসা: ৫৮]। তিনি মনে করেন যে, রাজনীতির মূল ভিত্তি দুটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তা হলো আমানতদারি ও ইনসাফ: (যেহেতু আয়াতটি হকদারদের কাছে আমানত পৌঁছে দেওয়া এবং ইনসাফের সাথে ফয়সালা

করাকে আবশ্যক করেছে, তাই এ দুটিই হলো ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতি ও সৎ শাসনের মূল নির্যাস)(৫)।

---

(১) দেখুন: নিহায়াতুল মাতলাব ৫/৪৯৫ ও ১১/৪৯৭ এবং ৬/১৭, হাশিয়াতুশ শিরওয়ানি ৩/৬৮, শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ৩/৩৮৮, নাইলুল মাআরিব ২/৩৮৫, হাশিয়াতুত তাহাবি আলা মারাকিল ফালাহ ৫৮৮, বাদায়িউস সুলুক ৯৭।
(২) আল-খারাজ ওয়া সিনআতুল কিতাবাহ, কুদামা বিন জাফর ৪২৭।
(৩) দেখুন: আল-মুহিতুল বুরহানি ২/৬৯ ও ২/৮০, হাশিয়াতু ইবনু আবিদিন ২/১৪২, শারহু মুখতাসারিল খারশি ৪/১৪৯, হাশিয়াতুল আদাবি আলা কিফায়াতিত তালিব ২/৯৪, শারহুয যুরকানি ৪/৩৭৬।
(৪) দেখুন: আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফি বায়ানিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ, আল-মুনাবি ৪১৭, নাকদুত তালিব লি যাগালিল মাসায়িব ৪১, তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা, আস-সুবকি ৩/২৭২।
(৫) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রাঈ ওয়া আর-রাইয়্যাহ ৬।

তিনি প্রথম স্তম্ভকে—যা হলো আমানত—প্রশাসনিক দায়িত্ব ও সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন এবং দ্বিতীয় স্তম্ভকে—যা হলো ন্যায়বিচার—আল্লাহর অধিকার এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকারের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন।

আর এই সব বিষয়ই শাসনের সাথে সম্পৃক্ত; চাই তা এমন বিষয়ে হোক যার সপক্ষে সুনির্দিষ্ট দলিল বিদ্যমান, অথবা এমন বিষয়ে হোক যাতে কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল নেই। যদিও এর আলোচনার ফাঁকে শাসকদের রাজনীতি ব্যতীত অন্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মাসআলাও আলোচিত হয়েছে।

এই অর্থে রাজনীতি (সিয়াসাত) পরিভাষাটি 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ' শিরোনামে ইমামতে উজমা বা মহান নেতৃত্বের বিধিবিধান সম্পর্কে লিখিত বিষয়াবলির নিকটবর্তী; যেমনটি আল-মাওয়ার্দি এবং আবু ইয়ালা আল-ফাররা তাদের 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ' নামক গ্রন্থে করেছেন। সেখানে তারা এই পরিভাষার অধীনে ইমামদের গুণাবলি, তাদের শর্তাবলি, তাদের শাসনক্ষমতা অর্জনের পদ্ধতি এবং তাদের পক্ষ থেকে জারিকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহ—যা শাসক ও শাসন নীতির সাথে সম্পৃক্ত—সেসব কিছু একত্র করেছেন।

অনুরূপভাবে ইমামত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রচিত অন্যান্য গ্রন্থও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন: ইবনে জামাআহ-র 'তাকরীরুল আহকাম ফী তদবীরি আহলিল ইসলাম', আল-মাওসিলীর 'হুসনুস সুলুক লি-হাফিজ লি-দাওলাতিল মুলুক', এবং ইবনুল মুবাররাদের 'তাওদীহু তুরুকিল ইস্তিকামাহ ফী বায়ানিল আহকামিল বিলায়াহ ওয়াল ইমামাহ' সহ অন্যান্য গ্রন্থ। কারণ এগুলোর মূল লক্ষ্য হলো শাসকদের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি। তেমনিভাবে রাজকীয় শিষ্টাচার বা সুলতানি আদব-কায়দা নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ এবং এই জাতীয় অন্যান্য কিতাবও একই পর্যায়ভুক্ত।

আমরা বলতে পারি যে: এই অর্থে রাজনীতির ব্যবহারই হলো রাজনীতির প্রকৃত ও মূল অর্থ, যা শোনার সাথে সাথেই মানুষের মনে ভেসে ওঠে।

তৃতীয় অর্থ: যে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল নেই, তাতে শাসকের পদক্ষেপসমূহ।

এই পরিভাষাটি যদিও বর্তমান সময়ের 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বিষয়ক গবেষকদের নিকট বহুল প্রচলিত হয়ে উঠেছে—যেমনটি সামনে আসবে—তবে পূর্বসূরিদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি ততটা স্পষ্ট ছিল না। তা সত্ত্বেও ফকিহগণের বক্তব্যের বিভিন্ন স্থানে আমরা এর উপস্থিতির চিহ্ন খুঁজে পাই:

এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী পাঠসমূহ হলো ইবনে নুজাইম আল-হানাফি কর্তৃক ‘সিয়াসা’ (শাসননীতি)-র সংজ্ঞায় যা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: (তাদের বক্তব্যের প্রকাশ্য অর্থ হলো, সিয়াসা হলো শাসক কর্তৃক জনস্বার্থের বিবেচনায় এমন কোনো কাজ সম্পাদন করা যা তিনি সমীচীন মনে করেন, যদিও সেই কাজের সপক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল না থাকে)। যদিও তিনি হানাফিদের নিকট ‘তাজির’ (বিচক্ষণতামূলক শাস্তি) সংশ্লিষ্ট সিয়াসার ধারণা ব্যাখ্যা করছিলেন, তথাপি সিয়াসার ব্যাপারে তার প্রদত্ত সংজ্ঞাটি সাধারণভাবে শাসক কর্তৃক কোনো কাজ সম্পাদন করার অর্থেই এসেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, এটি একটি সাধারণ পদক্ষেপ এবং এই পদক্ষেপটি জনস্বার্থ বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত। ফলে এটি এমন সব বিষয়ে শাসকদের ‘মাসলাহা’ বা কল্যাণভিত্তিক ইজতিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট, যে বিষয়ে কোনো সুনির্ধারিত ‘নস’ (শরয়ি পাঠ) বিদ্যমান নেই।

এর কাছাকাছি একটি সংজ্ঞা ইমাম নাসাফি সিয়াসার ক্ষেত্রে প্রদান করেছেন যে: (প্রজাদের জন্য কল্যাণকর পন্থায় কোমলতা ও কঠোরতার মাধ্যমে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা)।

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো ইবনুল কাইয়্যিম-এর সেই বক্তব্য যা তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক ‘তামাত্তু’ (হজ) নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে বলেছেন: (...নিশ্চয়ই এটি এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো মাসলাহা বা জনস্বার্থ অনুযায়ী আংশিক প্রশাসনিক নীতি, যা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কেউ কেউ একে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য আবশ্যকীয় সাধারণ শরিয়ত মনে করে নিয়েছে)।

অনুরূপভাবে ইবনে মুফলিহ-এর উক্তি: (তাদের বক্তব্যের প্রকাশ্য অর্থ হলো: শাসকের আদেশে রোজা রাখা আবশ্যক হয় না, যদিও ‘আল-মুস্তাউইব’ ও অন্যান্য কিতাবে এসেছে যে নাফরমানি বা পাপের বিষয় না হলে শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব, এমনকি কেউ কেউ এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো: সিয়াসা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং ইজতিহাদমূলক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে; এটি নিরঙ্কুশ বা ঢালাও কোনো বিষয় নয়)।

আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সুন্নাহ অনুসরণের শর্তারোপ সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় তারা উল্লেখ করেছেন যে এটি: (জীবনচরিত এবং শাসননীতির জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট, শরয়ি বিধান বা আহকামের ক্ষেত্রে নয়)। তারা এখানে সিয়াসা (শাসননীতি) এবং হুকুম (বিধান)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন; কেননা হুকুম মূলত নস বা সুনির্দিষ্ট দলিলাদির ওপর প্রতিষ্ঠিত, পক্ষান্তরে সিয়াসা তদ্রূপ নয়।

(১) আল-বাহরুর রায়েক ৫/১১।
(২) তিলবাতুত তালাবা ফীল ইস্তিলাহাতিল ফিকহিয়্যাহ ১৬৭।
(৩) আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/৪৬।
(৪) আল-ফুরূ ৩/২২৭।
(৫) আল-হাভীল কাবীর ১৬/১৬৩, আত-তাহবীর শারহুত তাহরীর ৮/৩৮০৯।

চতুর্থ অর্থ: তা'যীরমূলক শাস্তি

এটি হানাফী মাযহাবে একটি বহুল প্রচলিত পরিভাষা; কেননা তারা সাধারণভাবে 'সিয়াসাহ' বা 'সিয়াসাহ শারইয়াহ' বলতে ঐ সকল শাস্তিকে বোঝেন যা শাসক সেই সব অপরাধের দমন ও প্রতিরোধের জন্য নির্ধারণ করেন যেগুলোর জন্য শরীয়তে কোনো নির্ধারিত (হদ্দ) শাস্তি নেই।

ইবনে আবিদীন 'সিয়াসাহ' পরিভাষা সম্পর্কে বলেছেন: (এটি এর চেয়ে আরও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় যাতে ধমক ও শাসন বিদ্যমান থাকে, যদিও তা হত্যার মাধ্যমে হয়। যেমনটি তারা পুংমৈথুনকারী, চোর ও শ্বাসরোধকারী সম্পর্কে বলেছেন যে, যদি তাদের পক্ষ থেকে এই অপরাধগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে 'সিয়াসাহ' হিসেবে তাদের হত্যা করা বৈধ। এবং যেমনটি বিদআতী সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে)।

অতঃপর তিনি এর একটি সংজ্ঞা এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে: (এটি হলো ফাসাদের মূল উপড়ে ফেলার জন্য এমন কোনো অপরাধের দণ্ড কঠোর করা যার একটি শরয়ী বিধান বিদ্যমান রয়েছে)(১)।

তিনি অন্যদের থেকেও বর্ণনা করেছেন যে: (সিয়াসাহ হলো কঠোরতর শরীয়ত। আর এটি দুই প্রকার: জুলুমপূর্ণ সিয়াসাহ, যা শরীয়ত হারাম করেছে; এবং ইনসাফপূর্ণ সিয়াসাহ, যা জালেমের কাছ থেকে হক আদায় করে নেয়, অনেক জুলুম প্রতিহত করে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের দমন করে)(২)।

সুতরাং সিয়াসাহ হলো: (এটি এমন প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার ইমামের ওপর ন্যস্ত থাকে)(৩), এবং (সিয়াসাহর মাধ্যমেই নির্বোধদের অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখা যায়)(৪)।

এই কারণেই হানাফী ফকীহগণের নিকট এই অধ্যায়ে মাসলাহাত বা জনস্বার্থে শাসকের পদক্ষেপ হিসেবে 'সিয়াসাহ'র উল্লেখ অধিক হারে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাদের কিছু বক্তব্য হলো:

---

(১) হাশিয়া ইবনে আবিদীন ৪/১৫; দাদে আফেন্দী 'আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ' ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় এটিকে আল-বাবাত্তির 'আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ'-এর দিকে নিসবত করেছেন, তবে এটি 'আল-ইনায়াহ'-তে হুবহু এই শব্দে নেই। 'আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ' গ্রন্থের মুহাক্কিক ড. ফুয়াদ আব্দুল মুনঈম 'আল-ইনায়াহ' ৫/৫২৪ পৃষ্ঠায় এর অর্থগত নিকটবর্তী একটি স্থানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।
(২) হাশিয়া ইবনে আবিদীন ৪/১৫; এটি 'মুঈনুল হুক্কাম' ১৬৯ পৃষ্ঠায় আত-তরাবুলসির বক্তব্য।
(৩) মাজমাউল আনহুর ১/৫৯১।
(৪) আল-বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ ১৩/৬২।

(ইমাম যদি এতে কোনো কল্যাণ দেখেন তবে তিনি তা স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী করবেন, ফলে তা শাসননীতি (সিয়াসাত) ও তা’যীর হিসেবে গণ্য হবে) (১)।

(এবং মুখমণ্ডল কালো করা (২) ছিল শাসননীতির অন্তর্ভুক্ত। ফলে শাসক যখন এতে জনকল্যাণ দেখবেন, তখন তার জন্য তা করার অধিকার থাকবে) (৩)।

(সুতরাং শাসননীতি (সিয়াসাত) হলো অপরাধের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ বিবেচনা করে ফয়সালা করা। আর স্পষ্টত এটি রাষ্ট্রপ্রধানদের

(আইম্মাহ) বিশেষ এখতিয়ার, বিচারকদের (কাযী) নয়) (৪)।

• এই কারণেই হানাফীগণ বেশ কিছু শরয়ী শাস্তিকে শাসননীতির (সিয়াসাত) অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করেছেন; ফলে সেগুলো কোনো অপরিবর্তনীয় শরয়ী বিধান নয়, বরং জনকল্যাণের স্বার্থে শাসনতান্ত্রিক শাস্তি। এর মধ্যে রয়েছে:

- লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় জঘন্য কাজে লিপ্ত ব্যক্তির শাস্তিস্বরূপ হত্যার যে বিধান এসেছে (৫)।

- এবং সেই ইহুদির ঘটনায়, যে জনৈক ইহুদি নারীকে তার অলংকারের লোভে পাথর দিয়ে হত্যা করেছিল; ফলে নবী ﷺ দুই পাথরের মাঝে রেখে তার ওপর কিসাস কার্যকর করেছিলেন (৬)।

এটি হানাফীদের এই মতের পরিপন্থী যে, ভারী বস্তু দ্বারা হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস নেই। তাই তারা এই হাদিসটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি (রাসূল ﷺ) শাসনতান্ত্রিক (সিয়াসাত) পন্থায় এর নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ সে ব্যক্তি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসেবে পরিচিত ছিল। আর যখন কেউ এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, তখন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য তাকে শাসনতান্ত্রিক পন্থায় হত্যা করার অধিকার থাকে (৭)।

- এবং মাখযুমী গোত্রের সেই মহিলার ঘটনায়, যে আসবাবপত্র ধার নিত এবং পরে তা অস্বীকার করত; ফলে নবী ﷺ তার হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন (৮)। এটি ধার নেয়া বস্তু অস্বীকারকারীর হাত না কাটার হানাফী মাযহাবের পরিপন্থী; ফলে তারা (একে সিয়াসাত হিসেবে) গণ্য করেছেন...

---

(১) আল-ইখতিয়ার লি-তা'লিলিল মুখতার ৪/৯১।
(২) আত-তাসখীম: এর অর্থ হলো কয়লা দিয়ে মুখ কালো করা। দেখুন: তালাবাতুত তালাবাহ ফীল ইসতিলাহাতিল ফিকহিয়্যাহ (১৩৩)।
(৩) ফাতহুল কাদীর ৭/৪৭৭।
(৪) আল-বাহরুর রায়েক ৫/১৮।
(৫) দেখুন: আল-হিদায়াহ ২/৩৪৭।
(৬) বুখারী (৬৮৭৯) ও মুসলিম (১৬৭২) আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।
(৭) দেখুন: আল-মাবসুত ২৬/১২৪।
(৮) মূল ঘটনাটি বুখারী (৩৭৩৩) ও মুসলিম (১৬৮৮) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর আসবাবপত্র অস্বীকার করার বিষয়টি ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে।

হাদীসটি রহিত হওয়ার ওপর অথবা এটি সিয়াসা (প্রশাসনিক নীতি) হিসেবে গণ্য হবে, যেহেতু তার থেকে এই বিষয়টি বারবার সংঘটিত হয়েছিল (১)।

এবং এ জাতীয় আরও অন্যান্য উদাহরণ (২)।

• অনুরূপভাবে, তারা খোলাফায়ে রাশেদিন থেকে জারিকৃত বেশ কিছু শাস্তিকে 'সিয়াসা' বা শাসনতান্ত্রিক নীতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। এগুলো হলো এমন সব প্রশাসনিক পদক্ষেপ, যা শরয়িভাবে নির্ধারিত নয় এমন সব অপরাধের দণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে। এর

মধ্যে রয়েছে:

– মুরতাদ হওয়ার কারণে আবু বকর (রা.) কর্তৃক কিছু নারীকে হত্যা করার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা; যদিও এটি মুরতাদ হওয়ার কারণে নারীকে হত্যা না করার বিষয়ে তাদের (ফকিহদের) সাধারণ মতের পরিপন্থী। তাই তারা একে দুটি বিষয়ের যেকোনো একটির ওপর প্রয়োগ করেছেন: হয় তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের উস্কানি বিদ্যমান ছিল, ফলে সেই কারণে তাদের হত্যা করা হয়েছিল; অথবা এটি সিদ্দীক (রা.)-এর পক্ষ থেকে জনকল্যাণ ও শাসনতান্ত্রিক কৌশলের (সিয়াসা) ভিত্তিতে জারি করা হয়েছিল (৩)।

– কওমে লুতের কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাহাবীগণ কর্তৃক হত্যা করার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাও ‘সিয়াসা’ বা শাসনতান্ত্রিক নীতির অন্তর্ভুক্ত (৪)।

– মিথ্যা সাক্ষীকে উমর (রা.) কর্তৃক দোররা মারার শাস্তিটিও ‘সিয়াসা’ বা প্রশাসনিক নীতির অন্তর্ভুক্ত। এর ওপর ভিত্তি করেই মূলত জনসমক্ষে অপদস্থ বা পরিচিত করার ওপরই নির্ভর করা হয়, কারণ এটিও এক প্রকারের ‘তাযীর’ বা সংশোধনমূলক শাস্তি (৫)।

এবং সাহাবীগণ কর্তৃক ‘সিয়াসা’ বা শাসনতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগের আরও অন্যান্য প্রমাণাদি (৬)।

তদ্রূপ তারা এমন আরও কিছু ‘তাযীর’ বা সংশোধনমূলক শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যা প্রশাসনিক বা শাসনতান্ত্রিকভাবে (সিয়াসা) বৈধ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে:

(১) দেখুন: তাবয়ীনুল হাকায়িক ৩/২১৭।
(২) দেখুন: তাবয়ীনুল হাকায়িক ৩/২২৫, আস-সিয়াসা আশ-শরইয়্যাহ, লুদদাহ আফান্দি ৭৭ ও ৮০।
(৩) দেখুন: আল-মাবসূত ১০/১১০।
(৪) দেখুন: তাবয়ীনুল হাকায়িক ৩/১৮১।
(৫) দেখুন: আল-মাবসূত ১৬/১৪৫, আল-হিদায়া ৩/১৩১, তাবয়ীনুল হাকায়িক ৪/২৪২।
(৬) দেখুন: বাদায়েউস সানায়ে ৭/২৯৯, আল-মাবসূত ২৪/২৪, আস-সিয়াসা আশ-শরইয়্যাহ, লুদদাহ আফান্দি ৭৮ ও ৭৯।

ব্যভিচারীকে দেশান্তর করা।(১) এবং বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপের (রজম) সমন্বয় করা, অথবা বেত্রাঘাত ও দেশান্তর করা।(২) যার থেকে বারবার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তাকে ভারী বস্তু দ্বারা, অথবা শ্বাসরোধ করে, অথবা ডুবিয়ে হত্যা করা।(৩) এবং জিম্মিদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নবী ﷺ-কে গালি দিয়েছে তাকে হত্যা করা, যদিও সে পাকড়াও হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে।(৪) এবং এ জাতীয় অন্যান্য অপরাধ।(৫)

সুতরাং এখানে 'সিয়াসাহ' (প্রশাসনিক দণ্ড) 'তা'যীর' (বিবেচনামূলক দণ্ড) অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণেই একটিকে অন্যটির সাথে সংযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়, যা বুঝায় যে উভয়ের মর্মার্থ এক।(৬)

ইবনে আবিদীন বলেন: (প্রকাশ্যত সিয়াসাহ ও তা'যীর পরস্পর সমার্থক। এ কারণেই তারা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে একটিকে অন্যটির ওপর সংযুক্ত করেছেন, যেমনটি হিদায়া, যাইলায়ী ও অন্যান্য কিতাবে ঘটেছে)।(৭)

বলা যেতে পারে যে: সিয়াসাহ হলো তা'যীরের ভিত্তি বা উৎস, স্বয়ং তা'যীর নয়। এ কারণেই হিদায়া গ্রন্থে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কোনো মাহরাম নারীকে বিবাহ করেছে: (তাকে সিয়াসাহ হিসেবে তা'যীরের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হবে, শরীয়ত নির্ধারিত কোনো হদ হিসেবে নয়)।(৮)

তাদের এই উক্তিটি উক্ত বিষয়কে আরও শক্তিশালী করে: (তা'যীরের ক্ষেত্রে প্রহার করা শরীয়তসম্মত, আর এর অতিরিক্ত যা কিছু

আছে তা সিয়াসাহ হিসেবে গণ্য হবে)।(৯)

---

(১) দ্রষ্টব্য: হিদায়া ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, ২/৩৪৪।
(২) দ্রষ্টব্য: মাজমাউল আনহুর, ১/৫৯০।
(৩) দ্রষ্টব্য: মাজমাউল আনহুর, ২/৬২২।
(৪) দ্রষ্টব্য: হাশিয়া ইবনে আবিদীন, ৪/৬৩। এখানে এটি উল্লেখ করা চমৎকার হবে যে, ইবনে আবিদীন উল্লেখ করেছেন যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের জন্য এই দণ্ডটি তিনি হানাফী কিতাবসমূহে পাননি। বরং তিনি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ তাদের পক্ষ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার ওপর নির্ভর করেছেন; অতঃপর তিনি বলেছেন: (তিনি এটি আমাদের মাযহাব থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নির্ভরযোগ্য, সুতরাং এটি গ্রহণযোগ্য)। দ্রষ্টব্য: হাশিয়া ইবনে আবিদীন, ৪/২১৫।
(৫) দ্রষ্টব্য: আল-মাবসুত, ৯/১৩৫; তাবয়ীনুল হাকায়েক, ৩/১৭৯; দুরারুল হুক্কাম, ২/৮০; আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়া লিল-বাবরতী, ২/২২৫; আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ লিদ্দাহ আফেন্দী, ৯৫-১০২।
(৬) দ্রষ্টব্য: আল-ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, ৪/৮৬; তাবয়ীনুল হাকায়েক, ৩/১৭৪; আল-বাহরুর রায়েক, ১১/৫; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, ৪/৮; আল-লুবাব ফী শারহিল কিতাব, ৩/১৮৮; আল-জাওয়াহিরাতুন নায়্যিরা আলা মুখতাসারিল কুদুরী, ২/১৭২।
(৭) হাশিয়া ইবনে আবিদীন, ৪/১৫।
(৮) ফাতহুল কাদীর ইবনুল হুম্মাম, ৫/২৫৯; এবং দ্রষ্টব্য: তাবয়ীনুল হাকায়েক, ৩/১৭৯; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, ৪/২৫।
(৯) আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়া, ৭/৪৬৭; এবং দ্রষ্টব্য: আল-বিনায়াহ, ৯/১৯৭।

এটি নির্দেশ করে যে, সিয়াসা (প্রশাসনিক নীতি) মূলত তা'যির (বিচক্ষণতামূলক শাস্তি) নয়, বরং এটি সেই জনস্বার্থ (মাসলাহাত) যার ওপর এটি ভিত্তি করে। 'আন-নাহরুল ফাইক' গ্রন্থে বলা হয়েছে: (এটি সিয়াসামূলক তা'যির হওয়ার ভিত্তিতে জায়েজ) অর্থাৎ জনস্বার্থ বা মাসলাহাত।

এই ব্যবহারটি হানাফীগণের নিকট প্রচলিত হলেও এবং এই বিষয়ে তাদের একটি বিশেষ পরিভাষা থাকলেও, এটি অন্যান্যদের নিকটও ব্যবহৃত হয়। তারা সিয়াসা শব্দটি তা'যিরমূলক শাস্তির অর্থে ব্যবহার করেন। যেমন:

– শাফিয়ীগণ কোনো শপথকারী ব্যক্তিকে তার শহর থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করা সমীচীন মনে করেন না। কিন্তু যখন তাদের সামনে এই নজির পেশ করা হলো যে, আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কায়েস ইবনুল মাকশুহকে বন্দি অবস্থায় ইয়ামেন থেকে মদিনায় নিয়ে এসেছিলেন যেন তিনি সেখানে শপথ করেন; এবং একইভাবে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কাসামাহর (রক্তপণ সংশ্লিষ্ট শপথ) লোকদের ২২ দিনের দূরত্বের পথ থেকে মক্কায় নিয়ে এসেছিলেন যেন তারা হিজর-এ (হাতীমে) শপথ করে; তখন তারা (শাফিয়ীগণ) বলেছিলেন: (তারা মূলত এটি সেই সিয়াসা বা শাসনতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্তিতে করেছিলেন যা বিজ্ঞ মতামত ও জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট)।

– (তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: এটি তার তলব বা দাবির ওপর নির্ভর করে না; বরং স্বামীর পক্ষ থেকে যা প্রকাশ পেয়েছে তা হলো শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ, যার কারণে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও সিয়াসার মাধ্যমে সে শাসনের যোগ্য)।

– (কিন্তু বিচারকের জ্ঞান সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পরিবেষ্টনকারী ছিল না, এবং নিকটবর্তী বিষয়ে কারারুদ্ধ করা সিয়াসার পদ্ধতির অনুকূল, যেন অধিকারগুলো বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়)।

এবং এ জাতীয় আরও উদাহরণ। হানাফীগণের সিয়াসা শব্দের প্রয়োগের অর্থ এই নয় যে, অন্য ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সঠিক হবে না। একারণেই ইবনে নুজাইম উল্লেখ করে বলেছেন: (আমি আমাদের মাশায়েখদের বক্তব্যে সিয়াসার কোনো সংজ্ঞা দেখতে পাইনি)। অতঃপর তিনি এর স্বপক্ষে মাকরিযীর সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, যদিও তা একটি সাধারণ সংজ্ঞা যা কেবল তা'যিরমূলক শাস্তির

সাথে সুনির্দিষ্ট নয়।

---

(১) আন-নাহরুল ফাইক ৩/১৩৫।
(২) আল-হাভী আল-কাবীর ১৭/১১৫।
(৩) নিহায়াতুল মাতলাব ১৫/২৯, রওদাতুত তালিবীন ৮/৩৩৩।
(৪) নিহায়াতুল মাতলাব ১৫/১১৫।
(৫) আল-হাভী ১৪/১৭৬ - ১৭৭, এবং আল-ফুনুন ১/৩৮১, ও ২/৪৯৮।
(৬) আল-বাহরুর রায়েক ৫/৭৬।

আমরা আরও দেখতে পাই যে, মুহাম্মদ ইবনে হাসান উমর কর্তৃক আবু মুসা আল-আশআরীর নিকট প্রেরিত পত্রটিকে ‘কিতাবুস সিয়াসা’ (রাজনীতির কিতাব) বলে অভিহিত করতেন (১)।

তাদের নিকট অপরাধমূলক বিষয় ছাড়াও জনকল্যাণ সাধিত হওয়ার ক্ষেত্রেও ‘সিয়াসা’ শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তারা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে কোনো জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় কোনো দাস মুক্ত করেছে; এমতাবস্থায় তার ‘ওয়ালা’ (উত্তরাধিকার ও পৃষ্ঠপোষকতা) সিয়াসা বা নীতিগত কারণে মুসলিমদের জন্য সাব্যস্ত হবে (২)।

পঞ্চম অর্থ: সত্য উন্মোচনকারী পথসমূহ।

সিয়াসা শরঈয়াহর গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো একে সত্য উন্মোচনকারী পথসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এতে সাক্ষ্য-প্রমাণের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা হয় এবং অপরিবর্তনীয় সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা হয় না; কেননা এতে সত্য প্রতিষ্ঠা এবং জনকল্যাণ ও ন্যায়বিচার বাস্তবায়িত হয়।

এটি হানাফী পদ্ধতির কাছাকাছি (৩)। তবে বলা যেতে পারে যে, এখানে সত্য প্রমাণের পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সুনির্দিষ্ট দিকের প্রতি যত্ন নেওয়া হয়েছে, তাই এর ওপর গুরুত্বারোপ করায় কোনো দোষ নেই, যদিও একে একটি সাধারণ প্রয়োগের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

(১) দেখুন: বাদায়েউস সানায়ে ৭/৯।
(২) দেখুন: আন-নুতরাফ ফিল ফাতাওয়া, আবুল হাসান আস-সুগদী ৪৩৪।
(৩) হানাফীদের নিকট সিয়াসা পরিভাষাটি সত্য পর্যন্ত পৌঁছানোর সহায়ক আলামতগুলোর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হতে পারে। এজন্য দাদাহ আফেন্দী ‘সিয়াসা শরঈয়াহ’ (১০৬ - ১১৭) গ্রন্থে এমন কিছু বিধান উল্লেখ করেছেন যা দণ্ডবিধি ও শাস্তির সীমানা ছাড়িয়ে জনকল্যাণ বিবেচনার সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখানে তিনি পরিস্থিতিগত প্রমাণ, লক্ষণ ও সাক্ষ্য বিবেচনার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এটিই এখানে মূল ভিত্তি। যেমন পদ্ধতিটি পরস্পর নিকটবর্তী; সুতরাং যে ব্যক্তি অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের সময় জনকল্যাণ বিবেচনা করে এবং তাতে সিয়াসা বা প্রশাসনিক কৌশলের আশ্রয় নেয়—জনকল্যাণ অর্জন ও অনিষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে—তাকে অবশ্যই সত্য পর্যন্ত পৌঁছানোর সহায়ক আলামতগুলোও বিবেচনা করতে হবে। উভয় বিষয়ের মধ্যে কিছু সাধারণ মাসআলা রয়েছে, যেমন কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করা এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো। সিয়াসা বিবেচনার মূল চালিকাশক্তি হলো কিছু বিষয়ে শাসকদের জন্য সুযোগ প্রশস্ত করার প্রয়োজনীয়তা যা শরীয়াহর বিরোধী নয়, যাতে যুলুম প্রতিরোধ করা যায় এবং দুর্নীতিবাজদের দমন করা যায়। এটি উভয় প্রয়োগকেই অন্তর্ভুক্ত করে, ফলে এদের

একটি সাধারণ সংজ্ঞার অধীনে আনা সম্ভব।

পৃষ্ঠা 31

এ বিষয়ে যারা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে ইবনুল কাইয়্যিম অন্যতম, তার ‘আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ফিস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ’ গ্রন্থে। তিনি গ্রন্থটির শুরুতে এমন একটি প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন যা এই শরয়ী রাজনীতির দ্বারা তার উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে। তিনি বলেছেন: (ওয়ালি বা বিচারক কর্তৃক তার দূরদর্শিতা বা আলামতসমূহের ভিত্তিতে বিচার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যার মাধ্যমে তার নিকট সত্য প্রকাশিত হয়, এবং আলামত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা, শুধুমাত্র বাহ্যিক সাক্ষ্য-প্রমাণ ও স্বীকৃতির ওপর সীমাবদ্ধ না থাকা) (১)।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: (নিশ্চয় রাজনীতি দুই প্রকার: একটি হলো জালেম রাজনীতি যা শরীয়ত হারাম করেছে, আর অন্যটি হলো ন্যায়নিষ্ঠ রাজনীতি যা পাপাচারী জালিমের কাছ থেকে সত্যকে বের করে নিয়ে আসে, আর তা শরীয়তেরই অংশ) (২)।

একই পথ অনুসরণ করেছেন ইবনু ফারহুন তার ‘তাবসিরাতুল হুক্কাম’ গ্রন্থে। তিনি বলেন: (রাজনীতি দুই প্রকার: একটি জালেম রাজনীতি যা শরীয়ত হারাম করেছে, আর অন্যটি ন্যায়নিষ্ঠ রাজনীতি যা জালিমের কাছ থেকে সত্য বের করে আনে এবং অনেক জুলুম প্রতিহত করে, আর ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের নিবৃত্ত করে। এর মাধ্যমে শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হয়। সুতরাং শরীয়ত এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা এবং সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এর ওপর নির্ভর করাকে আবশ্যক করে দেয়) (৩)।

এই অর্থ অনুযায়ী শরয়ী রাজনীতির কিছু উদাহরণ হলো:

– কারিগর ও তাদের ন্যায় পেশাজীবীদের দায়বদ্ধ করার মাধ্যমে বিচার করা। কারিগররা তারা যা তৈরি বা মেরামত করতে নেয় তার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে যদি তারা নিজেদেরকে সেই কাজের জন্য নিয়োজিত করে; তারা তা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করুক বা পারিশ্রমিক ছাড়া (৪)।

– এর অন্তর্ভুক্ত হলো অভিযুক্তদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, তাদের ব্যাপারে বিশদ অনুসন্ধান করা এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আলামতগুলো বিবেচনা করা: (যদি আমরা তাদের প্রত্যেককে শপথ করিয়ে ছেড়ে দেই, অথচ জমিনে তাদের ফাসাদ ও চুরির আধিক্যের বিষয়টি সুপরিচিত, এবং আমরা যদি বলি যে: ‘আমরা তাকে দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া পাকড়াও করব না’, তবে এই কাজ শরয়ী রাজনীতির পরিপন্থী হবে) (৫)।

---

(১) আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, ১/৩-৪।
(২) আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, ১/৭-৮।
(৩) তাবসিরাতুল হুক্কাম, ২/১৩৭।
(৪) তাবসিরাতুল হুক্কাম, ২/৩২৩; এবং দেখুন: মুয়ীনুল হুক্কাম, ২০০; এবং আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর খেলাফতে শরয়ী রাজনীতিতে কারিগরদের দায়বদ্ধ করার আলোচনা সামনে আসবে।
(৫) আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, ১/৩২।

- (যদি কোনো ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে নিজেই মামলা লড়ে এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে তিনবার বিচারকের সামনে উপস্থিত হয়, তবে তার জন্য কোনো প্রতিনিধি বা উকিল নিয়োগ করার অধিকার নেই, যতক্ষণ না সে অসুস্থ হয় অথবা সফরের সংকল্প করে। ইবনুল আত্তার বলেন: তাকে শপথ করতে হবে যে, সে উকিল নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে সফরের বাহানা করছে না। যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে সে উকিল নিয়োগ করতে পারবে না। সুতরাং এখানকার এই শপথ গ্রহণ 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বা শরয়ি প্রশাসনিক নীতির অন্তর্ভুক্ত)(১)।

ষষ্ঠ অর্থ: আভিধানিক অর্থে ব্যবহার।

আর তা হলো, এই পরিভাষাটিকে তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা, যা কোনো বিষয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং তার উত্তম ব্যবস্থাপনার অর্থ প্রদান করে। আর: (সিয়াসাহ হলো কোনো বিষয়কে সংশোধনের নিমিত্তে তার রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা)(২)।

তাই আপনি 'সিয়াসাহ' শব্দটিকে অনেক বিষয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হিসেবে দেখতে পাবেন। যেমন বলা হয়: মানুষের সিয়াসাহ বা ব্যবস্থাপনা(৩), দুনিয়ার সিয়াসাহ(৪), উম্মাহর সিয়াসাহ(৫), প্রজাসাধারণের সিয়াসাহ(৬), সাধারণ জনগণের সিয়াসাহ(৭), ভূখণ্ডের সিয়াসাহ(৮), সেনাবাহিনীর সিয়াসাহ(৯), যুদ্ধের সিয়াসাহ(১০), শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের সিয়াসাহ(১১), সন্তান প্রতিপালনের সিয়াসাহ(১২), অধীনস্থদের সিয়াসাহ(১৩) এবং গবাদি পশুর সিয়াসাহ(১৪)... ইত্যাদি। পূর্বোক্ত সব ক্ষেত্রে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—এইসব বিষয়ের দায়িত্ব পালন এবং সেগুলোর উত্তম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

---

(১) তাবসিরাতুল হুক্কাম ২/২১১।
(২) আল-বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ ৩/৩৯৩।
(৩) দেখুন: আদ-দাখিরা ১৩/২৮৬, তুহফাতুল মুহতাজ ৯/৭০।
(৪) তুহফাতুল মুহতাজ ৯/৭৫।
(৫) দেখুন: শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ৩/৩৮৯।
(৬) দেখুন: আদ-দাখিরা ১০/৩১, মুগনিল মুহতাজ ৫/৪২১।
(৭) দেখুন: কাশফুল আসরার ওয়া হাতকুল আস্তার, আল-বাকিল্লানি ৬৯৯।
(৮) দেখুন: আত-তাজরিদ, কুদুরি ১২/৬৫৩৪।
(৯) দেখুন: আদ-দাখিরা ৪/২৪৬।
(১০) দেখুন: নিহায়াতুল মাতলাব ১১/৪৬৩, আদ-দাখিরা ২/২৫৬।
(১১) দেখুন: আল-মাদখাল, ইবনুল হাজ্জ ১০৩।
(১২) দেখুন: আল-মাদখাল, ইবনুল হাজ্জ ৪/২৯৫।
(১৩) দেখুন: মুখতাসারুত তিরমিজি, তুফি ২/৩৪৩।
(১৪) দেখুন: নিহায়াতুল মাতলাব ১৫/৫৭০, এবং দেখুন: ৫/২৯৩।

এর কাছাকাছি হলো একে 'দৃঢ়তা' (হা্যম)-এর সাথে যুক্ত করে ব্যবহার করা। তখন বলা হয়: "এটি দৃঢ়তা ও সুপরিচালনার (সিয়াসাত) অন্তর্ভুক্ত।" অথবা এটি শাসকদের প্রশংসার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় যে, তিনি উত্তম পরিচালনা করেছেন।

অতএব মানুষের পরিচালনার (সিয়াসাত) অর্থ হলো তাদের সাথে কোমলতা অবলম্বন করা এবং পর্যায়ক্রমিক ধারা ও নম্রতার সাথে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করা। যেমন ইবনুল হাজ্জ জনৈক ব্যক্তির জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: (আমার শায়খ হাসান আয-যুবাইদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: আমি চাই না যে কোনো নেককার বা আলেম আমার কাছে আসুক, কারণ আমার প্রতি তাদের কোনো প্রয়োজন নেই এবং তাদের প্রতিও আমার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আমি এমন ব্যক্তিকে চাই যে তার রবের দরবার থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, যাতে আমি তাকে রবের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারি—অথবা এই জাতীয় কোনো কথা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি বাজারে বসে থাকে, আলেম ও নেককারদের কাছে আসে না, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় না এবং নিজের এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে, সে তার রবের দরবার থেকে পলায়নকারী। সুতরাং এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলেমের দায়িত্ব হলো তাকে পরিচালনা করা, যতক্ষণ না তিনি তাকে তার রবের দরবারে পৌঁছে দেন।)

তিনি বলেন: (এর উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তি, যিনি পুণ্য ও কল্যাণের অধিকারী এবং আল্লাহ তাকে চূড়ান্ত স্তরের মাকামসমূহের কোনো একটিতে অধিষ্ঠিত করেছেন; যখন তার কাছে এমন কেউ আসে যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে ও তওবা করতে চায়, তখন তিনি চান তৎক্ষণাৎ তাকে তার নিজের স্তরে বা মাকামে পৌঁছে দিতে, অথচ এর আগে তার কোনো পরিচালনা বা পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।)

(ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুসারীগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইমাম মালেকের কোনো 'গোপন কিতাব' ছিল না। আর এতে এমন অনেক আপত্তিকর বিষয় ছিল যা ইমাম মালেক ছাড়া অন্য কেউও জায়েজ মনে করতেন না, তাহলে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে তা কীভাবে সম্ভব? ইমাম মালেকের ব্যাপারে যা বর্ণনা করা হয়—যে তিনি অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল খলিফাকে বিশেষ ছাড় দিতেন—বাস্তবতা ছিল তার ঠিক বিপরীত। বরং তিনি তাদের প্রতি কঠোর ছিলেন এবং সুকৌশলে তাদের পরিচালনা করতেন, যাতে তাদের আভিজাত্যের পর্যায় থেকে সাধারণ মুসলমানদের পর্যায়ে নামিয়ে আনেন। যেমনটি মুয়াত্তা পাঠ করার ক্ষেত্রে খলিফার সাথে তাঁর আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল।)

---

(১) শারহুস সইয়ারিল কাবীর, আস-সারাকসী, ১/১৯২।
(২) দেখুন: আল-ইশারাতুল ইলাহিয়্যাহ ফিল মাবাহিসিল উসুলিয়্যাহ, আত-তুফী, ২/৩৪৪।
(৩) আল-মাদখাল, ইবনুল হাজ্জ, ২/৮৭।
(٤) আল-মাদখাল, ইবনুল হাজ্জ, ৩/১৫২; অনুরূপ দেখুন: ১/১১৩।
(৫) আল-মাদখাল, ২/১৯২।

সিয়াসা শব্দের এই ভাষাগত অর্থ এবং প্রথম অর্থের মধ্যে পার্থক্য হলো: এখানে এর ব্যবহার কেবলমাত্র সেই বিষয়ের ব্যবস্থাপনা এবং সংশোধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ যার দিকে এটি সম্বন্ধিত করা হয়েছে। সুতরাং এটি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এখানে সিয়াসা শব্দটির পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব এবং তাতে অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। পক্ষান্তরে, প্রথম অর্থটি স্বয়ং জনকল্যাণ এবং সংশোধন প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত; তা সাধারণ বা বিশেষ যে কোনো বিষয়ের সাথেই

সংশ্লিষ্ট হোক না কেন। এক্ষেত্রে সিয়াসা শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর অর্থ রয়েছে।

এই ভূমিকার সারসংক্ষেপ:

পূর্ববর্তী ফকীহগণের সিয়াসা পরিভাষার ব্যবহারের এই অনুসন্ধানের পর, আমরা নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলগুলো বের করতে পারি:

প্রথমত: পূর্ববর্তী ফকীহগণের নিকট এই পরিভাষাটির কোনো অবিচ্ছিন্ন বা সুস্পষ্ট ব্যবহার ছিল না। এর কারণ হলো, এ ধরনের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার অভাব এবং এর থেকে অর্জিত কোনো সুফলের অনুপস্থিতি। সুতরাং তাদের জন্য একটি একক ব্যবহারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার কোনো অর্থ ছিল না। এর প্রয়োজনীয়তা না থাকার প্রমাণ হিসেবে ইবনে নুজাইম (৯৭০ হিজরি) বলেন: "আমি আমাদের মাশায়েখগণের বক্তব্যে সিয়াসার কোনো সংজ্ঞা দেখিনি।" সুতরাং তাদের এই সংজ্ঞা প্রদান থেকে বিমুখ থাকা এর প্রয়োজনীয়তার অভাবকেই উন্মোচিত করে।

দ্বিতীয়ত: কোনো পরিভাষাকে একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে, অন্য কোনো অর্থে এর ব্যবহার প্রত্যাখ্যাত হবে। বরং এর সর্বোচ্চ সীমা এই যে, সেই অর্থে পরিভাষাটির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য ছিল; এর অর্থ এই নয় যে অন্য অর্থটি সঠিক হবে না।

তৃতীয়ত: এর ভিত্তিতে, আমরা এই সংজ্ঞাগুলোর কোনোটির চুলচেরা বিশ্লেষণ করার, সেগুলোর ত্রুটি বর্ণনা করার অথবা সেগুলো গঠনের ক্ষেত্রে অধিকতর উত্তম কোনো প্রস্তাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করি না। কারণ বিষয়টি এমন এক পরিভাষা সংশ্লিষ্ট যাকে তারা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত (জামে-মানে) করতে চাননি। সুতরাং এ ধরনের চুলচেরা বিশ্লেষণের কোনো যৌক্তিকতা নেই এবং এর থেকে কোনো সুফলও নেই। বরং মূল উদ্দেশ্য হলো তারা এই পরিভাষাটি কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন তা জানা, সিয়াসার জন্য কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা বের করা নয়।

---

(১) আল-বাহরুর রায়েক, ৫/৭৬।

চতুর্থত: এই ব্যবহারসমূহের সাধারণ ভিত্তি হলো জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ; এটি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে জনকল্যাণ অর্জনের একটি প্রয়াস। এটি দ্বীন ও দুনিয়া এবং সাধারণ ও বিশেষ সব ধরনের জনকল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিস্তৃত হতে পারে। আবার এটি কেবল শাসকের কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে, অথবা শাসক বা বিচারকদের কোনো নির্দিষ্ট আচরণের ক্ষেত্রে সংকুচিত হতে পারে।

এমনকি যা শরয়ী দলীল বা নস-এর সাথে সংশ্লিষ্ট, তা-ও এর বাস্তবায়ন, এর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং তা পালনে বাধ্য করার ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক রাজনীতির মুখাপেক্ষী। সুতরাং, এই অর্থগুলোর সমষ্টি থেকে রাজনীতির একটি সামগ্রিক অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে যা জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদের সাথে সম্পর্কিত।

পঞ্চমত: এই ব্যবহারগুলোর অধিকাংশ কেবল 'রাজনীতি' শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যৌগিক শব্দ 'শরয়ী রাজনীতি' ব্যবহৃত হয় না। এই যৌগিক শব্দটি কেবল নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে এসেছে; যেমন হানাফী ফকীহগণ কর্তৃক শাস্তির (তা’যীর) ক্ষেত্রে এর ব্যবহার, অথবা বিচারব্যবস্থায় সত্য উদঘাটনের পথে সহায়ক উপায়সমূহের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার। আবার শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার কিতাবের শিরোনামের মতো ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহৃত হয়েছে। যারা সাধারণভাবে 'রাজনীতি' শব্দটি ব্যবহার করেন, তাদের উদ্দেশ্য মূলত এটিই। সুতরাং সাধারণভাবে রাজনীতি বলতে শরীয়তের অনুগামী রাজনীতিই উদ্দেশ্য। কারণ যখন স্বীকৃতির ক্ষেত্রে রাজনীতি শব্দটি উল্লেখ করা হয়, তখন তা শরয়ী রাজনীতিকেই বোঝায়। আর বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্রে যালিম রাজনীতির

বিপরীতে ইনসাফপূর্ণ রাজনীতির কথা উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয় ভূমিকা

আধুনিক গবেষকদের নিকট সিয়াসা শারইয়্যার সংজ্ঞা

যখন এটি স্থির হয়েছে যে, সিয়াসা শারইয়্যা (শরীয়তসম্মত রাজনীতি) পরিভাষাটি পূর্ববর্তী ফকীহগণের নিকট কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হতো না, তখন বর্তমান যুগে বিষয়টি ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। সমসাময়িকদের নিকট এই পরিভাষাটির প্রতি গুরুত্বারোপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ দাঁড়িয়েছে। এটি এমন এক ধারণা যার দ্বারা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জনকল্যাণ সাধন এবং ক্ষতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি ও জনশৃঙ্খলা পরিচালনা করা বুঝায়।

পরবর্তী যুগের ফকীহগণের পদ্ধতি যদি দণ্ডবিধি (হুদুদ) ও শাস্তির (তা'যীরাত) মতো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ‘সিয়াসা’ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে বাস্তবে এর ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত। এটি প্রশাসনের সকল কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এর মাধ্যমে শরীয়ত যা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য করেছে—অর্থাৎ সংকীর্ণতা দূর করা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা—তা অর্জন করা সম্ভব।(১)

আমরা এখানে দেখতে পাব যে, সিয়াসা শারইয়্যার প্রত্যেক গবেষকই এর একটি সর্বোত্তম সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেন। এই সমস্ত সংজ্ঞা সিয়াসা শারইয়্যার তিনটি মৌলিক স্তম্ভের উপস্থিতিকে তুলে ধরে, আর সেগুলো হলো:

১. শাসনকার্য পরিচালনার সাথে এর সম্পৃক্ততা।
২. জনকল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা।
৩. শরীয়তের বিধানের সাথে এর বৈপরীত্য না থাকা।

তবে আমরা সমসাময়িকদের মধ্যে সিয়াসা শারইয়্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য লক্ষ্য করি। সিয়াসা শারইয়্যার সীমানায় কোন কোন শরয়ী বিধান অন্তর্ভুক্ত হবে, সে বিষয়ে তারা দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়েছেন:

---

(১) দেখুন: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ওয়াল ফিকহুল ইসলামী, আব্দুর রহমান তাজ, পৃষ্ঠা: ৩১ - ৩৩।

প্রথম ধারা: যারা মনে করেন যে, আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি) সমস্ত শরয়ী বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে, চাই তা

সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হোক বা না হোক।

এর মধ্যে রয়েছে শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ কর্তৃক আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ-এর সংজ্ঞা। তিনি বলেন: (ইসলামী রাষ্ট্রের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির এমন ব্যবস্থাপনা যা জনকল্যাণ নিশ্চিত করে এবং ক্ষয়ক্ষতি প্রতিহত করে; যা শরীয়তের সীমানা এবং এর সামগ্রিক মূলনীতিসমূহ অতিক্রম করে না, যদিও তা মুজতাহিদ ইমামগণের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়) (১)।

শায়খ মুহাম্মদ আল-মারগী বলেন: (আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ হলো ইসলামী শরীয়তের নিয়মনীতি অনুযায়ী বান্দাদের স্বার্থের তদারকি করা; যে বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ-তে স্পষ্ট বিধান রয়েছে অথবা যে বিষয়ে মুসলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন—চাই তা ওয়াজিব হোক বা হারাম—তা অনুসরণ করা এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এমন কোনো নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা বৈধ নয় যা এর সাথে সাংঘর্ষিক হয় বা একে ধ্বংস করে। আর যে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট বিধান নেই বা কোনো ঐকমত্য নেই, তা হলো ইজতিহাদের ক্ষেত্র) (২)।

শায়খ আলী আল-খাফীফ তাঁর 'আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ' গ্রন্থে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাতে এটি স্পষ্ট যে, তিনি আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ-কে একটি ব্যাপক ধারণা হিসেবে দেখেন। কেননা তিনি খিলাফত এবং ইমামদের (শাসকদের) বিধান সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি শুরু করেছেন, এরপর শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ-এর রাজনীতি উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন যে তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে: (তিনি যেসব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, যেসব বিধান শরীয়ত হিসেবে প্রণয়ন করেছেন, যেসব বিষয় অনুমোদন করেছেন এবং মুয়ামালাত (লেনদেন) ও শাসনপদ্ধতি সংক্রান্ত যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন) (৩)।

এছাড়াও আরও অনেকে রয়েছেন (৪)।

---

(১) আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ, আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ ১৪।
(২) আল-ইজতিহাদ ফিল ইসলাম ৫৫।
(৩) দেখুন: আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ, আলী আল-খাফীফ, মাওসুআতুল আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ ৩/১০৭; অনুরূপভাবে শায়খ মুহাম্মদ আস-সাইয়্যিস, আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ-তে, মাওসুআতুল আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ ৪/১৩ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।
(৪) আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ হালতু গিয়াবি হুকমিন ইসলামিয়িন আন দিয়ারিল মুসলিমীন, আহমদ মুহিউদ্দীন সালিহ ২২; আল-মুওয়াজানা বাইনাল মাসালিহ, আহমদ আত-তায়ী ১৯৬ - ১৯৭; আল-ফিকহুস সিয়াসি ইনদাল ইমাম আলী বিন আবী তালিব, কামারুয যামান গাজ্জাল ৪৩ - ৪৫; আল-মারজিয়্যাহ ফী দাউয়িস সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ, ত্বহা আয-যাইদী ৩৫ - ৩৭; কিরাআতুন ফী কুতুবিস সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ, মুহাম্মদ শাকির আশ-শরীফ ৬; তাসীলে ফিকহিল আওলাউইয়্যাত।

দ্বিতীয় অভিমত: যারা মনে করেন যে, সিয়াসাহ শারইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি) ঐ সকল বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট যেগুলোর ব্যাপারে কোনো (সুস্পষ্ট) নস বা দলিল বিদ্যমান নেই।

তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

শায়খ আবদুল্লাহ সিয়াম সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর সংজ্ঞায় বলেন: “(সুনির্দিষ্ট) শরয়ি নস নেই—এমন কোনো বিষয়ে আকল বা বিবেকের মাধ্যমে ইনসাফের পথ এবং এর নিদর্শন ও চিহ্নসমূহকে চিহ্নিত করা; আর এর জন্য শরীয়তের মূলনীতি, নিয়ম-কানুন ও

বিধানাবলি থেকে সাহায্য ও নির্দেশনা গ্রহণ করা।”(১)

শায়খ আবদুর রহমান তাজ ব্যাখ্যা করেছেন যে, রাজনীতি ফিকহের প্রতিটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এটি বিশেষভাবে ঐ সকল বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট যেগুলো কোনো এক অবস্থায় স্থির থাকে না, বরং যুগ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে ভিন্নতর হয় এবং যেগুলোর স্বপক্ষে আমরা (সুনির্দিষ্ট) কোনো দলিল পাই না।(২)

ডক্টর আবদুল আল আতওয়া সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: “ইসলামী রাষ্ট্রের এমন সকল বিষয়াবলি পরিচালনা করা যেগুলোর বিধান সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট নস বর্ণিত হয়নি, অথবা যা উম্মাহর স্বার্থের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন ও রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা রাখে এবং যা শরীয়তের বিধান ও এর সাধারণ মূলনীতিসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ।”(৩)

এবং অন্যান্যরা।(৪)

= দ্বীন রক্ষায় এর প্রয়োগ সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর ক্ষেত্রে, মুহাম্মাদ হাম্মাম ২৬৫, সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যার শরয়ি বিধানাবলি, আতিয়্যাহ আদলান ১৪-১৫, সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-তে মাসলাহাহ বা জনস্বার্থের প্রভাব, আন-নুআইমি ১৩১, সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-তে ইজতিহাদের উসূলি নীতিমালা, আল-আনি ৭৮-৭৯, ইসলামে নারী ও রাজনৈতিক অধিকার, মাহমুদ আবু হুজাইর ২২-২৩, সিয়াসাহ শারইয়্যাহ, আকরাম কাসসাব ২৭, ইসলাম এবং বিধানাবলিকে বিধিবদ্ধ করা, আবদুর রহমান আল-কাসিম ৮৩।

(১) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়া কাওয়াইদুল আদল ওয়াল ইনসাফ ফিল কানুন, আবদুল্লাহ সিয়াম, মাওসুআতুল আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ-এর অন্তর্ভুক্ত ৩/২৫১।

(২) দ্রষ্টব্য: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়াল ফিকহুল ইসলামী ৩৫-৩৬।

(৩) আল-মাদখাল ইলাস সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, আবদুল আল আতওয়া ৫৬।

(৪) দ্রষ্টব্য: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, আবদুল্লাহ আল-কাদি ৩৫-৩৬; নবী ﷺ-এর আর্থিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ, মুহাম্মাদ মাহমুদ আবু লাইল ২০; সিয়াসাহ শারইয়্যাহ ও ব্যক্তিগত আইন ২৪; পরিণামসমূহ এবং সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর বিধানে তার প্রভাব, মুহাম্মাদ আস-সামাররায়ি ৫৯; এবং এটিই মাওসুআতুল আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ৪/১৪৭-এ আয-যালবানির প্রকাশ্য উদ্দেশ্য; আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ।

পৃষ্ঠা 39

আমরা বলতে পারি যে, সিয়াসাহ শারইয়্যাহর (শরয়ি রাজনীতি) দুটি ধারণা রয়েছে: একটি সাধারণ ধারণা যা প্রথম ধারা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়, এবং একটি বিশেষ ধারণা যা দ্বিতীয় ধারা দ্বারা উপস্থাপিত হয় (১)।

উভয় ধারার মধ্যে পার্থক্য শরীয়তের অকাট্য দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত (নসকৃত) বিষয়সমূহের সাথে সম্পৃক্ত: যেমন দণ্ডবিধি কার্যকর করা (হদ), কিসাস, এবং ক্রয়-বিক্রয়, সুদ ও বিবাহ ইত্যাদির অধ্যায়ে ঐকমত্যপূর্ণ বিচার বিভাগীয় বিধানসমূহ। যারা মনে করেন সিয়াসাহ শারইয়্যাহ কেবল ঐসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যেগুলোর ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট 'নস' নেই, তারা এই বিষয়গুলোকে সিয়াসাহ শারইয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না, যদিও তা সাধারণ রাজনীতির পরিসরে সংঘটিত হতে পারে। এগুলো তাদের নিকট সিয়াসাহ শারইয়্যাহর বিষয়বস্তু নয়, কারণ এখানে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কেবল আনুগত্য ও বাস্তবায়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে রাজনৈতিক ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই। অন্যদিকে যারা একে একটি সাধারণ ধারণা মনে করেন, তারা এই সকল বিষয়কে এর অন্তর্ভুক্ত করেন, কারণ এগুলো রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এতে কর্তৃপক্ষের একটি ভূমিকা রয়েছে।

উভয় ধারার মধ্যকার এই মতপার্থক্য মূলত পরিভাষাগত যা নামকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এটি একটি সাধারণ বিষয়। তবে যারা বলেন যে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ কেবল ঐসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যেগুলোতে কোনো স্পষ্ট 'নস' নেই, তাদের মতটি অধিক শক্তিশালী; কারণ অকাট্য বিষয়সমূহে সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ভূমিকা কেবল হুকুম বাস্তবায়ন এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর মধ্যে

সীমাবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে যেসকল বিধানের ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট 'নস' বিদ্যমান নেই, সেখানে রাজনীতির ভূমিকা অধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এটাই এই ধারণাকে স্বাতন্ত্র্য দান করে এবং এর প্রভাব সুস্পষ্ট করে। সিয়াসাহ শারইয়্যাহর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনার সময় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে।

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ বিজ্ঞান:

বেশ কিছু সমকালীন গবেষক সিয়াসাহ শারইয়্যাহকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন।

= আলী আয-যাহরানি ২৩, আল-মাদখাল ইলা আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়াল আনজিমাহ আল-মারইয়্যাহ, নাসের আল-গামদি ৩৩, আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়া আসারুহা ফিল হুকমি আশ-শারয়ি, নুসাইবাহ আল-বুগা ৪৬, আদ-দারাই ফিল সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়াল ফিকহিল ইসলামি, ওয়াহবাহ আয-জুহায়লি ১০, আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ইব্রাহিম আব্দুল রহিম ৪৪।

(১) দেখুন: আদওয়া আলা আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, সাদ মাতার আল-উতাইবি ১৮-২০, ফিকহুল মাআলাত ওয়া আসারুহু ফিল ইলাকাত আদ-দাওলিয়্যাহ, হাযেম আল-বাসসাম ৪৭, আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ইব্রাহিম আব্দুল রহিম ৪২-৪৩, আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ইনদাল জুওয়াইনি, ওমর আয-যাবদানি ৩২।

এদের মধ্যে রয়েছেন শেখ আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ, তার ‘আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ’ নামক গ্রন্থে। সেখানে তিনি সিয়াসা শারইয়্যাহকে একটি শাস্ত্র হিসেবে গণ্য করে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন: (সিয়াসা শারইয়্যাহর জ্ঞান হলো এমন এক শাস্ত্র, যাতে ইসলামের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন ও ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যাবলি পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়, যদিও প্রতিটি ব্যবস্থাপনার ওপর কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল বিদ্যমান না থাকে) (১)।

অতঃপর তিনি গ্রন্থটি এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, সেখানে সাংবিধানিক রাজনীতি, সাধারণ কর্তৃপক্ষসমূহ, পররাষ্ট্রনীতি এবং অর্থবিষয়ক নীতি আলোচনা করেছেন।

অনুরূপভাবে শেখ মুহাম্মদ আল-বান্নাও বলেছেন: (এটি এমন এক শাস্ত্র যাতে ইসলামের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন ও ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যাবলি পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়, যদিও প্রতিটি ব্যবস্থাপনার ওপর কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল বিদ্যমান না থাকে) (২)।

শেখ রিজক আল-যালবানী বলেছেন: (সিয়াসা শারইয়্যাহ হলো এমন এক শাস্ত্র যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার পরিপন্থী নয়—এমনভাবে প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী সামষ্টিক বিষয়াবলি পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়, যদিও প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর কোনো আংশিক দলিল বিদ্যমান না থাকে) (৩)।

এবং সমসাময়িক আরও অনেকে (৪)।

তারা সিয়াসা শারইয়্যাহকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে গণ্য করার স্বপক্ষে বেশ কিছু যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

---

(১) আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ, আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ ৪।
(২) আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ, মুহাম্মদ আল-বান্না, মাওসুআতুস সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ২/১৪৭ এর অন্তর্ভুক্ত; যেমনটি আল-জাযায়রি ‘আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ’ ১২ পৃষ্ঠায় একমত পোষণ করেছেন।
(৩) আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ, রিজক মুহাম্মদ আল-যালবানী, মাওসুআতুস সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ৪/১৬০ এর অন্তর্ভুক্ত।
(৪) দেখুন: আল-মাদখাল ইলাস সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ, আব্দুল আল-আত্বওয়াহ ১০-১১ ও ৫৭; আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ওয়া ইলাক্বাতুহা বিত-তানমিয়াহ আল-ইকতিসাদিয়াহ, ফুয়াদ আব্দুল মুনইম ৩৯-৪৫; ইলমুস সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ইনদাল ইমাম ইবনুল কায়্যিম, আব্দুল্লাহ আল-হুজাইলি; আদওয়াউ আলাস সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ৩১; আল-মাদখাল ইলাস সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ওয়াল আনযিমাহ আল-মারইয়্যাহ ৩৫; আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ, আব্দুল্লাহ আল-ক্বাযী ৩৭।

পৃষ্ঠা 41

১- সূক্ষ্ম বিশেষায়িত বিষয়সমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার গুরুত্ব, যেমনটি বর্তমান যুগের গবেষকদের রীতি; কেননা তারা প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নির্ধারণ করেছেন, যেমন তারা বিচার বিভাগীয় বিজ্ঞান (ইলমুল কাজা), উত্তরাধিকার বিজ্ঞান (ইলমুল ফারায়েজ) এবং অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেন (১)।

২- সিয়াসাহ শারইয়্যাহর (শরিয়াহভিত্তিক রাজনীতি) সাথে জনকল্যাণের সম্পৃক্ততা; আর বিজ্ঞানসমূহ তাদের বিষয়বস্তু ও মাসআলাসমূহের মাধ্যমে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়।

৩- এর সাথে সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহের অধ্যয়ন সহজতর করা (২)।

৪- সিয়াসাহর বিষয়বস্তুগুলোকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের অধীনে বিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা, যা এর বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্রিত করবে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে একে পূর্ণ মর্যাদা দান করবে, বিশেষ করে এ বিষয়ে প্রাচীন লেখনীর স্বল্পতার কারণে (৩)।

এখানে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ বিজ্ঞানকে পর্যালোচনার দুটি দিক রয়েছে:

প্রথম দিকটি হলো নামকরণের ক্ষেত্রে: আর এ বিষয়টি প্রশস্ত। কোনো নির্দিষ্ট জ্ঞানীয় ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হবে নাকি অন্য কোনো বিজ্ঞানের অনুসারী হিসেবে, তা মূলত একটি পারিভাষিক বিষয়। সুতরাং একে সিয়াসাহ বিজ্ঞান বলা হোক বা সিয়াসাহ অধ্যায় কিংবা সিয়াসাহর ক্ষেত্র, তা এখানে আলোচিত বিষয়ের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

দ্বিতীয় দিকটি হলো বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে: এর ফলে একটি সুস্পষ্ট ও উপকারী ফলাফল অর্জিত হয়। কারণ সাধারণ রাজনীতি এবং আধুনিক আইনে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সংক্রান্ত মাসআলাগুলো একটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ করা হয়; যেখানে এর মাসআলাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো স্পষ্ট করা হয়। এর মাসআলাগুলোতে পৌঁছানো সহজতর করতে এবং এর বিষয়বস্তু উপলব্ধির কাছাকাছি আনতে এর বড় ধরণের উপযোগিতা রয়েছে। এটি এই অধ্যায়ের মাসআলাগুলোর সামগ্রিক ধারণা গঠনের ক্ষেত্রেও সহায়ক।

(১) দেখুন: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ফিল আহওয়ালিশ শাখসিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৩।

(২) দেখুন: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়া আলাকাতুها বিত-তানমিয়াতিল ইকতিসাদিয়্যাহ, ফুয়াদ আব্দুল মুনঈম, পৃষ্ঠা ৪৫।

(৩) দেখুন: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়া আসারুহা ফিল হুকমিশ শারয়িয়্যিত তাকলিফি, পৃষ্ঠা ৬০।

পৃষ্ঠা 42

তৃতীয় ভূমিকা

সিয়াসাহ শারইয়্যাহর (শরয়ি রাজনীতি) পরিধির অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলির সীমানা

আমরা পূর্ববর্তী ভূমিকায় উল্লেখ করেছি যে, সিয়াসাস শারইয়্যাহ জনগণের জনস্বার্থ পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এটি সেই শরয়ি বিষয়গুলোর জন্য একটি সীমানা নির্ধারণ করবে যা এই সিয়াসাহ শারইয়্যাহর আওতার বাইরে থাকবে এবং এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে না। তার মধ্যে রয়েছে:

১- **অকাট্য বিধানসমূহ:**

শরীয়তের প্রতিটি অকাট্য বিধানই এই সিয়াসাহ শারইয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ মূল বিধানের ক্ষেত্রে সিয়াসাহ শারইয়্যাহর কোনো প্রভাব নেই। রাজনীতি বা সিয়াসাহ মূলত জনস্বার্থের সাধারণ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট, আর অকাট্য বিধান হচ্ছে এমন বিষয় যা মেনে চলা এবং যার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক। এখানে অকাট্য বিধানের অন্তর্ভুক্ত হলো আক্বিদা (বিশ্বাস), ইবাদত এবং আখলাকের (চরিত্র) মূলনীতিসমূহ।

তবে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ এগুলোর ওপর দুটি দিক থেকে আপতিত হয়:

প্রথম দিক: জনস্বার্থের ক্ষেত্রে এই বিধানটি প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত নির্বাহী পদক্ষেপসমূহ। যেমন: ক্বিসাস (প্রতিশোধ গ্রহণ) একটি অকাট্য শরয়ি বিধান, কিন্তু এই ক্বিসাস কার্যকর করার প্রক্রিয়া—চাই তা বিচারিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করার প্রক্রিয়া হোক কিংবা দণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি হোক—যা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনীতির মুখাপেক্ষী, তা সিয়াসাহ শারইয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দিক: বিধানটির ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বিষয়, যেমন: চরম আবশ্যকতা (জরুরত), বিশেষ প্রয়োজন (হাজাত), অক্ষমতা এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো, যা সামনে আলোচনা হতে যাওয়া ‘স্বার্থ ও ক্ষতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা’র মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সিয়াসাহ শারইয়্যাহর একটি ভূমিকা রয়েছে।

পৃষ্ঠা 43

আর এই দুই দিক বাদে যে অকাট্য বিধান রয়েছে, তা যদি কোনো সাধারণ বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়, তবে সেক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা হলো কেবল তা কার্যকর করা। ফলে তা শরয়ী রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে পূর্বোল্লিখিত সমকালীন কোনো কোনো আলিমের মতানুযায়ী, বিধানসমূহ সরাসরি দলীল দ্বারা প্রমাণিত হোক বা না হোক, সেগুলোকে রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা

করলে বিষয়টি ভিন্ন। অবশ্য এই পারিভাষিক বিষয়টি সহজতর।

২. বিশুদ্ধ ইবাদাতসমূহ:

মূলগতভাবে ইবাদাতের ক্ষেত্রে শরয়ী রাজনীতির কোনো অবকাশ নেই; চাই তা ওয়াজিব হোক কিংবা মুস্তাহাব, অথবা ইবাদাতের শর্ত, রুকন ও প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে হোক। মূলত দুটি কারণে ইবাদাতের বিষয়ে রাজনীতির কোনো প্রবেশাধিকার নেই:

প্রথম কারণ: রাজনীতি হলো শরীয়তের সীমানার ভেতরে থেকে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনা। সুতরাং ইবাদাতের নির্ধারিত সীমানার কোনো কিছুই পরিবর্তন করার অধিকার রাজনীতির নেই।

দ্বিতীয় কারণ: ইবাদাতের বিষয়ে রাজনীতির হস্তক্ষেপ করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। তবে যদি ইবাদাতের কোনো অংশ সাধারণ জনকল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে সেই সাধারণ কল্যাণের সীমানা পর্যন্ত শরয়ী রাজনীতির বৈধতা থাকে।

এর উদাহরণ হলো: মসজিদে জামায়াত কায়েমের সময় নির্ধারণ করে দেওয়া। মূলত জামায়াতে সালাত আদায় করা ইবাদাতের একটি বিষয়, যা শরয়ী রাজনীতির বিশেষায়িত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে শরীয়ত অনুযায়ী সালাত আদায়ের সময়টি প্রশস্ত। এখন জনগণের সাধারণ কল্যাণের দাবি হতে পারে জামায়াত কায়েমের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেওয়া, যাতে তারা একত্রিত হতে পারে। সুতরাং এটি সাধারণ জনকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে, এই ওয়াজিব কর্মটি পালনের সময়সীমা নির্ধারণ করা শরয়ী রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. পরিমাপ, নিসাব এবং শরয়ী দণ্ডবিধি:

শারী’ (বিধানদাতা) যে সমস্ত সময়, স্থান, সংখ্যা বা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই সীমানা পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই। তদুপরি এই সীমানাগুলো পরিবর্তন করার মধ্যে কোনো কল্যাণও নিহিত নেই।

যাকাতের নিসাবসমূহ, যেমন গবাদি পশুর নিসাব, স্বর্ণ ও রূপা (মুদ্রাদ্বয়), ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসল এবং তা থেকে প্রদেয় পরিমাণ, মিরাসি স্বত্ব বা উত্তরাধিকারের অংশসমূহ, হদ বা দণ্ডবিধিতে বেত্রাঘাতের সংখ্যা, ইদ্দতের সময়কাল এবং তালাকের সংখ্যা... ইত্যাদি। এই সবগুলিই হলো শরিয়ত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপ, যেখানে কোনো কিছু পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই।

৪. জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয় এমন ফিকহী বিধানাবলীর পর্যালোচনা:

সুতরাং যে সকল বিধান কোনো সাধারণ জনস্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাতে ‘সিয়াসাহ শারইয়াহ’ (শরিয়তভিত্তিক প্রশাসনিক নীতি)-র কোনো অনুপ্রবেশ নেই। উদাহরণস্বরূপ ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ে ফকিহগণের মধ্যকার মতপার্থক্যসমূহ; এক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলিম গ্রহণযোগ্য মতগুলোর মধ্য থেকে যেটিকে সঠিক মনে করে তার মাধ্যমেই ইবাদত বা আমল করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ ও পর্যালোচনার অবকাশ থাকে, ততক্ষণ কোনো একটি মতকে চাপিয়ে দেওয়া বা মানুষকে তা গ্রহণে বাধ্য করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নীতির কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো আর্থিক লেনদেন এবং মানুষের জীবনযাপনের সাধারণ কর্মকাণ্ডসমূহ যেখানে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই; সুতরাং মূল নিয়ম হলো সিয়াসাহ শারইয়াহর পক্ষ থেকে এগুলোতে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না।

তবে বর্তমান যুগে এমন কিছু নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে যা এই ক্ষেত্রগুলোতে সিয়াসাহ শারইয়াহর হস্তক্ষেপের পরিধি বিস্তৃত করেছে। সেটি হলো সমকালীন আইন প্রণয়ন (তাকনীন), যা এই সকল বিধানের বেশ কিছু খুঁটিনাটি বিষয়কে রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছে, যাতে তা বিচারকদের রায়ের ভিত্তি হতে পারে। ফলে এগুলো প্রশাসনিকভাবে বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে। একইভাবে সমকালীন প্রশাসনিক নীতি লেনদেনসহ জীবনের অনেক ক্ষেত্রে বিস্তারিত কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করে দিয়েছে। জনস্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এগুলো এখন সিয়াসাহ শারইয়াহর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রশাসনিক বা সিয়াসাহর অধ্যায়ে কোনো ফিকহী মত নির্বাচনের ক্ষেত্রে শাসকের পদক্ষেপটি দুটি অবস্থার উপর নির্ভরশীল:

প্রথম অবস্থা: শাসক যখন কোনো মতকে জনস্বার্থের ভিত্তিতে কিংবা ক্ষতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অথবা এই জাতীয় অন্য কোনো কারণে পছন্দ করেন; এটি স্পষ্টভাবে সিয়াসাহ শারইয়াহর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় অবস্থা: শাসক যখন কোনো মতকে দলিলের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে নির্বাচন করেন; সিয়াসাহ শারইয়াহর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিচারে এই মাসআলার বিধান অকাট্য (কাতঈ) বিষয়গুলোর বিধানের মতোই হবে; অর্থাৎ এটি সিয়াসাহ বা প্রশাসনিক নীতির অন্তর্ভুক্ত নয়।

...শারয়ি, কারণ এটি মূল পাঠ বা নস পর্যালোচনার সাথে সম্পৃক্ত। তবে এটি সেই মতবাদের বিপরীত যারা রাজনীতিকে নস দ্বারা বর্ণিত এবং নস বহির্ভূত সবকিছুর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

৫. রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক বিষয়ে ফতোয়া:

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট জ্ঞানতাত্ত্বিক গবেষণা ও ফতোয়াসমূহ মূলত শারয়ি রাজনীতির (সিয়াসাহ শারইয়্যাহ) অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো শারয়ি রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে এই দিক থেকে যে, এগুলোই এমন ভিত্তি যার মাধ্যমে শারয়ি রাজনীতি অনুধাবন করা যায় এবং শাসকরা তাদের বিচারিক সিদ্ধান্তে এগুলোর ওপর নির্ভর করেন। কিন্তু বাধ্যবাধকতার দিক থেকে এগুলো শারয়ি রাজনীতির বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় না, যতক্ষণ না কোনো রাষ্ট্রীয় হুকুম বা নির্দেশ জারি হয়।

সমকালীন অধিকাংশ আলিমের শারয়ি রাজনীতি উপস্থাপনের পদ্ধতি হলো—এটি কেবল শাসকের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কেননা তারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, শারয়ি রাজনীতি হলো শাসকের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি পদক্ষেপ বা রাষ্ট্রের বিষয়াবলি পরিচালনার ব্যবস্থাপনা। তারা শাসক ছাড়া অন্য কারো পদক্ষেপকে এর সাথে যুক্ত করেন না।

তাদের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন যে, শারয়ি রাজনীতি শাসক অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। এর মধ্যে মুফতি অন্তর্ভুক্ত নন; কারণ তার বক্তব্য বাধ্যতামূলক নয়। তাদের ভূমিকা কেবল দিকনির্দেশনা ও বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যতক্ষণ না শাসক তা গ্রহণ করেন (১)।

তবে কিছু সমকালীন গবেষকের মাঝে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান, যারা মনে করেন যে শারয়ি রাজনীতি কেবল শাসকের পক্ষ থেকে জারি করা বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তারা শারয়ি রাজনীতিকে এই পরিসরের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন (২)।

এক্ষেত্রে মতবিরোধটি পারিভাষিক। তবে এই ফতোয়া ও গবেষণাসমূহ রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের সুস্পষ্ট প্রভাব বজায় রাখবে, চাই তাকে ওই নামে অভিহিত করা হোক বা না হোক।

---

(১) দেখুন: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ফিল আহওয়ালিশ শাখসিয়্যাহ ২৫; আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়া আসারুহা ফিল হুকমিত তাকলিফি ৪৭ ও ৭৪-৭৫; আয-যাওয়া বিতুল ইজতিহাদিয়্যাহ ফিস সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, আবদুল কারিম আল-আনি ৭৮।
(২) দেখুন: আদওয়াউ আলাস সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ২১; মুযাক্কিরাতুস সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, আবদুল্লাহ আন-নাসির ৯; আল-মাদখাল ইলাস সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়াল আনযিমাতিমর মারইয়্যাহ ৩২।

---

৬. বিশেষ কর্তৃত্বসমূহ:

যেমন নাবালক, নির্বোধ ও পাগলের ওপর অভিভাবকত্ব, এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব, এবং বিবাহের ক্ষেত্রে পিতার অভিভাবকত্ব।

এই ধরনের কর্তৃত্ব সমকালীনদের নিকট 'শরয়ি রাজনীতি' (সিয়াসাহ শারইয়্যাহ)-এর ধারণার অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ এটি জনস্বার্থ বা সাধারণ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

তবে বিধানের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী শরয়ি রাজনীতির যে বৈশিষ্ট্য—যা সামনে আলোচিত হবে—তা এগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান। কেননা শরয়ি রাজনীতি বাধ্যতামূলক করার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে, যা বিধানের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে; আর এই বৈশিষ্ট্যটি উক্ত বিশেষ কর্তৃত্বগুলোর মধ্যেও পাওয়া যায়, যদিও তা তুলনামূলক দুর্বল মাত্রায় এবং ক্ষুদ্র পরিসরে। এর বিস্তারিত বর্ণনা চতুর্থ উপক্রমণিকায় আসবে।

চতুর্থ ভূমিকা

সিয়াসা শরইয়্যাহর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রভাব বিস্তারকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ

সিয়াসা শরইয়্যাহর ক্ষেত্রে যে বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হলো এর প্রভাব বিস্তারকারী বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। বর্তমান যুগে কোন বিষয়টি সিয়াসা শরইয়্যাহকে এতটা গুরুত্ব ও বিশেষ তাৎপর্য দান করেছে?

এই প্রশ্নের উত্তর সিয়াসা শরইয়্যাহর প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিবদ্ধ করে এবং এর প্রভাব বিস্তারকারী গুরুত্বকে উন্মোচিত করে। সুতরাং এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণের পরিবর্তে প্রাচীন ও আধুনিক সংজ্ঞাসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণে নিমজ্জিত হওয়া আমাদের জন্য উচিত হবে না।

আমরা বলতে পারি যে, সিয়াসা শরইয়্যাহর প্রতি সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি মূলত চারটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে সংক্ষেপিত করা যায়:

১- পর্যালোচনার কৌশল: এটি জনকল্যাণ নিশ্চিতকারী উপযুক্ত শারঈ বিধান আহরণের উদ্দেশ্যে ইমাম বা শাসকের বাস্তবতা

পর্যালোচনার পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট।

কেননা তিনি সিয়াসা শরইয়্যাহকে এমন এক জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য করেন যা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এমন বিষয়ের সাথে জড়িত যেখানে কোনো সরাসরি নস বা দলিল নেই; যাতে করে শরীয়তসম্মত জনকল্যাণ নিশ্চিতকারী শারঈ ইজতিহাদে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়।

২- স্বতন্ত্র বিজ্ঞান: এটি হলো সিয়াসা শরইয়্যাহকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে দেখা, যেখানে একটি শাস্ত্রের সুপরিচিত মূলনীতিসমূহ ফুটে ওঠে:

নিশ্চয়ই প্রতিটি শাস্ত্রের মূলনীতি হলো দশটি
সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় এবং ফলাফল

এবং এর মর্যাদা, সম্বন্ধ ও রচয়িতা;
নাম, উৎস এবং শরীয়তদাতার বিধান।
মাসআলাসমূহ; কেউ কেউ আংশিক জেনেই সন্তুষ্ট থাকেন,
আর যে ব্যক্তি সব কটি জানল, সে পূর্ণ সম্মান অর্জন করল।

সুতরাং তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের জন্য একটি বিস্তৃত শরয়ী সমাধান প্রদানের চেষ্টা করেন, যার মাধ্যমে ইসলামের বিধানসমূহের ব্যাপারে অনেক সংশয় তৈরি করা হয়েছে।

৩- ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা: এটি দ্বিতীয়টির কাছাকাছি, তবে এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের মাধ্যমে বিশেষায়িত করে, আর তা হলো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি পরিচালনাকারী রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে তিনি এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ, এতে প্রভাবশালী ক্ষমতাগুলোর প্রকৃত রূপ এবং তাদের কাজের পরিধি তুলে ধরতে চান।

৪- জনকল্যাণ সাধন (আল-ইস্তিসলাহ আল-আম): এর দ্বারা সাধারণভাবে জনকল্যাণ অর্জন করা উদ্দেশ্য, তা সাধারণ কোনো বিষয়ে হোক বা বিশেষ কোনো বিষয়ে। সুতরাং 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বলতে তিনি উদ্দেশ্য করেছেন: কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রাজ্ঞ পদ্ধতি, হোক তা শিক্ষামূলক কোনো উদ্দেশ্যে, সামাজিক উদ্দেশ্যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য কিছুর জন্য (১)।

এগুলো সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ধারণার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির চিন্তায় একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির সমাবেশ ঘটা সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য হলো এই অর্থগুলোর মধ্যে পার্থক্য করার গুরুত্ব স্পষ্ট করা; সিয়াসাহ শারইয়্যাহ কি এখানে একটি তাত্ত্বিক কৌশল, নাকি একটি বিজ্ঞান যা বিক্ষিপ্ত মাসআলাগুলোকে একত্র করে, নাকি একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যবস্থা, নাকি জনকল্যাণ অর্জনের একটি প্রচেষ্টা?

---

(১) সাধারণ রাজনৈতিক বিষয়াবলিতে বিধানসমূহের ক্ষেত্রে মাসলাহাত বা জনকল্যাণভিত্তিক দলীল প্রদানের হাতিয়ার হিসেবে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শাসকদের থেকে প্রকাশিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য করার বিষয়টি সমকালীন কিছু গবেষক উল্লেখ করেছেন। দেখুন: 'আল-মাসলাহাতুল আম্মাহ মিন মানজুরিন ইসলামি', ফাওজি খলিল, পৃ. ১১১-১১৫। আর যারা সিয়াসাহ শব্দটিকে মাসলাহাত বা কল্যাণের অর্থে ব্যবহার করেছেন তাদের মধ্যে ইবনে উসাইমীন অন্যতম, দেখুন: আশ-শারহুল মুমতি, ১৩/২৯ এবং ১৪/২৮।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ-এর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হলো প্রাথমিক বিচারে এটি একটি পর্যালোচনামূলক কৌশল, একটি নির্ভরযোগ্য ইজতিহাদ এবং বিধানসমূহের ক্ষেত্রে কল্যাণধর্মী ও প্রভাবশালী প্রয়োগ।

এর ভিত্তিতে, রাজনীতি যখন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সকল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিদ্যায় পরিণত হয়, তখন তা একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে রূপ নেয় যা এই অধ্যায় সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহকে একত্রিত করে এবং এর বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু পরিভাষাটি স্বয়ং কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে না; ফলে আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ এবং ইবাদত বা লেনদেন (মুআমালাত) শাস্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। কারণ এটি বিভিন্ন অধ্যায় থেকে সংগৃহীত বিবিধ মাসআলার সমষ্টি মাত্র।

তেমনিভাবে এটি আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর লেখার গুরুত্বকেও বিলুপ্ত করে। সুতরাং যদি আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর অধীনে শুরা, বাইআত, যুদ্ধ কিংবা নির্বাচন সম্পর্কে বলা হয়, তবে এই ধারণাগুলো পর্যালোচনার জন্য না আসা পর্যন্ত আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা থাকবে না; কারণ রাজনীতি তখন কেবল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

এই কারণে আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর আলোচনাগুলো একথাই নিশ্চিত করে যে, এটি একটি নির্ভরযোগ্য ইজতিহাদ ও পর্যালোচনামূলক কৌশল; এটি কেবল কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্র কিংবা কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নয়। এর মধ্যে রয়েছে:

১- আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর বৈধতার দলিলসমূহ—যা সামনে আসবে—প্রমাণ করে যে, এটি একটি ইজতিহাদ এবং বিধানসমূহের ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী পদ্ধতি। দলিলসমূহ নিশ্চিত করে যে আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ একটি শরয়ি বিষয়; আর এর অর্থ হলো আমরা এখানে একটি নির্ভরযোগ্য ও বৈধ ইজতিহাদের সম্মুখীন, কোনো তাত্ত্বিক বিদ্যা বা নিছক জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের নয়।

২- পাশাপাশি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সীরাতের মধ্যে আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর প্রমাণাদি এই অর্থকেই সুদৃঢ় করে। সেখানে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কোনো স্বতন্ত্র মাসআলা উল্লেখ করা হয়নি, বরং এমন সব ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে যা আমাদের জনকল্যাণমূলক বিষয়ে ইজতিহাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ অধ্যয়নের সময় এই বিষয়টি স্মরণে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেন মনোযোগ এর সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে। কারণ আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ অত্যন্ত ব্যাপক, যার ফলে পাঠক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে, যদি তিনি বিষয়টি অনুধাবন করেন এবং বিধানের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী দিকের ওপর আলোকপাত করেন...

শরিয়াহভিত্তিক রাজনীতি; তিনি শরিয়াহভিত্তিক রাজনীতির প্রকৃত রূপ এবং এটি যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ (গবেষণা), তা উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে এমন প্রতিটি বিষয়ের প্রতি যত্নবান হয়েছেন; কারণ এটিই হলো এই রাজনীতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। ফলে তিনি এমন কিছুতে লিপ্ত হন না যা এর প্রভাবকে দুর্বল

করে দেয়।

আমরা এই মৌলিক ভূমিকা এবং বইটির অবশিষ্ট গবেষণাসমূহে এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যা এই গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদের প্রভাবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর অর্থ এই নয় যে অন্যান্য মাসআলাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে না; বরং উদ্দেশ্য হলো পাঠক যেন শরিয়াহভিত্তিক রাজনীতির মানচিত্রে প্রতিটি মাসআলার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকেন।

যখন এটি সুপ্রতিষ্ঠিত হলো যে, শরিয়াহভিত্তিক রাজনীতি হলো একটি গ্রহণযোগ্য জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ এবং বিধানাবলির ক্ষেত্রে একটি গবেষণামূলক প্রক্রিয়া, তখন আমরা যখন এই প্রক্রিয়াটিকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করি, দেখতে পাই যে এটি দুটি কেন্দ্রীয় নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয় যা একে শরয়ি বিধানের ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত করে:

প্রথম নিয়ামক: বাধ্যবাধকতা (ইলজাম)। রাজনীতি মূলত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। আর এই শাসকের মানুষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করার ক্ষমতা রয়েছে। এই বাধ্যবাধকতা বিধানের ওপর প্রভাব ফেলবে, ফলে কিছু বিধান বৈধতা (ইবাহাত) থেকে হারাম বা ওয়াজিবে রূপান্তরিত হবে, অথবা ফরজে কিফায়া কোনো কোনো মানুষের ওপর ফরজে আইন হয়ে যাবে, এবং এভাবেই চলতে থাকবে (১)।

এটি হলো এই রাজনৈতিক শরয়ি ইজতিহাদের অন্যতম প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য, যা একে অন্য সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে।

আর যখন আপনি এই বৈশিষ্ট্যটি স্মরণে রাখবেন, তখন আমরা অনুধাবন করতে পারব যে, বিশেষ অভিভাবকত্বগুলো (যেমন নাবালকের ওপর অভিভাবকত্ব এবং অনুরূপ বিষয়গুলো) এখানে বিদ্যমান একই অর্থ বহন করে, যদিও তার মাত্রা কিছুটা কম। নাবালকের অভিভাবকের তার ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপের কর্তৃত্ব রয়েছে। অতএব, আমরা এই বিশেষ অভিভাবকত্বগুলোকে শরিয়াহভিত্তিক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করি বা এর বাইরে রাখি, প্রকৃত বিষয় হলো গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে শরিয়াহভিত্তিক রাজনীতির ধারণায় প্রভাব বিস্তারকারী অন্যতম বৈশিষ্ট্যটি এর মধ্যে বিদ্যমান।

---

(১) পাঁচটি তাকলিফি বিধানের ওপর শরিয়াহভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব সম্পর্কে জানতে দেখুন: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ওয়া আসারুহা ফিল হুকমিশ শরইয়্যিত তাকলিফি, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৪৩-৫১৯ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় কারণ: বিধানাবলির ওপর আপতিত পরিবর্তনশীল বিষয়সমূহ; আর তা হলো শারঈ বিধানের ওপর আবশ্যকতা, প্রয়োজন, জনকল্যাণ বা সক্ষমতার মতো পরিবর্তনশীল বিষয়াবলি আপতিত হতে পারে। অথবা কাল ও পাত্র ভেদে বিধানের ভিত্তি পরিবর্তিত হতে পারে, যা শরীয়তের গ্রহণযোগ্য মূলনীতি অনুযায়ী এই পরিবর্তনশীল বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে ইজতিহাদ করার আবশ্যকতাকে অনিবার্য করে তোলে।

আর সাধারণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে এই পরিবর্তনশীলতা অনেক বেশি হয়, যা শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী জনকল্যাণ নিশ্চিত করা এবং অনিষ্ট দূর করার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাসলাহাত-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আবশ্যকতাকে অনিবার্য করে তোলে। সিয়াসা শারঈয়্যাহ-র ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্যটি হলো এই যে, এটি গ্রহণযোগ্য মূলনীতি অনুযায়ী পরিবর্তনশীল বাস্তবতার আলোকে ইজতিহাদ করবে এবং এই ইজতিহাদ বিধানাবলির ওপর প্রভাব ফেলবে।

আর যখন আমরা এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাবটি উপলব্ধি করতে পারব, তখন এটি সিয়াসা শারঈয়্যাহ-র সেই পরিসর নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে যে বিষয়ে সমকালীনদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটেছে।

তখন আমরা বুঝতে পারব যে, সমকালীন আলিমদের ফতোয়া এবং ফকীহদের গবেষণায় এই বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান। কারণ তারা এই পরিবর্তনশীল দিকটি নিয়ে কাজ করেন এবং এতে বিধান প্রকাশ করেন। সুতরাং সেগুলোকে সিয়াসা শারঈয়্যাহ-র অন্তর্ভুক্ত করা হোক বা না হোক, তাতে এই বাস্তবতার কোনো পরিবর্তন হবে না যে, এগুলো সেই একই প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা সিয়াসা শারঈয়্যাহ-র ক্ষেত্রে কার্যকর থাকে।

আর আমরা যখন বুঝতে পারি যে প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্যটি পরিবর্তনশীল বিষয়াবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তখন অহি-র বাণীর যেসব বিষয় অকাট্য, সেগুলো এই ধরনের ইজতিহাদের অবকাশ রাখে না। তাই সেগুলোতে এমন কোনো প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য নেই যে তাকে সিয়াসা শারঈয়্যাহ-র ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে; যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়ও, তবে তার কোনো অর্থ থাকবে না।

এই ভূমিকার সারকথা:
সিয়াসা শারঈয়্যাহ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এর প্রভাবশালী দিকটির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যা একে অন্য সবকিছু থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে। আর এই দিকটি হলো একে একটি জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য করা যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে এবং অহি-র বাণীর ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। এর ওপরই আমরা দলিলসমূহ উপস্থাপন করি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর খলীফাগণ এবং পরবর্তীকালে ইসলামের ফকীহদের কর্ম থেকে এর প্রমাণাদি সাব্যস্ত করি।

এই নির্ভরযোগ্য ইজতিহাদ, যার প্রভাব দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল: প্রথমত: **বাধ্যবাধকতার বৈশিষ্ট্য**, যা কোনো শাসক বা প্রশাসককে এমন বিশেষ এখতিয়ার প্রদান করে যা কিছু বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয়ত: **নির্ভরযোগ্য ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য**।

সিয়াসা শরইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি) অধ্যায়ে আমরা যে সূক্ষ্ম পর্যালোচনাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তার ভিত্তিতে এই অধ্যায়টিকে কেবল সেই বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যা উক্ত প্রভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট, যাতে সিয়াসা শরইয়্যাহর সঠিক উপলব্ধি অর্জিত হয়। কোনো বিষয় বিচার বিভাগ, সাধারণ রাজনীতি কিংবা আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অর্থ এই নয় যে তা সিয়াসা শরইয়্যাহর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই মাসআলাগুলো বিচার ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা সাংবিধানিক আইনের অধীনে আলোচিত হতে পারে; অথবা শূরা, বায়আত ও খিলাফত ইত্যাদি প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে যদি সেগুলো সিয়াসা শরইয়্যাহর প্রয়োগিক দিক হয়, তবে ভিন্ন কথা। যদি সেগুলো জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো ইজতিহাদ ধারণ করে, তবে তা সিয়াসা শরইয়্যাহর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক উপাদান।

এরপর সিয়াসা শরইয়্যাহর আলোচনাকে কেবল সেই বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যা এই নির্ভরযোগ্য ইজতিহাদের সাথে সম্পৃক্ত অথবা যা এতে প্রভাব ফেলে। কারণ, বাধ্যবাধকতা বা পরিপালনের বিষয়টি শাসকের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা শাসকের ধারণা, বাধ্যবাধকতার সীমা এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়—যা এই বৈশিষ্ট্যটিকে উন্মোচন করে—সেগুলো নিয়ে আলোচনার গুরুত্বকে অপরিহার্য করে তোলে।

পঞ্চম ভূমিকা

জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ ও শরয়ি নসের মধ্যকার সম্পর্ক

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি) জনকল্যাণ আনয়ন এবং অনিষ্ট প্রতিরোধের মাধ্যমে জনস্বার্থ পরিচালনার প্রচেষ্টা চালায়। এই মহান লক্ষ্য অর্জনে এটি শরীয়তের কাঠামোর ভেতরে একটি ইজতিহাদি পদ্ধতি।

এটি জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ এবং শরয়ি নসের (দলিল) মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে পর্যালোচনার দাবি রাখে। জনকল্যাণ বিবেচনা করা এবং শরীয়তের সীমার প্রতি অনুগত থাকার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সীমানা কতটুকু?

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ মূলত দুটি স্তম্ভের ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত: জনকল্যাণের প্রতি লক্ষ রাখা এবং শরীয়তের সীমানার প্রতি অনুগত থাকা। এই দুটি স্তম্ভের যেকোনো একটির পরিপালনে কোনো প্রকার ত্রুটি হলে তা দ্বিতীয় স্তম্ভের জন্য ক্ষতিকর হবে, এমনকি তা খোদ ঐ স্তম্ভটির জন্যও ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি শরীয়তের সীমানা পালনে ত্রুটি করে জনকল্যাণ বিবেচনা করে, সে মূলত জনকল্যাণ বিবেচনার ক্ষেত্রেই ত্রুটিশীল হবে। কারণ এমতাবস্থায় সেই কল্যাণ গ্রহণযোগ্য শরয়ি কল্যাণ হিসেবে গণ্য হবে না, যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ধারণা করে যে তা একটি কল্যাণ।

তেমনিভাবে যে ব্যক্তি নস বা দলিলে এমনভাবে বাড়াবাড়ি করে যা তাকে গ্রহণযোগ্য জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ পালনে ত্রুটির দিকে নিয়ে যায়, সে মূলত খোদ নস বিবেচনার ক্ষেত্রেই ত্রুটিশীল। কারণ সে একটি গ্রহণযোগ্য কল্যাণকে নসের বিরোধী মনে করার ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অকার্যকর করে দিয়েছে; ফলে সে খোদ নসটি যথাযথভাবে বুঝতেও ব্যর্থ হয়েছে।

এটি সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ক্ষেত্রে ইজতিহাদের সূক্ষ্মতাকে নিশ্চিত করে। আর এতে ইজতিহাদ করার যোগ্য সেই ব্যক্তি, যিনি শরয়ি বিধানাবলির ক্ষেত্রে ইজতিহাদের যোগ্যতা এবং পরিবর্তনশীল কল্যাণ ও অকল্যাণ সংক্রান্ত গভীর জ্ঞানের যোগ্যতার সমন্বয় করেছেন। যেহেতু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, 'সিয়াসাহ' হলো একটি ইজতিহাদি মেধা এবং জনস্বার্থ পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন এক পর্যালোচনামূলক প্রক্রিয়া যা শরীয়ত পরিপন্থী নয় এমন জনকল্যাণ নিশ্চিত করে, তাই এই মেধা কেবল পরিচর্যার মাধ্যমেই অর্জিত হয় না...

...কোনো নির্দিষ্ট অধ্যায়ের মাসআলাসমূহ, অথবা কোনো সুনির্দিষ্ট গবেষণা ক্ষেত্রের অধ্যয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে নয়, বরং এটি দৃষ্টিভঙ্গির যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত; এটি নির্দিষ্ট কোনো অধ্যায় বা মাসআলার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নয়।

জনকল্যাণমূলক রাজনৈতিক ইজতিহাদের সীমারেখা:

সুতরাং, জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদের পরিধি সেসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যেগুলোতে সুনির্দিষ্ট কোনো নস (দলীল) নেই। আর এই পরিধি চারটি মৌলিক ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথম ক্ষেত্র: বৈধতা (ইবাহাত)।
দ্বিতীয় ক্ষেত্র: যাতে এমন নস এসেছে যা কোনো প্রথা বা পরিবর্তনশীল জনকল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত।

তৃতীয় ক্ষেত্র: এমন নস যা অন্যান্য শরয়ি মূলনীতি ও নিয়মনীতির সাথে সাংঘর্ষিক।
চতুর্থ ক্ষেত্র: সম্ভাব্য অর্থবোধক নস।

এই ক্ষেত্রসমূহের বিস্তারিত বিবরণ:

প্রথম ক্ষেত্র: বৈধতা (ইবাহাত)।

শরিয়তের প্রশস্ততার একটি দিক হলো, যে বিষয়ে কোনো হারামের নস বা দলীল আসেনি তা বৈধ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যা তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন, তবে তা ব্যতীত যার জন্য তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়ো।" [আল-আনআম: ১১৯]। অতএব, যে কাজ বা জনকল্যাণমূলক বিষয় শরিয়ত নিষিদ্ধ করেনি, তা বৈধতার গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত। কারণ বিধাতা (আল্লাহ) হারামের বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বৈধতার এই পরিধি জীবনের অধিকাংশ কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট। মানুষের বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণকারী অধিকাংশ আইন ও ব্যবস্থা এই গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত; ফলে এসব ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ শরিয়তের বিরোধী নয়।

বৈধতার গণ্ডিতে আমরা তিন ধরনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে পারি:

প্রথম ধরণ:

জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেই সব কথা ও কাজ যা সাধারণ বৈধতার অন্তর্ভুক্ত এবং যেগুলোর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো নস নেই। এটি সেই বিশাল পরিধি যার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে কোনো নস আসেনি।

দ্বিতীয় প্রকার:

এমন বিধান আসা যা মানুষকে কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে নির্বাচনের সুযোগ প্রদান করে। এই নির্বাচন বা ইখতিয়ার দুই প্রকার:

প্রথম: মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির নিজস্ব নির্বাচন, যেমন কাফফারাগুলোর ক্ষেত্রে ইখতিয়ার প্রদান; যেমন শপথের কাফফারা: "এর কাফফারা হলো দশজন মিসকিনকে মাঝারি মানের খাদ্য দান করা যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাইয়ে থাকো, অথবা তাদের পোশাক দান করা, অথবা একজন দাস মুক্ত করা" [আল-মায়িদাহ: ৮৯], এবং হজ্জের সময়ের কষ্টের (তথা কোনো নিষিদ্ধ কাজ হয়ে গেলে তার) কাফফারা। এই প্রকারের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফ ব্যক্তি তার ইচ্ছা অনুযায়ী নির্বাচন করেন এবং এর সাথে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয়: যার হাতে কর্তৃত্ব বা শাসনক্ষমতা (বিলায়াহ) রয়েছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন। এই নির্বাচন কর্তৃত্বের অধিকারীর জন্য বৈধ, তবে তার জন্য আবশ্যক হলো সেগুলোর মধ্য থেকে অধিকতর কল্যাণকর বিষয়টি বেছে নেওয়া। সুতরাং এটি বৈধতার গণ্ডির মধ্যে থাকা একটি মাসলাহাত বা জনকল্যাণমূলক রাজনৈতিক ইজতিহাদ।

এই প্রকারের কয়েকটি উদাহরণ হলো:

- পুরুষ যুদ্ধবন্দীদের বিধানের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের মধ্য হতে নির্বাচনের সুযোগ: যেমন হত্যা করা, অনুগ্রহ করে মুক্তি দেওয়া,

মুক্তিপণ গ্রহণ এবং দাস বানানো।(১)

- মুহারিব (সন্ত্রাসী বা ডাকাত) ব্যক্তির শাস্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বাণীতে উল্লিখিত চারটি বিষয়ের মধ্য হতে নির্বাচনের সুযোগ: "নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে" [আল-মায়িদাহ: ৩৩]; এক্ষেত্রে ইমাম বা শাসক এই চারটির মধ্য হতে জনকল্যাণের বিচারে সবচেয়ে উপযোগী শাস্তিটি নির্ধারণে ইখতিয়ার রাখেন।(২)

---

(১) দেখুন: আদ-দারদীর প্রণীত আশ-শারহুল কাবীর ২/১৮৪; রওজাতুত তালিবীন ১০/২৫১; আল-হিজ্জাবী প্রণীত আল-ইকনা ২/১৫। হানাফী মাযহাব মতে হত্যা, জিজিয়া ও দাসত্বের মধ্যে নির্বাচনের সুযোগ রয়েছে; দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক ৫/৯৮; এবং এটি পুরুষ যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
(২) এটি মালিকী মাযহাব অনুযায়ী; দেখুন: আল-খারশী প্রণীত শারহু মুখতাসারি খলীল ৮/১০৫; আদ-দারদীর আশ-শারহুল কাবীর ৪/৩৪৯। জুমহুর তথা অধিকাংশ ফকীহদের মতে আয়াতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে ইমামের এমন নির্বাচনের ইখতিয়ার নেই; দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক ৫/৭৩; রওজাতুত তালিবীন ১০/১৫৬; আল-হিজ্জাবী প্রণীত আল-ইকনা ৪/২৮৭।

...এবং এরই অন্তর্ভুক্ত হলো জোরপূর্বক বিজিত ভূমির ক্ষেত্রে ইমামের ইখতিয়ার, যা তিনি বণ্টন অথবা ওয়াকফ করার মধ্য থেকে বেছে নিতে পারেন (১)।

তৃতীয় প্রকার: সেই সকল শরয়ী বিষয় যা শাসকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে; এগুলো শরীয়তসম্মত বিষয় এবং শাসকের এখানে জনস্বার্থের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে।

এর উদাহরণ হলো:
- যুদ্ধবিরতি ও শান্তি চুক্তি সম্পাদনের বৈধতা।
- এবং যে সকল অপরাধের দণ্ড নির্ধারিত নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে তা'যীরের (শাস্তির) পরিমাণ নির্ধারণ করা।

কেননা এটি একটি শরীয়তসম্মত বিষয় এবং এর নির্ধারণ নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র: যে বিষয়ে এমন কোনো নস (শরয়ী পাঠ) অবতীর্ণ হয়েছে যা কোনো প্রথা (উরফ) বা পরিবর্তনশীল জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আর তা এভাবে যে, নস বা শরয়ী হুকুম কোনো প্রথা বা জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, পরবর্তীতে তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে; ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কারণ (ইল্লত) পরিবর্তিত থাকবে, ততক্ষণ হুকুমও পরিবর্তিত হবে। এখানে নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক ইজতিহাদের ভূমিকা আসে যাতে এই ধরনের অর্থগুলো বিবেচনায় নেওয়া যায়।

এ বিষয়ে কিছু সুপরিচিত উদাহরণ রয়েছে যা আমরা উল্লেখ করব এবং পরে এ সংক্রান্ত মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করব। প্রথা বা জনস্বার্থ পরিবর্তনের কারণে হুকুম পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ হলো (২):

১. আল-আকিলা:

যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে 'আকিলা' (রক্তপণের দায়িত্বশীল) ছিল ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা; সেখানে 'আহলে দিওয়ান' (রাষ্ট্রীয় রেজিস্টারভুক্ত বাহিনী)-এর কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। বরং তারা এ ক্ষেত্রে অন্যদের মতোই বিবেচিত হতো। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে গৃহীত হয়েছিল (৩)।

---

(১) এটি হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের মত। দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক ৫/৮৯; আল-ইকনা, হিজজাবী ২/৩১।
(২) আমি এখানে সতর্ক করতে চাই যে, এই পরিচ্ছেদে উদাহরণগুলোর উদ্দেশ্য হলো মূলনীতিটি স্পষ্ট করা এবং ফকীহগণ তা কীভাবে প্রয়োগ করেছেন তা বর্ণনা করা; প্রতিটি উদাহরণের বিশদ বিশ্লেষণ, দলিল উপস্থাপন বা আপত্তির জবাব দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়।
(৩) এটি শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মত। দেখুন: আশ-শারহুল কাবীর, ইবনে আবি উমর ৯/৬৪৬; রাওদাতুত তালিবীন ৯/৩৪৯।

কতিপয় ফকীহ এই মত পোষণ করেছেন যে, প্রথমে দিওয়ানভুক্ত (রাষ্ট্রীয় রেজিস্টারভুক্ত) ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করা হবে, অতঃপর নিকটাত্মীয় আসাবাগণ।

তারা এ বিষয়ে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কর্ম দ্বারা দলিল পেশ করেছেন; কেননা তিনি দিওয়ানভুক্ত ব্যক্তিবর্গের ওপর রক্তপণ (দিয়ত) নির্ধারণ করেছিলেন। (এটি তাঁর পক্ষ থেকে শরীয়তের বিধানের কোনো পরিবর্তন ছিল না, বরং তা ছিল বিধানের একটি নিশ্চয়তা। কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর গোত্রীয় লোকেরা সাহায্যের ভিত্তিতে দায়ভার গ্রহণ করত। কিন্তু যখন পারস্পরিক সহযোগিতা সামরিক ইউনিটের (পতাকা) ভিত্তিতে হতে লাগল, তখন তিনি রক্তপণের দায়ভার তাদের ওপর ন্যস্ত করলেন; এমনকি নারী ও শিশুদের ওপর তা আবশ্যক করেননি, কারণ তাদের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা অর্জিত হয় না)।

দ্বিতীয় মতানুসারে, 'আকিলাহ' (রক্তপণ বহনকারী)-এর উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক সহযোগিতা। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এই সহযোগিতা আত্মীয়তার সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই বিধানটি তার সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। যখন এই প্রথা (উরফ) পরিবর্তিত হলো এবং সহযোগিতা দিওয়ানভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে সংশ্লিষ্ট হলো, তখন বিধানটিও সেদিকে পরিবর্তিত হলো। সুতরাং এটি একটি উদাহরণ যে, কীভাবে বিধান তার ভিত্তিস্বরূপ প্রথা পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হয়।

২. সুনির্দিষ্ট বক্তব্য সংবলিত বিষয়ে পরিমাপ (কায়ল) ও ওজনের বিবেচনা:

যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বেশ কিছু রিবাবী (সুদ সংশ্লিষ্ট) মালের ক্ষেত্রে পরিমাপ ও ওজনের বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছে; এমতাবস্থায় সমজাতীয় রিবাবী মাল কি একে অপরের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েয (যেমন খেজুরের বিনিময়ে খেজুর), যদি শরীয়ত নির্ধারিত মানদণ্ড অর্থাৎ পরিমাপ ব্যতিরেকে অন্য কোনোভাবে তাদের সমতা নিশ্চিত হওয়া যায়?

কাজী আবু ইউসুফ এই মত পোষণ করেছেন যে, এই বিবেচনার ভিত্তি ছিল তৎকালীন প্রথা। সুতরাং যদি ওজন বা পরিমাপের মাধ্যমে সমতা নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু চার মাযহাব এ বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা শরীয়তের স্পষ্ট বক্তব্যের (নস) অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে কিংবা সুদের বিষয়টি 'তাআব্বুদী' (যুক্তি বহির্ভূত ইবাদতগত) হওয়ার কারণে প্রথাকে বিবেচনা করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(১) এটি হানাফী ও মালিকী মাযহাবের অভিমত, দেখুন: আশ-শারহুল কাবীর, আদ-দিরদীর, ৪/৩৮৪; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, ৬/৬৪১।
(২) হাশিয়া ইবনে আবিদীন, ৬/৬৪১; উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কর্মের বিষয়ে দেখুন: মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (২৭৩২৫)।

(৩) দেখুন: ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনুল হুমাম, ৭/১৫।
(৪) দেখুন: ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনুল হুমাম, ৭/১৫; আর-রওযুল মুরবি, ৩৪১; নিহায়াতুল মুহতাজ, ৪/১৯৫; শারহু মুখতাসার খলীল, আল-খারশী, ৫/৬৭।

৩- হারানো উট গ্রহণ করা:

কিছু ফকিহ পরিচিতি প্রদানের (তালান) উদ্দেশ্যে হারানো উট গ্রহণ করা বৈধ বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা এ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাকে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ব্যাখ্যা করেছেন: (কারণ সেই যুগে সৎ ও নেককার লোকদের প্রাধান্য ছিল; খুঁজে পাওয়া ব্যক্তিটি যদি তা ছেড়ে যেতেন, তবে কোনো খিয়ানতকারীর হাত সেখানে পৌঁছাত না। কিন্তু আমাদের যুগে খুঁজে পাওয়া ব্যক্তিটি নিরাপদ বোধ করতে পারেন না যে, তাঁর চলে যাওয়ার পর কোনো খিয়ানতকারীর হাত সেখানে পৌঁছাবে না। সুতরাং তা গ্রহণ করার মধ্যেই একে জীবিত রাখা এবং মালিকের জন্য তা সংরক্ষণ করা নিহিত, যা একে নষ্ট হতে দেওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম।)(১)

৪- মূল্য নির্ধারণ না করা:

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেল। তখন সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তিনি বললেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহ-ই মূল্য নির্ধারণকারী, তিনিই রিযিক সংকুচিতকারী, সম্প্রসারণকারী ও রিযিকদাতা। আমি আশা করি যে, আমি আমার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করব যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন রক্ত বা সম্পদের বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো অন্যায়ের দাবি করতে না পারে।)(২)

এই হাদিসটি মূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ হওয়ার ওপর দলিল প্রদান করে, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে বিরত থেকেছেন এবং হাদিসে 'অন্যায়ের' কথা উল্লেখ করেছেন, যা প্রমাণ করে যে মূল্য নির্ধারণ করা একটি জুলুম বা অন্যায়।

এই কারণেই জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ফকিহগণ মূল্য নির্ধারণ না করার পক্ষে মত দিয়েছেন(৩)। তবে মালিকি মাযহাবের কেউ কেউ—যা ইমাম মালিকের একটি বর্ণনাও বটে—জনস্বার্থ রক্ষায় মূল্য নির্ধারণ করা জায়েয হওয়ার দিকে মত দিয়েছেন। যেমনটি হানাফী মাযহাবও জনক্ষতি দূর করার আবশ্যকতা দেখা দিলে এটি বৈধ হওয়ার মত পোষণ করেছে(৪)।

(১) আল-মাবসুত ১১/১১।

(২) এটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ (৩৪৫১), তিরমিযী (১৩১৪), আহমাদ তাঁর মুসনাদ-এ (১১৮০৯) এবং ইবনে মাজাহ (২২০০)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাসান সহীহ।

(৩) শাফিঈ ও হাম্বলীগণ এটি হারাম হওয়ার দিকে মত দিয়েছেন এবং হানাফীগণ মাকরুহ হওয়ার দিকে মত দিয়েছেন—যতক্ষণ না এর মাধ্যমে জনক্ষতি প্রতিহত করার বিষয়টি জড়িত থাকে; যেমনিভাবে ইমাম মালিক এটি নিষেধ করেছেন। দেখুন: নিহায়াতুল মুহতাজ ৩/৪৭৩, কিফায়াতুন নাবিহ ৯/২৮৩, আল-ইনসাফ ৪/৩৩৮, গায়াতুল মুনতাহা ১/৫১৭, আল-হিদায়াহ ৪/৪৭৭-৪৭৮, মাজমাউল আনহুর ২/৫৪৮, হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন ৬/৩৯৯, আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা ৫/১৮; ইবনে রুশদ বাজারে পণ্য সরবরাহকারীদের ওপর মূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত্য বর্ণনা করেছেন। দেখুন: আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ৯/২৬৮।

(৪) দেখুন: আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ৯/৩১৪ এবং ৩৬৮, আত-তাজ ওয়াল ইকলীল ৬/২৫৪, আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা ৫/১৮। হানাফী মাযহাবের মতামতের জন্য পূর্ববর্তী টীকায় উল্লিখিত সূত্রগুলো দেখুন।

এটিই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার অভিমত। তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে: (যখন ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণ ব্যতীত মানুষের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না, তখন তাদের জন্য ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে; যেখানে কোনো কমতি বা অন্যায্য আধিক্য থাকবে না)**(১)**।

আর এই ইজতিহাদ (গবেষণা) মূল দলিলের বিরোধী নয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মূল্য নির্ধারণ থেকে বিরত থাকা হয়েছিল এর কোনো প্রয়োজন না থাকার কারণে, ফলে সেক্ষেত্রে কোনো জনস্বার্থ বিদ্যমান ছিল না। তবে যখন এই জনস্বার্থ বিদ্যমান থাকে, তখন সংশ্লিষ্ট স্বার্থের পরিবর্তনের কারণে বিধানটিও পরিবর্তিত হয়।

ইবনুল আরাবী বলেন: (অন্যান্য সকল আলেম হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে বলেছেন যে, কারো ওপর মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না। তবে সত্য হলো মূল্য নির্ধারণ করা এবং এমন একটি নিয়মের অধীনে বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে উভয় পক্ষের কারো ওপর জুলুম না হয়। আর এই নিয়মটি কেবল সময়, পরিস্থিতির পরিমাণ এবং মানুষের অবস্থা যথাযথভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমেই নিরূপণ করা সম্ভব। আল্লাহই সঠিক পথের তাওফীকদাতা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন তা সত্য এবং তিনি যা করেছেন তা একটি বিধান (হুকুম); তবে তা এমন এক কওমের জন্য যাদের দৃঢ়তা ছিল সঠিক এবং তারা তাদের রবের কাছে আত্মসমর্পণকারী ছিল। পক্ষান্তরে যারা মানুষকে গ্রাস করার এবং তাদের জীবন সংকীর্ণ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর সুযোগ অধিক প্রশস্ত এবং তাঁর বিধান অধিক কার্যকর)**(২)**।

৫. যোহরের সালাত শীতল করে (বিলম্ব করে) আদায় করা:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে যোহরের সালাত বিলম্বে আদায় করে শীতল করার সুন্নাত বর্ণিত হয়েছে, যাতে গরমের তীব্রতা কমে যায়। তিনি বলেছেন: (যখন গরম তীব্র হয়, তখন সালাত শীতল করে আদায় করো; কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিশ্বাস থেকে উদ্ভূত)**(৩)**।

এর পেছনের হিকমত বা রহস্য হলো মানুষের কষ্ট ও কাঠিন্য দূর করার স্বার্থ বিবেচনা করা, যাতে তারা সালাতে একাগ্রতা বজায় রাখতে পারে। তবে ফকীহগণ এই উদ্দিষ্ট স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বিধানের প্রয়োগক্ষেত্রের ব্যাপারে একাধিক মতে বিভক্ত হয়েছেন:

---

(১) মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/১০৫, আত-তুরুক আল-হুকমিয়্যাহ ২/৬৮৩।
(২) আরিজাতুল আহওয়াযী ৬/৫৪।
(৩) এটি বুখারী (৫৩৩) ও মুসলিম (৬১৫) আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও সহীহায়নে (বুখারী ও মুসলিম) আবু যার, ইবনে উমর এবং আবু সাঈদ খুদরী (রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন) এর বর্ণিত হাদীস থেকেও এটি উদ্ধৃত হয়েছে।

বলা হয়েছে: এটি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড তাপের সাথে সংশ্লিষ্ট, শীতকালের সাথে নয়। এক্ষেত্রে জামাতবদ্ধ হওয়া অথবা অঞ্চলটি উত্তপ্ত হওয়া শর্ত নয়। (১)

আবার বলা হয়েছে: এটি জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট; কেননা এর উদ্দেশ্য হলো সুবিধা বা সহজতা প্রদান করা। আর এটি জামাতের ক্ষেত্রে অর্জিত হয়, একাকী ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়। এটি গ্রীষ্ম ও শীত উভয় ঋতুকেই অন্তর্ভুক্ত করে, যদিও গ্রীষ্মকাল অধিকতর স্পষ্ট। (২)

আরও বলা হয়েছে: এটি গরম অঞ্চলের সাথে এবং এমন মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট যেখানে মানুষ দূর থেকে জামাতের উদ্দেশ্যে আসে। (৩)

আবার বলা হয়েছে: এটি ব্যাপক; কোনো বিস্তারিত বিশ্লেষণ ছাড়াই প্রতিটি প্রচণ্ড তাপেই 'ইবরদ' (তীব্র গরমে যোহরের নামায কিছুটা বিলম্বে পড়া) করা সুন্নাত। (৪)

তাই বলা যেতে পারে যে: ইবরদের বিধানটি এর 'মাসলাহাত' বা কল্যাণ পরিবর্তিত হওয়ার কারণে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে জামাত ও একাকী ব্যক্তির মধ্যে, গ্রীষ্ম ও শীতের তাপের মধ্যে এবং উত্তপ্ত ও শীতল অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এর অবস্থা পূর্ববর্তী উদাহরণগুলোর মতোই হবে।

তবে অধিকতর শক্তিশালী মত হলো—এই বিধানটি সেরূপ নয়। এটি এমন কোনো ইবরদের বিধান নয় যা কোনো এক সময়ে সাব্যস্ত হওয়ার পর পরবর্তীতে তার ভিত্তি পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয়ে গেছে; বরং হাদীস অনুধাবন এবং এর মর্ম বর্ণনার ক্ষেত্রে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ইবরদ কোথায় শরীয়তসম্মত হবে—সেই ক্ষেত্র নিয়েই এই বিতর্ক নিহিত।

এই কারণেই ইবনে রজব (রহ.) বলেন: "ইবরদের আদেশ যে কারণে দেওয়া হয়েছে, সেই অর্থের ব্যাপারে তারা (আলেমগণ) মতভেদ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: এর উদ্দেশ্য হলো নামাযে একাগ্রতা (খুশু) অর্জন করা। কেননা প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে নামায পড়া সেই ব্যক্তির নামাযের মতো যার সামনে এমন খাবার উপস্থিত যার প্রতি তার প্রাণ লালায়িত, অথবা সেই ব্যক্তির নামাযের মতো যে মল-মূত্রের বেগ দমন করছে। কারণ সেই মুহূর্তে মানুষের মন দুপুরের বিশ্রাম ও আরামের প্রতি ব্যাকুল থাকে। এই মত অনুযায়ী, একাকী নামায আদায়কারী এবং জামাতে আদায়কারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: এর কারণ হলো প্রচণ্ড গরমে হেঁটে মসজিদের দূর থেকে আগমনকারীদের কষ্টের আশঙ্কা করা; আর এই মতানুযায়ী এটি তাদের জন্যই নির্দিষ্ট..."

(১) এটি হানাফী মাযহাবের মত; দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক ১/২৬০, আল-বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ ২/৪০।
(২) এটি মালিকী মাযহাবের মত; দেখুন: আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ১৮/১৭০, শারহু মুখতাসারি খলীল লিল খারশী ১/২১৬।
(৩) এটি শাফেয়ী মাযহাবের মত; দেখুন: আল-উম্ম ১/৯১, নিহায়াতুল মুহতাজ ১/৪৩৩।
(৪) এটি হাম্বলী মাযহাবের মত; দেখুন: শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ১/১৪১।

দূরবর্তী স্থানসমূহ থেকে আগত মুসল্লিদের জামাতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ‘ইবরাদ’ (তীব্র গরমে যোহরের সালাত কিছুটা বিলম্বে আদায় করা) করা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: এটি হলো জাহান্নামের নিশ্বাস ত্যাগের সময় (১)।

পরিবর্তনশীল স্বার্থ বা জনকল্যাণের (মাসলাহাত) সাথে বিধানের (হুকুম) সম্পৃক্ততার উদাহরণের ক্ষেত্রে একটি সমসাময়িক মাসয়ালা অধিকতর স্পষ্ট। আর তা হলো—ইবরাদের বিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রভাব। যদি মসজিদসমূহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তীব্র গরমে ইবরাদ করার ক্ষেত্রে মানুষ কোনো কষ্ট অনুভব না করে, তবে কি বলা হবে যে ইবরাদ সুন্নাত হিসেবে অবশিষ্ট রয়েছে? নাকি স্বার্থের পরিবর্তন এবং হিকমত (যৌক্তিক কারণ) বিলুপ্ত হওয়ার দরুন এই বিধানটি আর বলবৎ নেই?

সমসাময়িক আলেমগণ এ বিষয়ে দুটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: তারা এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, বিধান তার কারণের (ইল্লাত) সাথে আবর্তিত হয়। সুতরাং যখন এই আধুনিক সরঞ্জামাদি বিদ্যমান থাকে, তখন ইবরাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্যকৃত স্বার্থটি আর অর্জিত হয় না (২)।

দ্বিতীয় মত: অন্য আলেমগণ দুটি কারণে এই বিধানটি বলবৎ থাকার পক্ষে মত দিয়েছেন:

প্রথম কারণ: এই বিধানটি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, তাই একে বিলুপ্ত হতে দেওয়া যায় না; বিশেষ করে হাদিসে এই বিধানের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রচণ্ড গরম জাহান্নামের উত্তাপের অংশ।

দ্বিতীয় কারণ: এই আধুনিক সরঞ্জামগুলো প্রত্যেকের জন্য সহজলভ্য নাও হতে পারে, তদুপরি মসজিদে যাওয়ার পথেও প্রচণ্ড গরম বিদ্যমান থাকে (৩)।

বিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথা (উরফ) ও জনস্বার্থের (মাসলাহাত) প্রভাব:

এগুলো এমন কিছু শরয়ী দলিল ও বিধানের উদাহরণ যা প্রথা ও জনস্বার্থের পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হয়েছে। এটি একটি সর্বসম্মত বিষয় যে, শরয়ী বিধানসমূহের মধ্যে এমন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে যা...

(১) ফাতহুল বারী, ইবনে রজব ৪/২৪১।
(২) দ্রষ্টব্য: শরহু উমদাতিল আহকাম, ইবনে জিবরীন ৮/১০ (শামেলা সংস্করণ অনুযায়ী)।
(৩) দ্রষ্টব্য: তীব্র গরমে যোহরের সালাতে ইবরাদ, আহমদ আল-মাজনা ১৩২, উলূমুশ শরঈয়াহ ওয়াল আরাবিয়াহ জার্নাল, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ৩, এবং ইবনে বায ওয়েবসাইট: https://cutt.us/ttequ

সময় ও স্থানের পরিবর্তনের কারণে সেগুলোর ওপর পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া সম্ভব। তবে এই বিষয়টির নামকরণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতিতে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে:

প্রথম পদ্ধতি: যারা বিধানের (আহকাম) মধ্যে এই পরিবর্তনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। বরং তাদের মতে যা ঘটে তা হলো, বিধানের ভিত্তি (মানাত) পরিবর্তিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে বিধানটিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং বিধানের নতুন রূপটি পুরনো রূপের অবিকল অনুরূপ নয়। বরং যখন প্রথম ক্ষেত্রে সেই ভিত্তিটি বিদ্যমান ছিল, তখন বিধানটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। যখন

ভিত্তিটি পরিবর্তিত হলো, তখন বিধানটিও বদলে গেল। উদাহরণস্বরূপ, যারা মূল্য নির্ধারণ (তাস'য়ীর) বৈধ মনে করেন, তাদের মতে এটি এমন নয় যে যা পূর্বে হারাম ছিল পরে তা মুবাহ (বৈধ) হয়ে গেছে। বরং এটি প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। নবী (সা.) এটি বর্জন করেছিলেন কারণ তখন এর প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন বিধানের ভিত্তি পরিবর্তিত হয়; ফলে এটি আর সেই পুরনো বিধান থাকে না।

তাদের দলিল হলো, যে অবস্থার ক্ষেত্রে বিধান পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, তা তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ পূর্ববর্তী অবস্থার মতো নয়, বরং সেখানে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এ কথা বলা যাবে না যে বিধানটি পরিবর্তিত হয়েছে, কারণ সেটি অভিন্ন নয়। বরং যা পরিবর্তিত হয়েছে তা হলো সেই ভিত্তি (মানাত) যার ওপর বিধানটি নির্ভরশীল ছিল। যেমন সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত 'মরুওয়াত' (ভদ্রতা বা ব্যক্তিত্ব) বিষয়ক প্রথার ভিন্নতা, বিক্রিত পণ্য হস্তগত করার পদ্ধতি, তালাকের শব্দের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও রূপক শব্দাবলি, ভরণপোষণের পরিমাণ, কেনাবেচায় ত্রুটির সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি। এই সকল ভিত্তির ওপর বিধানের আবর্তন বিধানের মূল সত্তার পরিবর্তন নয় (১)।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: যারা বিধানের পরিবর্তনকে সাব্যস্ত করেন। কারণ এখানে উদ্দেশ্য হলো অনুগামী বিষয়াবলি, অনুষঙ্গ, কারণ ও হেতুর সাথে যুক্ত হয়ে বিধানের পরিবর্তন হওয়া। আর এটিকেই আমরা পরিবর্তনশীল বলি, চাই একে ফতোয়া বলা হোক কিংবা 'তাহকীকে মানাত' (ভিত্তি নিশ্চিতকরণ) বলা হোক। সুতরাং সুন্নাহয় বর্ণিত কোনো বিধান যদি মানুষের অবস্থা ও আচরণের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তবে জনস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে শরিয়তদাতার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে সেই অনুযায়ী বিধানের পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক (২)।

---

(১) দেখুন: যাওয়াবিতুল মাসলাহা ২৪৭, আস-সাবাত ওয়াল শুমুল, লি-আবিদ আস-সুফিয়ানি ৪৪৯ - ৪৫০।
(২) দেখুন: আল-মাদখালুল ফিকহিল আম ২/ ৯৫০ - ৯৫১, কায়েদাতু তাগাইয়ুরিল আহকামিল ইজতিহাদিয়্যাহ, লি-আহমাদ আল-হাবিত ২৯৩, তাগাইয়ুরুল ফাতাওয়া ফিল ফিকহিল ইসলামি, লি-আবদিল হাকিম আর-রুমাইলি ৬৬৮ - ৬৭৯।

পরিবর্তনের মূলনীতির একটি প্রসিদ্ধ রূপরেখা এরই অন্তর্ভুক্ত, যা 'মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যাহ'-তে এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে: **"যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিধানের পরিবর্তনকে অস্বীকার করা যাবে না"**(১)।

আর সমকালীন আলিমদের মধ্যকার এই মতপার্থক্য পূর্ববর্তী ফকীহদের মধ্যেও একইভাবে লক্ষ্য করা গেছে:

যেখানে কিছু ফকীহর নিকট শরয়ী বিধানের পরিবর্তনের অভিব্যক্তিটি ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। যেমন আল-কারাফীর উক্তি: **"সর্বসম্মত মূলনীতি হলো, যে সকল বিধান কোনো রীতির (আদাত) ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, সেই রীতির পরিবর্তন ঘটলে বিধানও পরিবর্তিত হয়ে যায়"**(২)।

আল-তুফী বলেছেন: **"... এবং মুজতাহিদদের ইজতিহাদের দাবি অনুযায়ী কাল ও স্থানভেদে শরয়ী বিধানাবলি পরিবর্তিত হয়, আর এটি জনকল্যাণ ও অকল্যাণের ভিন্নতার কারণেও ভিন্ন হয়ে থাকে"**(৩)।

তবে কোনো কোনো ফকীহ সরাসরি বিধানের ওপর 'পরিবর্তন' শব্দটির প্রয়োগের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, পরিবর্তন মূলত সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আস-সুবকী বলেন: **"আমরা এটি বলি না যে, কালের পরিবর্তনের সাথে বিধান পরিবর্তিত হয়; বরং নতুন সৃষ্ট পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে তা ঘটে থাকে"**(৪)।

হুলুলু বলেন: **"... তবে সরাসরি বিধানের ওপর পরিবর্তন শব্দটি প্রয়োগ করা সঠিক নয়, যদিও আমাদের দৃষ্টিতে এর উদ্দেশ্য**

এর সংশ্লিষ্টতার (তাআল্লুক) প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে”(৫)।

মূলত এখানকার মতপার্থক্যটি পারিভাষিক। কেননা সকলেই এই পরিবর্তনের অস্তিত্বের ব্যাপারে একমত, এবং এ বিষয়েও একমত যে, এই পরিবর্তনটি মাসআলার ভিত্তি (মানাত) বা এর কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। আর কোনো কার্যকর প্রভাবক ছাড়া বিধান পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণেই প্রথম পদ্ধতির অনুসারীগণ দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুসারীদের দৃষ্টিতে যা ‘পরিবর্তন’, তাকে ‘বিধানের ভিত্তির (মানাত) পরিবর্তন’ হিসেবে অভিহিত করেন; কারণ এখানে বিধানের ভিত্তি হলো সামাজিক প্রথা বা উরফ(৬)।

---

(১) দেখুন: দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম ১/৪৭।
(২) আল-ফুরূক ৪/১০৩, এবং দেখুন: ১/১৭৬।
(৩) মুখতাসারুত তিরমিযী ২/৪৩২, এবং পরিবর্তনের অভিব্যক্তি সম্পর্কে আরও দেখুন: জামউল জাওয়ামি (১৫)।
(৪) ফাতাওয়াস সুবকী ২/৫৭২, এবং দেখুন: আল-বাহরুল মুহীত, যারকাশী ১/২২০।
(৫) আত-তাওদীহ ফী শারহিত তানকীহ, হুলুলু ১/২৭৫।
(৬) দেখুন: জওয়াবিতুল মাসলাহ ২৫২।

এই কারণেই তাদের কেউ কেউ একে 'ফতোয়ার পরিবর্তন' হিসেবে প্রকাশ করাকে পছন্দ করেন। কারণ পরিবর্তন ঘটে সেই ইজতিহাদ বা গবেষণায় যা কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে, মূল নস (মূল পাঠ) বা বিধানের ওপর নয়। শব্দচয়নের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা কাম্য, বিশেষ করে যখন অস্পষ্টতা বা ভুল ব্যাখ্যার আশঙ্কা থাকে (১)।

এটিই এই মূলনীতির ক্ষেত্রে ইবনুল কাইয়্যিমের অভিব্যক্তি, তিনি বলেছেন: (পরিচ্ছেদ: সময়, স্থান, অবস্থা, নিয়ত এবং রীতিনীতির পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ফতোয়ার পরিবর্তন ও ভিন্নতা সম্পর্কে) (২)।

যাই হোক, পরিবর্তন মূলত ইজতিহাদ, ফতোয়া বা বিধানের প্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট; এটি মূল সম্বোধন বা স্বয়ং নসের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কেননা: (রীতিনীতির ভিন্নতার কারণে বিধানের ভিন্নতা হওয়াটা প্রকৃতপক্ষে মূল সম্বোধনের ভিন্নতা নয়) (৩)।

শরয়ী বিধানাবলির পরিবর্তনের মানদণ্ড:

যখন কোনো উপযুক্ত কারণের ভিত্তিতে কতিপয় শরয়ী বিধানের পরিবর্তনের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়, তখন ইজতিহাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিষয় বিবেচনা করা নসের বিরোধী নয়। একারণেই আমরা একে 'যে ক্ষেত্রে কোনো নস নেই' এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি; কারণ এই অবস্থায় বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো অকাট্য নস নেই, বরং এটি একটি বৈধ মাসআলা।

এর মানদণ্ড হলো, এটি প্রথা ও রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিধানাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং (নিশ্চয়ই যে বিধানগুলো সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, সেগুলো হলো প্রথা ও রীতিনীতির ওপর নির্ভরশীল বিধান। কারণ কাল পরিক্রমায় মানুষের প্রয়োজন পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তনের ভিত্তিতে প্রথা ও রীতিনীতিও বদলে যায়। আর প্রথা ও রীতিনীতি পরিবর্তনের ফলে বিধানগুলোও পরিবর্তিত হয়, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। পক্ষান্তরে, সেই সকল শরয়ী দলিলের ওপর নির্ভরশীল বিধানাবলি যা প্রথা ও রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, সেগুলো পরিবর্তিত হয় না) (৪)।

---

(১) দেখুন: কায়েদাতু তাগাইয়ুরিল আহকামিল ইজতিহাদিয়্যাহ ওয়া তাতবিকাতুহাল মুআসিরাহ ১১৭।
(২) ইলামুল মুওয়াক্কিঈন ৩/১১।
(৩) আল-মুওয়াফাকাত ২/৪৯১; এবং দেখুন: ২/৪৮৯ ও ২/৪৯১-৪৯২; আরও দেখুন: নজরিয়্যাতু দাওয়ারানিল আহকামিশ শারইয়্যাহ, জামিলা তালুত ১৪০।
(৪) দুরারুল হুক্কাম ফি শারহি মাজাল্লাতিল আহকাম ১/৪৭।

আর এই মানদণ্ডটি অবশ্যই এমন একটি নির্ভরযোগ্য শরয়ি দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যা প্রমাণ করে যে, সংশ্লিষ্ট বিধানটি একটি প্রথার (উরফ) ওপর ভিত্তি করে ছিল এবং পরবর্তীতে তা পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং (যদি পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে কিছু বিধানের পরিবর্তন কিংবা নতুন বিধান প্রবর্তনের দাবি করা হয়, তবে সেই প্রবর্তিত বিধানগুলো অবশ্যই এমন হতে হবে যার সপক্ষে শরিয়তের মূলনীতি সাক্ষ্য দেয়, অথবা এমন হতে হবে যা অন্তত বাতিল বলে গণ্য হবে না)(১)।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো এমন বিধানের পরিবর্তন যা মূলত কোনো প্রথা বা জনস্বার্থের (মাসলাহাত) ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সেই প্রথা বা জনস্বার্থ পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ বিধানটি কোনো প্রথার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এবং পরে সেই প্রথা বদলে গেছে। এটি 'নস' (পবিত্র পাঠ) অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রথার প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনার চেয়ে ভিন্ন; কারণ সেখানে প্রথা দুই প্রকার:

১. মৌখিক প্রথা (উরফ কাওলি): নস বা পাঠটি যদি সাধারণ শব্দে আসে, কিন্তু নবী (সা.)-এর সমসাময়িক প্রথায় তা বিশেষ কোনো অর্থে ব্যবহৃত হতো, তবে সেই যুগের মানুষের বুঝ অনুযায়ী সাধারণ শব্দটিকে বিশেষ অর্থের জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। যেমন 'দাব্বাহ' (প্রাণী) শব্দটিকে কোনো বিশেষ চতুষ্পদ জন্তুর জন্য নির্দিষ্ট করা। এটি নসের মর্ম অনুধাবন এবং লক্ষ্য নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত, যা গ্রহণ করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।

২. ব্যবহারিক প্রথা (উরফ আমালি): তা হলো এমন কোনো বাস্তব কর্মগত প্রথা যা নসের সাধারণ বিধানকে বিশেষায়িত করে। অধিকাংশ ফকিহ এটি গ্রহণ না করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে হানাফি মাযহাবের মতে এটি দলিল হিসেবে গণ্য, কারণ নবী (সা.) এর প্রতি মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এই প্রথা যদি নবী (সা.)-এর যুগের পরের হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়(২)।

---

(১) শারহুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যাহ, আহমাদ আয-যারকা, পৃষ্ঠা ২২৮। ফকিহদের নিকট বিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলো জানার জন্য যারা এই মূলনীতি নিয়ে গবেষণা করেছেন, যেমন আল-কারাফি, ইবনুল কাইয়্যিম, আশ-শাতিবি এবং অন্যান্যদের গ্রন্থাবলী দেখুন। সমকালীন গবেষকদের নিকট এর প্রয়োগ সম্পর্কে দেখুন: 'কায়েদাতু তাগাইয়ুরিল আহকামিল ইজতিহাদিয়্যাহ ওয়া তাতবিকাতুহাল মুআসিরাহ', পৃষ্ঠা ২৪৪-২৫২; 'তাগাইয়্যুরুয যুরুফি ওয়া আসারুহু ফি ইখতিলাফিল আহকাম', মুহাম্মাদ আল-মানসি, পৃষ্ঠা ৫৮-৬৪; 'আল-ফুতওয়া আল-মুআসিরাহ', খালিদ আল-মুযাইনি, পৃষ্ঠা ৩৫৯-৩৮৫।

(২) দেখুন: 'আল-বাহরুল মুহিত', আয-যারকাশি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯১-৩৯৭; 'শারহুল কাওকাবিল মুনির', ইবনুন নাজ্জার আল-ফুতুহি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮৫-৩৮৬। আরও দেখুন: 'আল-উরফু ওয়াল আদাতু বাইনাশ শরিয়াতি ইসলামিয়া ওয়াল কানুনিল ওয়াদয়ি', হাসনাইন মুহাম্মাদ হাসনাইন, পৃষ্ঠা ১২৭; 'আসারুল উরফি ফিত তাশরিইল ইসলামি', সাইয়্যিদ সালিহ আওয়াদ, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৬৩; 'তাখসিসুন নুসুসি বিল আদিল্লাতিল ইজতিহাদিয়্যাহ ইনদাল উসুলিয়্যিন', খলিফা বাকর আল-হাসান, পৃষ্ঠা ১২৩; 'আল-উরফু ওয়া আসারুহু ফিশ শারিয়াতি ওয়াল কানুন', আহমাদ আস-সিয়ার মুবারকি, পৃষ্ঠা ১৪৫-১৫৭।

ফেকহি ইজতিহাদের পরিবর্তন:

পূর্বে যা আলোচনা করা হয়েছে তা মূলত শরয়ি মূল পাঠসমূহের সেই পরিবর্তন সম্পর্কিত, যখন তা পরিবর্তনশীল প্রথা বা জনকল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত হয়। শরয়ি মূল পাঠসমূহের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ, কারণ এর উদাহরণসমূহ সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। তবে আমরা যদি ফেকহি ইজতিহাদসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে পরিবর্তনের ক্ষেত্র হবে অনেক প্রশস্ত। এক্ষেত্রে পরিবর্তন শুধুমাত্র বিধানের ভিত্তি বা ‘মানাতুল হুকুম’ পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা ‘মানাতুল হুকুম’ পরিবর্তনের কারণে হতে পারে, আবার ইজতিহাদ স্বয়ং পরিবর্তনের কারণেও হতে পারে।

এ বিষয়ে ফেকহি ইজতিহাদসমূহের কিছু উদাহরণ:

- জবরদখলকৃত বস্তুর উপকারিতার ক্ষতিপূরণ:

যেমন যদি দখলকারী ব্যক্তি জবরদখলকৃত বস্তু থেকে উপকৃত হয়; যেমন গাড়ি চালানো, কাপড় পরিধান করা কিংবা বাড়িতে বসবাস করা; তবে কি তার ওপর এই উপকারিতার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা এবং এর বিনিময় বা ভাড়া প্রদান করা আবশ্যক?

হানাফি মাযহাবের রায় হলো, উপকারিতার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না (১), কারণ এগুলো বিনিময়যোগ্য বা মূল্যবান সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয় (২)।

তবে হানাফি মাযহাবের পরবর্তী যুগের ফকিহগণ এই সাধারণ নিয়ম থেকে তিনটি সম্পদকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করেছেন। সেগুলো হলো: যদি জবরদখলকৃত সম্পদটি ওয়াকফকৃত হয়, অথবা এতিমের সম্পদ হয়, কিংবা যা উপার্জনের বা ভাড়ার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল (৩)।

আর এই ব্যতিক্রমটি করা হয়েছে ওয়াকফকৃত সম্পদের প্রতি কিছু মানুষের লালসার বিষয়টি বিবেচনা করে...

(১) দ্রষ্টব্য: তাবয়িনুল হাকায়িক ৫/২৩৪, আল-বাহরুর রাইক ৮/৩৭। জমহুর উলামায়ে কেরাম এই উপকারিতার ক্ষতিপূরণ প্রদানের পক্ষে মত দিয়েছেন; দ্রষ্টব্য: কাশশাফুল কিনা‘ ৪/১১২, আল-হাভি আল-কাবির ৭/৩৮৩। আর মালিকিগণ বস্তুর সত্তা জবরদখল এবং তার ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য করেন; যদি বস্তুর সত্তা জবরদখল করা হয় তবে তারা উপকারিতার ক্ষতিপূরণ আবশ্যক করেন না যদি না তা ব্যবহার করা হয়। আর যদি সত্তার দখল ছাড়াই সীমা লঙ্ঘন করা হয়, তবে ব্যবহার করা হোক বা না হোক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক। দ্রষ্টব্য: শারহু মুখতাসারি খলিল লিল-খারশি ৬/১৩১, হাশিয়াতুদ দাউকি ৩/৪৪৩ এবং আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৫/১২৩-১২৪।

(২) এটি চুক্তি বহির্ভূত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; দ্রষ্টব্য: আল-মাবসুত ৫/৭১, বাদায়েউস সানায়ে ২/২৭৮।

(৩) দ্রষ্টব্য: আল-বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ ১১/২৫১, হাশিয়া ইবনে আবিদিন ৬/১৮৬।

...এবং ইয়াতিমদের; তাই (পরবর্তী ফকীহগণ ওয়াকফ ও ইয়াতিমদের সম্পদের প্রতি মানুষের লোভ দেখে 'ইস্তিহসান' স্বরূপ এগুলোর মুনাফার নিশ্চয়তা বিধান করা বৈধ করেছেন)(১)।

- বিবেচ্য জবরদস্তি (ইকরাহ):

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর নিকট শরিয়তসম্মতভাবে বিবেচ্য জবরদস্তি বা ইকরাহ হলো তা, যা শাসকের পক্ষ থেকে আসে। কারণ শাসক যা বলেন তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখেন, যা অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান মনে করেন যে, জবরদস্তি শাসক এবং শাসক ব্যতীত অন্য যে কারো মাধ্যমেও সংঘটিত হতে পারে।

এই মতপার্থক্যটি সম্ভবত প্রকৃত (হাকিকি), যা শাসকের এমন এক বিশেষ জবরদস্তির ক্ষমতার দিকে নির্দেশ করে যা অন্য কারো মাঝে পাওয়া যায় না; কেননা শাসককে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, যা শাসক ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে ভিন্নতর। কারণ অন্যের পক্ষ থেকে জবরদস্তি ঘটার বিষয়টি বিরল, তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং তার বিরুদ্ধে অন্যের সাহায্য নেওয়া সম্ভব।

আবার বলা হয়েছে যে: তাঁদের মধ্যকার এই মতভেদটি মূলত সমসাময়িক যুগের প্রথাগত (উর্ফি) পার্থক্যের কারণে, স্বয়ং বিধানের (যাতুল হুকুম) ক্ষেত্রে নয়। এর কারণ হলো, ইমাম আবূ হানীফার যুগে শাসক অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ছিলেন, ফলে তাঁর পক্ষ ছাড়া জবরদস্তি সচরাচর সংঘটিত হতো না। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে ফতোয়াও পরিবর্তিত হয়। তাই তাঁরা (সাহেবাইন) বলেছেন যে, শাসক ব্যতীত অন্যের মাধ্যমেও জবরদস্তি সংঘটিত হয়(২)।

- প্রকাশ্য ন্যায়পরায়ণতাকে (আদালাত) গ্রহণ করা:

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হুদুদ ও ক্বিসাস ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সাক্ষীর প্রকাশ্য ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে ফয়সালা করা সমীচীন মনে করেন, যদি বিবাদী সাক্ষীর ব্যাপারে কোনো আপত্তি না তোলে। এমতাবস্থায় সাক্ষীর ব্যাপারে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই। তবে তাঁর দুই ছাত্র (সাহেবাইন) এ বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেছেন; তাঁরা বলেন, সাক্ষীর ব্যাপারে অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে। তাঁরা এই মতপার্থক্যের স্বরূপ নিয়েও মতভেদ করেছেন। বলা হয়েছে: এখানকার মতপার্থক্যটি সময়ের পার্থক্যের কারণে, প্রকৃত কোনো মতভেদ নয়। কেননা ইমাম আবূ হানীফার হুকুমটি তাঁর সমসাময়িক যুগের প্রথার ওপর ভিত্তি করে ছিল, যখন মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা সাধারণভাবে বিদ্যমান ছিল,

---

(১) দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম ১/৬৮৬ এবং ১/৪৮।
(২) দেখুন: বাদাইউস সানাই' ৭/১৬৭, আল-মাবসূত ৯/৫৯, আল-হিদায়া ৩/২৭২, আল-ইনায়া শারহুল হিদায়া ৫/২৭৩; এবং এখানে ইমাম আবূ হানীফার অবস্থানের জন্য জাসসাস অন্য একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা প্রথা বা উরফের পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, দেখুন: আহকামুল কুরআন ৩/৩৩৭।

সুতরাং প্রশ্নের পরিবর্তে এই দৃশ্যমান সংশোধনেই আমি ক্ষান্ত হলাম (১)।

- সামাজিক প্রথা বা রীতির ('উর্ফ) ওপর ভিত্তি করে বিবাহ, তালাক ও শপথের বিধানসমূহ:

এর কারণ হলো, ফকীহগণ প্রায়শই এই অধ্যায়গুলোতে এমন সব বিধান নির্ধারণ করেন যা তাদের সমসাময়িক প্রথার ওপর ভিত্তি করে রচিত, এবং তা চিরস্থায়ী শরীয়ত নয়। এই কারণে, যারা এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন না হয়ে সেগুলোর ওপর নির্ভর করে তারা ভুল করে থাকে। ইমাম আল-কারাফি 'উর্ফ বা প্রথার নীতি অনুসরণের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এই বিষয়ে যারা শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন:

(এটি এমন একটি মূলনীতি যা লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। আর এটি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবন করলে আপনার কাছে অনেক ফতোয়া প্রদানকারী ফকীহর ভুল স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তারা তাদের ইমামদের কিতাবে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা সমস্ত যুগের সকল জনপদের মানুষের ওপর প্রয়োগ করে থাকে। অথচ এটি ইজমার পরিপন্থী। তারা মহান আল্লাহর কাছে অবাধ্য ও পাপিষ্ঠ, তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা কোনো ওজর পাবে না; কেননা তারা ফতোয়া প্রদানের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এবং ফতোয়ার উৎস, শর্ত ও অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত না হয়েই ফতোয়া প্রদানের কাজে লিপ্ত হয়েছে) (২)।

তিনি এই বিষয়টির প্রতি যত্নবান হওয়ার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করে বলেন: (আর এই নিয়ম অনুযায়ীই যুগ যুগ ধরে ফতোয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। সুতরাং প্রথায় যা কিছু নতুনত্ব আসবে তা বিবেচনা করুন, আর যা বিলুপ্ত হবে তা বর্জন করুন। সারা জীবন কিতাবে যা লেখা আছে শুধুমাত্র তার ওপরই নির্ভর করবেন না। বরং যখন আপনার অঞ্চলের বাইরের কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে আসবে, তাকে আপনার অঞ্চলের প্রথার ওপর পরিচালিত করবেন না। তাকে তার অঞ্চলের প্রথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন এবং সেই অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করুন; আপনার অঞ্চলের প্রথা বা আপনার কিতাবে যা নির্ধারিত আছে সেই অনুযায়ী নয়। এটিই হচ্ছে সুস্পষ্ট সত্য। আর সর্বদা কিতাবস্থ বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর স্থবির হয়ে থাকা দ্বীনের মধ্যে পথভ্রষ্টতা এবং মুসলিম আলেম ও পূর্ববর্তী সালাফগণের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অজ্ঞতা) (৩)।

তিনি এর জন্য কিছু উদাহরণ প্রদান করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

- যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে "তুমি মুক্ত" অথবা "তুমি সম্পর্কহীন", তার ওপর তিন তালাক কার্যকর হওয়া; ইমাম মালিকের কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে সেই প্রেক্ষিতে...

---

(১) দেখুন: শারহু মুখতাসারিত তহাবী ৮/৩২, বাদাউস সানায়ে ৬/২৭০, শারহু আদাবিল কাজী ১/২২৭-২২৯।
(২) দেখুন: আল-ফুরূক ১/১৪১।
(৩) দেখুন: আল-ফুরূক ১/৩৮৬-৩৮৭।

তা ছিল তাঁর সমসাময়িক প্রথার ওপর ভিত্তি করে একটি ফতোয়া, অথচ বর্তমানে সেসব প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে আজ আমরা কাউকে 'খালিয়া' বা 'বারিয়্যাহ' শব্দের মাধ্যমে তালাক প্রদান করতে দেখি না।(১)

— স্বামী-স্ত্রী যদি মোহরানা গ্রহণের ব্যাপারে মতবিরোধ করে, তবে সে ক্ষেত্রে বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত প্রথা অনুযায়ী ভিন্ন হবে। ফলে

তাদের দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কখনও স্বামীর কথা, আবার কখনও স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।(২)

অতএব, জনস্বার্থ বা প্রথার পরিবর্তনের কারণে বিধানের পরিবর্তন ঘটার বিষয়টি শরিয়তের মূল পাঠ (নস) এবং ফকীহগণের ইজতিহাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

তবে নস এবং শরয়ী বিধানসমূহের ক্ষেত্রে বিষয়টি দুটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্বতন্ত্র:

১. এ জাতীয় উদাহরণ খুবই নগণ্য এবং এগুলো সীমিত কিছু উদাহরণের সাথে সংশ্লিষ্ট যা গণনা করা সম্ভব।
২. এগুলো বিধানের প্রয়োগস্থল বা ভিত্তি অনুসন্ধানের (তাহকীকুল মানাত) সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এটি মূলত বিধানের পরিবর্তন নয়, বরং বিধানের প্রয়োগস্থলের যথার্থতা যাচাই করা।

পক্ষান্তরে ফকীহগণের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে এ জাতীয় উদাহরণ অনেক। এটি কেবল প্রয়োগস্থলের (মানাত) পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; যেমন বিবাহ, তালাক, শপথ, ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রথার পরিবর্তনের কারণে বিধানের পরিবর্তন ঘটে। বরং এটি খোদ ইজতিহাদের পরিবর্তনের কারণেও হতে পারে। যেমন কোনো ফকীহ কোনো একটি মতকে কিংবা নসের কোনো একটি বুঝকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, অতঃপর কোনো শক্তিশালী দলীলের উপস্থিতিতে তিনি সেই মতটি পরিবর্তন করেন। অথবা পূর্ববর্তী দলীলের দুর্বলতা অনুধাবন করার কারণে, কিংবা কোনো জনকল্যাণ প্রকাশ পাওয়া অথবা ইতিপূর্বে অস্পষ্ট থাকা কোনো অনিষ্ট স্পষ্ট হওয়ার কারণেও এটি হতে পারে; ফলে এই সবকিছুর ওপর ভিত্তি করে বিধানটি পরিবর্তিত হয়।

একটি যৌক্তিক আপত্তি:

বিধান পরিবর্তনের বিষয়টি সাব্যস্ত করা কিছু মানুষের মনে এই উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে যে, পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে এটি শরীয়তের বিধানাবলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পথ উন্মুক্ত করে দেবে এবং এটি প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো বিধান স্থগিত করার বাহানায় পরিণত হবে।

---

(১) দেখুন: আল-ফুরূক ৩/২৮৩, এবং দেখুন: ১/১৩৮।
(২) দেখুন: আল-ফুরূক ১/১৪০।

শরীয়তকে প্রথা ও জনস্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত করা। এই সতর্কতা অনেক সময় এই বিষয়ে আলোচনা বর্জন করতে কিংবা এই পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে একে সংকীর্ণ করার দিকে ধাবিত করতে পারে।

সত্য কথা হলো, শরীয়তের বিধান নিয়ে অনর্থক নাড়াচাড়া বা ছিনিমিনি খেলার কোনো সঠিক ভিত্তি নেই। যে ব্যক্তি এমনটি করে, সে নিজের মতকে জায়েজ করার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করতেই দ্বিধাবোধ করে না। সুতরাং নির্ভরযোগ্য ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গিতে ফকিহগণের কর্মপন্থা নির্ধারণ করার দ্বারা এই ধরনের অযৌক্তিক মতামতের বৈধতা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বরং এই স্পষ্টীকরণই শরীয়ত নিয়ে খেলার পথকে সংকীর্ণ করে দেয়। কারণ এটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করে দেয়, ফলে ভুল পথটি উন্মোচিত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে নীরব থাকা বাতিলপন্থীদের পথকেই শক্তিশালী করে।

এজন্যই, এই ধরনের নির্ভরযোগ্য ফিকহি নীতিমালার দোহাই দিয়ে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন না করার নিশ্চয়তা হলো এই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া যে, ব্যক্তিকে অবশ্যই শরীয়তের বিধানাবলি অনুধাবনের যোগ্য হতে হবে যাতে সে ভুল না করে। এর পাশাপাশি তাকে দ্বীনদারি ও এমন আত্মরক্ষা বা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যা শরীয়তের বিধান নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রটিকে শিথিলতা ও অনর্থক কাজ থেকে রক্ষা করবে।

তৃতীয় ক্ষেত্র: অন্যান্য শরয়ি মূলনীতি ও উসুলের সাথে সাংঘর্ষিক নস (দলিল)।

'সিয়াসা শরইয়্যাহ' বা প্রশাসনিক রাজনীতির প্রয়োগক্ষেত্রগুলোর মধ্যে একটি হলো নস বা দলিলসমূহের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত করা। এটি করা হয় অধিক শক্তিশালী দলিলটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে কোনো অকাট্য নস নেই। সেখানে নসের উপস্থিতি এই বিষয়ে কোনো প্রভাব ফেলে না, কারণ নসগুলো পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে এখানে ইজতিহাদ ও তারজিহ (প্রাধান্য নির্ধারণ) করার প্রয়োজন পড়ে।

এই বিরোধটি দলিলের নির্ভরযোগ্যতা, অর্থের স্পষ্টতার শক্তি অথবা দলিলসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি ইত্যাদি বিচারে নসসমূহের মধ্যে কোনটি অধিক অগ্রগণ্য—তার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। এমতাবস্থায় এটি নসের অর্থ ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে, যা আমাদের এখানে আলোচিত সিয়াসা শরইয়্যাহ-এর কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়।

আবার এই বিরোধটি সংশ্লিষ্ট মাসলাহাত (কল্যাণ) ও মাফাসাদ (অকল্যাণ) পর্যালোচনার সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে। আর এখানে এই ক্ষেত্রটিই উদ্দেশ্য। এগুলো হলো এমন কিছু শরয়ি বিধান যা একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় দুটি কল্যাণের মধ্যে অধিকতর উত্তমটি গ্রহণ করা এবং দুটি অকল্যাণের মধ্যে কম ক্ষতিকরটি বেছে নেওয়া ওয়াজিব।

এখানে উদ্ভূত বিষয়টি হতে পারে:

১. আবশ্যকতা (জরুরত): শরয়ী মূলনীতি হলো: “আর তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যা তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন, তবে যার প্রতি তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়ো।” [আল-আন‘আম: ১১৯]। এ থেকেই আলিমগণ প্রসিদ্ধ ফিকহি মূলনীতিটি গ্রহণ করেছেন: “আবশ্যকতা বা চরম নিরুপায় অবস্থা নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে।”

২. প্রয়োজন (হাজাত): এটি তীব্রতা ও সংকীর্ণতার ক্ষেত্রে ‘আবশ্যকতা’র চেয়ে নিম্নস্তরের। এ কারণে বিধানের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ‘আবশ্যকতা’র প্রভাবের চেয়ে কম হয় (১)।

৩. শরিয়ত-স্বীকৃত মাসলাহাত (কল্যাণ): এর অন্তর্ভুক্ত হলো: দণ্ডবিধি (হদ) কার্যকরের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা, যদি অপরাধীর ওপর বড় কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। মূল বিধান হলো দ্রুত কার্যকর করা, তবে এই কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে বিলম্বকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে কিসাস গ্রহণে বিলম্ব করা। উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের থেকে আলী বিন আবী তালিব (রা.)-এর কিসাস গ্রহণে বিলম্ব করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনুল আরাবি বলেন:

“(কেননা আলী যদি তাদের কাছ থেকে কিসাস গ্রহণ করতেন, তবে বিভিন্ন গোত্র তাদের পক্ষ নিয়ে গোত্রীয় সংঘাতের জন্ম দিত, যার ফলে তৃতীয় একটি যুদ্ধ বেধে যেত। তাই তিনি অপেক্ষা করেছিলেন যেন বিষয়টি সুসংহত হয়, সাধারণ আনুগত্যের শপথ (বাইআত) সম্পন্ন হয় এবং বিচারকের দরবারে নিহতের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কিসাসের দাবি উত্থাপিত হয়, যাতে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করা যায়। উম্মাহর মাঝে এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, ইমামের জন্য কিসাস বিলম্ব করা বৈধ, যদি তা ফিতনা সৃষ্টি করা বা ঐক্য বিনষ্ট করার দিকে নিয়ে যায়) (২)।”

৪. সংঘটিত ক্ষতির চেয়ে বৃহত্তর কোনো কল্যাণ (মাসলাহাত): যেমন জালেম শাসকের অধীনে দায়িত্ব গ্রহণ করা—যা সামনে আলোচনা করা হবে—সে ব্যক্তির জন্য যে জনগণের কষ্ট লাঘব করতে চায়। কারণ তার মতো ব্যক্তির এতে অংশগ্রহণ একটি বড় কল্যাণ। এক্ষেত্রে ক্ষতি তো অবধারিতভাবেই সংঘটিত হচ্ছে (সে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক), তবে তার প্রবেশের ফলে অনিষ্ট বা ফাসাদ কিছুটা লাঘব হয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, কল্যাণ ও ক্ষতির এই বৈপরীত্য মূলত মুসলমানদের দুর্বলতা, বিভেদ এবং তাদের ওপর শরিয়ত অনুযায়ী শাসনকারী কোনো ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতেই বেশি প্রকট হয়; কারণ এর ফলে ...

(১) শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে ‘প্রয়োজন’ বা হাজাতের প্রভাবের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: আল-হাজাহ ওয়া আসারুহা ফিল আহকামুত তাকলিফিয়্যাহ, লেখক: আহমদ আল-রশিদ ১/২৫৭-২৭৩।
(২) আহকামুল কুরআন ৪/১৫০।

মূর্খতা, প্রবৃত্তির বিস্তার এবং সত্য প্রচ্ছন্ন থাকা; মূলত এই পরিস্থিতিই এই ধরণের বৈপরীত্য বিদ্যমান থাকার অন্যতম প্রধান কারণ। এটি এমন একটি বিষয় যা ইবনে তাইমিয়্যাহ লক্ষ্য করেছেন এবং বলেছেন:

(বৈপরীত্যের অধ্যায়টি অত্যন্ত প্রশস্ত একটি অধ্যায়; বিশেষ করে ঐ সকল যুগ ও স্থানে যেখানে নবুওয়াতের প্রভাব এবং নবুওয়াতের খেলাফত বা উত্তরাধিকার হ্রাস পেয়েছে। কারণ এই বিষয়গুলো সেখানে অধিক পরিমাণে দেখা দেয়। আর এই ঘাটতি যত বৃদ্ধি পায়, এই বিষয়গুলোও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। উম্মতের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো এগুলোর উপস্থিতি। কারণ যখন ভালো ও মন্দের সংমিশ্রণ ঘটে, তখন অস্পষ্টতা ও অপরিহার্যতা তৈরি হয়। ফলে একদল লোক কেবল ভালো দিকটি দেখে এবং এই পক্ষটিকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাতে বড় ধরণের মন্দ নিহিত থাকে। আবার অন্য একদল লোক মন্দ দিকটি দেখে এবং অপর পক্ষটিকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাতে বড় ধরণের কল্যাণ বর্জন করা হয়। আর মধ্যপন্থী যারা উভয় দিক বিবেচনা করেন, তাদের অনেকের কাছেই উপকার ও অপকারের পরিমাণ স্পষ্ট হয় না। অথবা তাদের কাছে তা স্পষ্ট হলেও তারা এমন কাউকে পায় না যে তাদের ভালো কাজ করতে এবং মন্দ কাজ বর্জন করতে সাহায্য করবে; কারণ কুপ্রবৃত্তিগুলো মতামতের সাথে মিশে গিয়েছে।)(১)।

৫- শর্তাবলির কোনো একটি শর্তের অনুপস্থিতি:

বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিবেচিত কোনো কোনো শর্তের অনুপস্থিতি ঘটা প্রতিবন্ধকতাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর বিধান কার্যকর করতে অক্ষম হওয়াও শর্তের অনুপস্থিতির অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই কিছু শরয়ি বিধানের কার্যকারিতা প্রভাবিত হয় যখন তা প্রতিষ্ঠিত করার মতো সক্ষম কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান থাকে না।

এজন্যই যখন বিধানগুলো প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষমতা এবং সেগুলো কার্যকর করার অসামর্থ্য প্রকাশ পায়, তখন মুসলমানদের জন্য ঐ সকল আমল করা বিধিসম্মত হয় যা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের সূচনালগ্নে করতেন। যেমন: মুশরিকদের উপেক্ষা করা, তাদের নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। এগুলো এমন সব বিধান যা ইসলামের শুরুতে তৎকালীন মুসলমানদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রবর্তন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মুসলমানরা শক্তিশালী হওয়ার পর তা ছেড়ে দেওয়া হয়। সুতরাং এগুলো কোনোভাবেই ঢালাওভাবে রহিত (মানসুখ) বিধান নয়; বরং এগুলো সুনির্দিষ্ট কারণ বা পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান। অতএব, যখন কোনো যুগে, স্থানে বা অবস্থায় মুসলমানদের পরিস্থিতি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই সময়ের পরিস্থিতির মতো হবে, তখন তাদের জন্য ঐ সকল বিধান অনুযায়ী আমল করা বিধিসম্মত হবে।

---

(১) মাজমুউল ফাতাওয়া ২০/ ৫৭ - ৫৮।

পৃষ্ঠা 73

বিধানসমূহ, যাকে অনেক আলেম 'মুনসা' (স্থগিত বা বিলম্বিত) নামে অভিহিত করেন এবং তারা একে মহান আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত করেন: "আমি কোনো আয়াত রহিত করলে কিংবা তা বিস্মৃত করে দিলে (অথবা স্থগিত করলে) আমি তার চেয়ে উত্তম কিংবা তার সমপর্যায়ের কোনো আয়াত নিয়ে আসি।" [আল-বাকারা: ১০৬]। এটি 'নুনসা-হা' কিরাআত অনুযায়ী।

ইমাম যারকাশী বলেন:
"কোনো বিশেষ কারণের প্রেক্ষিতে কোনো নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, অতঃপর সেই কারণটি দূর হয়ে গেছে। যেমন মুসলিমদের দুর্বলতা ও সংখ্যাস্বল্পতার সময়ে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ, এবং যারা আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে তাদের ক্ষমা করে দেওয়ার নির্দেশ ইত্যাদি; যেমন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান এবং জিহাদ ওয়াজিব না করা ও এ জাতীয় বিষয়সমূহ। অতঃপর (শক্তির সঞ্চার হলে) এর বিপরীতে পরবর্তী সময়ে নতুন বিধান প্রদান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি রহিতকরণ (নাসখ) নয়, বরং এটি হলো বিলম্বিতকরণ (নাস'), যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (অথবা আমি তা স্থগিত রাখি)। সুতরাং স্থগিত বা বিলম্বিত বিষয়টি হলো যুদ্ধের নির্দেশ আসা পর্যন্ত মুসলিমদের শক্তিশালী হওয়া। আর দুর্বল অবস্থায় বিধান হলো কষ্টের মুখে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব হওয়া।"

এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনেক মুফাসসিরের সেই মতামতের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে যায় যা তারা শিথিলতামূলক আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে প্রচার করে থাকেন যে, সেগুলো 'তরবারির আয়াত' (আয়াতুস সাইফ) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। বিষয়টি আসলে তা নয়, বরং এগুলো 'মুনসা' (বিলম্বিত বিধান) এর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হলো, প্রতিটি নির্দেশ যা কোনো বিশেষ কারণ বা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে, সেই কারণ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত তা পালন করা ওয়াজিব। অতঃপর সেই কারণটি পরিবর্তিত হয়ে অন্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বিধানটিও অন্য বিধানে রূপান্তরিত হয়, এটি (প্রকৃত অর্থে) রহিতকরণ নয়।(১)

ইমাম জাস্সাস বলেন:
"তবে কোনো এক সময়ে যদি মুসলিমদের অক্ষমতার কারণে শত্রুর মোকাবিলা করতে এর প্রয়োজন পড়ে, অথবা তাদের নিজেদের বা সন্তানদের ব্যাপারে প্রাণের আশঙ্কার সৃষ্টি হয়, তবে শত্রুর সাথে জিজিয়া প্রদান ব্যতিরেকেই সন্ধি ও সমঝোতা করা বৈধ হবে। কেননা, চুক্তি বা সন্ধি নিষিদ্ধ হওয়া ছিল মূলত শত্রুর ওপর মুসলিমদের শক্তি ও আধিপত্য বিদ্যমান থাকার কারণে। ইসলামের শুরুর দিকে সন্ধি করা বৈধ ও জায়েজ ছিল এবং পরবর্তী সময়ে উক্ত কারণের (শক্তির) উদ্ভব হওয়ায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সুতরাং যখন সেই কারণটি দূর হয়ে যাবে এবং পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে যেখানে মুসলিমরা ছিল..."

---

(১) আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন, ইমাম যারকাশী ২/ ৪২ - ৪৩; এই জাতীয় অর্থের বর্ণনার জন্য আরও দেখুন: নুযুমুদ দুরার ফি তানাসুবিল আয়াতি ওয়াস সুওয়ার, আল-বিকায়ী ২/ ৯৪ - ৯৫; আল-জামে লি আহকামিল কুরআন ১২/ ৪৮; আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন ৩/ ৬৮ - ৬৯; এবং মুনসা বিষয়ক আলোচনায় দেখুন, আহমদ আল-মামারি ৪৪১ - ৪৬৭।

...শত্রু থেকে নিজেদের জীবনের ওপর ভীতির কারণে সেই বিধানটি ফিরে আসে যা যুদ্ধবিরতির (হুদনাহ) বৈধতা থেকে উৎসারিত। (১)

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন:
"মুমিনদের মধ্যে যারা এমন কোনো ভূখণ্ডে থাকে যেখানে তারা দুর্বল অথবা এমন কোনো সময়ে থাকে যখন তারা দুর্বল, তারা যেন সেই আয়াতের ওপর আমল করে যাতে কিতাবধারী এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ এবং ক্ষমা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শক্তিমানরা কেবল কুফর নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়াতের ওপর আমল করবে যারা দ্বীনকে আক্রমণ করে, এবং সেই আয়াতের ওপর আমল করবে যা কিতাবধারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেয় যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।" (২)

এই ধরনের পরিবর্তন বিবেচনা করা সিয়াসাহ শারইয়্যাহর (শরয়ি রাজনীতি) ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য মাসলাহাত-ভিত্তিক ইজতিহাদ। কেননা এটি অক্ষমতা ও দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির সাথে জড়িত। ফলে শরিয়তের মূল বিধানের ওপর আমল করা তাত্ত্বিকভাবে অপ্রাধান্যযোগ্য (মারজুহ) হয়ে পড়ে, কারণ শরিয়তের মূলনীতি ও বিধিবিধানের মধ্যে এমন কিছু বিদ্যমান থাকে যা সেই পরিস্থিতির জন্য অধিক অগ্রগণ্য (রাজিহ)।

এই ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্মরণে রাখা উচিত:

— প্রয়োজন (হাজাত), নিরুপায় অবস্থা (দারুরাত) এবং জনকল্যাণকে (মাসলাহাত) তাদের নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে বিবেচনা করা আসলে শারয়ি নসসমূহের (দলিলসমূহ) প্রয়োগ এবং সেগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন মাত্র; এটি মাসলাহাত বা বিবেকের দোহাই দিয়ে নসসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার অন্তর্ভুক্ত নয়।

— আপতিত পরিস্থিতিগুলোর (আওয়ারিদ) প্রতি লক্ষ্য রাখা উভয় দিকের ভারসাম্য রক্ষা এবং যা অধিক অগ্রগণ্য তাকে প্রাধান্য দেওয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ, নিরুপায় অবস্থার (দারুরাত) পরিস্থিতি আর প্রয়োজনের (হাজাত) পরিস্থিতি এক নয়। আবার প্রয়োজন সাধারণ জনকল্যাণের চেয়েও উচ্চতর বিষয়। সুতরাং প্রতিটি আপতিত পরিস্থিতির প্রভাব তার নিজ শক্তির ওপর এবং তার বিপরীতে থাকা বিষয়ের শক্তির ওপর নির্ভর করে।

— সক্ষমতা (ইসতিতা'আত) হলো শারয়ি ওয়াজিবসমূহ পালনের একটি শর্ত। আর সক্ষমতা বলতে এখানে শারয়ি সক্ষমতা বোঝানো হয়েছে, যা এমন সামর্থ্যকে বোঝায় যার ফলে আরও বড় কোনো ফাসাদ (ক্ষতি) সৃষ্টি হয় না। এটি কোনো কাজের পরিণতির তোয়াক্কা না করে কেবল নিরঙ্কুশ সামর্থ্যকে বোঝায় না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ যা ইবনে তাইমিয়্যাহ সতর্ক করেছেন এবং বলেছেন:

---

(১) আহকামুল কুরআন ২/২৭৬-২৭৭, এবং এই অর্থের জন্য আরও দেখুন: ৩/৪২৭, ৩/৫৭৩।
(২) আস-সারিমুল মাসলুল ২/২১৪, এবং এই অর্থ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আরও দেখুন: ৩/৬৮১-৬৮৩, ২/৪০৫-৪০৬, আহকামু আহলিয যিম্মাহ ২/৭৬৮।

শরীয়ত প্রণেতা শরয়ী সামর্থ্যের (ইস্তিতায়াহ শারইয়্যাহ) ক্ষেত্রে কেবল কাজের নিছক সক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদির দিকেও লক্ষ্য করেন। সুতরাং কোনো কাজ যদি প্রবল ক্ষতির (মাফাসাদাহ রাজেহাহ) সাথে করা সম্ভব হয়, তবে তা শরয়ী সামর্থ্য হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন: যে ব্যক্তি শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করার সামর্থ্য রাখে, অথবা যে ব্যক্তি অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম, অথবা যে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার মাঝেও দুই মাস রোজা রাখতে সক্ষম এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়। (১)

চতুর্থ ক্ষেত্র: ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে এমন নস (নস মুহতামাল)।

সিয়াসাহ শারইয়ার (শরয়ী রাজনীতির) অন্যতম ক্ষেত্র হলো সেই সকল নস যা ইজতিহাদী পরিসর এবং গ্রহণযোগ্য মতভেদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। মূলত এগুলো একটি বৈধ ইজতিহাদী ক্ষেত্র, যেখানে একজন (শাসক বা মুজতাহিদ) তার নিকট অধিকতর নিকটবর্তী মনে হওয়া মতটির দিকে ঝুঁকে পড়তে পারেন এবং জনকল্যাণ (মাসলাহাতুল আম্মাহ) বিবেচনার ভিত্তিতে এই মতগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটিকে বেছে নিতে পারেন। এমতাবস্থায় তা গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য হবে।

এর একটি উদাহরণ হলো ইমামের (শাসকের) অনুমতি ব্যতীত জুমুআর সালাত আদায়ের বিধান। এ বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান (২); সুতরাং যদি অনুমতি শর্ত হওয়ার মতটি গ্রহণ করা জনকল্যাণ নিশ্চিত করে, তবে সিয়াসাহ শারইয়ার গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ হলো সেই মতটিকেই বেছে নেওয়া।

বৈধ মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে এই ইজতিহাদ যদি নিছক ইলমি বা তাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে হয়—যেমন শাসক কোনো একটি মত পছন্দ করে তা কার্যকর করলেন তার অনুসৃত মাযহাবের অনুকরণের (তাকলীদ) কারণে, কিংবা নির্দিষ্ট দলিলের ভিত্তিতে কোনো একটি মতকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে—তবে এটি সিয়াসাহ শারইয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং এটি পূর্বে বর্ণিত অকাট্য নসসমূহের (নসূস ক্বতঈয়্যাহ) সদৃশ হবে, যেহেতু তিনি এখানে নিজের কাছে প্রাধান্য পাওয়া বিধান অনুযায়ী আমল করছেন।

আর যদি এই পছন্দ বা নির্বাচন কোনো কল্যাণকর বিবেচনার ভিত্তিতে হয়—যেমন ক্ষতি প্রতিহত করা, হারামের পথ বন্ধ করা (সাদ্দুয যারীআহ), কোনো প্রয়োজন কিংবা বিশেষ জনকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা—তবে তা সিয়াসাহ শারইয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

(১) মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ৩/৪৯; একই প্রসঙ্গের বর্ণনায় দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ৮/৪৩৯-৪৪০ এবং ১৪/১০৩।
(২) জুমুআ কায়েমের ক্ষেত্রে ইমামের অনুমতির শর্তারোপের ব্যাপারে হানাফীগণ জমহুর (অধিকাংশ) ওলামায়ে কেরামের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন। দেখুন: আল-বাহরুর রাইক ২/১৫৬, শারহুয যুরকানী আলা মুখতাসারি খালীল ২/১১০, আল-মাজমু ৪/৫৮৩, শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ১/৩১১।

ষষ্ঠ ভূমিকা

অনুরূপ পরিভাষাসমূহের সাথে সিয়াসাহ শারইয়্যাহর সম্পর্ক

পরিভাষা ও ধারণাসমূহ বোঝার ক্ষেত্রে একটি উপকারী পদ্ধতি হলো সেগুলোকে তাদের নিকটবর্তী পরিভাষাসমূহের সাথে তুলনা করা; যাতে তাদের মধ্যকার ঐকমত্য ও পার্থক্যের দিকগুলো জানা যায়, যা এই পরিভাষাটি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করে।

যখন আমরা সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ধারণার সাথে তুলনা করার জন্য এর নিকটবর্তী পরিভাষাগুলো অনুসন্ধান করি, তখন আমরা

নিম্নোক্ত পরিভাষাগুলো চিহ্নিত করতে পারি:

১- সিয়াসাহ শারইয়্যাহ এবং ফিকহ শাস্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক:

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ হলো ফিকহ শাস্ত্রের একটি অংশ। কারণ ফিকহের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, যা অকাট্য এবং ইজতিহাদী (গবেষণামূলক) উভয় প্রকার বিধানকেই অন্তর্ভুক্ত করে; এবং এটি সাধারণ ও বিশেষ উভয় দিক এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিককেই শামিল করে। অন্যদিকে, সিয়াসাহ শারইয়্যাহ এই সবকিছুর একটি নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি হলো ব্যবহারিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ধারণাপ্রসূত (সাধারণ) দিকের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু আমরা যদি সিয়াসাহ শারইয়্যাহকে এমন একটি শাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করি যা রাজনীতি সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ও মাসআলাসমূহকে একত্রিত করে, তবে সেটিও ফিকহের একটি অংশ হবে; তবে তা ফিকহের একটি বিশেষ অধ্যায়ের মধ্যে অকাট্য ও ধারণাপ্রসূত এবং ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক—উভয় দিককেই সমন্বিত করবে।

২- সিয়াসাহ শারইয়্যাহ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যকার সম্পর্ক:

যেকোনো সাধারণ ব্যবস্থার মূলনীতি হলো তা সিয়াসাহ শারইয়্যাহর অংশ। কেননা এটি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি বাধ্যতামূলক আইন। আর এর অন্তর্গত আইন ও নিয়মাবলী যদি শরীয়তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তবে তা সিয়াসাহ শারইয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

---

৩. সিয়াসাতে শারইয়াহ এবং সিয়াসাতে শারইয়াহ শাস্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক:

আমরা যদি সিয়াসাতে শারইয়াহকে সিয়াসাতে শারইয়াহ শাস্ত্র হিসেবেই গণ্য করি, তবে এই ধরনের তুলনার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু সিয়াসাত যে একটি গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ এবং শরীয়তসম্মত জনকল্যাণ (মাসলাহাত) অর্জনের একটি পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি—এই মৌলনীতির ভিত্তিতে সিয়াসাত দুটি দিক থেকে সিয়াসাতে শারইয়াহ শাস্ত্র হতে ভিন্নতর:

প্রথম দিক: সিয়াসাতে শারইয়াহ হলো একটি ইজতিহাদ ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি; পক্ষান্তরে সিয়াসাতে শারইয়াহ শাস্ত্র হলো একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্র, যা রাজনীতি সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ও মাসআলাসমূহকে একত্রিত করে।

দ্বিতীয় দিক: সিয়াসাতে শারইয়াহ এই মাসআলাগুলোর একটি নির্দিষ্ট দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর তা হলো জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ। অন্যদিকে সিয়াসাত শাস্ত্র এই মাসআলাগুলো এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য মাসআলাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

৪. সিয়াসাতে শারইয়াহ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যকার সম্পর্ক:

রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অধ্যায়, সুতরাং এটি সিয়াসাতে শারইয়াহ শাস্ত্রের একটি অংশ। সিয়াসাতে শারইয়াহ শাস্ত্রের সাথে তুলনার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যে দুটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখানেও প্রযোজ্য। কেননা সিয়াসাতে শারইয়াহ একটি পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, এটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্র নয়। সিয়াসাত কেবল ইজতিহাদগত দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেখানে রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত ব্যাপক।

এর সাথে তৃতীয় একটি দিক যুক্ত করা যায়, আর তা হলো—সিয়াসাতে শারইয়াহ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে

যেমন বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও হতে পারে।

৫. সিয়াসাতে শারইয়াহ এবং মাসলাহা মুরসালাহর মধ্যকার সম্পর্ক:

এদের মধ্যকার পার্থক্য দুটি দিক থেকে স্পষ্ট করা যেতে পারে:

প্রথম দিক: মাসলাহা মুরসালাহ সিয়াসাতে শারইয়াহর ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী এবং এটি সিয়াসাতে শারইয়াহর অন্যতম প্রধান মূলনীতি যার ওপর এটি দণ্ডায়মান। তবে এটিই একমাত্র দলিল নয়; কেননা সিয়াসাতে শারইয়াহ অন্যান্য দলিলের ওপরও ভিত্তি করে থাকে।

পৃষ্ঠা 78

দ্বিতীয় দিক: এই দুটি বিষয় হাকীকত (প্রকৃত সত্তা) এবং অর্থের দিক থেকে ভিন্ন; মাসলাহা মুরসালা মূলত শরয়ী বিবেচনার ভিত্তিতে কল্যাণের প্রকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। পক্ষান্তরে সিয়াসাত শারইয়্যাহ শাসক কর্তৃক তার শাসনকার্য পরিচালনার পদ্ধতির পর্যালোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট। সিয়াসাত শারইয়্যাহর ভিত্তি কখনও এই মাসলাহা হতে পারে, তবে তা স্বয়ং সিয়াসাত শারইয়্যাহ নয়। তদ্রূপ মাসলাহা মুরসালা এমন ক্ষেত্রেও কার্যকর হতে পারে যেখানে সিয়াসাত শারইয়্যাহর কোনো ভূমিকা নেই, যেমন ব্যক্তিগত বিষয়াবলী।

সিয়াসাত শারইয়্যাহ এবং মাসলাহা মুরসালাহর মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রে আরও বলা যায় যে: সিয়াসাত শারইয়্যাহ হলো জনকল্যাণ রক্ষা এবং এর ক্ষতিকারক বিষয়সমূহ প্রতিহত করার জন্য একটি প্রশাসনিক মাধ্যম। কেননা এটি জনকল্যাণ রক্ষার্থে ক্ষমতাকে কাজে লাগায়। একই সাথে এই জনকল্যাণ অর্জন করাই হলো সিয়াসাত শারইয়্যাহর মূল লক্ষ্য, যা হাসিলের জন্য তা সচেষ্ট থাকে (১)।

---

(১) দেখুন: আল-মাসলাহাতুল আম্মাহ মিন মানযুর ইসলামি, পৃষ্ঠা ১১১ ও ১১৭।

পৃষ্ঠা 79

সপ্তম ভূমিকা

রাজনীতি ও শরিয়তের মধ্যকার সম্পর্ক

শরিয়তের জন্য রাজনীতি অপরিহার্য এবং রাজনীতি শরিয়তেরই অংশ। এমনকি রাজনীতি যদি মুবাহ (বৈধ) বা ইজতিহাদসাপেক্ষ বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত হয়, তবুও তা শরিয়তের বিধানের বাইরে চলে যায় না। কারণ, শরিয়তই সেই সব বিষয়কে মুবাহ ঘোষণা করেছে এবং সেগুলোতে ইজতিহাদ করার অবকাশ দিয়েছে।

তবে ফিকহশাস্ত্রের ইতিহাসে রাজনীতি ও শরিয়তের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি জটিলতা তৈরি হয়েছিল, যা ইসলামের একদল ফকিহ সমালোচনা করেছেন।

এই জটিলতা রাজনীতির শরিয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং শরিয়তের সীমানা অতিক্রম করে দূরে সরে যাওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এর আংশিক কারণ হলো—তারা এমন কিছু জনকল্যাণমূলক (মাসলাহাত) পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন যেগুলোকে তারা শরিয়তবিরোধী মনে করতেন। ফলে তারা জনকল্যাণের স্বার্থে সেই পথগুলো অবলম্বন করেন এবং সেগুলোকে 'রাজনীতি' (সিয়াসাত) হিসেবে অভিহিত করেন। এর ফলে এটি শরিয়তের মুখোমুখি এক অবস্থানে দাঁড়ায়। অতঃপর তারা এই রাজনীতির পরিধি আরও বিস্তৃত করেন এবং শরিয়তের সীমানা ছাড়িয়ে যান।

আল-মাকরিজি এই বিষয়টি এবং মোঙ্গলদের সাথে এর সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন:

"(এটি একটি মোঙ্গলীয় শব্দ, যার মূল হলো 'ইয়াসা'। মিশরের অধিবাসীরা শব্দটিকে বিকৃত করেছে এবং এর শুরুতে একটি 'সীন' যোগ করে তারা একে 'সিয়াসাত' বলেছে। অতঃপর তারা এর শুরুতে আলিফ-লাম যুক্ত করে। ফলে যাদের এ বিষয়ে জ্ঞান নেই, তারা মনে করে এটি একটি আরবি শব্দ। অথচ প্রকৃত বিষয়টি তেমন নয় যেমনটি আমি আপনাকে বলেছি। এবার শুনুন, কীভাবে এই শব্দটি উৎপত্তি লাভ করে মিশর ও সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল: যখন পূর্ব দেশসমূহে তাতার সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খান রাজা ওং খানকে পরাজিত করলেন এবং একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন তিনি কিছু নিয়ম ও দণ্ডবিধি নির্ধারণ করলেন। তিনি এগুলো একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন যার নাম দেন 'ইয়াসা'। কেউ কেউ একে 'ইয়াসাক'ও বলে থাকে, তবে এর মূল নাম হলো 'ইয়াসা'। যখন তিনি এটি প্রণয়ন শেষ করলেন, তখন তিনি তা ইস্পাতের পাতে খোদাই করে লিখলেন এবং একে নিজ জাতির জন্য আইন (শরিয়ত) হিসেবে নির্ধারণ করলেন।)"(১)।

(১) আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ই'তিবার ৩ / ৩৮৪।

আল-মাকরিজি 'ইয়াসিক'-এর কিছু নীতিমালা ও বিধান পর্যালোচনা করার পর মুসলিম বিশ্বের সাথে তাতারদের সংমিশ্রণ এবং এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে তাদের রীতিনীতির প্রসার এবং তৎকালীন রাজত্ব ও সালতানাতে তাদের প্রভাবের বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি ছিল যে, তারা বিচারকদের হাতে ন্যস্ত করেছিল: (নামাজ, রোজা, জাকাত এবং হজ সংক্রান্ত ধর্মীয় যাবতীয় বিষয়াদি। এছাড়া ওয়াকফ ও এতিমদের বিষয়গুলোও তাদের জিম্মায় রাখা হয়েছিল। শরিয়াহ বিষয়ক বিচারিক বিষয়গুলো দেখার দায়িত্বও তাদের দেওয়া হয়েছিল, যেমন দম্পতিদের বিবাদ, পাওনাদারদের দাবি এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ। কিন্তু তাতাররা নিজেদের ক্ষেত্রে চেঙ্গিস খানের রীতিনীতির দিকে ফিরে যাওয়া এবং 'ইয়াসা' এর বিধান অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত। তাই তারা নিজেদের মধ্যকার প্রথাগত বিরোধগুলো মীমাংসা করার জন্য একজন 'হাজিব' (প্রহরী বা রাজ কর্মকর্তা) নিযুক্ত করেছিল। এই হাজিব ইয়াসার বিধান অনুযায়ী প্রভাবশালীদের দমন করতেন এবং দুর্বলের প্রতি ইনসাফ করতেন। এর পাশাপাশি তারা সালতানাতের দিওয়ান বা দাপ্তরিক বিষয়গুলোতে ইকতা (ভূমি বণ্টন) সংক্রান্ত বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসার দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত করেছিল, যাতে দিওয়ানের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং হিসাবের নীতিমালা বাস্তবায়িত হয়)(১)।

ইবনে তাইমিয়্যাহ এই ঐতিহাসিক সমস্যাটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং যে সকল ফকিহ এর জন্য দায়ী তাদের সমালোচনা করে বলেন:

(যখন খিলাফত আব্বাসীয় বংশধরদের হাতে চলে যায় এবং তাদের জনগণের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার (সিয়াসাত) প্রয়োজন দেখা দেয়, আর ইরাকের ফকিহদের মধ্য থেকে যারা বিচারিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তারা যখন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন ইনসাফপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাদের কাছে থাকা জ্ঞান পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে তারা তখন 'মাজালিম' (অভিযোগ নিষ্পত্তি বিভাগ) প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হন। তারা যুদ্ধ সংক্রান্ত শাসনকে শরিয়াহ শাসন থেকে আলাদা করে ফেলেন। মুসলিম বিশ্বের অনেক জনপদে এই বিষয়টি এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে, এমনকি বলা হতে থাকে: শরিয়াহ এবং সিয়াসাত। ফলে একজন তার প্রতিপক্ষকে শরিয়াহর দিকে আহ্বান জানায়, আর অন্যজন সিয়াসাতের দিকে আহ্বান জানায়। এক শাসককে শরিয়াহ অনুযায়ী বিচার করার এবং অন্যজনকে সিয়াসাত অনুযায়ী বিচার করার অনুমতি দেওয়া হলো। এর কারণ ছিল এই যে, যারা নিজেদের শরিয়াহর সাথে সংশ্লিষ্ট দাবি করতেন, তারা সুন্নাহর জ্ঞানে পিছিয়ে ছিলেন। ফলে এমন বহু বিষয়ের উদ্ভব হলো যেখানে তারা যখন বিচার করতেন, তখন মানুষের অধিকার নষ্ট হতো এবং দণ্ডবিধি (হুদুদ) অকার্যকর হয়ে পড়ত। এমনকি রক্তপাত ঘটত, সম্পদ কেড়ে নেওয়া হতো এবং হারাম কাজগুলো বৈধ হয়ে যেত। আর যারা নিজেদের সিয়াসাতের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন, তারা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে এক ধরণের মনগড়া মতামতের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে যারা উত্তম তারা হলেন যারা...)

---

(১) আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার ৩/৩৮৫ - ৩৮৬।

তিনি প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে ফয়সালা করেন এবং ন্যায়বিচার অন্বেষণ করেন। পক্ষান্তরে তাদের অনেকেই প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ফয়সালা করে, এবং তারা শক্তিশালী ও যারা তাদের ঘুষ দেয় তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে, এবং এই জাতীয় আরও অনেক কিছু (১)।

ইবনুল কাইয়্যিম এই প্রপঞ্চের প্রতি তাঁর এই সমালোচনামূলক পথ অব্যাহত রেখে বলেন:

“এটি পা পিছলে যাওয়ার স্থান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তির জায়গা। এটি এক সংকীর্ণ মাকাম ও কঠিন যুদ্ধক্ষেত্র। একদল এতে চরম অবহেলা করেছে, ফলে তারা দণ্ডবিধি স্থগিত করেছে, অধিকারসমূহ নষ্ট করেছে এবং পাপাচারীদেরকে ফাসাদের ব্যাপারে সাহসী করে তুলেছে। তারা শরীয়তকে অপূর্ণাঙ্গ সাব্যস্ত করেছে যা বান্দাদের কল্যাণে যথেষ্ট নয় এবং অন্যের মুখাপেক্ষী। তারা সত্য জানা ও তা বাস্তবায়নের সঠিক পথসমূহ নিজেদের জন্য রুদ্ধ করে নিয়েছে। তারা নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও—অন্যরাও তা জানে—যে এটি বাস্তবসম্মত সত্য, তবুও তারা এগুলোকে অকেজো করে রেখেছে। তারা মনে করেছে যে, এগুলো শরীয়তের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহর কসম! এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তার সাথে মোটেও সাংঘর্ষিক নয়, যদিও তা তাদের ইজতিহাদলব্ধ শরীয়তের বুঝের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। আর যে বিষয়টি তাদেরকে এই পথে পরিচালিত করেছে তা হলো: শরীয়ত অনুধাবনের ক্ষেত্রে এক ধরণের ত্রুটি, বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধির ক্ষেত্রে ত্রুটি এবং একটিকে অন্যটির ওপর প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ত্রুটি।

যখন শাসকগণ এটি দেখলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, এই আলেমগণ শরীয়ত থেকে যা বুঝেছেন তা ছাড়া অন্য ব্যবস্থা ব্যতীত জনগণের বিষয়াদি সুশৃঙ্খল হচ্ছে না, তখন তারা তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী মন্দ ও ব্যাপক ফাসাদ তৈরি করল। ফলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল এবং তা সংশোধন করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। শরীয়তের হাকীকত সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের পক্ষে এই পরিস্থিতি থেকে জনজীবনকে রক্ষা করা এবং সেই ধ্বংসলীলা থেকে উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ল। অন্যদিকে আরেকটি দল প্রথম দলের বিপরীতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করল; ফলে তারা এমন কিছু বিষয়কে বৈধতা দান করল যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের পরিপন্থী। উভয় দলই সেই ঘাটতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর কিতাবসমূহে যা নাজিল করেছেন তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে ছিল” (২)।

সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ফিকহে এই ফিকহি সমালোচনা থেকে প্রাপ্ত নির্যাস হলো দুটি বিষয়, যা রাজনীতি ও শরীয়তের মধ্যকার

সম্পর্ককে সুস্পষ্ট করে:

(১) মাজমুউল ফাতাওয়া ২০/ ৩৯২ – ৩৯৩।
(২) আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/ ৩০ – ৩১।

প্রথম বিষয়: রাজনীতি শরীয়তেরই অন্তর্ভুক্ত। মানুষের সংশোধন যাতে নিহিত এবং তাদের যা প্রয়োজন, তা শরীয়তেরই অংশ। এর বিপরীতে যা কিছু কল্পনা করা হয়, তা মূলত রাজনীতি বোঝার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা অথবা শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতার ফল।

(সুতরাং যখনই ইনসাফ বা ন্যায়ের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় এবং যেকোনো পথেই হোক না কেন তার রূপ উন্মোচিত হয়, সেখানেই আল্লাহর শরীয়ত ও তাঁর দ্বীন বিদ্যমান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর চেয়েও অধিক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও ন্যায়পরায়ণ যে, তিনি ন্যায়ের পথ, চিহ্ন ও নিদর্শনসমূহকে সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে সীমাবদ্ধ করবেন, অতঃপর যা সেগুলোর চেয়েও অধিক স্পষ্ট, শক্তিশালী প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শনবাহী তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন)।

অতএব, যে রাজনীতি শরীয়ত থেকে বিচ্যুত তা অন্যায় ও জুলুমের রাজনীতি। আর প্রতিটি ন্যায়নিষ্ঠ রাজনীতি যা জনকল্যাণ নিশ্চিত করে, তা গ্রহণযোগ্য শরয়ি রাজনীতি হিসেবে গণ্য।

এই কারণেই যখন জনৈক শাফেয়ি আলেম বলেছিলেন, 'শরীয়তের অনুকূল বিষয় ছাড়া কোনো রাজনীতি নেই', তখন ইবনুল আকিল তাকে খণ্ডন করে বলেন: (যদি আপনি আপনার এই উক্তির মাধ্যমে—'শরীয়তের অনুকূল বিষয় ছাড়া'—উদ্দেশ্য করেন যে, তা শরীয়ত যা ব্যক্ত করেছে তার পরিপন্থী হবে না, তবে তা সঠিক। আর যদি আপনি উদ্দেশ্য করেন যে, 'শরীয়ত যা ব্যক্ত করেছে তা ছাড়া কোনো রাজনীতি নেই', তবে তা ভুল)।

সুতরাং শরয়ি রাজনীতি মানুষের জনকল্যাণ সাধনে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে, যদিও সে বিষয়ে বিশেষ কোনো স্পষ্ট পাঠ (নস) বর্ণিত না হয়ে থাকে—যতক্ষণ পর্যন্ত না তা কোনো শরয়ি বিধানের পরিপন্থী হয়। শরিয়ত ও রাজনীতির মধ্যকার সম্পর্ক হলো: (ন্যায়নিষ্ঠ রাজনীতি শরীয়তেরই একটি অংশ এবং তার শাখাগুলোর একটি শাখা। আর যে ব্যক্তি শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে, সেগুলো যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করে এবং সে বিষয়ে যার উত্তম বুঝ রয়েছে, তার শরীয়তের পাশাপাশি অন্য কোনো রাজনীতির আদৌ প্রয়োজন হয় না)।

দ্বিতীয় বিষয়: শরীয়তসম্মত ন্যায়নিষ্ঠ রাজনীতিসমূহের বর্ণনায় ত্রুটি মূলত শরীয়তকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছে। কেননা তারা অনুভব করেছে যে, মানুষের কল্যাণ সাধনে শরীয়ত অপর্যাপ্ত।

ফলে (এই ধরনের জঘন্য ভুলের ওপর ভিত্তি করেই শাসকগোষ্ঠী শরীয়তের বিরোধিতা করার সাহস পেয়েছে। তারা ধারণা করেছে যে, শরীয়ত বিশ্ব পরিচালনা ও উম্মাহর কল্যাণ সাধনে সক্ষম নয়। ফলে তারা আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করেছে এবং তা অজ্ঞতা থেকেই প্রসূত...

---

(১) আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/৩১।
(২) আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/২৯।
(৩) আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/৭।

উভয় পক্ষই শরীয়তের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ইনসাফ থেকে বিচ্যুত হয়ে জুলুম, বিদআত এবং এমন রাজনীতিতে লিপ্ত হয়েছে, যাকে একদল শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করেছে আর অন্যদল একে শরীয়তের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিপরীত হিসেবে গণ্য করেছে। তারা ধারণা করেছে যে, শরীয়ত অপূর্ণাঙ্গ এবং এটি মানুষের সামষ্টিক কল্যাণ সাধনে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত দল শরীয়তের সাধারণ ও ব্যাপক নির্দেশনাসমূহ থেকে যা বুঝেছে, তাকেই পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত বলে সাব্যস্ত করেছে।

(বরং যখন একদল এমন ধারণা পোষণ করল, তখন তারা বিচারের সঠিক পথ রুদ্ধ করে ফেলল; ফলে অসংখ্য অধিকার ভূলুণ্ঠিত হলো। কারণ তাদের কাছে অধিকার প্রমাণের পথ ছিল অত্যন্ত সীমিত। এর ফলে পাপিষ্ঠ জালিম তার জুলুম ও পাপাচার চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল এবং বলতে লাগল: "আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী নেই"। এভাবে যখন বহু অধিকার বিনষ্ট হতে লাগল, তখন আল্লাহ বিচারব্যবস্থার কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে সরিয়ে নিলেন। তখন এতে শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির এমন সব বিষয় প্রবেশ করল যার দ্বারা কখনো হক আদায় হয় আবার কখনো তা নষ্ট হয়, কখনো জুলুম হয় আবার কখনো ইনসাফ কায়েম হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ যা নিয়ে এসেছেন তা যদি যথাযথভাবে জানা থাকত, তবে তাতেই পূর্ণাঙ্গ জনকল্যাণ বিদ্যমান ছিল; যা কোনো প্রকার অবহেলা, শত্রুতা এবং শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ শাসকদের রাজনীতির মুখাপেক্ষী করত না।)

সুতরাং এটি একটি যালিম রাজনীতি, যা কিছু কল্যাণ সাধন করলেও এর অকল্যাণ ও ক্ষতি অনেক বেশি। এই কারণেই ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম এর সমালোচনা করে বলেছেন: **"বাতিলপন্থী অজ্ঞরা যাকে রাজনীতি বলে অভিহিত করে, তা মূলত জনকল্যাণের ওপর অকল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়া অথবা অকল্যাণ অপেক্ষা কল্যাণ অধিক হওয়া সত্ত্বেও তা বর্জন করা।"**

এটি অভ্যন্তরীণ ফিকহি পর্যালোচনার একটি অংশ। যুগ যুগ ধরে ইসলামের ফকীহগণ একে অপরের বক্তব্যের পর্যালোচনা করে এসেছেন। পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের ভুলত্রুটি সংশোধন করেছেন এবং অন্যান্য ফকীহদের বক্তব্যের বিচ্যুতি, তার প্রভাব এবং তার থেকে উদ্ভূত বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কারণ তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল দ্বীনের হেফাযত এবং শরীয়তের বিধানসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

অতএব, সিয়াসাতে শরইয়্যাহ (শরীয়তসম্মত রাজনীতি) শরীয়তেরই অংশ। শরীয়তের দৃষ্টিতে জনকল্যাণের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, তবে এর জন্য সঠিক ফিকহি অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। এটি এমন এক পদ্ধতি যা শরীয়তের সীমানায় অবিচল থেকে কোনো কল্যাণকে বিনষ্ট করে না। এর মাধ্যমেই সকল কল্যাণ লাভ করা এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কায়েম করা সম্ভব। কিন্তু বহু মানুষের বিবেক ও জ্ঞান এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য অনুধাবনে অক্ষম।

---

(১) আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/২৭৩-২৭৪।
(২) আত-তানবীহ আলা মুশকিলাতিল হিদায়াহ, ইবনুল আবিল ইয ৫/৯২৩।
(৩) আল-কাওয়াইদুল কুবরা ১/৮৯।

একটি সূক্ষ্ম ফিকহী ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় ইবনে তাইমিয়্যাহ মানুষের সেই অবস্থানগুলো তুলে ধরেছেন, যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতার দাবি ও রাজনীতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, দান ও জনকল্যাণের বিস্তৃতি এবং ইনসাফ ও শরীয়তের বিধান রক্ষার আবশ্যিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেন:

(এক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে: এক দল—যাদের ওপর দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার ও ফাসাদ সৃষ্টির নেশা প্রবল হয়ে উঠেছে। ফলে তারা পরকালের পরিণামের কথা চিন্তা করে না। তারা মনে করে যে, দান-দক্ষিণা ছাড়া ক্ষমতা টিকে থাকে না। আর অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন ছাড়া এই দান-দক্ষিণা সম্ভব নয়। ফলে তারা হয়ে ওঠে লুণ্ঠনকারী ও যথেচ্ছ দানকারী। তারা বলে: 'এমন ব্যক্তি ছাড়া মানুষের শাসনভার গ্রহণ করা সম্ভব নয় যে নিজে খায় এবং অন্যকেও খাওয়ায়। কারণ যদি এমন কোনো পবিত্র ও সৎ ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণ করে যে নিজে (অবৈধ সম্পদ) খায় না এবং অন্যকেও খাওয়ায় না, তবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে পদচ্যুত করবে; যদি না তারা তার জান ও মালের কোনো ক্ষতি করে')।(১)

এরপর তিনি দ্বিতীয় দলের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তাদের ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করেছেন:

(আরেকটি দল যাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার ভয় রয়েছে এবং এমন দ্বীনদারি রয়েছে যা তাদেরকে সৃষ্টিজীবের ওপর জুলুম করা ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার মতো মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এটি একটি উত্তম গুণ ও আবশ্যক বিষয়। কিন্তু এর পাশাপাশি তারা হয়তো মনে করে যে, ওইসব (প্রথম দলের) লোকদের করা হারাম কাজগুলো ছাড়া রাজনীতি সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। ফলে তারা রাজনীতি থেকে পুরোপুরি বিমুখ থাকে। অনেক সময় তাদের দ্বীনদারির সাথে অন্তরের ভীরুতা, কৃপণতা বা স্বভাবগত সংকীর্ণতা যুক্ত হয়। এর ফলে তারা কখনো কখনো এমন ওয়াজিব কাজ বর্জন করে বসে, যা বর্জন করা তাদের জন্য কিছু হারামে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। অথবা তারা এমন ওয়াজিব কাজ থেকে নিষেধ করতে শুরু করে, যা মূলত আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদানের নামান্তর। তারা কখনো হয়তো ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। আবার কখনো হয়তো তারা মনে করে যে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ওয়াজিব এবং তা সশস্ত্র লড়াই ছাড়া সম্ভব নয়; ফলে তারা খারেজীদের ন্যায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এদের মাধ্যমে দুনিয়ার সংশোধন হয় না এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীনও কায়েম হয় না। তবে তাদের দ্বারা দ্বীনের অনেক শাখা ও দুনিয়াবি কিছু বিষয় সংশোধিত হতে পারে। তারা ইজতিহাদ করতে গিয়ে যে ভুল করেছে, সেজন্য হয়তো তাদের ক্ষমা করা হবে এবং তাদের সীমাবদ্ধতা মার্জনা করা হবে। আবার কখনো তারা সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, দুনিয়ার জীবনে যাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে অথচ তারা ধারণা করছে যে তারা ভালো কাজই করছে। এটি তাদেরই পদ্ধতি যারা নিজেদের জন্য কিছু গ্রহণ করে না,)

(১) আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৭৯।

...এবং তিনি অন্যকে প্রদান করেন না। তিনি কাফির ও পাপাচারীদের মন জয় করা সমীচীন মনে করেন না; অর্থ বা উপকারের মাধ্যমেও নয়। তিনি মনে করেন যে, যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য (মুআল্লাফাতুল কুলুব) তাদেরকে দান করা এক প্রকার জুলুম এবং নিষিদ্ধ অনুদান।(১)

অতঃপর তিনি শরয়ী রাজনীতির সঠিক হক আদায়কারী দলের কথা উল্লেখ করে বলেন:

(তৃতীয় দল: মধ্যপন্থী উম্মত, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনের অনুসারী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সাধারণ ও বিশেষ সকল মানুষের ওপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত। আর তা হলো মানুষের জন্য অর্থ ও সুবিধাদি ব্যয় করা—যদিও তারা প্রধান ব্যক্তি হয়ে থাকেন—অবস্থার সংশোধন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, এবং সেই পার্থিব বিষয়ের জন্য যা দ্বীনের প্রয়োজনে

দরকার হয়। সাথে সাথে নিজের পবিত্রতা বজায় রাখা, ফলে তিনি যা তাঁর প্রাপ্য নয় তা গ্রহণ করেন না। এভাবে তারা তাকওয়া এবং ইহসানের সমন্বয় ঘটান: "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল" [আন-নাহল: ১২৮])।(২)

রাজনীতি ও শরীয়তের বিচ্ছেদের এই রূপ এবং আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষবাদে ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি:

এই ভূমিকার শেষে এখানে আমরা যে সমস্যার কথা বলছি যা ফিকহি ইতিহাসে ঘটেছে, আর আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করা সমীচীন হবে। কারণ এই আধুনিক ধারণার সাথে আমরা এখানে যে পরিস্থিতির কথা বলছি তার কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা এখানে যে বিচ্ছেদটি সমালোচিত হচ্ছে, তা জনকল্যাণের (মাসলাহাত) অজুহাতে কিছু শরয়ী বিধান লঙ্ঘন করার সাথে সম্পৃক্ত, যদিও সামগ্রিকভাবে শরীয়তের বিধানের প্রতি আনুগত্য বিদ্যমান থাকে। এটি মূলত কোনো সংশয় বা প্রবৃত্তিগত কারণে শরীয়তের কিছু বিধানের বিরোধিতা করা। তাদের শরীয়ত-বিরোধী জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এতে কখনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকতে পারে, আবার কখনো তা প্রবৃত্তি ও লালসা চরিতার্থ করার জন্য সেই ব্যাখ্যাকে অতিক্রম করে যেতে পারে।

পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারায় যে বিচ্ছেদ বিদ্যমান, তা রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে জনকল্যাণ বিবেচনার ভিত্তি ওহীর নির্দেশনার বাইরে হয়ে থাকে। সেখানে কোনো কিছু নিষিদ্ধ করা বা আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরির ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী কিংবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর কোনো গুরুত্ব থাকে না।

---

(১) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ৭৯ - ৮০।
(২) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ৮০ - ৮১।

অষ্টম ভূমিকা

সিয়াসা শারইয়্যাহর অধ্যায়সমূহ

আমরা যদি সিয়াসা শারইয়্যাহকে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী ও এর জনস্বার্থ পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিজ্ঞান হিসেবে দেখি, অথবা রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনায় শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইজতিহাদের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করি, তবে সিয়াসা শারইয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়সমূহকে অথবা যেখানে এর মাসআলাসমূহ বিদ্যমান থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোকে সমকালীন আইনি অধ্যায়সমূহে বিভক্ত করা সম্ভব। সেগুলো হলো:

১. সাধারণ কর্তৃত্ব: এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়াবলি, শাসকের অধিকার ও দায়িত্ব, জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব এবং বর্তমান যুগে যাকে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা বলা হয়।
২. বিচার ব্যবস্থা: এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঐ সকল নীতিমালা যা মামলা দায়ের ও আদালতে আইনি লড়াইয়ের পদ্ধতি এবং তদন্ত, অভিযোগ ও গ্রেফতারের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. আর্থিক ব্যবস্থা: যা রাষ্ট্রের আর্থিক উৎস এবং এর ব্যয়ের খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট।
৪. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: যা অর্থ-সম্পদ সুসংগঠিত করা এবং তা বিনিয়োগ করার পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট।
৫. ফৌজদারি ব্যবস্থা।

৬. আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (১)।

আর এগুলিই অধিকাংশ শারয়ি মাসআলার ক্ষেত্র, কারণ এগুলি জনস্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত এবং এগুলোর ক্ষেত্রে মাসলাহাত-ভিত্তিক (জনস্বার্থমূলক) ইজতিহাদের অতি প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা এর সাথে সপ্তম একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যোগ করতে পারি, আর তা হলো:

---

(১) দেখুন: আল-মাদখাল ইলাস সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ৫৮-৬১, আদওয়া আলাস সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ১২২-১২৪।

৭. পারিবারিক ব্যবস্থা: এটি বর্তমান সময়ের সংহিতাবিন্যাসের কারণে হয়েছে, যা বিবাহ, তালাক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ এই দিক দিয়ে এতে প্রবেশ করেছে।

আমরা যদি এই অধ্যায়গুলোর দিকে লক্ষ্য করি, তবে দেখতে পাব যে এগুলো অত্যন্ত বিস্তৃত, যা ফিকহের প্রায় সকল মাসআলাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। ফিকহের সকল অধ্যায়কে সুশৃঙ্খলভাবে গবেষণার আওতায় নিয়ে আসার জন্য এখন শুধু অষ্টম ক্ষেত্রটি যুক্ত করা বাকি আছে, আর তা হলো:

৮. ইবাদতসমূহ: এর কারণ হলো, যখন কোনো ক্ষতি বা জনস্বার্থ বিদ্যমান থাকে যা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের দাবি রাখে, তখন ইবাদতের ক্ষেত্রেও সিয়াসাহ শারইয়্যাহর প্রবেশ ঘটতে পারে। সিয়াসাহ শারইয়্যাহকে যদি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে দেখা হয়, তবে ইবাদতকে এর সাথে যুক্ত করা হয়তো উপযুক্ত হবে না; কারণ ইবাদতের মাসআলাসমূহ বর্তমান গবেষণার পরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে, একে যদি বিচার-বিশ্লেষণ ও ইজতিহাদের একটি পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে সিয়াসাহ শারইয়্যাহর কর্মপরিধি সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য একে এখানে যুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ বিজ্ঞান এবং এই ক্ষেত্রগুলোতে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্যটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। যারা একে একটি বিজ্ঞানের অধ্যায় হিসেবে দেখেন, তারা রাজনীতি সংশ্লিষ্ট এর সকল মাসআলা নিয়ে আলোচনা করেন। আর যারা সিয়াসাহ শারইয়্যাহকে একটি গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ হিসেবে দেখেন, তারা এই অধ্যায়গুলোতে কেবল জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ইজতিহাদের প্রয়োগ বা এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোই অন্তর্ভুক্ত করেন।

নবম ভূমিকা

সিয়াসা শারইয়্যাহ অনুযায়ী আমল করার বৈধতা

সিয়াসা শারইয়্যাহ অনুযায়ী আমল করা একটি বৈধ বিষয়, যা একাধিক শরয়ি মূলনীতি ও দালিলিক প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত। এর সপক্ষে সুনিশ্চিত শরয়ি মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করার পূর্বে আমি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করতে চাই:

প্রথম বিষয়: "সিয়াসা শারইয়্যাহ অনুযায়ী আমল করার বৈধতা" পরিভাষাটি ব্যবহার করা "সিয়াসা শারইয়্যাহর প্রামাণিকতা (হুজ্জিয়্যাহ)" ব্যবহারের চেয়ে অধিকতর সঠিক। কারণ সিয়াসা শারইয়্যাহ ইজমা বা কিয়াসের মতো কোনো স্বতন্ত্র দলিল নয় যে এর প্রামাণিকতার দলিল অনুসন্ধান করতে হবে; বরং এটি একটি বিশেষ ইজতিহাদ যার বৈধতার দলিল অন্বেষণ করা হয়। সুতরাং কোনো বিষয় সম্পর্কে এটি বলা সঠিক হবে না যে, "সিয়াসা শারইয়্যাহর দলিলে" এটি বৈধ (মুবাহ) বা নিষিদ্ধ (হারাম)। কেননা সিয়াসা শারইয়্যাহ কোনো দলিল নয়, বরং একটি বৈধ ইজতিহাদ। দলিল থেকে বিধান আহরণের (ইস্তিদলাল) ক্ষেত্রে এটি দলিলাদি পর্যালোচনার ইজতিহাদের ন্যায় একটি বৈধ কর্মপন্থা, তবে এটি নিজে কোনো দলিল নয়। যেমন কোনো বিধান সম্পর্কে বলা যায় না যে, "ইজতিহাদের দলিলে" এটি হারাম। বরং ইজতিহাদ হলো একটি কর্মপদ্ধতি বা প্রক্রিয়া যা দলিলাদির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। তদ্রূপ সিয়াসা শারইয়্যাহ হলো একটি গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ যা শরয়ি দলিলাদি ও মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতীয় বিষয়: সিয়াসা শারইয়্যাহ বেশ কয়েকটি দিক ও পর্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে কিছু শাসক কর্তৃক শরিয়ত কায়েমের আবশ্যিক কর্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা বাস্তবায়নের ভার তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। আবার কিছু পদক্ষেপ শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত যা অনিষ্টের পথ রুদ্ধ করা (সাদ্দুয যারাই') অথবা কষ্ট লাঘবের সাথে সম্পৃক্ত। আবার এর কিছু দিক বৈধ বিষয়কে সীমাবদ্ধ করা বা মতভেদ নিরসনের সাথেও সংশ্লিষ্ট। তাই সিয়াসা শারইয়্যাহ অনুযায়ী আমল করার বৈধতার সপক্ষে দলিলাদি বিন্যস্ত করার সময় দলিলটি এমন হতে হবে যা সিয়াসা শারইয়্যাহর পূর্ণাঙ্গ ধারণার বৈধতা প্রমাণ করে।

এই পদ্ধতিটি বিচ্ছিন্নভাবে এমন সব দলিল উল্লেখ করার চেয়ে অধিক সুশৃঙ্খল, যার প্রতিটি দলিল সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-র (শারয়ি রাজনীতি) কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখাগত বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করে। যেমন: কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এমন সব দলিল উল্লেখ করা যা সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-র প্রায়োগিক খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর প্রমাণ বহন করে। এক্ষেত্রে প্রতিটি নির্দিষ্ট দলিল সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-র একটি অংশের ওপর প্রমাণ দেয়, কিন্তু সামগ্রিক সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-র ওপর একে দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না, যতক্ষণ না একে একটি সামগ্রিক মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, শাখাগত বিষয়ের প্রমাণ মূল বিষয়ের দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

পূর্ববর্তী কিছু গ্রন্থকারের কাছে—যেমন ইবরাহিম খলিফাহ, যিনি দাদে এফেন্দি নামে প্রসিদ্ধ—সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-র বৈধতার প্রমাণ হিসেবে আংশিক বা শাখাগত দলিলসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। কারণ তার নিকট সিয়াসাহ শারইয়্যাহ ছিল দণ্ডবিধি সংক্রান্ত একটি সংকীর্ণ ধারণার ওপর ভিত্তি করে; তাই সেখানে আংশিক দলিলসমূহ উল্লেখ করায় কোনো সমস্যা নেই, যেহেতু প্রতিটি আংশিক দলিলই সংশ্লিষ্ট বিধানের ওপর প্রমাণ পেশ করে।

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ অনুযায়ী আমল করার বৈধতার ওপর শারয়ি মূলনীতিসমূহ:

পূর্বালোচনার ভিত্তিতে, সিয়াসাহ শারইয়্যাহ অনুযায়ী আমল করার বৈধতার প্রমাণসমূহ নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়:

প্রথম মূলনীতি: সাধারণ উদ্ভাবনী মূলনীতিসমূহ; যেমন: সংকীর্ণতা বা কাঠিন্য দূর করা, মন্দের পথ রুদ্ধ করা, জনস্বার্থ, সামাজিক

রীতি এবং ইস্তিহসান।

এগুলো হলো এমন সব উদ্ভাবনী মূলনীতি যার প্রতিটির সপক্ষে একাধিক দলিল বিদ্যমান। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: “তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা বা কাঠিন্য আরোপ করেননি।” [আল-হাজ্জ: ৭৮]। এবং মহান আল্লাহর বাণী: “আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন অতিবাহিত করো।” [আন-নিসা: ১৯]। এবং মহান আল্লাহর বাণী: “আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, অন্যথায় তারা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে না বুঝে আল্লাহকেও গালি দেবে।” [আল-আন‘আম: ১০৮]।

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-র বৈধতার স্বপক্ষে এই মূলনীতিসমূহ বিবেচনার দিকটি দুই প্রকার:

প্রথম দিকটি হলো: সিয়াসা শরইয়াহ (শরয়ী রাজনীতি) এর ওপর নির্ভরশীল; সুতরাং এটি সেই মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত যার ওপর সিয়াসা শরইয়াহ ভিত্তি করে। অতএব, যতক্ষণ এই মূলনীতিগুলো গ্রহণযোগ্য থাকবে, ততক্ষণ সিয়াসা শরইয়াহও গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় দিকটি হলো: এই মূলনীতিগুলো শরীয়াহর সাথে সংগতিপূর্ণ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে জনকল্যাণ (মাসলাহা) রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপের প্রয়োজনীয়তাকে সুনিশ্চিত করে। আর এটাই হলো সিয়াসা শরইয়াহর দাবি। সুতরাং সিয়াসা শরইয়াহর উদ্দেশ্য সেই একই উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হয় যা এই মূলনীতিসমূহ লক্ষ্য করে।

দ্বিতীয় মূলনীতি: শরীয়াহর সামগ্রিক নীতিমালা; যেমন- ন্যায়বিচার, সহজীকরণ, ইহসান এবং দয়া।
যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, ইহসান এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন; আর তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করছেন।" [আন-নাহল: ৯০]।

দলিল বা প্রমাণের দিকটি হলো, সিয়াসা শরইয়াহ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ইহসান এবং দয়া নিশ্চিত করার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয় মূলনীতি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতে সিয়াসা শরইয়াহ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ দলীল হিসেবে গণ্য। সিয়াসা শরইয়াহর ক্ষেত্রে তাঁর কথা ও কাজ উভয় থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

তাঁর বাণীর ক্ষেত্রে, বেশ কিছু শরয়ী নস (দলিল) বর্ণিত হয়েছে যা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কল্যাণকর দিকটি বিবেচনা করার ওপর গুরুত্বারোপ করে। এগুলো অনেকগুলো প্রমাণ, যার প্রতিটি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে। নবুওয়ী রাজনীতির আলোচনায় এগুলো বিস্তারিতভাবে আসবে।

আর তাঁর কাজের ক্ষেত্রে, তা হলো রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর কর্মকাণ্ডসমূহ। কেননা তিনি মুসলিমদের ইমাম বা নেতা হিসেবে তাঁদের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সুতরাং এই বাস্তবধর্মী রাজনীতিতে তাঁর অনুসরণ করা একটি শরয়ী বিধান।

চতুর্থ মূলনীতি: খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল। খুলাফায়ে রাশেদীনের সীরাতে রাজনৈতিক ইজতিহাদ বিদ্যমান ছিল। সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের দলীল হওয়ার বিষয়ে মতভেদ থাকলেও, এটি খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে দলীল গ্রহণের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না।

এটি সিয়াসা শরঈয়াহর (শরঈ রাজনীতি) স্বপক্ষে একটি দলীল, কারণ এই প্রমাণটি খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে ঐক্যমত্যপূর্ণ একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য সাহাবীগণও এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে একমত পোষণ করেছেন। ফলে এটি একটি সুস্পষ্ট ইজমা-এ সুকূতি (মৌন সম্মতিমূলক ঐক্যমত্য)।

আর তাঁদের মধ্য থেকে কোনো একজনের ব্যক্তিগত উক্তি স্বতন্ত্রভাবে দলীল হিসেবে গণ্য হবে না। এই কারণেই রাজনৈতিক ইজতিহাদের কিছু মাসআলায় তাঁদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে রাজনৈতিক ইজতিহাদের মূল ভিত্তিটি মতভেদের বিষয় নয়; বরং তাঁরা এর বৈধতার ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন, যদিও এর কিছু শাখা-প্রশাখায় তাঁরা মতভেদ করেছেন।

অচিরেই সাহাবায়ে কিরামের রাজনৈতিক ইজতিহাদের বহু নিদর্শন আলোচিত হবে।

পঞ্চম মূলনীতি: সিয়াসা অনুযায়ী আমল করা মূলত শরীআতের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা:

সিয়াসা শরঈয়াহর বৈধতার অন্যতম দলীল হলো এটি শরীআতের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তবায়ন করে। কারণ সিয়াসা শরঈয়াহ হলো এমন এক ইজতিহাদ যা শরীআতদাতার উদ্দেশ্য পূরণ করে এবং তার সাথে কোনো বিরোধ সৃষ্টি করে না; যা এর বৈধতাকেই প্রমাণ করে।

সিয়াসা শরঈয়াহ যে শরীআতের মাকাসিদসমূহ বাস্তবায়ন করে, তা কয়েকটি দিক থেকে স্পষ্ট হয়:

প্রথম দিক: শরীআত কর্তৃক জনকল্যাণ নিশ্চিত করা এবং অপকার প্রতিহত করার যে নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে, তা এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা শরীআত মূলত জনকল্যাণ অর্জন ও তা পরিপূর্ণ করতে এবং অপকার প্রতিহত ও লাঘব করতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ বিষয়ে অসংখ্য দলীল বিদ্যমান রয়েছে এবং সিয়াসা শরঈয়াহ মূলত এই উদ্দেশ্যটি অর্জনেই সচেষ্ট থাকে।

দ্বিতীয় দিক: কিছু বিধানের ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থার পার্থক্যের প্রতি শরীআতের লক্ষ্য রাখা। পরিস্থিতির ভিন্নতাকে শরীআত বিশেষ বিধান প্রণয়নের কারণ সাব্যস্ত করেছে। যেমন সম্পদশালী ব্যক্তির অবস্থা দরিদ্রের মতো নয়, তাই ধনীর ওপর যাকাত ফরয করা হয়েছে কিন্তু দরিদ্রের ওপর নয়। তদ্রূপ সক্ষম ব্যক্তির অবস্থা অক্ষমের মতো নয় এবং বিজ্ঞ ব্যক্তির অবস্থা অজ্ঞের মতো নয়। সিয়াসা শরঈয়াহ তার ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে; ফলে এটি শরীআতের একটি গ্রহণযোগ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে।

তৃতীয় দিক: শরীআত বিভিন্ন অবস্থা এবং আকস্মিক প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে। এই কারণেই সফর ও অসুস্থতার ক্ষেত্রে সহজ বিধান রাখা হয়েছে এবং পাগল, শিশু ও নির্বোধ ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সিয়াসা শরঈয়াহ মূলত এই ধরনের পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ দিক: সিয়াসা শারইয়্যাহ সেই সামগ্রিক উদ্দেশ্যসমূহ (মাকাসিদ আল-কুল্লিয়্যাহ) সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালায় যা শরীয়ত তার বিস্তারিত বিধানাবলির কাঠামোর মধ্যে বিবেচনা করেছে; যেমন পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের সংরক্ষণ (দ্বীন, জীবন, বুদ্ধি, সম্মান ও সম্পদের সংরক্ষণ)। তদ্রূপ এটি শরীয়তের বিভিন্ন অধ্যায়ে—যেমন রাজনীতি, ফৌজদারি দণ্ডবিধি, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি অধ্যায়ে—শরীয়তের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়।

সিয়াসা শারইয়্যাহর কর্মকাণ্ডের বৈধ দিকসমূহ:

আমরা যখন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শাসকের পক্ষ থেকে নির্গত কর্মকাণ্ডের দিকে তাকাই, যা জনকল্যাণ সাধনের লক্ষ্য রাখে, তখন আমরা দেখতে পাই যে আমরা এক বিশাল পরিধি এবং বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডের সম্মুখীন যা সিয়াসা শারইয়্যাহর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এই রাজনৈতিক ইজতিহাদসমূহকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাগ করা সম্ভব, যার প্রতিটি ক্ষেত্র সিয়াসা শারইয়্যাহর এক একটি প্রকার এবং এর মধ্যকার বৈধ দিকসমূহকে উন্মোচন করে, যেগুলোর গ্রহণযোগ্যতার ওপর বিভিন্ন দলীল ও মূলনীতি প্রমাণ পেশ করে:

১- রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পণ করা; যেমন রাষ্ট্রদূত, গভর্নর, কর্মকর্তা এবং সেনাপতি নিয়োগ দান।
২- রাষ্ট্রীয় আবশ্যিক কর্তব্যসমূহ পালন করা; যেমন অধিকার রক্ষা, নিরাপত্তা, সরকারি সম্পদ সংরক্ষণ, তদারকি এবং বিচারালয়ে বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে ফয়সালা করা। এর অন্তর্ভুক্ত হলো শরীয়তের সেইসব বিধান বাস্তবায়ন করা যা রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক, যেমন হুদুদ কায়েম করা এবং পাপাচার প্রতিরোধ করা।
৩- কিছু মুবাহ (বৈধ) কাজ থেকে বিরত রাখা বা কিছু কর্মকাণ্ডের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা।
৪- রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কোনো নির্ভরযোগ্য মত পালনে বাধ্য করা।
৫- শাস্তি এবং তা'যীর (বিবেচনামূলক দণ্ড)।
৬- ফরযে কিফায়া পালনকারীদের নিযুক্ত করা।
৭- জনকল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যা তার ওপর ন্যস্ত, যেমন যুদ্ধবিরতি বা সন্ধি চুক্তি করা (১)।

---

(১) এই দিকগুলোর কোনো কোনোটিকে অন্যটির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব, তবে আমি সেগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছি যেগুলোকে সিয়াসা শারইয়্যাহর ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য দিক হিসেবে গণ্য করা যথাযথ মনে করি এবং ফিকহী দৃষ্টিতে যেগুলোর প্রভাবশালী গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং তার গুরুত্ব ও শক্তিশালী প্রভাবের কারণে তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

দশম ভূমিকা

শরয়ি রাজনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

আমাদের যুগে প্রচলিত অভিব্যক্তিগুলোর মধ্যে একটি হলো: ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ শব্দটির ব্যবহার। এর দ্বারা এমন কিছু সাধারণ মূলনীতি নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য, যার মাধ্যমে ইসলাম অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শ থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। সমকালীন রচনাশৈলীতে এটি একটি উত্তম ইজতিহাদ বা প্রয়াস, যা এই ধারায় লেখার এক তীব্র প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভুত। এর কারণ হলো, অনেক মুসলিম পশ্চিমা সংস্কৃতি ও এর বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে; যা মানুষের অন্তরে দ্বীনের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির

মাধ্যমে তাদেরকে এই প্রভাব থেকে রক্ষা করার বিষয়টিকে অনিবার্য করে তুলেছে।

এই 'বৈশিষ্ট্যসমূহ' হলো ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করার এবং এর প্রতি মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করার একটি আধুনিক পদ্ধতি। সমকালীন লেখকগণ এই লক্ষ্য অর্জনে বেশ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; তারা সরাসরি ইসলামের সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন অথবা এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন যা একই উদ্দেশ্য সাধন করে। এটি সমকালীন চ্যালেঞ্জগুলোর বিপরীতে একটি জীবন্ত ও ইতিবাচক সাড়া, যা মানুষের অন্তরে দ্বীনের অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়। ফলে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করা এবং এর প্রকৃত রূপ স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার আবশ্যকতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এই লক্ষ্য অর্জনে সমকালীন লেখকদের প্রচেষ্টাকে রচনার বেশ কিছু ধারায় লক্ষ্য করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে:

১. সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ।
২. বিধানাবলির শ্রেষ্ঠত্ব এবং শরয়ি মূলনীতিসমূহের বর্ণনা।
৩. আকীদা, ইবাদত ও আখলাক সংক্রান্ত ইসলামের সাধারণ মূলনীতিসমূহের বর্ণনা।
৪. বেশ কিছু সমকালীন সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামের সমাধানের বর্ণনা।
৫. ইসলামি অর্থব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার মতো বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা।

৬- ইসলামে চরিত্র বা নৈতিকতা তথা দয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা, সদাচরণ, মহানুভবতা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা।

৭- ইসলামী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে লেখা—রাসূলুল্লাহর জীবনী থেকে শুরু করে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং তাঁদের পরবর্তী সময়ের ইতিহাস পর্যন্ত।

৮- ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন ব্যবস্থা, সমাজ ও মতাদর্শের ত্রুটি ও মন্দ দিকসমূহ বর্ণনা করা।

৯- শরীয়ত যেসব কল্যাণ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিয়ে এসেছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা।

১০- বর্তমান যুগে প্রচলিত বিভিন্ন ধারণা ও মূল্যবোধ যেমন—স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করা।

১১- ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম, মতাদর্শ ও মতবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা (১)।

সমসাময়িক শরয়ী আলোচনার লক্ষ্যে এ জাতীয় উত্তম পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রতিটি বিষয়ে প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যেগুলোর মান, তাত্ত্বিক শৃঙ্খলা এবং ফিকহী পদ্ধতির অনুসরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে।

সমসাময়িক রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে 'বৈশিষ্ট্যসমূহ' আলোচনা করা অন্যতম একটি উত্তম পদ্ধতি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার।

বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো তিনটি মৌলিক লক্ষ্য অর্জন করা:

প্রথম লক্ষ্য: অমুসলিমদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়া; ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা, এর সৌন্দর্যসমূহ উপস্থাপন করা এবং

ইসলাম সম্পর্কে সংশয়সমূহ নিরসন করার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় লক্ষ্য: এমন একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি করা যা ইসলামকে অন্যান্য ধর্ম, মতাদর্শ ও মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে, যাতে একজন মুসলিম সকল ক্ষেত্রে ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদের মধ্যকার পার্থক্যকারী সীমারেখা সম্পর্কে জানতে পারে।

(১) প্রাচীন ও বর্তমান লেখকদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনার রচনাশৈলী এবং এ বিষয়ের কিছু গ্রন্থ দেখুন: আহমাদ আল-সাইয়্যেদ রচিত 'মাহাসিনুল ইসলাম', পৃষ্ঠা: ৯-১৩।

এটি ইসলামি জীবনদর্শনের স্বাতন্ত্র্য এবং সর্ববিষয়ে এর স্বকীয়তা বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালায়; আর অভিন্ন বিষয়গুলোর উপস্থিতি যেন পার্থক্যের মূলনীতিসমূহকে আড়াল না করে দেয়।

তৃতীয় লক্ষ্য: দ্বীনের প্রতি আনুগত্যকে শক্তিশালী করা, এর বিধানাবলির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস গভীর করা এবং এর শরয়ি বিধানসমূহের প্রতি সন্তুষ্টি অর্জন করা।

যখন আমরা সমসাময়িক 'বৈশিষ্ট্যসমূহ' পরিভাষাটির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করি:

১. এটি সাধারণত্বের গুণ সম্পন্ন; কেননা এটি এমন সব ব্যাপক ও সামষ্টিক মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করে যা ইসলামের সৌন্দর্য এবং এর বিধানাবলির উৎকর্ষকে ফুটিয়ে তোলে। যেমন বলা হয়: ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি রব্বানি (ঐশী), কিংবা এটি সর্বজনীনতা সমৃদ্ধ, অথবা এই জাতীয় অন্য কিছু। সুতরাং এগুলো দলিল পেশ করার কোনো ভিত্তি নয়, কিংবা এটি বিধানাবলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্র নয়; বরং এগুলো ঈমানকে সুদৃঢ় করতে এবং বিরোধী মতাদর্শ ও ধর্মগুলোর সাথে মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট করতে সহায়ক।

২. এই বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামের প্রতিটি ব্যবস্থার সাথে প্রায়ই পুনরাবৃত্ত হয়; যখন আপনি ইসলামের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবেন, একইভাবে ইসলামি সংস্কৃতি, ইসলামি দ্বীন বা ইসলামি শরিয়াহ সম্পর্কে আলোচনা করবেন, তখন এই বৈশিষ্ট্যগুলো বারবার ফিরে আসে। এটি কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় নয়; কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত, তাই ইসলাম সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যবস্থার মূলে এগুলো বিদ্যমান থাকে। তাছাড়া, এই বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য হলো ইসলামি ব্যবস্থাকে অন্য ব্যবস্থা থেকে পৃথক করা এবং শরিয়তের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা গভীর করা। ইসলাম সম্পর্কে অথবা এর কোনো ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। যদিও ইসলামের নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার সময় কেবল সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর সীমাবদ্ধ না থেকে সেটির জন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দিষ্ট করা বেশি সমীচীন।

৩. এই বৈশিষ্ট্যগুলো গবেষণালব্ধ এবং ইজতিহাদভিত্তিক; তাই এর সংখ্যা নির্ধারণ বা এর উপাদানগুলো সুনির্দিষ্ট করা মূলত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার বিষয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই বৈশিষ্ট্যগুলো যেন প্রকৃতপক্ষেই ইসলামের মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়। এমন কোনো বিষয়কে বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা উচিত নয় যা আসলে বৈশিষ্ট্য নয়, আবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে অবহেলা করাও ঠিক নয়। একটি প্রচলিত ত্রুটি হলো, বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় কেবল দুনিয়াবি বিষয়াবলির ওপর গুরুত্বারোপ করা; অর্থাৎ কেবল নিছক জাগতিক দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উল্লেখ করে ক্ষান্ত হওয়া এবং যেসবে বিশেষ গুরুত্ব নিহিত রয়েছে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত না করা।

পৃষ্ঠা 96

...ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়াবলী, কিংবা অন্তরের আমলসমূহ, অথবা পরকালের প্রতি ঈমানের মর্যাদা এবং শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত অনুরূপ বিষয়াবলী।

বৈশিষ্ট্যাবলীর সংকলন লেখকের উদ্দেশ্য ও মনোযোগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এতে কোনো বিষয়কে বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে এবং এক বৈশিষ্ট্যকে অন্যটির সাথে একীভূত করার ক্ষেত্রে ইজতিহাদি বা গবেষণামূলক পরিসর বিদ্যমান থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা শব্দচয়ন ও বিন্যাসের সাথে সম্পর্কিত হয়। তবে লেখক যদি এই সীমা অতিক্রম করে শরীয়তদাতার এমন কোনো উদ্দেশ্য আরোপ করেন যা তিনি করেননি, অথবা শরীয়তদাতার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করেন, তবে সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের লক্ষ্যচ্যুত হয় এবং সেগুলো আর ইসলামের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হয় না, বরং তা ইসলামের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

যখন আমরা বৈশিষ্ট্যাবলীর ওপর সমকালীন গবেষণাগুলোর (১) প্রতি লক্ষ্য করি, তখন আমরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য থেকে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিম্নোক্তভাবে সারসংক্ষেপ করতে পারি:

১- রব্বানিয়্যাহ (আল্লাহ-প্রদত্ত হওয়া): এর অর্থ হলো বিধানসমূহ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ ওহী থেকে গৃহীত। সুতরাং এসকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ওহীর মূল উৎস এবং এর সুদৃঢ় (মুহকাম) ভাষ্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের নিয়মে আবদ্ধ।

২- ব্যাপকতা ও পূর্ণতা: এটি দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়াবলীতে এবং ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ।

৩- ভারসাম্য: এটি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড অনুযায়ী যাবতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যেখানে একটি কল্যাণের প্রতি যত্নবান হতে গিয়ে অন্য কোনো কল্যাণের বিনাশ ঘটে না। এটি এমন এক ন্যায়নিষ্ঠ মানদণ্ড যা দরিদ্র ও ধনী, ছোট ও বড়, নর ও নারী এবং সাধারণ ও বিশেষ অধিকারসহ অন্যান্য সকল অধিকারকে সংরক্ষণ করে।

---

(১) উদাহরণস্বরূপ দেখুন: খাসাইসুস তাশরিয়িল ইসলামি, ফাতহি আদ-দুরাইনি ৩৫ - ৪৬; মুসান্নাফাতুন নাজমিল ইসলামিয়্যাহ, মুস্তাফা ওয়াসফি ১৩ - ১৫; মিজাতুশ শারিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ আলাল কাওয়ানিনিল ওয়াদয়িয়্যাহ, আব্দুল হামিদ তাহমাজ ৫৩ - ১০৩; মুয়াফাকাতু কাসদিশ শারি ওয়া মুখালাফাতুহু, তারিক বাকিরি ৩৬৩ - ৩৬৭; খাসাইসুল ইসলামিল্লাজি নাদউ ইলাইহি, ইসমাইল আলি মুহাম্মদ ১০ - ৮০; খাসাইসুন নিযামিল ইক্তিসাদি ফিল ইসলাম, যায়েদ আর-রুমমানি ৪১ - ৭২; আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ ফি কিতাবি ফাতহুল বারি, সালাহ আনোয়ার ৫৮ - ৬৪; ফিকহু মাকাসিদুশ শারিয়্যাহ ফি তানজিলিল আহকাম, ফাউজি আস-সাবিত ২৫ - ৩৩; আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইব্রাহিম আব্দুর রহিম ৩২ - ৪৩, এবং ৩৪৫ - ৩৬৬; উসুলুন নাযারি ফি মাকাসিদে তাশরিয়িল ইসলামি, নিমর আহমাদ আস-সাইয়্যিদ ১/২৫৯ - ৩৫৮; আল-মাদখালু লি দিরাসাতিস সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ ওয়ান নাজমুল মারইয়্যাহ, আল-গামিদি ৬২ - ৯৬।

৪- আদর্শিকতা এবং স্থায়িত্ব: আর তা হলো এর বিধানসমূহ এমন সব অটল বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত যা কোনো নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড অনুযায়ী এর প্রভাববিস্তারকারী কারণসমূহ অর্জিত হওয়া ব্যতিরেকে পরিবর্তিত হয় না। ফলে তা প্রবৃত্তি, খেয়াল-খুশি, কামনা-বাসনা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের বশীভূত হয় না।

৫- বাস্তবতা: এর বিধানসমূহ সকল কাল ও স্থানের জন্য উপযোগী হওয়ার মাধ্যমে।

৬- মধ্যপন্থা: এই বিধানগুলো এক ন্যায়নিষ্ঠ ও সর্বোত্তম মধ্যপন্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে, যাতে কোনো বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি নেই।

এই বৈশিষ্ট্যসমূহ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সিয়াসাহ শারইয়্যাহ বিজ্ঞানের শরয়ী বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট। সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-কে একটি গ্রহণযোগ্য গবেষণা ও ইজতিহাদ পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করার সময় এই বৈশিষ্ট্যগুলো সেখানে উল্লেখ করা সমীচীন নয়। কারণ এটি এমন এক ক্ষেত্র যা ইজতিহাদ, ভুল এবং গ্রহণযোগ্য মতপার্থক্যের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং একে ওই পূর্ণতার সাথে গুণান্বিত করা সঠিক নয় যা এই বৈশিষ্ট্যগুলোতে বিদ্যমান। বরং এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে ওই মূলনীতিগুলোকে গুণান্বিত করা হয় যার ওপর এই ইজতিহাদ নির্ভরশীল, অথবা শরীয়তের অকাট্য বিষয়গুলোকে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে লেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা:

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখা যাতে সঠিক হয়—চাই তা পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের মতো করে লেখা হোক অথবা আরও সূক্ষ্মভাবে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হোক—সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক:

১- ইসলামের স্বাতন্ত্র্যসমূহ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ হওয়া:
বৈশিষ্ট্যসমূহ ইসলাম ও এর বিধানের স্বতন্ত্র বিষয়গুলোকে প্রকাশ করে। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই সুদৃঢ় বিষয়াবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে এবং সামষ্টিকভাবে ইসলামের প্রকৃত রূপ ও এর ব্যাপকতাকে উন্মোচনকারী হতে হবে। তাই কিছু দিক প্রকাশ করে অন্য কিছু বাদ রাখা সঠিক নয়, অথবা এমন অস্পষ্ট শব্দে প্রকাশ করাও ঠিক নয় যাতে সত্য ও মিথ্যা মিশে যায়, কিংবা এমন সাধারণ ঢঙে বর্ণনা করাও উচিত নয় যা ইসলাম ধর্মের বিশেষ স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করে না।

২- প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র প্রভাব ফুটিয়ে তোলার গুরুত্ব:
সুতরাং যখন আমরা ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব, তখন অবশ্যই আমাদের এগুলোর প্রতিটির প্রভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে, আর...

আলোচনাটি কেবল এর অর্থ বর্ণনা এবং এর প্রতি শরীয়তের স্বীকৃতির প্রমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

উদাহরণস্বরূপ, ব্যবস্থাটি আল্লাহপ্রদত্ত হওয়ার প্রভাব কী? কেবল এর অর্থ বর্ণনা করা এবং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে—একথা বলাই যথেষ্ট নয়; বরং এই ব্যবস্থা আল্লাহপ্রদত্ত হওয়ার প্রভাব অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে কিংবা সামগ্রিক জীবনযাত্রায় কী হতে পারে, তা বর্ণনা করা আবশ্যক।

উদাহরণস্বরূপ, কিছু লোক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন না হয়েই বলে থাকে: এটি আল্লাহর আইন এবং এটি মানুষের তৈরি আইন। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা আইনটিও মানুষই প্রয়োগ করবে, ফলে মানুষের তৈরি আইনের ক্ষেত্রে যেসব সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়, তা এখানেও বিদ্যমান থাকে। তাই বিধানটি ওহীর ওপর ভিত্তি করে হওয়ার ফলে যেসব বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়—যা অন্য কোনো ব্যবস্থায় সম্ভব নয়—সেগুলোর প্রভাব ফুটিয়ে তোলা জরুরি। যেমন: বিধানের স্থায়িত্ব ও চিন্তাধারার পরিবর্তনে এর পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকা, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা, এবং পার্থিব শাস্তির পাশাপাশি পারলৌকিক শাস্তির সাথে যুক্ত থাকায় এর প্রতি আনুগত্য শক্তিশালী হওয়া, এবং এতে আত্ম-পর্যবেক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা—যা মানবীয় আইনে অর্জন করা সম্ভব নয়। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

এর কারণ হলো, বৈশিষ্ট্যসমূহ ইসলামের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে চায়, এর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে এবং এর প্রতি আনুগত্যকে সুদৃঢ় করে। আর এই লক্ষ্য অর্জনে এর প্রভাব বর্ণনা করার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি প্রমাণ করার সক্ষমতা অর্জনের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও এই জাতীয় সমকালীন জ্ঞানশাখাগুলোতে উত্তম জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যাতে এই বিষয়টি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায়।

৩- এই কথা স্মরণে রাখা যে, স্বাতন্ত্র্য মূল উৎসের সাথে সংশ্লিষ্ট, প্রয়োগের সাথে নয়:

এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলোর স্বাতন্ত্র্য এর মূল উৎসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মানুষের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং আমরা যখন ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করি এবং একে ব্যাপকতা, পূর্ণাঙ্গতা ও ভারসাম্যপূর্ণ হিসেবে অভিহিত করি, তখন এগুলো মূলত এর সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধানাবলির বিশেষণ। পক্ষান্তরে কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা সমাজের সামাজিক ব্যবস্থা যে তেমনই হবে—এমনটি আবশ্যক নয়। বরং সেই নির্দিষ্ট ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে ইসলামের বিধানাবলি পালনে তাদের অঙ্গীকারের মাত্রা, জনকল্যাণ সাধন ও অপকারিতা দূরীকরণে তাদের গবেষণালব্ধ প্রচেষ্টার ব্যাপ্তি এবং এর জন্য গ্রহণযোগ্য উপায়সমূহ অবলম্বনের ওপর।

এই বিষয়টি সচেতনতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারার মধ্যে ওহীর পন্থা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে যে ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়, তা সেই সকল মুসলিমদের ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে যারা এই পন্থা অনুসরণে অবহেলা করে।

এবং এটি আমাদের চতুর্থ বিষয়ের দিকে ধাবিত করে:

৪ - বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো থেকে উপকৃত হওয়াকে বাতিল করে না:

মূলত বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত মূলনীতিগুলোর দিকসমূহ স্পষ্ট করা। এটি বিদ্যমান অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনাকে, বরং এর বৈধতাকে নাকচ করে দেয় না। কেননা স্বাতন্ত্র্য নিহিত থাকে এসব বৈশিষ্ট্যের মূলনীতিসমূহের মধ্যে। তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য জনকল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষতিকর বিষয়সমূহ দূর

করার লক্ষ্যে সাধারণ অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা থেকে উপকৃত হওয়া আবশ্যক।

সুতরাং আমরা যখন সমকালীন উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে তুলনা করে ইসলামে রাজনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমরা শরীয়তের বিধানে রাজনীতির সামগ্রিক মূলনীতিসমূহকেই ফুটিয়ে তুলি। এর অর্থ এই নয় যে, সমকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোতে বিদ্যমান সকল গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ও উপকারী অভিজ্ঞতাকে বর্জন করা। কেননা রাজনীতির ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং তাকে শরয়ী হিসেবে অভিহিত করার অর্থ এই নয় যে, তা বিদ্যমান সবকিছুকেই অপসারিত করে দেয়, কিংবা প্রতিটি মাধ্যমকেই প্রয়োগের সময় অবশ্যই পরিবর্তিত হতে হবে। বরং উপায় ও উপকরণের ক্ষেত্রে মূল নীতি হলো বৈধতা। আর যা কিছুই জনকল্যাণ সাধন করে এবং অনিষ্টতা দূর করে তা-ই গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ না তা কোনো শরয়ী বিধানের পরিপন্থী হয়। সুতরাং এসব ব্যবস্থার সাথে মতপার্থক্য মূলত মানদণ্ড বা উৎসের ক্ষেত্রে; জনকল্যাণ বিবেচনা করা, অধিকার রক্ষা করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা কিংবা মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করার মূলনীতির ক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই।

একাদশ ভূমিকা

সিয়াসাহ শারইইয়াহর সুফলসমূহ

সিয়াসাহ শারইইয়াহর সুফল বা ফলাফলসমূহ বিভিন্ন দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। মূলত সিয়াসাহ শারইইয়াহর সুফল বহুমুখী; এর সুফল রয়েছে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে:
১- মুজতাহিদ এবং শাসকবর্গ।
২- জনগণের ওপর শাসন পরিচালনাকারী রাজনৈতিক ব্যবস্থা।
৩- শাসিত বা প্রজাসাধারণ, যারা মূলত সাধারণ জনগণ।
৪- শরয়ি দলীলসমূহের ক্ষেত্রে ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্ভরযোগ্য ইজতিহাদ।

সুফলসমূহের বিষয়টি অত্যন্ত বিস্তৃত যা সীমাবদ্ধ করা কঠিন। প্রত্যেক গবেষক এই গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামটি সার্থক করার জন্য নিজের দৃষ্টিতে যা অধিক উপযুক্ত মনে করেন, তা-ই উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। এর মাধ্যমেই সিয়াসাহ শারইইয়াহর গুরুত্বের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়।

সিয়াসাহ শারইইয়াহর সুফলসমূহ সেই সব প্রেরণা দ্বারা প্রভাবিত হয় যা একে উৎসাহিত করেছে। আমাদের বর্তমান যুগে এমন কিছু নতুন প্রভাবক রয়েছে যা সিয়াসাহ শারইইয়াহর প্রতি মনোযোগ বাড়াতে উৎসাহিত করেছে এবং একে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। সিয়াসাহ শারইইয়াহর বিষয়ে গ্রন্থ রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যে বৃহৎ ফিকহি আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, এই প্রভাবকগুলোই ছিল তার মূল চালিকাশক্তি। কারণ, এই গবেষণার মাধ্যমে সিয়াসাহ শারইইয়াহকে লক্ষ্য অর্জনের পথ হিসেবে দেখা হয়। আমাদের বর্তমান যুগে এই উদ্দীপনামূলক প্রভাবকসমূহকে—যা একই সাথে সিয়াসাহ শারইইয়াহর সুফলও বটে—নিম্নোক্ত প্রভাব ও ফলাফলগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করানো যেতে পারে:

প্রথম প্রভাব: সমসাময়িক পরিবর্তনসমূহ বিবেচনা করা।

বর্তমান সময়ের এই বৃহৎ প্রভাবকগুলো এমন নির্ভরযোগ্য ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তাকে উৎসাহিত করেছে যা বিবেচনা করে...

এই বৃহৎ পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে এমন একটি সঠিক শরয়ী অবস্থান পেশ করা জরুরি, যা শরীয়তের বিধানসমূহের বিরোধিতা না করে এই কারণগুলোর প্রভাব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

আমাদের পূর্ববর্তী ফকীহগণ—আল্লাহ তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন—যাকে তাঁরা 'নাওয়াযিল' (নতুন উদ্ভূত সমস্যা) বা 'ওয়াকায়ি' (ঘটনাবলি) বলে অভিহিত করেছেন, সে বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলো হলো এমন সব ফিকহি নতুন বিষয় যা তাঁদের পূর্ববর্তীদের যুগে বিদ্যমান ছিল না। তবে বর্তমান যুগে বিষয়টি আরও কঠিন ও জটিল হয়ে উঠেছে; কারণ বর্তমান যুগটি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনশীল হয়ে পড়েছে এবং বাস্তবের এমন এক ভিন্ন রূপ ও নতুন চিত্র তৈরি করেছে যা ইতিপূর্বে পরিচিত ছিল না। এটি নির্ভরযোগ্য ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য করে তুলেছে।

আমাদের যুগে প্রভাবশালী প্রধান পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপে সংক্ষেপ করা যেতে পারে:

১. জাগতিক সকল ক্ষেত্রে মুসলিমদের দুর্বলতা এবং অনেক মুসলিমের পশ্চিমা শক্তির কর্তৃত্বের অধীনে চলে আসা। মানুষের জীবন ও মনন গঠনে তাদের সরাসরি প্রভাব এবং এর ফলে পশ্চিমা সংস্কৃতির মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও আচরণের ব্যাপক প্রভাব।

২. মানব রচিত আইন ও ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ, যা মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে বর্তমানে শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে শরীয়ত আর প্রধান মানদণ্ড হিসেবে অবশিষ্ট নেই এবং আল্লাহর বাণী ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণীর সার্বভৌমত্বও কার্যকর নেই।

৩. সকল ক্ষেত্রে আধুনিক নতুন উদ্ভূত বিষয় ও 'নাওয়াযিল', যা এই নতুন বিষয়গুলোর ওপর শক্তিশালী ও নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য করে তুলেছে। সেই সাথে এই বিষয়গুলো যেসব পরিবর্তন বহন করে তা অধ্যয়ন করা, ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গির ওপর এগুলোর প্রভাবের মাত্রা এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজন ও অপরিহার্যতার পরিমাপ করাও জরুরি। এগুলো অর্থনীতি, রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন।

৪. মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা যা মুসলিমদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে এবং তাদের ঐক্য নষ্ট করেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারা প্রতিটি বিষয়ে এমনকি ইসলামের মূলনীতি ও অকাট্য বিধানসমূহের ক্ষেত্রেও মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। ফলে অনেক মানুষ শরীয়তের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করছে এবং অন্য কোনো মানদণ্ডকে গ্রহণ করছে। মুসলিমদের মাঝে এমন সব চিন্তা ও মতবাদের উদ্ভব হয়েছে যা ওহীর সামনে মাথা নত করে না অথবা ওহীর সমান্তরাল অন্য কোনো মানদণ্ডের আনুগত্য করে। এমনকি যারা শরীয়ত বাস্তবায়নের দাওয়াত দেন, তাদের মধ্যেও এমন মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় যা কিছু মানুষের মনে এই মূল ভিত্তিটি সম্পর্কেই সন্দেহের উদ্রেক করে।

এই ধরনের বড় ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এমন একটি সিয়াসা শারইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি) থাকা অপরিহার্য যা শারয়ি দলীলসমূহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে জনকল্যাণ হাসিল এবং অপকার দূর করার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করবে। কারণ, এই পরিবর্তনগুলো শরীয়ত বর্জন, এর থেকে বিমুখ হওয়া এবং সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটানোর দিকে ধাবিত করে। ফলে মানুষ শরীয়ত অনুসরণ থেকে বিমুখ হয় এবং ইসলামের শত্রুরা এই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে মানুষকে তাদের দ্বীনের প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে এবং ইসলাম যে সব কাল ও সব স্থানের জন্য উপযোগী, সে বিষয়ে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় সিয়াসা শারইয়্যাহ এগিয়ে আসে এই দাবিগুলোর অসারতা প্রমাণ করতে। এটি প্রমাণ করে যে, শরীয়তের সীমানার অধীন ইজতিহাদের মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধন, অপকার দূরীকরণ, প্রয়োজন পূরণ, অধিকার রক্ষা এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় প্রভাব: মানবরচিত আইন ও রাজনীতি থেকে অমুখাপেক্ষিতা।

বর্তমান যুগে মুসলিম বিশ্বের ওপর আপতিত হওয়া অন্যতম বড় বিপদ হলো বিচারব্যবস্থা ও আইনের ক্ষেত্রে ওহী ছাড়া অন্য কিছুর বশ্যতা স্বীকার করা। মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে আমদানিকৃত আইনগুলোই এখন বিচারিক মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও সেগুলো ওহীর সাথে সাংঘর্ষিক। এই পরিস্থিতিই উলামায়ে কেরাম, দাঈ এবং সংস্কারকদের সিয়াসা শারইয়্যাহর বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে এটি ঐসব আমদানিকৃত ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে। যেন প্রয়োজন বা জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে এই আমদানিকৃত ব্যবস্থাগুলোর শরণাপন্ন হতে না হয়, বরং সিয়াসা শারইয়্যাহই একটি বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয় যা মুসলিমদের রক্ষা করবে।

এই মনোযোগ এই সচেতনতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে যে, গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অবহেলা মানবরচিত আইনের শরণাপন্ন হওয়ার পেছনে বড় প্রভাব ফেলে এবং এটি তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। এটি কোনো নতুন বিষয় নয়; ইসলামী ইতিহাসে শরীয়তের বিপরীতে রাজনীতির উদ্ভব হয়েছিল মূলত গ্রহণযোগ্য জনকল্যাণ বিবেচনা করার ক্ষেত্রে ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটির কারণে। যা শাসকদের শরয়ি বিচার ব্যবস্থার সমান্তরাল একটি রাজনৈতিক পথ অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল যাতে তারা তাদের স্বার্থ হাসিল করতে পারে; পরবর্তীতে তারা যুলুম-অবিচারের দিকে ধাবিত হয়েছিল, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে রাজনীতি ও শরীয়তের মধ্যকার আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

আর এটি শরীয়ত বর্জনের কোনো যৌক্তিকতা পেশ করা নয়, বরং এটি হলো ঐ সকল কারণ অনুসন্ধান করা যা এর দিকে ধাবিত করে, যেন আমরা সেগুলো থেকে সতর্ক থাকতে পারি। অন্যথায়, একজন মুসলিমের জন্য শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করা কোনোভাবেই বৈধ নয়।

এমনকি যদি ফকিহ, শাসক বা অন্য কেউ এর ওপর আমল করার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেন, তবুও প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ আমলের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। অন্যের অবহেলার কারণে কারো জন্য কোনো অজুহাত থাকবে না।

তৃতীয় প্রভাব: বাস্তব জীবনে শরিয়তের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

এই মানব-রচিত ব্যবস্থাগুলো থেকে বিমুখ হওয়া তখনই সম্ভব হবে যখন শরিয়তের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এটি এমন এক সর্বোচ্চ সংবিধানে পরিণত হবে যা অন্য কোনো আইন অতিক্রম করতে পারবে না। মুসলমানদের দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে অবস্থা এমনটাই ছিল। উপনিবেশবাদের পর মুসলিম উম্মাহ যখন মানব-রচিত আইনের দ্বারা আক্রান্ত হলো, তার আগে পর্যন্ত তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের বিষয়ে শরিয়তের বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিচার ব্যবস্থা কার্যকর ছিল না।

সুতরাং 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' (শরিয়াহসম্মত রাজনীতি) হলো বাস্তব জীবনে শরিয়ত প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম। এটি এমন এক বিষয়

যা বিধানের সম্যক জ্ঞান, তা প্রয়োগের পদ্ধতি, এর সাথে সাংঘর্ষিক সমকালীন পরিবর্তনসমূহ, সক্ষমতা ও সম্ভবপরতার শর্তাবলি এবং বিধানের পরিণামসমূহ বিবেচনার ক্ষেত্রে গভীর গবেষণালব্ধ প্রয়াস দাবি করে। এই সবকিছুর জন্য সিয়াসাহ শারইয়্যাহ প্রয়োজন; এটি ব্যতীত শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

বাস্তব ক্ষেত্রে শরিয়তের প্রয়োগ মানুষের চিন্তা ও ধারণায় এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাসকে তাত্ত্বিকভাবে সুদৃঢ় করে। এটি ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও দয়ার সেই মূলনীতিগুলোকে ফুটিয়ে তোলে যার ওপর শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সিয়াসাহ শারইয়্যাহ হলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে এই আদর্শে পৌঁছানোর পথ ও মাধ্যম। এটি সকল শাসনব্যবস্থায় ইসলামের কর্মপদ্ধতি ও অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার একটি ক্ষেত্র।

চতুর্থ প্রভাব: জনকল্যাণ নিশ্চিত করা এবং মানুষের বিষয়াবলি পরিচালনায় অনিষ্ট দূর করা।

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-র অন্যতম সুফল হলো এটি জনকল্যাণ সাধন করে এবং মানুষের থেকে অনিষ্ট দূর করে। আর এটি কেবল নিছক কামনার মাধ্যমে অর্জিত হয় না; বরং এটি অর্জনের জন্য প্রকৃত ইজতিহাদ (গবেষণালব্ধ প্রজ্ঞা), নিরলস প্রচেষ্টা এবং ক্ষমতায়নের ঐশ্বরিক নিয়মাবলি অনুসরণ করা আবশ্যক। এই সকল তাৎপর্য সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-র ধারণার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়।

পঞ্চম প্রভাব: সমকালীন ইজতিহাদকে সক্রিয় করা এবং এর উপকরণসমূহকে শক্তিশালী করা।

এটি একটি জরুরি ফল যা কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ দূর করার সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন। কেননা বর্তমান যুগে কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছানোর বিষয়টি জটিল হয়ে পড়েছে এবং তা বহু বিষয়ের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে গেছে।

যদি ফিকহশাস্ত্রে ইজতিহাদ বলতে শরয়ি হুকুমে পৌঁছানোর জন্য সামর্থ্যের সর্বোচ্চ প্রয়োগ বুঝায়, তবে আমাদের সময়ের মতো এক জটিল যুগে হুকুমসমূহে পৌঁছানোর জন্য সামর্থ্যের সেই প্রয়োগ বহুবিধ জ্ঞান এবং বিভিন্ন ব্যবস্থার ওপর অবগতি লাভের দাবি রাখে, যা কল্যাণ ও অকল্যাণের মানদণ্ডকে প্রভাবিত করে।

প্রশংসনীয় শরয়ি রাজনীতির অন্যতম প্রভাব হলো এটি সমকালীন ইজতিহাদকে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালায়, যা শরয়ি মূলনীতি অনুযায়ী অর্জিত কল্যাণসমূহ বিবেচনা করবে এবং অকল্যাণ প্রতিহত করবে।

ইজতিহাদকে শক্তিশালী করার অন্তর্ভুক্ত হলো সমকালীন বাস্তবতার ফিকহ-এর প্রতি গুরুত্ব প্রদান, এর রূপরেখা তৈরিতে প্রভাব বিস্তারকারী বিজ্ঞান ও জ্ঞানসমূহ অধ্যয়ন করা এবং এর চিন্তা ও আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপকরণ ও মাধ্যমগুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া। এই আধুনিক ক্ষেত্রগুলোতে অবহেলা করে কল্যাণ অর্জন, প্রয়োজন পূরণ এবং অকল্যাণ রোধ করা সম্ভব নয়।

ষষ্ঠ প্রভাব: মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা।

ঐক্যবদ্ধ হওয়া, কাতার সুসংহত করা এবং অন্তরের মেলবন্ধন এমন বিষয় যার ফলে কল্যাণ বৃদ্ধি পায়, অকল্যাণ হ্রাস পায় এবং অনিষ্টতা লাঘব হয়। এটিই সেই পথ যা শরয়ি রাজনীতি নিশ্চিত করে। কারণ এটি সাধারণভাবে মানুষের বিষয়াদি পরিচালনা করে, ফলে সকলে এর ওপর ঐক্যবদ্ধ হয় এবং অন্তরে মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়।

রাজনীতির অন্যতম প্রভাব হলো এটি শরয়ি বিধানের অনুগত একটি শাসনের জন্য সচেষ্ট থাকে। আর শরয়ি বিধান কার্যকর করাই একমাত্র পথ যার ওপর মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। শরয়ি বিধান কার্যকর করা ব্যতীত মুসলিমরা তাদের দ্বীনের বাইরের কোনো আদর্শের ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। তারা মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও নৈকট্য তৈরি এবং অকল্যাণ রোধে যতই চেষ্টা করুক না

কেন, বিভেদ ও মতপার্থক্য প্রকাশ পাবেই। কারণ মুসলিমদের অন্তরকে তাদের রবের কিতাবের মতো অন্য কিছু ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে না।

সপ্তম প্রভাব: মানুষের জন্য সহজীকরণ।

নিশ্চয়ই সহজীকরণ একটি গ্রহণযোগ্য শরয়ী মূলনীতি এবং শরীয়তের প্রকাশ্য উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কোনো কঠিনতা চান না।" [আল-বাকারা: ১৮৫]। সুতরাং শরীয়তের সকল বিধানই সহজ। মানুষের মধ্যে যে সংকট বা সংকীর্ণতা পরিলক্ষিত হয়, তার কারণ হলো শরীয়ত সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের অভাব। যা তাদেরকে এমন কিছু আঁকড়ে ধরতে পরিচালিত করে যার মধ্যে সংকীর্ণতা রয়েছে অথচ তা শরীয়তের অংশ নয়। অথবা শরীয়ত পালনে শিথিলতার কারণে তারা তাদের দ্বীনের বিধান থেকে দূরে সরে যায়, ফলে তাদের উপর বিধানগুলো বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং নিজেদের দূরত্ব ও অবহেলার কারণে তারা সংকীর্ণতা অনুভব করে। অন্যথায় বিধানগুলোর মূল সত্তার মাঝে কোনো সংকীর্ণতা বা কাঠিন্য নেই।

আর সিয়াসা শরইয়্যাহ হলো একটি গ্রহণযোগ্য ফিকহী ইজতিহাদ যা শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হলো মানুষের জন্য সহজীকরণ—শরীয়তের কোনো বিরোধিতা না করে। সুতরাং শরীয়ত পরিপন্থী সহজীকরণের উদ্দেশ্য করা সিয়াসা শরইয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। তদুপরি, সিয়াসা হলো জনকল্যাণমুখী ইজতিহাদ। আর মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সহজীকরণের কাজ হলো তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনা এবং তাদের থেকে অকল্যাণ প্রতিহত করা।

অষ্টম প্রভাব: সমসাময়িক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে ইতিবাচক সুফল গ্রহণ।

সুতরাং সিয়াসা শরইয়্যাহ শরীয়তসম্মত জনকল্যাণ অর্জনের প্রচেষ্টায় বিদ্যমান সবকিছুকে বাতিল করে দেয় না বা বর্তমান সবকিছুকে সমূলে উচ্ছেদ করে না; বরং এটি একটি প্রাণবন্ত ও বিচক্ষণ ইজতিহাদ, যা সব ধরনের জনকল্যাণ অনুসন্ধান করে। তাই এই জনকল্যাণের উৎস কোথা থেকে তা কোনো ক্ষতি বয়ে আনে না; বরং এটি কেবল শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে।

অতএব, সিয়াসা শরইয়্যাহর ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দাবি হলো সেই সমসাময়িক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে সুফল গ্রহণ করা, যা বিভিন্ন দেশ ও জাতির জন্য মহান কল্যাণ বয়ে এনেছে। সিয়াসা শরইয়্যাহ ওহীর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রামাণিকতাকে আঁকড়ে ধরার দাবি হলো তার সমান্তরাল অন্যান্য আদর্শ যেমন উদারবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করা; কিন্তু জীবনমুখী সেইসব অর্জন, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করা নয় যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়েছে, তাদের বিষয়াদি সংশোধিত হয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে।

নবম প্রভাব: ইজতিহাদ তথা গবেষণার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ।

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ তার জনকল্যাণমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভারসাম্যের সাথে দুটি মৌলিক মূলনীতির সংরক্ষণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালায়। তা হলো শরিয়তের সীমারেখা, এর মূলনীতি ও অকাট্য প্রমাণাদির প্রতি অনুগত থাকা; এবং জনকল্যাণ অর্জন ও অপকারিতা দূর করার বিষয়টিকে বিবেচনা করা। এখানে যেন কোনো এক দিক অন্য দিকের উপর প্রাধান্য বিস্তার না করে। কারণ সিয়াসাহ শারইয়্যাহর অনুপস্থিতি বিধান ও বাস্তব ঘটনাবলির পর্যালোচনার ক্ষেত্রে চরমপন্থা বা শিথিলতার বিভিন্ন দ্বার উন্মোচিত করে দেয়। একদিকে জনকল্যাণকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে মূলনীতি বা অকাট্য প্রমাণসমূহকে অকেজো করে ফেলার চরমপন্থা সৃষ্টি হয়, আবার অন্যদিকে প্রমাণাদি আঁকড়ে ধরার অজুহাতে জনকল্যাণকে উপেক্ষা করার শিথিলতা দেখা দেয়। আর এ সবকিছুর মূলেই রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার ত্রুটি।

দশম প্রভাব: ইসলাম ও এর বিধিবিধানের প্রকৃত রূপ উপস্থাপন।

এটি পূর্ববর্তী সকল সুফলেরই একটি ফসল। কেননা মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তাদের রবের দাসত্বে অনুগত করা, সত্য প্রকাশ করা, মানুষকে সত্যের নিকটবর্তী করা, এর বিধানাবলি বাস্তবায়ন সহজতর করা, এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সংশয় ও প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা এবং সত্যের কাছে পৌঁছানোর পদ্ধতি ও এর বিধানাবলি অনুধাবনের গতিপথ সঠিক করা। এ সবকিছুর মাধ্যমেই ইসলাম, এর ব্যবস্থা ও বিধিবিধানের প্রকৃত রূপ উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে এমন এক প্রেক্ষাপটে যেখানে ইসলামের রূপ বিকৃত করার ব্যাপক অপচেষ্টা, বিশাল বিকৃতি এবং এর বিধানাবলির বিরুদ্ধে চরম ষড়যন্ত্র চলছে, যা মুসলিমদের এক বিশাল অংশের ওপর প্রভাব ফেলেছে। সম্ভবত কিছু ভ্রান্ত অবস্থান বা মতামত এই বিকৃত ধারণাগুলোকে আরও গভীর করতে ভূমিকা রেখেছে। এমতাবস্থায় সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য শরয়ি গবেষণা এই চিত্রকে সংশোধন করে এবং বিচ্যুতি দূর করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে।

আমি এখানে 'প্রকৃত রূপ উপস্থাপন' কথাটি ব্যবহার করেছি; 'ইসলামের রূপ উন্নত করা' বা 'এর চিত্র সুন্দর করা' বলিনি। কারণ আল্লাহর শরিয়ত কোনো বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা সুশোভিতকরণের মুখাপেক্ষী নয়। এটি তার নিজস্ব সৌন্দর্য ও লাবণ্যে চরম পূর্ণতা ও উৎকর্ষের অধিকারী। বরং প্রয়োজন হলো মানুষের সামনে এই রূপটি সঠিকভাবে তুলে ধরা এবং এর পথে বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করা।

দ্বাদশ ভূমিকা

ফিকহী ঐতিহ্যে সিয়াসা শারইয়্যাহ-এর উৎসসমূহ

সিয়াসা শারইয়্যাহর প্রতি গুরুত্বারোপ — চাই তা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাসলাহাহ ভিত্তিক ইজতিহাদের দিক থেকে হোক, কিংবা রাজনীতির বিভিন্ন অধ্যায় ও মাসআলাসমূহের প্রতি মনোযোগের দিক থেকে হোক — পূর্ববর্তী ফকীহগণের নিকট তা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং এ সংক্রান্ত ফিকহী উপাদানও ছিল বিশাল। যদিও বর্তমান যুগে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার আধিক্য এবং নিত্যনতুন মাসআলা ও শাখা-প্রশাখার প্রসারের দিক থেকে সিয়াসা শারইয়্যাহর ওপর রচনাশৈলী অনেক বড় পরিসরে হচ্ছে, তবে এর অর্থ এই নয় যে ঐতিহ্যবাহী (তূরাসী) পাণ্ডুলিপিতে এর অভাব রয়েছে; বরং তা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত।

সুতরাং পূর্ববর্তীগণ এই অধ্যায়ের প্রতি কম গুরুত্ব দিয়েছেন — এমন কথা বলা ভুল। এটি মূলত পর্যালোচনার একটি ত্রুটি, যার কারণ তিনটি বিষয়ের দিকে ফিরে যায়:

প্রথম বিষয়: এমন কিছু নির্দিষ্ট মাসআলা বা বিধান অনুসন্ধান করা যার প্রয়োজনীয়তা আমাদের যুগে প্রকটভাবে অনুভূত হয়; যেমন রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনার পদ্ধতি, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর, রাষ্ট্রের তিন বিভাগের কর্মপদ্ধতি এবং তদারকি ও জবাবদিহিতার মাধ্যমসমূহ ইত্যাদি। ফলে যখন তারা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এ সংক্রান্ত সন্তোষজনক আলোচনা খুঁজে পায় না, তখন তারা মনে করে যে এর কারণ হলো এই অধ্যায়গুলোর প্রতি মনোযোগের অভাব বা অবহেলা।

অথচ এই ত্রুটি যদি থেকে থাকে, তবে তা সমকালীন ফিকহী গবেষণার দিকেই নির্দেশ করা উচিত, পূর্ববর্তী ফিকহী রচনার দিকে নয়; কারণ সেই সময়ে এই আলোচনাগুলো পরিচিত ছিল না এবং এই বিষয়গুলো তাদের সামর্থ্য কিংবা প্রয়োজনের আওতাভুক্ত ছিল না।

এই কারণেই ফিকহী গবেষণা এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছে যে, তারা এমন কিছু মৌলিক উপাদান সরবরাহ করবে যার ওপর ভিত্তি করে সমসাময়িক পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো বিনির্মিত হবে; তারা আপনার সামনে এমন সব বিষয়ে বিস্তারিত সমাধান পেশ করবে না যা তাদের যুগে সম্ভবপর ছিল না এবং তাদের সময়ের নিরিখে কোনো কল্যাণও (মাসলাহাহ) সাধন করত না। এই কারণেই ফকীহগণ যখন কিছু বিস্তারিত বিষয় বর্ণনায় প্রশস্ততা অবলম্বন করেছেন...

তাদের সময় ও শাসনের অবস্থা অনুযায়ী; এক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফল খুব বেশি হবে না। যেমন বিভিন্ন প্রকারের মন্ত্রণালয়ের বিস্তারিত বিবরণ অথবা প্রশাসনিক অঞ্চলসমূহের বিস্তারিত তথ্যাবলি। কেননা এই বিস্তারিত বিবরণগুলো সমসাময়িক প্রচলিত রীতির (উরফ) অনুসারী হওয়ায় এগুলোর বড় কোনো স্থায়ী প্রভাব নেই।

দ্বিতীয় বিষয়: রচনার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির অনুসন্ধান করা; যেমন সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ক্ষেত্রে কোনো সমন্বিত তত্ত্ব, অথবা এই বিষয়ের নিয়ন্ত্রক কোনো সামগ্রিক মূলনীতি, অথবা এর কোনো পূর্ণাঙ্গ দর্শন, কিংবা এই শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ—এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে এটি প্রতিটি যুগের প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এই উদ্দেশ্যসমূহ অনুযায়ী রাজনৈতিক রচনার প্রতি গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক। এর মানে এই নয় যে, পূর্ববর্তী ফকীহদের মধ্যে যারা এই পদ্ধতিতে লিখেননি তাদের সমালোচনা করা হবে; কারণ সম্ভবত তাদের যুগে এর কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

তৃতীয় বিষয়: রাজনীতি বিষয়ক এমন বিশেষায়িত ও স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলি অনুসন্ধান করা যা এর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় মাসআলা ও শাখা-প্রশাখাকে একত্রিত করবে। যেহেতু এই জাতীয় রচনার সংখ্যা তুলনামূলক কম, তাই কিছু মানুষ মনে করেন যে, এই বিষয়ের প্রতি ফকীহদের মনোযোগ দুর্বল বা অপর্যাপ্ত ছিল।

মূল উৎসসমূহ থেকে তথ্য তালাশ করার ক্ষেত্রে শিথিলতাই এখানে ভুলের কারণ। আমরা যদি সিয়াসাহ শারইয়্যাহর মাসআলাগুলো অনুসন্ধানের জন্য ফিকহী উৎসগুলো পর্যবেক্ষণ করি, তবে আমরা সেগুলোকে অত্যন্ত বিস্তৃত দেখতে পাব।

এর অর্থ হলো, সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততার সমালোচনা হতে হবে নির্দিষ্ট কোনো ইজতিহাদের প্রতি যার ত্রুটি বা ভুল প্রমাণিত হয়েছে, অথবা নির্দিষ্ট কোনো কিতাব বা লেখকের প্রতি—এবং সেখানে জ্ঞান ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তাদের ত্রুটিগুলো ফুটিয়ে তুলতে হবে। এখানে উদ্দেশ্য কোনো প্রকার সমালোচনাকে রুদ্ধ করা নয়; কেননা ফকীহগণ সর্বদা একে অপরের গঠনমূলক সমালোচনা করে এসেছেন। ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের জন্য অভ্যন্তরীণ ফিকহী সমালোচনা একটি অপরিহার্য বিষয়। বরং এখানে যা সমালোচিত তা হলো মনোযোগের অভাব সংক্রান্ত ঢালাও সমালোচনা, যা মোটেও সঠিক নয়।

আমরা এখানে এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্য থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করব এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের বিবরণ প্রদান করব:

প্রথম ক্ষেত্র: ইমামত এবং সাধারণ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব (বিলায়াহ) বিষয়ক স্বতন্ত্র গ্রন্থসমূহ।

এগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো:
১. আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী (৪৫০ হি.) রচিত 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ওয়াল উইলায়াতুদ দ্বীনিয়্যাহ'।
২. আবু ইয়ালা আল-ফাররা (৪৫৮ হি.) রচিত 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ'।
৩. আবুল মাআলী আল-জুওয়াইনী (৪৭৮ হি.) রচিত 'আল-গিয়াসি' অথবা 'গিয়াসুল উমাম ফি তিয়াতিজ জুলাম'।
৪. ইবনে জামাআহ (৭৩৩ হি.) রচিত 'তাহরীরুল আহকাম ফি তদবীরি আহলিল ইসলাম'।
৫. মুহাম্মাদ বিন আল-মাওসিলি (৭৭৪ হি.) রচিত 'হুসনুস সুলুক আল-হাফিজ দাওলাতুল মুলুক'।
৬. ইবনুল মুবাররাদ (৯০৯ হি.) রচিত 'তাওদীহু তুরুকিল ইস্তিকমাহ ফি বায়ানিল আহকামিল উইলায়াহ ওয়াল ইমামাহ'।
৭. আবুল আব্বাস আল-ওয়ানশারীসী (৯১৪ হি.) রচিত 'আল-উইলায়াত'।
৮. মুহাম্মাদ মিয়ারা (১০৭২ হি.) রচিত 'রিসালা ফিল ইমামাতিল উজমা'।
৯. আব্দুল কাদির আল-ফাসী (১০৯১ হি.) রচিত 'আল-আজরিবাতুল হিসান ফিল খলিফাতি ওয়াস সুলতান'।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র: বিচার বিভাগীয় বিধিবিধান (আহকামুল কাযা) এবং এই প্রশাসনিক পদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধিবিধান বিষয়ক স্বতন্ত্র গ্রন্থসমূহ।

এই ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ হলো:
১. খাসসাফ (২৬১ হি.) রচিত 'আদাবুল কাযী', এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ; যেমন- জাসসাস (৩৭০ হি.) এবং আস-সাদর আশ-শাহীদ (৫৩৬ হি.)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
২. আবুল কাসিম আস-সিমনানী (৪৯৯ হি.) রচিত 'রাওদাতুল কুদাত ওয়া তরিকুন নাজাত'।
৩. ইমাদ উদ্দীন আল-আশফুরকানী (৬৩৬ হি.) রচিত 'সিনওয়ানুল কাযা ওয়া উনওয়ানুল ইফতা' ।

---

৪. আদাবুল কাজা, ইবন আবিল দাম আশ-শাফেয়ি (৬৪২ হি.)।

৫. আদাবুল কাজা, আস-সুরুজি (৭১০ হি.)।

৬. মুইনুল হুক্কাম আলাল কাজায়া ওয়াল আহকাম, ইবন আবদির রাফি (৭৩৪ হি.)।

৭. মুইনুল হুক্কাম ফিমা ইয়াতারাদদাদু বাইনাল খাসমাইন মিনাল আহকাম, আলাউদ্দীন আত-তরাবুলুসি (৮৪৪ হি.)।

তৃতীয় ক্ষেত্র: জিহাদ ও যুদ্ধ বিষয়ক স্বতন্ত্র গ্রন্থসমূহ।

তন্মধ্যে রয়েছে:

১. সিয়ারুল আওযায়ি (১৫৭ হি.)।

২. আস-সিয়ার, আবু ইসহাক আল-ফাযারি (১৮৮ হি.)।

৩. আর-রাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযায়ি, কাজি আবু ইউসুফ (১৮২ হি.)।

৪. আস-সিয়ারুল কাবির, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (১৮৯ হি.)।

৫. আল-ইনজাদ ফি আবওয়াবিল জিহাদ, ইবনুল মুনাসিফ (৬২০ হি.)।

৬. মাশারিউল আশওয়াক ইলা মাসারিইল উশশাক, ইবনুন নাহহাস (৮১৪ হি.)।

চতুর্থ ক্ষেত্র: সিয়াসা শারইয়্যাহ (শরয়ি রাজনীতি) ও শাসকদের কর্মকাণ্ড বিষয়ক স্বতন্ত্র গ্রন্থসমূহ।

তন্মধ্যে রয়েছে:

১. আল-ইহকাম ফি তাময়িযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম ওয়া তাসাররুফাতিল কাজি ওয়াল ইমাম, শিহাবুদ্দীন আল-কারাফি (৬৮৪ হি.)।

২. আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রায়িইয়্যাহ, শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (৭২৮ হি.)।

---

৩. আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ফিস সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (৭৫১ হিজরী)।
৪. তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকদিয়্যাহ ওয়া মানাহিজিল হুক্কাম, বুরহানুদ্দীন বিন ফারহুন (৭৯৯ হিজরী)।
৫. আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইব্রাহিম খলিফা—যিনি দাদাহ আফান্দি (৯৭৩ হিজরী) নামে সুপরিচিত—এর রচিত।
এবং এর সাথে (নিম্নোক্ত কিতাবটি) অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব, যদিও তা বিশেষভাবে সিয়াসাতে শারইয়্যাহ-র উপর রচিত নয়, তবে মাসালিহ (জনকল্যাণ) সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে:

৬. আল-কাওয়াইদুল কুবরা, অথবা কাওয়াইদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম, ইজ্জুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম (৬৬০ হিজরী)।

পঞ্চম ক্ষেত্র: সম্পদ ও ভূমি রাজস্ব (খারাজ) বিষয়ক স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলি।

তন্মধ্যে রয়েছে:
১. আল-খারাজ, আবু ইউসুফ (১৮২ হিজরী)।
২. আল-খারাজ, ইয়াহইয়া বিন আদম (২০৩ হিজরী)।
৩. আল-আমওয়াল, আবু উবাইদ আল-কাসিম বিন সাল্লাম (২২৪ হিজরী)।
৪. আল-আমওয়াল, ইবনে যানজুয়াহ (২৫১ হিজরী)।
৫. আল-ইসতিখরাজ লি-আহকামিল খারাজ, ইবনে রজব (৭৯৫ হিজরী)।

ষষ্ঠ ক্ষেত্র: রাজন্যবর্গের শিষ্টাচার এবং প্রজাসাধারণের শাসনের পদ্ধতি বিষয়ক স্বতন্ত্র কিতাবসমূহ:

তন্মধ্যে রয়েছে:
১. আত-তিবরুল মাসবুক ফি নাসিহাতিল মুলুক, আবু হামিদ আল-গাজালি (৫০৫ হিজরী)।
২. সিরাজুল মুলুক, আবু বকর আত-তোরতুশি (৫২০ হিজরী)।

৩. আল-মানহাজ আল-মাসলুক ফি সিয়াসাতিল মুলুক, আবদুর রহমান আশ-শায়জারি (৫৯০ হিজরি)।
৪. বাদায়ি আস-সুলুক ফি তাবায়ি আল-মুলক, ইবনুল আজরাক (৮৯৬ হিজরি)।

সপ্তম ক্ষেত্র: হিসবাহ (জনশৃঙ্খলা ও বাজার নিয়ন্ত্রণ) এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ বিষয়ক একক কিতাবসমূহ।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো:
১. নিহায়াতুর রুতবা ফি তলাবিল হিসবাহ, আবদুর রহমান আশ-শায়জারি (৫৯০ হিজরি)।
২. নিহায়াতুর রুতবা ফি তলাবিল হিসবাহ, ইবনে বাসসাম (৬২৬ হিজরি)।
৩. মা’আলিমুল কুরবাহ ফি তলাবিল হিসবাহ, ইবনুল উখুওয়াহ (৭২৯ হিজরি)।
৪. আল-কানযুল আকবার মিনাল আমরি বিল মা’রুফ ওয়ান নাহয়ি আনিল মুনকার, ইবনে আবি বকর আস-সালিহি (৮৫৬ হিজরি)।

অষ্টম ক্ষেত্র: আহলুয যিম্মাহর (অমুসলিম প্রজাদের) বিধান বিষয়ক একক কিতাবসমূহ।

তন্মধ্যে রয়েছে:
১. আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ইবনুল কাইয়্যিম (৭৫১ হিজরি)।
২. আল-মাযাম্মাহ ফি ইস্তি’মাল আহলিয যিম্মাহ, ইবনুন নাক্কাশ (৭৬৩ হিজরি)।

নবম ক্ষেত্র: ফিকহী সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ফিকহী অধ্যায়সমূহ।

তা ফিকহী গ্রন্থসমূহের এমন কিছু অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যা রাজনৈতিক গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত, আর তা হলো: বিচার ব্যবস্থা (কাযা), জিহাদ, হুদুদ ও তা’যির (দণ্ডবিধি), বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ (কিতালু আহলিল বাগি), যুদ্ধাপরাধীদের (মুহারিবিন)

বিধান এবং ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানদের গুণাবলি।

দশম ক্ষেত্র: আকিদাহ বিষয়ক সংকলনের অধ্যায়সমূহ।

আর এটি আকিদাহর সাধারণ কিতাবসমূহের ইমামত অধ্যায়ের মতো।

এই পদ্ধতির বিন্যাস সিয়াসাহ শারইয়্যাহর (শরয়ি রাজনীতি) ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত বিষয়ের বিশালতা উন্মোচনে অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়া লক্ষ্য অনুযায়ী উৎসসমূহকে ভিন্ন উপায়েও উপস্থাপন করা সম্ভব; যেমন- সিয়াসাহ শারইয়্যাহ রচনার ইতিহাস এবং এর ক্রমবিকাশের পর্যায়সমূহ অনুসরণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই উৎসসমূহ অধ্যয়ন করা (১)।

---

(১) এই পদ্ধতি অনুযায়ী রচনার বিভিন্ন পর্যায় এবং এ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দেখুন: 'আল-মাদখাল ইলাস সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়াল আনজিমাহ আল-মারইয়্যাহ', পৃষ্ঠা ২৫৭-৩১০। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিষয়ে যা কিছু রচিত হয়েছে তার বিস্তারিত তালিকার জন্য দেখুন: আবদুল গনি মাস্তু রচিত 'আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ', পৃষ্ঠা ১০৫-১১৫।

""

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের রাজনীতি

""

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মতৎপরতা

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ বা শরয়ি রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ফিকহি অধ্যায়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত আলোচনা; আর এটি এজন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু কাজ রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মতৎপরতা বলতে উদ্দেশ্য হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো বিধানের ক্ষেত্রে মানুষের শাসক ও তাদের প্রধান হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। আবার কোনো কোনো মামলার ক্ষেত্রে তিনি তাদের মধ্যে বিচারক হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। কখনো তিনি শরয়ি বিধানের প্রবর্তক ও প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং মুফতি হিসেবে দ্বীনি বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই সাথে ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান), বিচারক, প্রচারক এবং মুফতি। সাধারণ মানুষের মাঝে এই পার্থক্যের বিষয়ে সচেতনতার অভাব থাকতে পারে, যার ফলে এই মূলনীতিটি না জানার কারণে তারা শরয়ি বিধান অনুধাবনের ক্ষেত্রে ভুল করে বসেন।

(১) ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর কর্মতৎপরতা: এর অর্থ হলো, এই ধরনের কাজ কেবল শাসকদের জন্য নির্দিষ্ট। সাধারণ মানুষের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের উদ্দেশ্যে এগুলো করা বৈধ নয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো কেবল একজন শাসক হিসেবেই সম্পাদন করেছেন। যেমন: সেনাবাহিনী সুসংগঠিত করা, গনিমতের মাল বণ্টন করা এবং দণ্ডবিধি (হুদুদ) কার্যকর করা। এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় বা শাসনতান্ত্রিক বিধান যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন; অতএব তাঁর পরবর্তী শাসক ও সুলতানগণ তা কার্যকর করবেন। কারও জন্য এ কথা বলা বৈধ নয় যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে হুদুদ কার্যকর করেছিলেন, আমিও সেভাবে তা কার্যকর করব।" কারণ সেসব ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল একজন ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে।

(২) তদ্রূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন: তিনি বিবাদমান পক্ষগুলোর মাঝে ফয়সালা করেন। যেমন: ঋণ পরিশোধে বাধ্য করা, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ। এর অর্থ হলো, এই ধরনের কাজ

কেবল বিচারকদের সাথে সংশ্লিষ্ট, সাধারণ মানুষের জন্য নয়।

---

(৩) একইভাবে নবী ﷺ একজন শরীয়ত প্রণেতা হিসেবে কাজ করেন: তিনি উম্মতের কাছে তাদের দ্বীন এবং তাদের রবের বাণী পৌঁছে দেন। এছাড়া তিনি একজন মুফতি হিসেবে কাজ করেন, যিনি মানুষের দ্বীনি বিধান সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দেন এবং এটি সকল মানুষের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য (১)।

শরীয়তের বিধানসমূহের ক্ষেত্রে এটিই সর্বাধিক প্রচলিত এবং এটিই মূল ভিত্তি। সুতরাং, যতক্ষণ না কোনো দলিল দ্বারা এটি স্পষ্ট হয় যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পদক্ষেপটি একজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) বা বিচারক হিসেবে ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত একে মূল ভিত্তি থেকে বিচ্যুত করা যাবে না।

উলামায়ে কেরাম নববী কার্যাবলীর প্রকারভেদের মধ্যে পার্থক্য করার এই নিয়মের সপক্ষে কিছু প্রসিদ্ধ উদাহরণ উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথম উদাহরণ:

নবী ﷺ-এর বাণী: “যে ব্যক্তি কোনো মৃত (অনাবাদী) জমি আবাদ করবে, তা তারই” (২)। ফকিহগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই পদক্ষেপের ব্যাখ্যায় দুটি মতের ওপর মতভেদ করেছেন:

প্রথম মত: এই পদক্ষেপটি ছিল একজন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) হিসেবে (৩)। এর ওপর ভিত্তি করে, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য জমি আবাদ করা এবং তার মালিক হওয়া বৈধ নয়; কারণ তাঁরা মনে করেন, এই হাদিসটি ইমাম হিসেবে নবী ﷺ-এর পদক্ষেপের ওপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: এই পদক্ষেপটি ছিল একজন শরীয়ত প্রণেতা হিসেবে, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নয় (৪)। ফলে তাঁরা এই বিধানটিকে সকল মানুষের জন্য সাধারণ করে দিয়েছেন; সুতরাং যে কেউ কোনো মৃত ভূমি আবাদ করবে, তা তারই হবে।

(১) নববী কার্যাবলীর নীতিমালা সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন: আল-কারাফীর 'আল-ইহকাম ফী তাময়ীজিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম', পৃ. ৪৫-৪৯; আল-ফুরুক (৩৬ নং পার্থক্য), ১/২০৫-২০৯; আদ-যাখীরা, ৩/৪২১-৪২২, ৬/১৫৭-১৫৮, ৯/১৬০-১৬১। অন্যান্য আলেমদের বক্তব্যের জন্য দেখুন: আল-কাওয়াইদুল কুবরা, ২/২৪৪; ইবনু দাকীকিল ঈদ-এর 'ইহকামুল আহকাম শারহু আহাদীতি সাইয়্যিদিল আনাম', ৪/৩৭৭; ইবনুল কাইয়্যিমের 'যাদুল মা'আদ', ৩/৪২৯-৪৩০; সুবকীর 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর', ২/২৮৫-২৮৬; আল-বাহরুল মুহীত, ৮/২৫৪; শারহুয যারকাশী আলা মুখতাসারিল খিরাকী, ৬/৪৭৮-৪৭৯; আল-ইসনাভীর 'আত-তামহীদ ফী তাখরীজিল ফুরু আলাল উসুল', ৫০৯-৫১০; লাহুলুর 'আত-তাওযীহ ফী শারহিত তানকীহ', ২/৩৮-৩৯; আত-তাহরীর শারহুত তাহরীর, ৮/৩৯০৫-৩৯১০; শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ', ১/২২৩-২২৪; ইবনু আশুরের 'মাকাসিদুশ শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ', ২০৭-২৩০ পৃষ্ঠা।

(২) ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (২৩৩৫)।

(৩) এটি হানাফী ও মালিকী মাযহাবের অভিমত, দেখুন: বাদায়েউস সানায়ে, ৬/১৯৪; আদ-যাখীরা, ৬/১৫৬।

(৪) এটি শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অভিমত, দেখুন: আল-মুহাযযাব, ১/৪২৩; আর-রওদুল মুরবি, ২/৪২৫।

পৃষ্ঠা 119

দ্বিতীয় উদাহরণ:
হিন্দ বিনতে উতবার প্রতি নবী ﷺ-এর বাণী: (তুমি তোমার নিজের ও তোমার সন্তানের জন্য যা যথেষ্ট হয় তা ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করো) (১)।
জমহুর ফকীহগণ (২) এই মত পোষণ করেছেন যে, এটি একটি বিচারবিভাগীয় ফয়সালা। এর ভিত্তিতে: বিচারবিভাগীয় ফয়সালা ব্যতীত কোনো নারীর জন্য তার স্বামীর সম্পদ থেকে গ্রহণ করা বৈধ নয়।
অন্যরা মত দিয়েছেন যে: এটি একটি সাধারণ বিধান (শরয়ি আইন)। সুতরাং স্বামী যদি স্ত্রীর প্রাপ্য আদায়ে অবহেলা করে, তবে স্ত্রীর জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বামীর সম্পদ থেকে গ্রহণ করা বৈধ (৩)।

তৃতীয় উদাহরণ:
নবী ﷺ-এর বাণী: (যে ব্যক্তি কোনো শত্রুকে হত্যা করবে এবং তার সপক্ষে তার কাছে প্রমাণ থাকবে, তবে সেই নিহতের আসবাবপত্র বা মালসামান (সালব) তারই হবে) (৪)।
একদল আলিম এই মত পোষণ করেছেন যে: নবীজীর এই পদক্ষেপটি ছিল ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। এর ভিত্তিতে: মুজাহিদ নিহতের মালসামান পাওয়ার অধিকারী হওয়ার জন্য ইমামের অনুমতি থাকা আবশ্যক (৫)।
অন্য একদল আলিম মনে করেন: এই অতিরিক্ত দান (তানফিল) সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত, যা নবী ﷺ-এর বাণীর মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং এর জন্য ইমামের অনুমতির প্রয়োজন নেই (৬)।
এই জাতীয় আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে (৭)।

---

(১) বুখারী এটি সংকলন করেছেন, ২/৭৬৯, হাদিস নং ২০৯৫।
(২) তারা হলেন হানাফী, মালিকী এবং শাফেয়ীগণ। দেখুন: আল-মাবসুত ১৭/৩৯, আল-ইস্তিকাযকার ৭/৯৪, মুগনি আল-মুহতাজ ৩/৪৪৮।
(৩) এটি হাম্বলীগণের মাযহাব। দেখুন: আল-মুগনি, ইবনে কুদামা (৮/১৯৫)।
(৪) বুখারী এটি সংকলন করেছেন (৩১৪২), এবং মুসলিম (১৭৫১)।
(৫) এটি হানাফী এবং মালিকীগণের মাযহাব। দেখুন: আল-হিদায়া শারহুল বিদায়া ২/১৪৯, হাশিয়াতুদ দুসুকি আলাশ শারহিল কাবীর ২/১৯১।
(৬) এটি শাফেয়ী এবং হাম্বলীগণের মাযহাব। দেখুন: নিহায়াতুল মুহতাজ (৬/১৪৪), আল-ইনসাফ, আল-মারদাভী ৪/১৪৮।
(৭) সেই সমস্ত মাসআলাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যাতে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে নবী ﷺ-এর কার্যাবলীর ধরণ নির্ধারণের কারণে, দেখুন: 'তাসাররুফুন নাবী ﷺ বাইনাল ইমামতি ওয়াল কাদা ওয়াল ইফতা', ফাহাদ আল-মুহসিন আর-রিস, পৃষ্ঠা: ৪৮০ - ৪৯২।

পৃষ্ঠা 120

সুতরাং আপনি যেমন দেখছেন, নবীজির কর্মপন্থার ধরন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মতভেদই বিভিন্ন বিধিবিধানের ক্ষেত্রে উলামাদের মতপার্থক্যের কারণ হয়েছে।

ফকিহ ইবনে আশুর —আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন— নবীজির কর্মপন্থা ও কার্যাবলি বর্ণনার পরিধি আরও বিস্তৃত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নবীজির কর্মপন্থা কখনো আপস-মীমাংসা, উপদেশ প্রদান, আদব শিক্ষা দেওয়া কিংবা পরামর্শপ্রার্থীর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান ইত্যাদি উদ্দেশ্যেও হতে পারে (১)।

নবীজির কর্মপন্থা বা কার্যাবলির অধীনে এ বিভাগগুলোর অন্তর্ভুক্তি সর্বজনস্বীকৃত নাও হতে পারে। কারণ ইমামত (নেতৃত্ব), বিচারকার্য এবং ফতোয়া প্রদান —এগুলো হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ কার্যাবলি বা দায়িত্ব। আবার একজন স্বামী, পিতা কিংবা নামাজের ইমাম হিসেবে তাঁর কার্যাবলিও এই বিভিন্ন দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করতেন।

আর উপদেশ প্রদান, শিষ্টাচার শিক্ষা এবং ইঙ্গিত প্রদানের বিষয়টি হলো বক্তব্যের উদ্দেশ্য। কেননা কোনো নির্দেশের মাধ্যমে কখনো তা পালন করা অপরিহার্য করা হয়, আবার কখনো তা নসিহত বা মীমাংসার উদ্দেশ্যে হয়; তবে এগুলো ইমামত বা বিচারকার্যের মতো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব নয়।

সুতরাং উল্লিখিত তিনটি পদের সাথে নামাজের ইমামতির দায়িত্বকেও যুক্ত করা যেতে পারে। ফিকহি মাসআলার ওপর এর প্রভাবের একটি উদাহরণ হলো—কুরবানির পশু জবেহ করার ক্ষেত্রে কোন ইমামের জবেহ ধর্তব্য হবে, তা নিয়ে ফকিহগণ ইখতিলাফ করেছেন। তিনি কি খলিফা হবেন নাকি নামাজের ইমাম? এই মতপার্থক্যের কারণ হলো, এক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ কি 'ইমামতে কুবরা' (রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব) হিসেবে ছিল নাকি নামাজের ইমাম হিসেবে ছিল (২)?

অথবা কোনো বিষয়ের মালিক হিসেবে তাঁর আচরণ। ফকিহগণ এ বিষয়ে যে দলিল পেশ করেছেন তার মধ্যে একটি হলো—উম্মাহাতুল মুমিনিনগণের একজনের সেই পেয়ালাটি ভেঙে ফেলার ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত উত্তর যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহার দেওয়া হয়েছিল।

(১) দেখুন: মাকাসিদুশ শারিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, ইবনে আশুর ২১২।
(২) দেখুন: জাওয়াব আবু সাঈদ বিন লুব, আল-মি'ইয়ার আল-মু'রাব ২/৭৩। অনুরূপ আরও একটি উদাহরণ হলো, কেউ কেউ দুই ঈদের নামাজের আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নফল নামাজ বর্জন করা থেকে দলিল দিয়েছেন যে তিনি তখন ইমাম ছিলেন; কিন্তু ইমাম আহমদ এ বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেখুন: মাসাইলুল ইমাম আহমদ লিল-আছরাম, সংকলক: আবদুল্লাহ আল-তারিকি ২/১৯৩, আল-মুগনি ৩/৩৪০। এটি এমন একটি গবেষণার বিষয় যা বিভিন্ন মাজহাবের কিতাবগুলো থেকে এই মূলনীতির দ্বারা প্রভাবিত ফিকহি মাসআলাগুলো সংগ্রহের দাবি রাখে।

...তাঁর জনৈক স্ত্রীর নিকট থেকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তোমাদের মা ঈর্ষান্বিত হয়েছেন।" অতঃপর তিনি খাদেমকে ততক্ষণ পর্যন্ত আটকে রাখলেন যতক্ষণ না তিনি বর্তমানে যে স্ত্রীর ঘরে অবস্থান করছিলেন তাঁর নিকট থেকে একটি পাত্র আনা হলো। এরপর তিনি সুস্থ পাত্রটি সেই স্ত্রীকে প্রদান করলেন যার পাত্রটি ভেঙে গিয়েছিল এবং ভাঙা পাত্রটি সেই স্ত্রীর ঘরে রেখে দিলেন যার ঘরে সেটি ভেঙেছিল।(১)

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই দুটির মধ্যকার তফাৎ বিবেচনা না করেই তা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এর নানাবিধ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো: (এটি মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালার অন্তর্ভুক্ত নয় যার ওপর তাদের

বাধ্য করা হয়; বরং এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিজস্ব মালিকানায় হস্তক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত। কারণ উভয় ঘরই তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মালিকানাধীন ছিল এবং বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, উভয় ঘরের পাত্র ও খাদ্য সামগ্রী তাঁরই ছিল)।(২)

নববীয় কার্যাবলি অনুধাবনের পদ্ধতি

নববীয় কার্যাবলি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম বেশ কিছু সহায়ক মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে রয়েছে:

১- নববীয় কার্যাবলির অধিকাংশ বিষয়ই হলো শরিয়ত প্রণয়ন (তাশরি‘)। সুতরাং মূলনীতি হলো, কোনো প্রমাণ না থাকা পর্যন্ত সেটিকে সাধারণ শরিয়ত প্রণয়ন হিসেবেই গণ্য করা হবে।(৩)

ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম বলেন: (রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে ফতোয়া প্রদান, বিচারকার্য এবং ইমামতে উজমা বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের কাজ। কেননা তিনি হলেন ইমামদের ইমাম। সুতরাং যখন তাঁর থেকে কোনো কাজ প্রকাশ পায়, তখন তাঁর কার্যাবলির অধিকাংশ অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তাকে ফতোয়া হিসেবে গণ্য করা হবে, যতক্ষণ না এর বিপরীতে কোনো দলিল পাওয়া যায়)।(৪)

ইবন দাকীকুল ঈদ বলেন: (এটি একটি মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট: আর তা হলো, এই জাতীয় ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাজসমূহ যখন শরিয়ত প্রণয়ন এবং শাসকবর্গের বিচারিক কর্মকাণ্ডের মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে, তখন কি তাকে গণ্য করা হবে...)

---

(১) বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন (৫২২৫)।
(২) মাতালিউত তামাম, আশ-শাম্মা' ১৮২।
(৩) দেখুন: শারহুয যারকাশি আলা মুখতাসারিল খারকি ৬/৪৭৯, আল-ফুরূক ৪/৪৬, আত-তামহীদ লিল ইসনাভি ৫০৯-৫১০, মাকাসিদুশ শরিয়াহ লি ইবনি আশূর ২২৯-২৩০।
(৪) আল-কাওয়াইদুল কুবরা ২/২৪৪।

...বিধান প্রদানের ওপর নাকি দ্বিতীয়টির ওপর? আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একে বিধান প্রদানের ওপর প্রয়োগ করা হয় (১)।

২- পারিপার্শ্বিক আলামতসমূহ বিবেচনা করা: কোনো আচরণ বা পদক্ষেপ রাষ্ট্রপ্রধান (ইমামত) হিসেবে নাকি বিচারকের (কাজা) অবস্থান থেকে নেওয়া হয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট আলামতসমূহ পর্যালোচনা করা আবশ্যক। এটি নিছক কোনো অনুমান বা ধারণার বিষয় নয়; বরং এটি একটি বিস্তারিত গবেষণালব্ধ কাজ (ইজতিহাদ), যা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ দাবি করে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন, তখন এটি একটি আলামত যে বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর পদক্ষেপের সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার সাহাবীরা যদি একই বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদক্ষেপের চেয়ে ভিন্ন কোনো আচরণ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তবে এটিও অন্য একটি আলামত যে তাঁদের দৃষ্টিতে ওই পদক্ষেপটি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ছিল (২)।

৩- প্রতিটি পদক্ষেপের প্রকৃত স্বরূপ এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি অনুধাবন করা। উদাহরণস্বরূপ, ইবাদতসমূহ কেবল বিধান

প্রদানের (তাশরী) সম্ভাবনা রাখে। আল-কারাফী বলেছেন:

“জেনে রাখুন, ইবাদতসমূহের কোনোটিতেই বিচারিক সিদ্ধান্তের (হুকুম) কোনো অনুপ্রবেশ ঘটে না, বরং এতে কেবল ফতোয়া বা ধর্মীয় নির্দেশনা প্রযোজ্য। সুতরাং ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল ফতোয়া হিসেবেই গণ্য” (৩)।

সারকথা হলো, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিস্তারিত পর্যালোচনার দাবি রাখে; (যদি কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় এবং সেটি কোন পদের বা অবস্থানের ভিত্তিতে করা হয়েছে তা জানা যায়, তবে বিষয়টি স্পষ্ট। আর যদি সংশয় দেখা দেয়, তবে বহিঃস্থ কোনো প্রমাণের মাধ্যমে একটি দিককে প্রাধান্য দিতে হবে) (৪)।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করা প্রয়োজন যে, এই সকল পদক্ষেপই শরয়ি বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো ওয়াজিব, মুস্তাহাব কিংবা বৈধতার বর্ণনামূলক হতে পারে। তবে এই মূলনীতির প্রকৃত ফলাফল হলো—এই বিধানের দায়বদ্ধ ব্যক্তি (মুকাল্লাফ) নির্ধারণ করা; অর্থাৎ এটি কি সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য, নাকি কেবল বিচারক ও শাসকদের জন্য? এটি যে সঠিক তা প্রমাণিত হয়েছে...

(১) ইহকামুল আহকাম ৪/৩৭৭।
(২) দেখুন: রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদক্ষেপসমূহ, লেখক: ইসাম আবু সানিয়াহ, পৃষ্ঠা: ৯১২, শরীয়াহ ও আইন বিজ্ঞান সাময়িকী, সংখ্যা ৩, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ।
(৩) আল-ফুরুক ৪/৯৪।
(৪) আত-তাহবীর শারহুত তাহরীর ৮/৩৯০৭।

মূলনীতিটি বেশ কিছু নববীয় হাদিসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এর ভিত্তিতে এটি এমন সব বিধান থেকে ভিন্ন, যা অনুকরণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়; যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে মানবিক স্বভাবজাত কারণে যেসব ক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে এবং যা তিনি সচরাচর অভ্যাসগতভাবে করেছেন। এগুলো উদ্দেশ্যমূলক সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা কেবল বৈধতা (ইবাহাত) নির্দেশ করে।

অনুরূপভাবে নববীয় সেই সব পদক্ষেপও এর অন্তর্ভুক্ত নয় যা তিনি ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জনস্বার্থমূলক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যেমন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা বা নিরাপত্তা রক্ষা করা। এ ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে এই পদক্ষেপটি স্বয়ং উদ্দেশ্য, বরং এর উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা। তাই এটিও মুবাহ বা বৈধ কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হবে।

রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কিছু পদক্ষেপের ক্ষেত্রে এই মূলনীতিটি বোঝার ব্যাপারে বর্তমান যুগের কেউ কেউ ভুল করেছেন। তারা মনে করেছেন যে, তা ইমাম বা বিচারকদের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিধান। ফলে তারা একে একটি সামগ্রিক মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছেন যে, রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলো হলো জনকল্যাণমূলক কর্ম যা পালন করা আবশ্যক নয়। এটি দুটি দিক থেকে ভুল:

প্রথমত: রাজনীতির পুরো ক্ষেত্রটিকে এই মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত বলে রায় দেওয়া এবং রাজনীতির প্রতিটি বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশকে জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ মনে করা—যার প্রত্যাবর্তন হলো ইমামদের পদক্ষেপের দিকে। এটি ভুল; কারণ এই আলোচনাটি মূলত সেই সব পদক্ষেপের সাথে সংশ্লিষ্ট যা তিনি ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, রাজনীতির অধ্যায়ে বর্ণিত প্রতিটি বিষয়ের সাথে নয়।

---

(১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবস্থাসমূহের মধ্যে পার্থক্যের বিস্তারিত মানদণ্ডের জন্য দেখুন: আস-সুন্নাহ ওয়া

সিলাতুহা বিল আমালি ওয়াল মাজাহিবিল ফিকহিয়্যাহ, নাজি লামিন, পৃষ্ঠা ১৪৫-১৪৯। নববীয় পদক্ষেপসমূহকে আমলে নেওয়ার শরয়ী প্রমাণ এবং সেগুলোর মধ্যে পার্থক্যের জন্য দেখুন: তাসাররুফাতুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাইনাল ইমামতি ওয়াল কাদায়ি ওয়াল ইফতা, আবদুল মুহসিন আর-রাইস, পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৫, যা 'আল-মাজাল্লাহ আল-ফিকহিয়্যাহ আস-সুউদিইয়্যাহ' এর ১৮তম সংখ্যায় প্রকাশিত, ১৪৩৫ হিজরি।
(২) এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার জন্য দেখুন: আফআলুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওয়া দালালাতুহা আলাত তাশরি, আল-আশকার, ১/২১৯-২৪৮। এটি অভ্যাসগতভাবে করা কাজগুলো থেকে 'তাশরি' বা বিধান হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে রহিত করে না, কারণ সেগুলো বৈধতা (ইবাহাত) প্রমাণ করে। তবে কেউ কেউ একে 'অ-বিধানিক সুন্নাহ' হিসেবে অভিহিত করেন, যার অর্থ হলো—সেখানে বিধান দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। আর এ বিষয়টি প্রশস্ত। দেখুন: আস-সুন্নাহ আত-তাশরিইয়্যাহ ওয়া গায়রুত তাশরিইয়্যাহ, আস-সাররামি, পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৪।

পৃষ্ঠা 124

দ্বিতীয়: এই সমস্ত বিষয়কে অ-বাধ্যতামূলক আইন হিসেবে গণ্য করা; আর এটি একটি ভুল, কারণ এই কার্যাবলি হলো আইন প্রণয়ন (তাশরি'), তবে তা বিচারক ও শাসকদের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে এই আইন প্রণয়ন কখনো মুবাহ (বৈধ), মুস্তাহাব অথবা ওয়াজিব হতে পারে।(১)

(১) ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক শরয়ী বিধানের ওপর ভিত্তিহীন নিছক একটি জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থায় পরিণত করার মাধ্যমে এই মূলনীতির উদ্দেশ্য বিকৃত করার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: আব্দুল্লাহ আল-আজীরীর ‘ইয়ানবুউল গুওয়ায়াতিল ফিকরিয়্যাহ’, পৃষ্ঠা ৫৮৫ - ৫৯৪; ফাহাদ আল-আজলানের ‘আত-তাসলিমু লিন-নাসিশ শারয়ী ওয়াল মু'আরাদাতুল ফিকরিয়্যাতিল মু'আসিরাহ’, পৃষ্ঠা ৬০ - ৬৫; মুহাম্মদ শাকির আশ-শরীফের ‘তাহতিমুস সানামিল ইলমানী’, পৃষ্ঠা ২২৪ - ২৪৬; মুস্তফা আত-তরাবুলসীর ‘মানহাজুল বাহাসি ওয়াল ফাতওয়া ফিল ফিকহিল ইসলামী’, পৃষ্ঠা ৩৬৮ - ৩৭৪; আস-সরাহীর ‘আস-সুন্নাতুত তাশরিইয়্যাহ ওয়াস-সুন্নাতু গয়রুত তাশরিইয়্যাহ’, পৃষ্ঠা ৪৭ - ৬৩; বাসতামি সাঈদের ‘মাফহুমু তাজদিদিদ দীন’, পৃষ্ঠা ২৪৯ - ২৫০।

পৃষ্ঠা 125

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নববী রাজনীতি

নববী রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসূল দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা। এটি এই শাসনব্যবস্থাকে সকল ক্ষেত্রে অনন্য করে তোলে। তিনি নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও সদাচরণের প্রতি অবিচল থেকে এবং তাঁর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও মানুষের কল্যাণে মানবীয় পূর্ণতার শিখরে পৌঁছেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

রাজনৈতিক দিকটি পুরোপুরি আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়; বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর মদিনার শাসক হওয়ার কারণে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি অত্যন্ত বহুবিধ এবং এর শিক্ষণীয় দিকগুলো অত্যন্ত বিস্তৃত। তাই এখানে শরিয়াহভিত্তিক রাজনীতির (সিয়াসাহ শারইয়াহ) মূলনীতি গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হবে।

রাজনৈতিক বিষয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য ব্যাপক:

একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য জীবনের সকল ক্ষেত্রকে পরিব্যপ্ত করে। কারণ তাঁর আনীত বার্তা (রিসালাত) একটি পূর্ণাঙ্গ বার্তা; তাই তিনি রাজনৈতিক দিকসহ সকল ক্ষেত্রেই আনুগত্যের যোগ্য। তাঁর নেতৃত্ব অন্য যে কারও নেতৃত্বের চেয়ে ভিন্ন। কারণ তিনি নেতা হওয়ার আগেই একজন নবী। নবুওয়তের দাবির প্রেক্ষিতে তাঁর আনুগত্য আরও মহিমান্বিত ও অপরিহার্য। নবুওয়তের কারণেই তিনি নেতৃত্বের যোগ্য। তিনি মুসলিমদের নেতা, কারণ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসূল, যিনি একটি চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান নিয়ে এসেছেন। এ কারণেই (তাঁর আনুগত্য অন্যান্য শাসকদের আনুগত্যের মতো কোনো পূর্ববর্তী অঙ্গীকার বা ক্ষমতাধরদের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা ওয়াজিব, এমনকি তাঁর সাথে কেউ না থাকলেও কিংবা সকল মানুষ তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলেও) (১)।

এই মূলনীতিটি অনুধাবন করলে আধুনিককালের কিছু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে যা উল্লেখ করেন তা নাকচ হয়ে যায় যে...

---

(১) মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববিয়্যাহ ১/৮২।

তিনি কেবলমাত্র বাইয়াতের চুক্তির মাধ্যমেই তাঁর রাজনৈতিক বৈধতা লাভ করেছিলেন—এ ধারণাটি নবী (সা.)-এর অভিভাবকত্বের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি সীমাবদ্ধতা। কেননা তিনি বাইয়াত থেকে এমন কোনো নতুন বিষয় বা কর্তৃত্ব লাভ করেননি যা তাঁর রিসালাতের বহির্ভূত ছিল; বরং তাঁর আনুগত্য করা আগে থেকেই অপরিহার্য ছিল। এই বাইয়াতের মাধ্যমে তিনি যা লাভ করেছিলেন তা হলো শরীয়ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একদল সাহায্যকারী ও আনসারদের প্রাপ্তি। সুতরাং (সাধারণ কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হক বা অধিকার, তা মূলত তাঁর নবুওয়াতের ওপর ভিত্তি করেই সাব্যস্ত)।

অতএব, এই বাইয়াত ছিল এমন একটি বিষয়ের ওপর যা তাঁদের ওপর আগে থেকেই ওয়াজিব ছিল; তাঁরা বাইয়াত গ্রহণ করুক বা না করুক, তা পালন করা তাঁদের জন্য আবশ্যকীয় ছিল: (যেমন সাহাবীগণ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইয়াত হওয়া ছিল এমন একটি বিষয়ের ওপর যা বাইয়াত ছাড়াও ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নির্দেশ দেন তাতে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব—তাঁরা বাইয়াত করুক বা না করুক। তবে তাঁর নিকট বাইয়াত হওয়া হলো শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত এই ওয়াজিব পালনের প্রতি একটি অঙ্গীকার)।

ইবনে রজব বলেন: (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করতেন তখন তাঁদের থেকে এর বিধানাবলি মেনে চলার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করতেন। আর কখনো কখনো তিনি তাঁদের ইসলাম গ্রহণের পর সেই অঙ্গীকার নবায়ন করার জন্য এবং সেই অবস্থানে অটল থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁদের থেকে বাইয়াত নিতেন)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতিতে রাজনৈতিক দিকসমূহ:

যখন আমরা তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আদর্শের রাজনৈতিক দিকের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন আমরা একে দুটি মৌলিক ক্ষেত্রে বিভক্ত করতে পারি:

প্রথম ক্ষেত্র: শাসনের প্রায়োগিক বাস্তবায়ন।

আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাসক হিসেবে যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে রিসালাত পৌঁছে দিতেন এবং বিধানাবলি বর্ণনা করতেন, আবার একই সাথে তিনি ছিলেন মুসলমানদের শাসক। ফলে তিনি সম্পাদন করতেন...

---

(১) দেখুন: মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ১/৮৬।
(২) হাশিয়াতু ইবনু আবিদীন ২/২৭৬।
(৩) আর-রদ্দু আলাস সুবকী ১/৪৪।
(৪) ফাতহুল বারী লিবনি রজব ১/১০৬। এই সংশয়টির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: আল-হুররিয়াত আস-সিয়াসিয়্যাহ আল-মুয়াসিরাহ ফী দাউয়ি ফিকহিস সাহাবাহ ৫৫৫-৫৬৯।

শাসক হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে; আর এটিই হলো ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) হিসেবে তাঁর কর্মতৎপরতা, যা নববী কর্মতৎপরতার ভূমিকায় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আর এর কারণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রে প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন; তবে কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি বিচারক হিসেবে অথবা ইমাম হিসেবেও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এমতাবস্থায় তা বিচারক ও প্রশাসকদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় এবং তা সাধারণ সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য হয় না।

এই বিধানের বাস্তব প্রয়োগের কিছু নিদর্শন নিম্নরূপ:

১. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ: যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃবৃন্দ নিযুক্ত করতেন, দূত প্রেরণ করতেন, জাকাত সংগ্রহ করতেন, ছোট ও বড় সামরিক অভিযানসমূহ পরিচালনা করতেন, গোয়েন্দা পাঠাতেন এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ করতেন যা শাসক হিসেবে জনগণের অবস্থা সুসংহত করার জন্য অপরিহার্য।
২. মানুষের অধিকার সংরক্ষণ: বিচারকার্য ও বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে, একে অপরের প্রতি জুলুম প্রতিরোধ করে এবং তাদের মাঝে অনুদান ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের মাধ্যমে।
৩. শরয়ি দায়িত্ব পালন: দণ্ডবিধি কার্যকর করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে।
৪. এমন সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেখানে শরয়ি বিধানদাতা একাধিক বিষয়ের মধ্যে পছন্দ করার সুযোগ দিয়েছেন: যেমন যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৫. জনকল্যাণের ভিত্তিতে তাঁর ওপর ন্যস্ত বৈধ বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ: যেমন সন্ধি ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন, ক্ষমা করা এবং সংশোধনমূলক শাস্তি কার্যকর করা ইত্যাদি।

এই সুবিশাল ক্ষেত্রটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাজনীতির এক বিশাল পরিধিকে পরিবেষ্টন করে আছে। এটি এমন বিষয় যা তাঁর পরে ইমাম ও শাসকদের জন্য নির্ধারিত; এগুলো শরীয়তের এমন বিধান যা শাসকরা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন এবং এমন সব তশরিয়ি সুন্নাত যা নেতৃবৃন্দ পালন করেন। এগুলোর বিধান আবশ্যকতা, পছন্দনীয়তা কিংবা বৈধতার স্তরে হয়ে থাকে,

তবে তা শাসকদের এখতিয়ারাধীন; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের ইমাম হিসেবে এগুলোর আঞ্জাম দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র: মূলনীতি এবং আংশিক শাখাসমূহ।

এই মূলনীতিসমূহ জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব বিস্তারকারী শরয়ি দলিলের সাথে সংশ্লিষ্ট; এগুলো নিছক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এগুলো রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগুলোর নির্দেশিকা দুটি দিক থেকে পরিলক্ষিত হয়:

প্রথম দিক: কল্যাণ ও অকল্যাণের (মাসলাহাত ও মাফাসাদাত) মধ্যে যখন বৈপরীত্য দেখা দেয়, তখন কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। এটি সিয়াসাহ শরঈয়্যাহ বা শরয়ি রাজনীতির জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র।

দ্বিতীয় দিক: এগুলো রাজনীতির বিভিন্ন অধ্যায়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিসমূহ উন্মোচন করে।

নিম্নে আমরা এই মূলনীতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু মূলনীতি এবং এর প্রায়োগিক উদাহরণসমূহ উল্লেখ করছি। ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলো স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আমরা এগুলোর কয়েকটির বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করব:

প্রথমত: মুনাফিকদের হত্যা করা বর্জন করা (যাতে মানুষ এ কথা না বলে যে, মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করেন)।

এই হাদিসটি একাধিক ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কিছু ব্যক্তির ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থেকেছেন:

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেন: (আমরা এক যুদ্ধে এক সৈন্যদলে ছিলাম। তখন মুহাজিরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জনৈক আনসারী ব্যক্তিকে সজোরে আঘাত করেন। তখন আনসারী ব্যক্তিটি চিৎকার করে বললেন: হে আনসারগণ! এবং মুহাজির ব্যক্তিটি চিৎকার করে বললেন: হে মুহাজিরগণ! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি শুনে বললেন: জাহেলিয়াতের এই ডাক কেন?! তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! মুহাজিরদের একজন আনসারদের একজনকে আঘাত করেছে। তখন তিনি বললেন: এটি বর্জন করো, কেননা এটি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (ঘৃণ্য)। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এ কথা শুনে বলল: তারা কি সত্যিই এমনটা করেছে? আল্লাহর কসম! আমরা যদি মদিনায় ফিরে যাই, তবে সেখান থেকে অধিক শক্তিশালী ও সম্মানিতরা অবশ্যই হীন ও লাঞ্ছিতদের বের করে দেবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছাল, তখন ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এই মুনাফিকের শিরশ্ছেদ করার অনুমতি দিন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তাকে ছেড়ে দাও; লোকে যেন এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ তাঁর নিজের সঙ্গীদের হত্যা করেন।)(১)

---

(১) ইমাম বুখারি (৪৯০৫) এবং ইমাম মুসলিম (২৫৮৪) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে নবী (সা.) হুনাইনের যুদ্ধের দিন গনিমতের মাল বণ্টনের সময় দ্বিতীয় একটি অবস্থানে এই উক্তিটি করেছিলেন। তখন জনৈক মুনাফিক তাঁকে বলেছিল: "হে মুহাম্মদ! ন্যায়বিচার করুন!" তিনি বললেন: "তোমার দুর্ভোগ হোক! আমি যদি ন্যায়বিচার না করি, তবে আর কে করবে? আমি যদি ন্যায়বিচার না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।" তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সুযোগ দিন যেন আমি এই মুনাফিককে হত্যা করি।" তিনি বললেন: "আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই যেন মানুষ এই কথা বলতে না পারে যে, আমি আমার সঙ্গীদের হত্যা করি।"

কেন নবী (সা.) মুনাফিকদের শাস্তি প্রদান বর্জন করেছিলেন:

তার কারণ এই যে, মুনাফিকরা সাহাবীদের সাথে মিশে থাকত এবং তারা প্রকাশ্যে কুফরি কিংবা ইসলামের অবমাননা করত না। সুতরাং নবী (সা.) যদি তাদের হত্যা করতেন, তবে তৎকালীন অধিকাংশ মানুষের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে যেত। তারা ধারণা করত যে, রাসূল (সা.) তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করছেন এবং যারা তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করছে তাদেরই হত্যা করছেন। ফলে এটি মানুষের ইসলামে প্রবেশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত।

ইবন আব্দুল বার বলেন:

(ইমাম মালিককে বলা হলো: যিনদীককে কেন হত্যা করা হবে, অথচ আল্লাহর রাসূল (সা.) মুনাফিকদের চেনা সত্ত্বেও তাদের হত্যা করেননি? তিনি বললেন: আল্লাহর রাসূল (সা.) যদি তাদের সম্পর্কে তাঁর অবগতির ভিত্তিতে তাদের হত্যা করতেন, অথচ তারা ঈমান প্রকাশ করত, তবে তা মানুষের জন্য এই কথা বলার সুযোগ করে দিত যে, তিনি তাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা অন্য কোনো কারণে হত্যা করছেন। ফলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকত।)

খাত্তাবি বলেন:

(এর মধ্যে দ্বীন পরিচালনা এবং পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখার একটি মহান অধ্যায় রয়েছে। আর তা হলো মানুষ বাহ্যিক দেখেই দ্বীনে প্রবেশ করে এবং তাদের অন্তরে কী আছে তা জানার কোনো পথ নেই। সুতরাং মুনাফিককে যদি তার গোপন কুফরির কারণে শাস্তি দেওয়া হতো, তবে দ্বীনের শত্রুরা মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার একটি পথ পেয়ে যেত। তারা তাদের ভাইদের বলত যে: "তোমরা যদি তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করো তবে তোমরা কিসের নিরাপত্তায় আছ? তোমাদের বিরুদ্ধেও গোপন কুফরির অভিযোগ আনা হতে পারে এবং এর মাধ্যমে তোমাদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ করে নেওয়া হতে পারে।")

---

(১) মুসলিম (১০৬৩) ও বুখারি (৩১৩৮) ও (৩৬১০) হাদীসটি অতিরিক্ত অংশটুকু ছাড়া বর্ণনা করেছেন। আর তৃতীয় অবস্থানে মুনাফিকদের বর্ণনায় এই উক্তিটি বর্ণিত হয়েছে; তাবারানি (৮১০০) এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর মূল অংশটি মুসলিমের (২৭৭৯) শাহিদে (সমর্থনমূলক বর্ণনায়) রয়েছে।

(২) আত-তামহিদ, ইবন আব্দুল বার ১০/১৫৪; এবং দেখুন: শরহে সহিহ আল-বুখারি, ইবন বাত্তাল ৮/৫৭৫।

সুতরাং তোমরা নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না, কারণ তা মানুষকে দ্বীন থেকে বিমুখ করার কারণ হবে।

এখান থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাদের হত্যা না করার কারণ দুটি বিষয়ের কোনো একটির দিকে ফিরে যায়:

প্রথম বিষয়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বিচার করতেন। তাদের থেকে যা প্রকাশ পেত তা তাদের বিরুদ্ধে সুসাব্যস্ত ছিল না, কারণ তারা কুফরি ও শত্রুতাকে অস্পষ্ট রাখত এবং তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করত না।

দ্বিতীয় বিষয়: তাদের অবস্থার মধ্যে অস্পষ্টতা বিদ্যমান ছিল, যা অনেক মানুষের কাছে তাদের হত্যার কারণটি অস্পষ্ট করে রাখত। ফলে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করত যে, তিনি তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করছেন; যার ফলে এর মাধ্যমে আরও বড় কোনো অনিষ্ট সাধিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

আর যা রাজনৈতিক দিকের সাথে সম্পৃক্ত তা হলো দ্বিতীয় কারণটি। কেননা তারা শাস্তির উপযুক্ত ছিল এবং তারা এমন কাজ করেছিল যা শাস্তিকে আবশ্যক করে দেয়। কিন্তু তাদের শাস্তি প্রদান বর্জন করা হয়েছিল এই প্রকাশ্য ফাসাদ বা অনিষ্টের আশঙ্কায় যে, মানুষ বলাবলি করবে মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করছেন। ফলে এই অস্পষ্টতা বিদ্যমান থাকার কারণে তাদের ওপর আবশ্যকীয় শাস্তি প্রয়োগ করা ত্যাগ করা হয়েছিল।

এখানে একটি সংশয় দেখা দেয় যে, মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিন্দা করা এবং ইসলামের অবমাননা করা। তাহলে কি আমাদের বর্তমান সময়ের মতো পরিস্থিতিতে যারা ইসলামের পবিত্রতা ও মর্যাদা এভাবে লঙ্ঘন করে, তাদের ছেড়ে দেওয়া বৈধ হবে?

উত্তর: উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে, এই বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। এটি ছিল মুসলমানদের দুর্বল অবস্থার সময়ের জন্য, যখন তারা এই বিধান প্রয়োগ করতে ভীত ছিল। কিন্তু এর পরে, যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিন্দা করবে তাকে আর ছেড়ে দেওয়া হবে না।

কাজী ইয়াজ বলেন: "অনুরূপ বিষয় যদি আজ কারো পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে প্রকাশ পায়—যেমন তাঁর বিচারের ক্ষেত্রে অপবাদ দেওয়া এবং এতে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলা—তবে তা কুফরি বলে গণ্য হবে, যার কারণে বক্তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু তিনি (নবী) আলাইহিস সালাম ইসলামের সূচনায় মানুষের অন্তর জয় করতেন এবং যা উত্তম তা দিয়ে প্রতিরোধ করতেন, আর তিনি ছিলেন..."

---

(১) আলামুল হাদিস ৩/১৫৮৬; এবং এই অর্থের অনুরূপ বক্তব্য আহলে ইলমদের আলোচনাতেও দেখুন: শরহু সহিহিল বুখারি, ইবনে বাত্তাল ৮/৫৭৫; শরহুন নববী আলা সহিহি মুসলিম ১৬/১৩৯; কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সহিহাইন, ইবনুল জাওজি ৩/৩৩; আত-তাউজিহ, ইবনুল মুলাক্কিন ২৩/৪০৮ ও ২০/৭০; আল-ইশরাফ আলা নুকাত মাসাইলিল খিলাফ, কাজী আব্দুল ওয়াহহাব ২/৯৬১; আল-মাসালিক ফি শরহি মুয়াত্তায়ি মালিক ৬/২২১; এবং আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবি ২/৫৪৪; আত-তাহরির ওয়াত-তানভির ১০/২৬৭।

মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এর চাইতেও অধিক স্পষ্ট এবং ইঙ্গিতপূর্ণ আপত্তিকর বক্তব্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করা হয়।(১)

অনেক আলেম এ কথার ওপর সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছেন যে, এই বিষয়টি নবী (সা.)-এর যুগের সাথে সুনির্দিষ্ট ছিল এবং এটি একটি রহিত বিধান।(২)

তবে এটি এমন কোনো বিধান কার্যকর করতে বাধা দেয় না যখন ইসলামের শুরুর দিকের মতো বিপর্যয়, দুর্বলতা এবং অক্ষমতা সৃষ্টি হয়, যেমনটি ইতিপূর্বে বিলম্বে কার্যকরযোগ্য (মানসা) শরয়ি বিধানসমূহের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ সেই বিপর্যয়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যাতে এই ধরনের বিধান কার্যকর করা যেতে পারে:

(সারকথা হলো, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর দণ্ডবিধি (হদ) প্রয়োগ করা হয়নি কারণ শরয়ি দলিলের মাধ্যমে তার অপরাধ এমনভাবে প্রকাশিত হয়নি যা সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলে জানতে পারে; অথবা তা কার্যকর করা সম্ভব ছিল না এই কারণে যে, এর ফলে কিছু লোক ইসলামে প্রবেশ করতে অনীহা প্রকাশ করত, কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে যেত এবং কোনো গোষ্ঠী এমন যুদ্ধ ও ফিতনা সৃষ্টি করত যার বিপর্যয় একজন মুনাফিককে হত্যা না করার বিপর্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি হতো। এই দুটি কারণের বিধান আজ অবধি বিদ্যমান রয়েছে। কেবল একটি বিষয় ব্যতীত, আর তা হলো—নবী (সা.) সম্ভবত এই আশঙ্কা করেছিলেন যে, কোনো ধারণা পোষণকারী মনে করতে পারে যে তিনি রাজাদের ন্যায় অন্য কোনো জাগতিক উদ্দেশ্যে নিজের সঙ্গীদের হত্যা করছেন; বর্তমান সময়ে এই বিষয়টি আর নেই।)(৩)

তিনি আরও বলেন:

(সুতরাং যেখানেই মুনাফিকের প্রভাব বিদ্যমান থাকবে এবং তার ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে তার বেঁচে থাকার চেয়ে বড় ফিতনার আশঙ্কা থাকবে, তখন আমরা এই আয়াতের ওপর আমল করব: "তাদের কষ্ট দেয়া বর্জন করো" [আল-আহযাব: ৪৮]; যেমনটি আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে অক্ষম হলে করে থাকি।)

---

(১) ইকমালুল মুআল্লিম, কাযী ইয়াদ ৭/৩২৭।
(২) দেখুন: আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিসে মুসলিম ১৯/৪৭, আয-যাখীরা ১২/৩৯, শারহুন নাওবী আলা সহীহ মুসলিম ১৫/১০৮, আস-সারিমুল মাসলুল ৩/৯০০ এবং ২/৪১৪, ফাতহুল বারী ৮/৩৬৬। যেমনটি কোনো কোনো আলেম উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলকে গালি দেওয়ার বিষয়টি ক্ষমা করা রাসূলের অধিকার ছিল, কিন্তু তাঁর পরে আর কারো জন্য তাঁর গালিকারীকে ক্ষমা করা বৈধ নয়। দেখুন: আস-সারিমুল মাসলুল ২/৪২১, যাদুল মাআদ ৩/৪৪১, ৩/৫৬৮ এবং ১/৬৫।
(৩) আস-সারিমুল মাসলুল ৩/৬৮১।

আমরা তাদের থেকে বিরত থাকা এবং ক্ষমা করার আয়াতের ওপর আমল করেছি। আর যখন শক্তি ও সম্মান অর্জিত হয়েছে, তখন আমাদের সম্বোধন করা হয়েছে তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: **“কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো”** [আত-তাওবা: ৭৩]। সুতরাং এটি স্পষ্ট করে যে, আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যার নিফাক (কপটতা) প্রকাশ পেয়েছে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে; কারণ তাঁর পরে আর কোনো নসখ (রহিতকরণ) নেই।(১)

দ্বিতীয়ত: কাবা পুনর্নির্মাণ পরিত্যাগ করা।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাতীম (আল-জাদার) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন: (এটি কি ঘরের অংশ? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি বললাম: তাহলে তারা কেন এটাকে ঘরের অন্তর্ভুক্ত করেনি? তিনি বললেন: তোমার সম্প্রদায়ের কাছে অর্থ সংকুলান হয়নি। আমি বললাম: তার দরজাটি উঁচুতে হওয়ার কারণ কী? তিনি বললেন: তোমার সম্প্রদায় এমনটি করেছে যাতে তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করাতে পারে এবং যাকে ইচ্ছা বাধা দিতে পারে। আর যদি তোমার সম্প্রদায় জাহেলিয়াত থেকে নিকটতম সময়ের না হতো এবং আমি যদি ভয় না করতাম যে তাদের অন্তর একে অপছন্দ করবে, তবে আমি হাতীমকে ঘরের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং এর দরজাকে মাটির সাথে মিলিয়ে দিতাম)।(২)

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ভিত্তির ওপর কাবা পুনর্নির্মাণ পরিত্যাগ করা ছিল মক্কাবাসীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইসলামে তাদের নতুন আগমনের কারণে। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, এর ফলে তাদের মাঝে অনীহা, আতঙ্ক ও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যা তাদের দ্বীনের ক্ষতি করবে; কেননা তাদের অন্তরে আল্লাহর ঘরের যে সম্মান বদ্ধমূল ছিল এবং তারা ঘরটিকে যে অবস্থায় দেখে বড় হয়েছে সেটির কারণে।(৩)

আর এই হাদিসটি ঐ হাদিসের পরিপূরক যেখানে বলা হয়েছে: (মানুষ যেন একথা না বলে যে মুহাম্মদ তার সাথীদের হত্যা করেন)। সুতরাং এটি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ফাসাদকে (ক্ষতি) বিবেচনা করে, আর প্রথমটি (কাবার বিষয়টি) দ্বীনে প্রবেশ না করার ফাসাদকে বিবেচনা করে।

ইবরাহিমের ভিত্তির ওপর কাবা পুনর্নির্মাণের বিধান:

আলেমদের অনেকেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইবরাহিমের ভিত্তির ওপর কাবা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি—

(১) আস-সারিমুল মাসলুল ৩/ ৬৮৩।
(২) বুখারি (১৫৮৪) এবং মুসলিম (৪০১) এটি বর্ণনা করেছেন।
(৩) এই অর্থটি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আলেমদের বক্তব্য দেখুন: মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা, আল-বাজী ২/ ২৮২; সহীহ মুসলিমের ওপর নববীর ব্যাখ্যা ৯/ ৯৮; আত-তাওদীহ লি-শারহিল জামিইস সাহীহ ১১/ ৩০২; আসারুল মুআল্লিমী ১৬/ ৪৮৬।

...আবশ্যকীয় ফরজসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এটি শরিয়তসম্মত মুস্তাহাব বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত (১), কারণ কাবাকে বর্তমান অবস্থায় রেখে দিলে শরিয়তের বিধানসমূহ প্রভাবিত হবে না।

এই কারণেই ইমাম বুখারি এই হাদিসটির শিরোনাম দিয়েছেন: **(অধ্যায়: মানুষের সঠিক বুঝের অভাবের আশঙ্কায় কোনো কোনো ঐচ্ছিক বিষয় বর্জন করা, পাছে তারা আরও কঠিন কোনো ফিতনায় পতিত হয়)** (২)। সুতরাং তিনি একে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, আবশ্যকীয় নয়।

আল-বাজি বলেন:

(যদিও স্থাপত্যের মাধ্যমে একে পূর্ণাঙ্গরূপে বেষ্টন করা ফরজ ছিল না এবং শরিয়তের এমন কোনো স্তম্ভও ছিল না যা এটি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হবে না; বরং তাওয়াফের সময় বিশেষভাবে একে বেষ্টন করা ওয়াজিব এবং এটি বর্তমান অবস্থায় বহাল রেখেই সম্ভব) (৩)।

ইব্রাহিম (আ.)-এর ভিত্তির ওপর কাবার পুনর্নির্মাণ যে মুস্তাহাব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তা তিনটি কারণ দ্বারা সুনিশ্চিত হয়:

প্রথমত: কাবা সংশ্লিষ্ট বিধান ও ইবাদতসমূহ ইব্রাহিম (আ.)-এর ভিত্তির ওপর কাবার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর যার বর্জনের ফলে কোনো ওয়াজিব কাজ বাদ পড়ে না, তার পুনর্নির্মাণ ওয়াজিব হয় না।

দ্বিতীয়ত: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধা দূর হওয়ার পর তা পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেননি। যদি এটি আল্লাহর ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ওয়াজিব বিষয় হতো, তবে বিদ্যমান অনিষ্টের কারণ দূর হওয়ার পর তা সংশোধন করা ওয়াজিব হতো। সুতরাং নির্মাণের প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী শরয়ি দলিলের অনুপস্থিতির সাথে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৌন সম্মতি প্রমাণ করে যে এটি ওয়াজিব নয়।

ইবনে তাইমিয়া বলেন:

(একথা বলা যাবে না যে, কুরাইশদের নির্মাণ হারাম ছিল যেহেতু তারা ইব্রাহিমের ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। ফলে এই সুরতে পরিবর্তন করা বৈধ হয়েছিল। কারণ বিষয়টি যদি এমনই হতো, তবে পরিবর্তন করা ওয়াজিব হতো। অথচ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম...)

---

(১) দেখুন: শরহু সহিহিল বুখারি ১/২০৫, আর-রাফেয়ি কৃত শরহু মুসনাদিশ শাফেয়ি ২/৩৪৮, সহিহ মুসলিমের ওপর নববি-র ব্যাখ্যা ৯/৮৯, ইবনুল মুলাক্কিন কৃত আত-তাওদিহ লি শরহিল জামিইস সহিহ ৩/৬৫০, আইনি কৃত উমদাতুল ক্বারি ২/২০৪, শরহুজ যুরক্বানি আলাল মুয়াত্তা ২/২৪৮, আসারুল মুয়াল্লিমি ১৬/৪৮৫ এবং অন্যান্য মতামত যা গ্রন্থের মূল পাঠে উল্লেখ করা হবে।
(২) এটি বুখারি বর্ণনা করেছেন (১২৬)।
(৩) আল-মুনতাক্বা শরহুল মুয়াত্তা ২/২৮২। ইবনুল মুলাক্কিন আত-তাওদিহ লি শরহিল জামিইস সহিহ ১১/৩০২-এ এই পাঠটি উদ্ধৃত করেছেন।

...যাতে তিনি তা অনুমোদন করেন। যখন তিনি তা অনুমোদন করলেন, তখন এটি জনস্বার্থে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং জনস্বার্থে পরিবর্তনের বৈধতা নির্দেশ করল। অতএব, এই দুটির মধ্যে যেটি অধিক কল্যাণকর, সেটিই পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (১)।

তৃতীয়ত: নবী ﷺ-এর বরিষ্ঠ সাহাবীগণ এটি করেননি, যদিও তাঁরা ওয়াজিবসমূহ পালনে চরম আগ্রহী ছিলেন এবং আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করতেন না। অথচ তাঁদের যুগে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছিল এবং মানুষের অন্তরে ঈমান

মজবুত হয়েছিল।

এজন্যই সহীহ বুখারীতে আসওয়াদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: (ইবনে যুবাইর আমাকে বললেন, আয়েশা আপনার কাছে অনেক গোপন কথা বলতেন, তিনি আপনাকে কাবা সম্পর্কে কী বলেছেন? আমি বললাম: তিনি আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন: হে আয়েশা! তোমার কওম যদি নতুন করে কুফর ত্যাগকারী না হতো, তবে আমি কাবা ভেঙে ফেলতাম এবং এতে দুটি দরজা তৈরি করতাম: একটি দিয়ে মানুষ প্রবেশ করবে এবং অন্যটি দিয়ে বের হবে। অতঃপর ইবনে যুবাইর তা বাস্তবায়ন করেছিলেন) (২)।

সুতরাং ইবনে যুবাইর আসওয়াদকে জিজ্ঞাসা করার আগে এই হাদীসটি সম্পর্কে জানতেন না; আর এটি ছিল আয়েশা তাঁর কাছে যেসব কথা গোপনে বলেছিলেন তার অন্তর্ভুক্ত। আয়েশা নিজেও নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করার আগে হাদীসটি জানতেন না। যদি এটি শরয়ী ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে এর বিষয়টি সুস্পষ্ট হতো এবং এর অবস্থা গোপন থাকত না, যেন ফিতনা দূরীভূত হওয়ার পর এই ওয়াজিবটি পালন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের বিষয়গুলো এটি মুস্তাহাব হওয়ার স্বপক্ষেই প্রমাণ পেশ করে, ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নয়।

ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ভিত্তির উপর কাবা পুনর্নির্মাণে ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কর্মের হুকুম:

ইবনে যুবাইর কাবা ভেঙে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ভিত্তির উপর তা পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তা পুনরায় ভেঙে ফেলেন। আলেমগণ ইবনে যুবাইর-এর অবস্থান সঠিক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, এই হাদীসটি ইবনে যুবাইর-এর কর্ম সঠিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে; তবে পরিস্থিতি পরিবর্তনের পর তিনি তা পরিবর্তন করা অপছন্দ করেছেন (৩)।

(১) জামেউল ফুসুল, প্রথম সংকলন, পৃষ্ঠা: ৩১৪।
(২) এটি বুখারী (১২৬) বর্ণনা করেছেন।
(৩) তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ইবনে কাসীর ১/৪৪১।

এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মাঝে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ বিষয়ে আলীর সাথে একমত হননি, যেমনটি ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে। তিনি মনে করতেন যে, বায়তুল্লাহ যে অবস্থায় আছে সেভাবেই যেন রাখা হয় এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একে যে অবস্থায় অনুমোদন দিয়েছেন তার ওপর রাখা হোক।

ইবনে তাইমিয়্যাহ এই মতবিরোধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

“অতঃপর ইবনে আল-যুবাইর যখন শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন তিনি এ বিষয়ে মানুষের সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের কেউ কেউ এতে জনকল্যাণ দেখতে পেলেন, আবার কেউ কেউ তাকে এটি না করার পরামর্শ দিলেন। তারা বললেন: এই কাবা ঘরটিই তো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বর্তমান ছিল এবং এর উপরেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। এটি ইবনে আব্বাস ও একটি দলের অভিমত ছিল। ফকীহগণ এই বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। তাদের কেউ কেউ এটিকে বর্তমান অবস্থায় বহাল রাখার পক্ষপাতী, যেমন ইবনে আব্বাসের অভিমত। এটি ইমাম মালিক ও অন্যদেরও উক্তি। বর্ণিত আছে যে, হারুনুর রশীদ যখন ইবনে আল-যুবাইরের মতো কাজ করার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন, তখন তাকে তা না করার পরামর্শ দেওয়া হলো। তিনি দেখলেন যে, এটি শাসকদের মতপার্থক্যের কারণে কাবার পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে—একজন ইবনে আল-যুবাইরের মতো নির্মাণের জন্য একে ধ্বংস করবে, আবার অন্যজন মনে করবে একে পূর্বের ন্যায় ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইবনে আল-যুবাইরের কাজকে সঠিক মনে করেন। বলা হয় যে,

ইমাম শাফিঈ এই মতের দিকেই ঝুঁকেছেন।” (১)

অতঃপর কাবার ক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ না করা এবং এর পবিত্রতা রক্ষার ওপর বিষয়টি স্থির হয়। ইমাম আল-কুরতুবী বলেন: **“মানুষ ইমাম মালিকের এই সিদ্ধান্তটিকে পছন্দ করেছেন এবং সে অনুযায়ী আমল করেছেন। ফলে এটি ইজমার (সর্বসম্মত ঐকমত্য) মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ধ্বংস করা বা পরিবর্তনের মাধ্যমে কাবার ওপর হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নয়।”** (২)

দ্বীন থেকে মানুষের বিমুখ হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে শারঈ রাজনীতির (সিয়াসাহ শারইয়্যাহ) সীমানা:

এই হাদিস দুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী-রাজনৈতিক মূলনীতির ওপর প্রমাণ পেশ করে, আর তা হলো—মানুষ যেন দ্বীন থেকে বিমুখ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। সুতরাং একে নির্ভরযোগ্য শারঈ মাকসাদগুলোর (উদ্দেশ্যসমূহ) অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো...

(১) আর-রাদ্দু আলাল মানতিকিয়্যিন ৫০৩ - ৫০৪; আরও দেখুন: জামিউল ফুসুল, প্রথম সংকলন ৩১৪ - ৩১৫; মুখতাসার তিরমিজি, লিত-তুফী ৪ / ২২৬।
(২) আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীসি মুসলিম ৩ / ৪৩৯; আরও দেখুন: আল-ফাতাওয়াল ফিকহিয়্যাহ আল-কুবরা, লিল-হাইতামী ১ / ১৩৭।

মফসাদাহর (ক্ষতি) সেই পরিমাণ যা এই মাসলাহাতের (কল্যাণ) ওপর প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। দুটি মাসলাহাতের মধ্যে অধিক অগ্রগণ্যটিকে প্রাধান্য দেওয়া কিংবা দুটি মফসাদাহর মধ্যে উচ্চতরটিকে প্রতিহত করার নীতিটি কোনো বিতর্কের বিষয় নয়; বরং যা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার দাবি রাখে তা হলো, কোনো মফসাদাহকে ‘উচ্চতর’ হিসেবে গণ্য করার মানদণ্ড কী, যার কারণে তার চেয়ে কমতর মফসাদাহটি সম্পাদন করা বৈধ হয়ে যায়।

মানুষের অনীহার কারণে কিছু বিধান বর্জন করার সীমা নির্ধারণের জন্য শরীয়তের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা এবং সেখানে এই বিষয়ের প্রভাব কতটুকু তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারি:

১- বেশ কিছু বিধানের ক্ষেত্রে নবুওয়াতের যুগেও একদল মানুষের মধ্যে অনীহা তৈরির মতো পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল—যদিও এর মাত্রা ছিল ভিন্ন ভিন্ন—কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কারণে সেই বিধানগুলোর প্রয়োগ বর্জন করেননি। এর উদাহরণ হলো:

- হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) বণ্টনের ক্ষেত্রে, যা মুনাফিকদের পক্ষ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি কটূক্তি করার কারণ হয়েছিল। তখন এক ব্যক্তি বলল: "আমরা এদের চেয়ে এর বেশি হকদার ছিলাম।" বর্ণনাকারী বলেন: বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কানে পৌঁছালে তিনি বললেন: "তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে করো না, অথচ আমি তাঁর কাছে বিশ্বস্ত যিনি আকাশের উপরে আছেন? সকাল-সন্ধ্যায় আমার কাছে আকাশের খবর আসে।" বর্ণনাকারী বলেন: তখন কোটরাগত চক্ষু, ফোলা গাল, উঁচু কপাল, ঘন দাড়ি, মুণ্ডিত মস্তক এবং পরিহিত বস্ত্র (লুঙ্গি) উঁচিয়ে পরিহিত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহকে ভয় করুন।" তিনি বললেন: "তোমার জন্য আফসোস! আমি কি পৃথিবীবাসীর মধ্যে আল্লাহকে ভয় করার সবচেয়ে বেশি হকদার নই?" (১)

- বনু নাযীর যুদ্ধে ইয়াহুদীদের খেজুর গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার ক্ষেত্রে; যেমনটি ‘সহীহাইনে’ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)

থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনু নাযীরের খেজুর গাছ কেটেছিলেন এবং পুড়িয়েছিলেন। আর এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে: **"তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছ অথবা যেগুলোকে তাদের কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ..."** [সূরা আল-হাশর: ৫] (২)। কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে খেজুর গাছ কাটার প্রতি আপত্তির কারণে, যেহেতু তারা একে 'ফাসাদ' (বিপর্যয়) বলে গণ্য করেছিল (৩)।

---

(১) বুখারী (৭৪৩২) ও মুসলিম (১৪৪) এটি বর্ণনা করেছেন, শব্দসমূহ তাঁর (মুসলিমের)।
(২) বুখারী (২৩২৬) ও মুসলিম (৩০) এটি বর্ণনা করেছেন।
(৩) দেখুন: তাফসীরে তাবারী ২৩/ ২৭২।

- আর কাব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনায়, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার প্রতিফল হিসেবে, এমনকি কিছু লোক এই কাজটির সমালোচনা করেছে এবং একে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেছে। আবায়া ইবনে রিফাআ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুয়াবিয়ার নিকট কাব ইবনে আশরাফের হত্যার কথা উল্লেখ করা হলো, তখন ইবনে ইয়ামিন বললেন: তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়েছে। তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ বললেন: হে মুয়াবিয়া! তোমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দেওয়া হচ্ছে আর তুমি তা অস্বীকার করছ না?! আল্লাহর শপথ! তোমার আর আমার মাথা কখনোই একই ছাদের নিচে থাকবে না, এবং আমি এই ব্যক্তির রক্ত না ঝরানো পর্যন্ত তাকে ছাড়ব না। (১) (২)

২- আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাহেলিয়াতের অনেক অভ্যাস পরিবর্তন করেছিলেন যা তারা পবিত্র মনে করত এবং তার বিরোধিতা করাকে গুরুতর বিষয় বলে গণ্য করত। এর মধ্যে রয়েছে:

- হজ্জের ক্ষেত্রে তাদের রীতিনীতির নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বিরোধিতা। কুরাইশ এবং যারা তাদের ধর্ম অনুসরণ করত তারা মুজদালিফায় অবস্থান করত, আর তাদের 'হুমস' বলা হতো। অন্যদিকে অন্যান্য আরবরা আরাফাতে অবস্থান করত। যখন ইসলাম আসল, তখন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আরাফাতে যান এবং সেখানে অবস্থান করেন, তারপর সেখান থেকে প্রস্থান করেন। (৩) আর তিনি তাদের হজ্জের মাসগুলোতে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন, অথচ জাহেলিয়াতের যুগে তারা এটাকে যমীনের বুকে সবচেয়ে বড় পাপাচার মনে করত। (৪) এছাড়া আরও অনেক বিষয়।

- যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বিবাহ। তিনি যায়েদ ইবনে হারিসাহর স্ত্রী ছিলেন, যাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে কেউ কাউকে পালকপুত্র গ্রহণ করলে মানুষ তাকে পালক পিতার নামেই ডাকত এবং সে তার উত্তরাধিকারী হতো। অবশেষে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন: **"তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো।"** [আল-আহযাব: ৫]। (৫)

৩- একইভাবে শরীয়ত এমন কিছু বিধান ফরয করেছিল যা কিছু মানুষের মধ্যে বিমুখতা সৃষ্টি করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে:

- কিবলা পরিবর্তন। আল্লাহ তাঁর কিতাবে এর হিকমত উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: **"আপনি ইতিপূর্বে যে কিবলার অনুসারী ছিলেন, আমি তা কেবল এজন্যই নির্ধারণ করেছিলাম যাতে আমি জেনে নিতে পারি যে, কে রাসূলের আনুগত্য করে আর কে তার পিঠ ফিরিয়ে ফিরে যায়।"** [আল-বাকারাহ: ১৪৩]।

(১) কাব ইবনে আশরাফ হত্যার ঘটনাটি বুখারী (৪০৩৭) ও মুসলিম (১১৯) বর্ণনা করেছেন।
(২) শারহু মুশকিলিল আসার, তাহাবী ১/১৯০-১৯১; দালায়েলুন নুবুওয়াহ, বায়হাকী ৩/১৯৩।
(৩) বুখারী (১৬৬৫) ও মুসলিম (১৫১) বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীস থেকে।
(৪) বুখারী (১৫৬৪) ও মুসলিম (১৯৮) বর্ণনা করেছেন।
(৫) বুখারী (৫০৮৮) ও মুসলিম (৬২) বর্ণনা করেছেন। মুসলিমে জাহেলিয়াতের উত্তরাধিকারের বিধানের বিষয়টি উল্লেখ নেই।

এই পরীক্ষার প্রভাবে কিছু মানুষের ধর্মত্যাগের (মুরতাদ হওয়ার) ঘটনা ঘটেছিল এবং অনেক মুনাফিক তাদের নিফাক প্রকাশ করে দিয়েছিল। মুশরিকরা বলেছিল: মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে মুমিনদের জন্য এটি ছিল এক ফিতনা (পরীক্ষা) ও পরিশুদ্ধির মাধ্যম (১)।

অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাফিরদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্তে দুর্বল মুমিনদের মজলিস থেকে তাড়িয়ে দিতে তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নিষেধ করেছেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছয়জন ব্যক্তি ছিলাম। তখন মুশরিকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল: এদের তাড়িয়ে দিন, যাতে তারা আমাদের ওপর দুঃসাহস দেখাতে না পারে। তিনি (সাদ) বলেন: আমি ছিলাম, ইবনে মাসউদ, হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং আরও দুই ব্যক্তি যাদের নাম আমি বলছি না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মনে আল্লাহ যা চাইলেন তা উদিত হলো এবং তিনি মনে মনে বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা এই আয়াত নাযিল করলেন: "আর যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে এবং তাঁর চেহারা কামনা করে, আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না" (২)। মূলত এই দুর্বল মুমিনদের উপস্থিতির কারণে কাফিররা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মজলিসে উপস্থিত হতে অনীহা বোধ করত। তাই তারা চেয়েছিল তাদের জন্য যেন বিশেষ একটি মজলিস থাকে, যার মাধ্যমে আরবরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানতে পারে (৩)।

সুতরাং এগুলো এমন বহু বিষয়ের প্রমাণ যেখানে শরীয়ত মানুষের অনীহা বা বিমুখ হওয়ার মফসাদাত (ক্ষতি)-কে ধর্তব্য মনে করেনি, চাই তা ইসলামে প্রবেশের ক্ষেত্রে হোক বা ইসলাম ত্যাগের ক্ষেত্রে।

এই নিয়মটি প্রয়োগের নীতিমালা:

আহলে ইলমদের পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে—যেখানে বলা হয়েছে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ভিত্তির ওপর কা’বা পুনর্নির্মাণ করা ওয়াজিব ছিল না—প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের অনীহা বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করার বিষয়টি এখানে মুস্তাহাব কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় বিষয়াবলির সাথে নয়। অতএব, ওয়াজিব বিধানসমূহ পালনের ক্ষেত্রে মানুষের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাই হলো মূলনীতি। এর কারণসমূহ হলো:

১- মূলনীতি হলো মানুষের এই অনীহা বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ওপর ওয়াজিব পালনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কেননা এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ক্ষতি কোনোভাবেই ওয়াজিব পালনের উপকারের চেয়ে বড় নয়।

(১) দেখুন: তাফসীর তাবারী ৩/১৫৬।
(২) এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং (২৪১৩)।
(৩) দেখুন: তাফসীর তাবারী ১১/৩৭৬।

পৃষ্ঠা 139

২- ওয়াজিব পালনের কল্যাণ সুনিশ্চিত, আর মানুষের অনীহার অনিষ্ট কল্পনাপ্রসূত। সুতরাং কল্পনাপ্রসূত বিষয়কে সুনিশ্চিত বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

৩- কারণ, ওয়াজিব বর্জন না করেই ওয়াজিব প্রতিষ্ঠার কল্যাণ অর্জন এবং অনীহার অনিষ্ট দূর করার মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব।

৪- ওয়াজিব প্রতিষ্ঠা করাই অনীহার অনিষ্ট দূর করার অন্যতম কারণ। ওয়াজিব বর্জনের মাধ্যমে অনীহার অনিষ্ট দূর করা সম্ভব নয়। কেননা অনীহা যদি স্বয়ং ওয়াজিবের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে, তবে তা বর্জন করতে থাকলে মানুষের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল হবে যে এটি একটি অনিষ্টকর বিষয় এবং তারা এর কল্যাণ বুঝতে পারবে না। ফলে যখন তারা জানতে পারবে যে এটি শরীয়তের বিধান, তখন তাদের অনীহা আরও বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে, যদি ওয়াজিবটি প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং মানুষের মন তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তবে তাদের অন্তরে থাকা অনীহা দূর হয়ে যাবে।

বিধানসমূহ প্রয়োগের স্বাভাবিক প্রেক্ষাপটে এটি প্রযোজ্য। তবে অনীহা যদি এমন তীব্র রূপ ধারণ করে যা স্বাভাবিক মাত্রার বাইরে চলে যায় এবং শরীয়ত যা উপেক্ষা করে তার চেয়েও বেশি হয়—যেমন যদি এর ফলে অনেক মানুষের ধর্মত্যাগী হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং মানুষের দ্বীন বা দুনিয়াতে বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, এবং অন্য কোনো উপায়ে তা দূর করা সম্ভব না হয়—তবে এক্ষেত্রে সেই ব্যতিক্রমী নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই অনিষ্ট বিবেচনা করে ওয়াজিব প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত করার কথা বলা হয়। তবে এখানে ওয়াজিব বর্জন কেবল অনীহার অনিষ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা অনীহার এমন এক চরম স্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট যা নিছক অনীহা অতিক্রম করে আরও বৃহত্তর অনিষ্টের দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণে, মুসলিম সমাজ যখন স্থিতিশীল থাকে এবং আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন দণ্ডবিধি (হুদুদ) প্রয়োগ এবং বিধি-বিধান পালনে বাধ্য করার ক্ষেত্রে মানুষের অনীহা বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে না। বরং এটি তখনই দুর্বল হয়ে পড়ে যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সক্ষমতা দুর্বল থাকে। এমতাবস্থায় এর কারণ হবে আনুষঙ্গিক অনিষ্টের সাথে সম্পর্কিত, মূল বিধান প্রয়োগের সাথে নয়। এটি বিধান প্রতিষ্ঠায় অক্ষমতা অথবা নিজের ক্ষতির আশঙ্কায় কিছু ওয়াজিব বর্জনের মতোই।

---

(১) ইবনুল আরাবী 'যুদ্ধে হাত কাটা হবে না' শীর্ষক হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি কিছু আলেমের অভিমত উল্লেখ করেছেন যারা অপরাধীর শত্রুপক্ষ বা দারুল হারবে পালিয়ে যাওয়ার অনিষ্ট বিবেচনা করার কথা বলেছেন। এরপর তিনি এর ওপর আপত্তি জানিয়ে বলেছেন: "শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি আছে বলে আমার জানা নেই, আর হুদুদ বা দণ্ডবিধি কায়েম করা হয়..."

পৃষ্ঠা 140

নবুওয়াতী রাষ্ট্রনীতির (সিয়াসাহ নাবাবিয়্যাহ) অন্তর্গত কতিপয় মূলনীতি ও বিশেষ দৃষ্টান্তসমূহ:

তৃতীয়: কা'ব ইবনুল আশরাফের হত্যার ঘটনায় যা বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কিছু বলার অনুমতি দিয়েছিলেন যখন তিনি তাকে কা'ব ইবনুল আশরাফকে হত্যার নির্দেশ দেন। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন: "কে আছ কা'ব ইবনুল আশরাফের (প্রতিবিধানের) জন্য? কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে।" তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি পছন্দ করেন যে আমি তাকে হত্যা করি?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" মুহাম্মাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "তবে আমাকে (কিছু বলার) অনুমতি দিন যাতে আমি বলি (অর্থাৎ কৌশল অবলম্বন করি)।" তিনি বললেন: "বল।" (১)

এই ঘটনাটি 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বা শরয়ী রাষ্ট্রনীতির বেশ কিছু প্রমাণ ধারণ করে; যেমন: অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর ব্যাপারে অবস্থান, তার সাথে আচরণের ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থবোধক কথা (মা'আরীয) ব্যবহারের বিধান, নিরাপত্তার সংশয় এবং নবী ﷺ-কে গালি প্রদানকারীর শাস্তি।

এই কাহিনী থেকে 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ'-এর সাথে সবচেয়ে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট যে শিক্ষাগুলো পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ-কে কিছু বলার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর অনুমতি প্রদান। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ-র পক্ষ থেকে যা ঘটেছিল, তার ব্যাখ্যা ও স্বরূপ বিশ্লেষণে উলামায়ে কিরাম দুটি মত প্রদান করেছেন:

প্রথম মত: এটি ছিল দ্ব্যর্থবোধক বা পরোক্ষ প্রকাশ (তা'রীয), কোনো স্পষ্ট মিথ্যা নয়।

কাজী আয়ায বলেন: (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ-র উক্তি: "আমাকে অনুমতি দিন যাতে আমি বলি!" এবং নবী ﷺ-এর উত্তর: "বল" — এটি জরুরত বা প্রয়োজনের খাতিরে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলার বৈধতার প্রমাণ। আর জবাবদিহিতা হবে নিয়ত ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে। তাঁর উক্তি: "তিনি আমাদের পরিশ্রান্ত করে তুলেছেন" — এর বাহ্যিক অর্থ হলো কষ্ট দেওয়া, কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ অর্থ সঠিক; কারণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে কষ্ট স্বীকার করা শরীয়তসম্মত এবং এর জন্য সওয়াব রয়েছে। জিহাদ, সালাত, সদকা এবং অন্যান্য সকল নেক কাজই প্রশংসনীয় শ্রম ও কষ্টের অন্তর্ভুক্ত...)

= তার অধিবাসীদের ওপর যা ছিল তা-ই ছিল। আর এই ধরণের তাকিয়া ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়, বরং এটি সাধারণত পরিস্থিতির জটিলতা ও গোত্রীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়। যেমনটি কোনো কোনো ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণ করতে বিলম্ব করেছিলেন পরিস্থিতির শান্ত হওয়ার প্রতীক্ষায়, যাতে কোনো গোত্রীয় দাঙ্গা সৃষ্টি না হয়। দ্রষ্টব্য: আরিজাতুল আহওয়াযি ৬/২৩১-২৩২; এবং দেখুন: মাত্বালিউত তামাম এবং নাসাইহুল আনাম ওয়া মানজাতুল খাওয়াস ওয়াল আওয়াম, লিল শাম্মাউল হিন্তাতি ১৫২।
(১) এটি বুখারী (৪০৩৭) ও মুসলিম (১১৫) বর্ণনা করেছেন।

...এবং ইবাদত-বন্দেগির ব্যাপারে শোরগোল করা নিন্দনীয়।(১)

দ্বিতীয় মত: কোনো কোনো আলেম মনে করেন যে, যা ঘটেছে তা ছিল সরাসরি অবমাননা।

এই মত অনুযায়ী, সেই উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট কুফরি বাক্য উচ্চারণ করার বিষয়ে একটি শক্তিশালী আপত্তি দেখা দেয়। তাঁরা এই আপত্তির উত্তর কয়েকভাবে দিয়েছেন, যার মধ্যে দুটি দিক সবচেয়ে শক্তিশালী:

প্রথম দিক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অনুমতি দিয়েছিলেন, তাই এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

সাথেই নির্দিষ্ট।(২)

দ্বিতীয় দিক: যদি মুসলিমদের কোনো বড় স্বার্থ এবং তীব্র প্রয়োজন থাকে তবে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা জায়েজ, যা বাধ্য হওয়ার (ইকরাহ) বিধানের পর্যায়ভুক্ত হবে।(৩)

এর জবাবে বলা যেতে পারে: মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেওয়া অনুমতির বিষয়টি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে (সম্ভাব্য), এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আর দলীলের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট বা সম্ভাব্য বিষয়কে সাধারণ নিয়মে পরিণত করা যায় না। এটি কুফরি বাক্য উচ্চারণের অনুমতি হতে পারে, আবার দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের (তায়ীয) অনুমতিও হতে পারে। সুতরাং এতে যথেষ্ট অকাট্য প্রমাণ নেই।

চতুর্থত: তাঁর সীরাতে পরামর্শের (শুরা) ঘটনাবলি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিধান হলো পরামর্শের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। এটি তাঁর সীরাতে একটি বহুল প্রচলিত নববী রাজনৈতিক কর্মপন্থা। এমনকি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে অন্য কাউকে তাঁর সাহাবীদের সাথে অধিক পরামর্শ করতে দেখিনি।”(৪)

(১) ইকমালুল মুল্লিম ৬/১৭৭; দেখুন: আস-সীয়ারুল কাবীর ১/২৭১, সহীহ মুসলিমের শারহ আন-নববী ১২/১৬১, আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীসি মুসলিম ৩/৬৬১, উমদাতুল কারী ১৪/২৭৭, ফাতহুল বারী ৫/১৪৪ এবং ৬/১৬০, আসারুল মুআল্লিমী ১৯/২৬৩।
(২) আল-ইনজাদ ফী আবওয়াবিল জিহাদ, ইবনুল মুনাসিফ ২৩৫।
(৩) আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর লিস-সুবকী ২/১৩২।
(৪) আহমদ তাঁর মুসনাদে এটি বর্ণনা করেছেন (১৯২৩১) এবং মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (৯৭২০), ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে (৪৮৭২) এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে (৫/৩৯৩) বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে এটি মুনকাতি (সূত্রবিচ্ছিন্ন)।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে (১) এবং ওহুদ যুদ্ধের দিন (২) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। আর তাঁর (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) পক্ষ থেকে একাধিক স্থানে লোকজনকে “আমাকে পরামর্শ দাও” বলে উৎসাহিত করার বিষয়টি বারবার ঘটেছে (৩)। তিনি পরামর্শের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু সাহাবীকেও বিশেষত্ব দিতেন; যেমন বদর যুদ্ধের দিন যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে তিনি আবু বকর ও উমরের সাথে পরামর্শ করেছিলেন (৪)। আর মদিনার ফলমূলের অর্ধেক গাতফান গোত্রকে প্রদানের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য তিনি দুই সা’দকে (সা’দ ইবনে মুআয ও সা’দ ইবনে উবাদাহ) নির্দিষ্ট করেছিলেন (৫)।

তাঁর (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) কর্মনীতিতে এই বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশের কারণে সাহাবীগণ স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর কাছে পরামর্শ পেশ করতেন। যেমন—সা’দ ইবনে মুআয দ্রুত এগিয়ে এসে বদর যুদ্ধের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একটি যুদ্ধকালীন ছাউনি নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছিলেন (৬)। হুবাব (ইবনুল মুনযির) বদর যুদ্ধের দিন যুদ্ধের স্থান পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন (৭)। উম্মে সালামাহ হুদায়বিয়ার দিন পরামর্শ দানে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মাথা মুণ্ডন করেন (৮)।

পরামর্শ প্রদান কেবল রাজনৈতিক অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ ছিল না; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইফকের (মিথ্যা অপবাদের)

ঘটনায় আলী ও উসামার সাথে পরামর্শ করেছিলেন (৯), যা ছিল একটি একান্ত ব্যক্তিগত পারিবারিক ঘটনা।

নবীজীর কর্মনীতিতে পরামর্শের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

সুতরাং আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্মনীতিতে পরামর্শের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নলিখিত দিকগুলো থেকে সারসংক্ষেপ করতে পারি:

---

(১) আত-তাবারী এটি তাঁর ইতিহাসে (১১/ ২২০) এবং ইবনে হিশাম ‘আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ’ (৩/ ১৬২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
(২) দেখুন: সীরাতে ইবনে হিশাম ২/ ৬৩।
(৩) যেমন ইফকের ঘটনার বর্ণনায় তাঁর পরামর্শ প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে; এটি বুখারী (৪৭৫৭) ও মুসলিম (১৩৩৩) বর্ণনা করেছেন। আর হুদায়বিয়ার দিনের ঘটনা ইমাম আহমাদ (১৯২৩১), নাসায়ী (৮৫২৮) বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান (৪৮৭২) একে সহীহ বলেছেন।
(৪) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন (১৭৬৩)।
(৫) দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী (১৩৪১), আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ লি ইবনি হিশাম ৪/ ১৮১।
(৬) বায়হাকী এটি দালায়েলুন নুবুওয়াহ গ্রন্থে (৯২০) বর্ণনা করেছেন; দেখুন: আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ লি ইবনি হিশাম ৩/ ১৬৮।
(৭) বায়হাকী ‘দালায়েলুন নুবুওয়াহ’ (৩/ ৩৫) এবং হাকিম ‘আল-মুসতাদরাক’ (৫৮৫৪) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন; আরও দেখুন: ‘আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ওয়া আখবারুল খুলাফা’, ইবনে হিব্বান (১/ ১৬৬), আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ লি ইবনি হিশাম ৩/ ১৬৮।
(৮) বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (২৭৩১)।
(৯) বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (৭৩৬৯)।

- শুরা কেবল রাজনৈতিক দিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও শুরার উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল।

- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিটি পরিস্থিতিতে অবস্থা অনুযায়ী পরামর্শ গ্রহণ করতেন; কখনো তিনি তাঁর বিশেষ সাহাবীদের একটি দলের সাথে পরামর্শ করতেন, আবার কখনো সকল সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করে শুরার পরিধি বিস্তৃত করতেন।

- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো বিষয়ের প্রস্তাব প্রদান বা নির্দিষ্ট কোনো কাজের আপত্তির ক্ষেত্রে শুরু থেকেই মানুষের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করতেন।

- শুরা কেবল বৈধ (মুবাহ) বিষয়সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর শরিয়তে যা হারাম করা হয়েছে, তাতে কোনো শুরার অবকাশ নেই। এই কারণেই তিনি উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি সেই মাখজুমী মহিলার জন্য সুপারিশ করেছিলেন, যে আসবাবপত্র ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করত। তখন তিনি তাকে বলেছিলেন: **"তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধিসমূহের (হদ) মধ্য হতে কোনো একটির ব্যাপারে সুপারিশ করছ?"** (১)।

- শুরা পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি ছিল না, বরং এর মাধ্যমে সর্বাধিক সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হতো।

নববীয় রাজনীতির কিছু মূলনীতি ও নিদর্শনাবলী:

পঞ্চম: তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) রাজনীতিতে ক্ষমার ঘটনাবলী।

ক্ষমা ছিল তাঁর (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) আদর্শের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

- তিনি সাহাবীদের মধ্য থেকে যারা ভুল করতেন তাদের ক্ষমা করে দিতেন, যেমন তিনি হাতেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ক্ষমা করেছিলেন যখন তিনি মুশরিকদের নিকট পত্র লিখেছিলেন (২)।

- তিনি পল্লীবাসীদের (বেদুইন) মধ্য থেকেও যারা ভুল করত তাদের ক্ষমা করে দিতেন, যেমন তিনি সেই পল্লীবাসীকে ক্ষমা করেছিলেন যে তাঁর চাদর ধরে সজোরে টান দিয়েছিল।

---

(১) বুখারী (৩৪৭৫) ও মুসলিম (১৬৮৮) এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) বুখারী (৬২৫৯) এটি বর্ণনা করেছেন।

...এক সজোরে হেঁচকা টান দিলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘাড়ের এক পাশে দাগ পড়ে গেল। অতঃপর সে বলল: হে মুহাম্মদ! আপনার কাছে আল্লাহর যে সম্পদ রয়েছে তা থেকে আমাকে দেওয়ার নির্দেশ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং হাসলেন, অতঃপর তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন (১)।

- তিনি তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন যে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তাদের একজনের সম্পর্কে তিনি বলেন: (আমি ঘুমন্ত থাকাবস্থায় এই ব্যক্তি আমার তলোয়ার খাপমুক্ত করেছিল, এমতাবস্থায় আমি জেগে উঠি যে তার হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার ছিল। সে আমাকে বলল: তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম: আল্লাহ। অতঃপর সে বসে পড়ল)। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনো শাস্তি দেননি (২)।

- তিনি মুনাফিকদের ক্ষমা করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) মুশরিকদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি আক্রমণকারী যুদ্ধরত কাফিরদেরও ক্ষমা করেছিলেন; ওহুদের যুদ্ধে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন: (আমি যেন নবী ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে দেখছি, তিনি কোনো একজন নবীর কাহিনী বর্ণনা করছেন, যাঁর কওম তাঁকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন: হে আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করে দিন, কেননা তারা জানে না) (৩)।

আয়েশা (রা.) যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনার ওপর কি ওহুদের দিনের চেয়েও কঠিন কোনো দিন এসেছিল? তিনি বললেন: (তোমার কওমের পক্ষ থেকে আমি যা ভোগ করার তা করেছি। আর তাদের পক্ষ থেকে আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল ‘আকাবাহর দিন’)।

তিনি যে চরম কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা সত্ত্বেও যখন পাহাড়ের ফেরেশতা তাঁর কাছে প্রস্তাব দিলেন যে তিনি তাদের ওপর দুই পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে পিষ্ট করে দেবেন, তখন নবী ﷺ বললেন: (বরং আমি আশা করি যে আল্লাহ তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন লোকদের বের করে আনবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না) (৪)।

শরয়ি রাজনীতিতে (সিয়াসাহ শরইয়্যাহ) ক্ষমার প্রভাব:

নবী ﷺ-এর অনুসৃত নীতি থেকে প্রাপ্ত এই নববী গুণটি শরয়ি রাজনীতির মহান তাৎপর্যসমূহ উন্মোচন করে। এটি এমন এক বিষয় যা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির দৃষ্টির সামনে রাখা আবশ্যক যারা...

---

(১) বুখারী (৫৮০৯)।
(২) বুখারী (৮৪৩)।
(৩) বুখারী (১৭৯২)।
(৪) বুখারী (৩২৩১) ও মুসলিম (১৭৯৫)।

তিনি সাধারণ রাজনীতির যেকোনো বিষয়ে তাঁর প্রিয়তম (সা.)-এর অনুসরণ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন; আর আমরা বিষয়টি নিম্নলিখিত অর্থগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট করতে পারি:

প্রথম অর্থ: ক্ষমা কেবল পূর্ণ ন্যায়বিচারের পরেই আসে। কারণ ক্ষমা হলো এমন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ ও ইহসান করা, যে ব্যক্তি শাস্তি ও প্রতিদানের যোগ্য। তবে আমরা এখানে কেবল ন্যায়বিচারেই সীমাবদ্ধ থাকব না; (কেননা এমন একটি শরিয়ত থাকা অপরিহার্য যা ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শাসনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে, আর সেই সাথে মানুষকে ক্ষমার প্রতি উৎসাহিত করা এবং অনুগ্রহ গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানানোও আবশ্যক, আর এটিই হলো ইসলামের শরিয়ত)(১)।

ক্ষমার ওপর গুরুত্বারোপ এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার অর্থ হলো আমরা ন্যায়বিচারের আবশ্যকতা ও তা প্রতিষ্ঠার বাধ্যবাধকতার গুরুত্বকেও অতিক্রম করেছি। সুতরাং ন্যায়বিচারের তুলনায় ক্ষমা হলো ফরজের বিপরীতে নফলের মতো, যা পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় অর্থ: ক্ষমা ও মার্জনা ভিত্তিক যে রাজনীতি, তা এই গুণের পূর্ণতা অর্জনে ততক্ষণ সফল হতে পারে না, যতক্ষণ না তা এমন কিছু গুণের অধিকারী হয় যা ক্ষমা ও মার্জনা করতে সহায়ক হয়: যেমন মানুষের প্রতি সুধারণা পোষণ করা, তাদের ভালোবাসা, তাদের কল্যাণ কামনা করা, তাদের জন্য যা উপকারী তা অর্জনে সচেষ্ট থাকা এবং তাদের কষ্ট বা ক্ষতির কারণ হয় এমন সবকিছু থেকে তাদের দূরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা। এই কারণেই আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রশংসা করে বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের যে কষ্ট হয় তা তাঁর কাছে অসহনীয়। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি মমতাশীল ও পরম দয়ালু।" [আত-তাওবাহ: ১২৮]

তৃতীয় অর্থ: ক্ষমা ধৈর্য এবং কষ্ট সহ্য করার দাবি রাখে। নেতা যেন তাড়াহুড়ো না করেন এবং শাসনব্যবস্থা যেন প্রতিশোধ ও শাস্তি প্রদানে ত্বরান্বিত না হয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তির যোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তা বিলম্বিত করা উচিত। কেননা শাস্তি কোনো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা বা প্রতিশোধের হাতিয়ার নয়; বরং তা প্রয়োজনে সংশোধনের একটি মাধ্যম মাত্র।

চতুর্থ অর্থ: ক্ষমা বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতার দাবি রাখে। এটি অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কেবল তাৎক্ষণিক ও আংশিক স্বার্থের দিকে তাকায় না, বরং এর কৌশলগত ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবের দিকে লক্ষ্য রাখে।

---

(১) আল-জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দিনাল মাসিহ, ইবনে তাইমিয়া, ৫ / ১০৫।

আত্মার পরিশুদ্ধি, ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শন সুদূরপ্রসারী ও গভীর প্রভাব ফেলে। আর যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বিবেচনায় নিতে অবহেলা করবে, সে ঐক্যবদ্ধ বিষয়কে ছিন্নভিন্ন করার কারণ হয়ে দাঁড়াবে: "আর আপনি যদি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত।" [আলে ইমরান: ১৫৯]

পঞ্চম অর্থ: ক্ষমা করার বিষয়টি অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বনের আবশ্যকতা দাবি করে। সুতরাং যাকে শাস্তি দেওয়া পাওনা ছিল, তাকে যদি ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং মার্জনা করা হয়, তবে যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ করেনি তার অধিকারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা আরও বেশি অগ্রগণ্য। আর যখন শরীয়ত শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে ক্ষমা করার আহ্বান জানিয়েছে এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য বর্ণনা করেছে, তখন যে অপরাধে লিপ্ত হয়নি সে অধিকতর যত্ন ও গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য। এটি আমাদের কাছে এই আবশ্যকতাকে দৃঢ় করে যে, ওয়াজিব বা আবশ্যক অধিকারগুলো যেন লঙ্ঘিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আর মুসলমানদের উচিত এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা নিশ্চয়তা তৈরিতে সচেষ্ট হওয়া যা ঐ অধিকারগুলোকে রক্ষা করবে, যেকোনো সীমালঙ্ঘন থেকে সেগুলোকে হিফাযত করবে এবং যেকোনো প্রকার অন্যায্য হস্তক্ষেপ থেকে সেগুলোকে নিরাপদ রাখবে। যে ব্যবস্থা ক্ষমা ও মার্জনার মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়, তা এই জাতীয় বিষয়ে কখনো শিথিলতা প্রদর্শন করতে পারে না।

ষষ্ঠত: তাঁর (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) নীতিতে দণ্ডবিধি ও শাস্তিমূলক পদক্ষেপের ঘটনাসমূহ।

নববী রাজনীতির পূর্ণতা হলো তা সর্বদা কেবল ক্ষমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যদিও ক্ষমা তাঁর (সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) আদর্শের ওপর প্রবল ছিল, কিন্তু কঠোরতা অবলম্বন এবং শাস্তি প্রদানও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক ও প্রাজ্ঞ রাজনীতি এটি ছাড়া সুসংগত হয় না। এই কারণেই নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশ কিছু ঘটনায় শাস্তি প্রদান করেছেন:

- যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মধ্য থেকে যারা তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছনে থেকে গিয়েছিলেন, তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগের নির্দেশ প্রদান। (১)
- আর জামাতে সালাত আদায়ে যারা অনুপস্থিত থাকে, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা। (২)
- আর নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনার হারামের ভেতরে শিকারকারী ব্যক্তির মালসামান যে ব্যক্তি তাকে পাবে তার জন্য কেড়ে নেওয়াকে বৈধ করেছেন। (৩)

---

(১) ইমাম বুখারী (৪৬৭৭) ও ইমাম মুসলিম (২৭৬৯) একে কাব ইবনে মালিকের হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন।
(২) ইমাম বুখারী (২৪২০) ও ইমাম মুসলিম (৬৫১) এবং অন্যান্যরা একে আবু হুরায়রার হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন।
(৩) ইমাম মুসলিম (১৩৬৪) ও আবু দাউদ (২০৩৮) এবং অন্যান্যরা একে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।

পৃষ্ঠা 147

নবী ﷺ-এর সীরাতের এমন কিছু শাখা এবং আংশিক বিধানের সমষ্টি এটি, যেগুলোর শারয়ী রাজনীতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো রাজনৈতিক-ফিকহী পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিস্তারিত আহকাম ও নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করে(১)।

(১) আমি এখানে নববী রাজনীতির আরও কিছু আহকাম ও নিদর্শনাদি উল্লেখ করেছিলাম এবং এ সংক্রান্ত কিছু বিধানের বর্ণনায় বিস্তারিত আলোচনাও করেছিলাম। অতঃপর আমি দেখলাম যে, এখানে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবকাশ নেই। তাই আমি এই শাখা ও আংশিক আহকামসমূহের কিছু বিষয় উল্লেখ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকেছি এবং এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেছি। বিষয়ের গুরুত্ব এবং এর উপাদানের ব্যাপকতার কারণে আমি নববী রাজনীতি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি লেখা সহজ করে দিন এবং তাঁর পক্ষ থেকে হিদায়াত, সাহায্য ও তাওফীক দান করুন।

পৃষ্ঠা 148

""

পৃষ্ঠা 149

তৃতীয় অধ্যায়

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাজনীতি

পৃষ্ঠা 150

""

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু বকর আস-সিদ্দিকের খিলাফতে শরয়ি রাজনীতি

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে শরয়ি রাজনীতির পরিধি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে খলিফাগণ বিশাল ভূখণ্ড ও সুমহান নগরীসমূহ শাসন করতেন এবং এক দিগন্তবিস্তৃত রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। এই ধরনের শাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হতো সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা, অনুদান বণ্টন, বিচারকার্য সম্পাদন, সন্ধি ও যুদ্ধচুক্তি সম্পাদন এবং দূত ও রাষ্ট্রদূত প্রেরণসহ সাধারণ রাজনীতির দাবি অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়াদি। এগুলো শাসকের ওপর অর্পিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ শরয়ি রাজনীতির জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র।

তবে আমরা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে শরয়ি রাজনীতির বর্ণনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেই বিষয়গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব, যা শরয়ি রাজনীতিকে একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক বিষয়াবলী পরিচালনার এমন একটি ইজতিহাদী প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করে, যার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় এবং যা শরয়ি দলিলের সাথে কোনো রূপ বিরোধিতা করে না। এটি জনসাধারণের বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপদ্ধতি উন্মোচন করে যে, তাঁরা কীভাবে শরয়ি দলিলের সাথে কোনো সাংঘর্ষিকতা ছাড়াই জনকল্যাণে কাজ করতেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত ছিল মুসলিম ইতিহাসে এক অনন্য সময়কাল। সেখানকার শাসকগণ ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ। তাঁরা জ্ঞান ও কর্ম, শক্তি ও আমানতদারি এবং তাকওয়া ও দৃঢ়তার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন এবং তাঁরা মানবীয় শাসনে ন্যায়বিচারের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তসমূহ বাস্তবায়ন করেছিলেন।

ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদের ইজতিহাদের এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সাহাবীদের বাণী ও অবস্থানের মর্যাদা এবং মুসলিমদের ইমাম হওয়ার কারণে তাঁদের রাজনৈতিক ইজতিহাদসমূহ সুপরিচিত ছিল। এর মাধ্যমে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে তাঁদের ঐকমত্যের বিষয়টি জানা সম্ভব হয়। সুতরাং যদি এই নীতিমালার ক্ষেত্রে কোনো বিরোধের কথা জানা না থাকে, তবে তা ‘মৌন ঐকমত্য’ হিসেবে গণ্য হবে, যাতে কোনো একটি মত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

সাহাবীগণ; আর অন্যদের পক্ষ থেকে এমন কোনো ভিন্ন মত বর্ণিত হয়নি যা তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণের প্রমাণ বহন করে। এটি এই ইজতিহাদসমূহের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতাকে আরও শক্তিশালী করে।

আমরা প্রত্যেক খলিফার যুগে প্রচলিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক বিধানগুলোর মধ্য থেকে বেশ কিছু বিধান উল্লেখ করব। আমরা শুরু করব আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দিয়ে। তাঁর যুগের রাজনৈতিক বিধানগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(১) মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ:

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফত গ্রহণের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পরবর্তী মুরতাদ হওয়ার (ধর্মত্যাগ) পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তিনি এই ফিতনা দমনের লক্ষ্যে যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি মহান রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন। এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন একটি পরিস্থিতি, কিন্তু আল্লাহ এই খুলাফায়ে রাশিদিনকে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফিক দান করেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ উম্মতে ইসলামকে রক্ষা করেন।

এখানে বলা যেতে পারে যে: শরীয়তের বিধান পালনে অস্বীকারকারী দল—যেমন যাকাত দিতে অস্বীকারকারী—তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের মধ্যে একটি সর্বসম্মত বিষয় (১); সুতরাং এটি সুনিশ্চিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত যা ‘সিয়াসাহ শারইয়্যাহ’ (শরয়ী রাজনীতি)-র অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয় না।

উত্তর হলো: এখানে আলোচনা মুরতাদ বা শরীয়তের বিধান অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফিকহী বিধান নিয়ে নয়; বরং আলোচনাটি হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনার ওপর সেই বিধানটি প্রয়োগ করা নিয়ে। আর এতে এমন এক শরয়ী বিধানের প্রয়োগ রয়েছে যার জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং সেই সাথে এক্ষেত্রে কল্যাণ ও অকল্যাণের দিকগুলো বিবেচনা করাও আবশ্যক, যার সবগুলোই রাজনৈতিক দিক।

(২) মাসহাফ (কুরআন) একত্রিকরণ:

যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইয়ামামার যুদ্ধে সাহাবীদের শাহাদাতের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে ডেকে পাঠালেন, তখন তাঁর কাছে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: ওমর আমার কাছে এসে বললেন: “ইয়ামামার যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং আমি আশঙ্কা করছি যে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে কারীদের (কুরআনের হাফেজ) শাহাদাত এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে কুরআনের অনেক অংশ হারিয়ে যেতে পারে, যদি না আপনারা তা একত্রিত করেন।”

---

(১) একদল আলেম এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্যের কথা বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন: ইবনে বাত্তাল 'শরহ সহীহ আল-বুখারী' (৮/৫৭৭), আল-জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' (১/৫৭১), ইবনুল আরাবি 'আহকামুল কুরআন' (২/৯৪) এবং ইবনে তাইমিয়া 'মাজমুউল ফাতাওয়া' (২৮/৩৫৬)।

"...এবং আমি অবশ্যই মনে করি যে আপনার কুরআন সংকলন করা উচিত।" আবু বকর বলেন: আমি উমরকে বললাম, "রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেননি আমি তা কীভাবে করব?" উমর বললেন, "আল্লাহর কসম, এটি কল্যাণকর।" উমর বারবার আমাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করতে থাকলেন যতক্ষণ না আল্লাহ আমার অন্তরকে এর জন্য প্রশস্ত করে দিলেন এবং উমর যা অনুধাবন করেছিলেন আমিও তা অনুধাবন করলাম। যায়িদ ইবনে সাবিত বলেন: উমর তখন তার কাছে বসা ছিলেন, কিন্তু কোনো কথা বলছিলেন না। আবু বকর বললেন: "নিশ্চয়ই তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক, তোমার প্রতি আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওহী লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআন অনুসন্ধান করো এবং তা সংকলন করো।" আল্লাহর কসম, যদি তিনি

আমাকে পাহাড়সমূহের মধ্য হতে একটি পাহাড় স্থানান্তর করার দায়িত্ব দিতেন, তবে তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের আদেশের চেয়ে বেশি ভারী মনে হতো না (১)।

কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপটি কোনো সুস্পষ্ট পাঠ (নস) দ্বারা নির্ধারিত ছিল না। কেউ হয়তো ধারণা করতে পারেন যে এটি নবী ﷺ-এর সুন্নাহর পরিপন্থী, কারণ তিনি তা সংকলন করে যাননি। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়; কারণ নবী ﷺ এর প্রয়োজনীয়তা না থাকার কারণেই এটি বর্জন করেছিলেন। কেননা তখন কুরআন অবতীর্ণ হওয়া অব্যাহত ছিল এবং কোনো কোনো আয়াত রহিত (মানসুখ) হচ্ছিল। তদুপরি নবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে তা বিস্মৃত হওয়ার কোনো ভয় ছিল না (২)।

সুতরাং নবী ﷺ-এর এটি বর্জন করা এমন কোনো বিষয় ছিল না যা উদ্দেশ্যমূলক ছিল বা যা আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। এই কারণেই যখন এতে জনকল্যাণ নিশ্চিত হলো, তখন আবু বকর তা সংকলন করলেন। সুতরাং এটি একটি সুস্পষ্ট শরয়ি নীতি (সিয়াসা শারইয়্যাহ)।

(৩) উমর ইবনুল খাত্তাবের স্থলাভিষিক্তকরণ:

এটি ছিল একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ যা আবু বকর বিভেদ ও মতবিরোধের আশঙ্কায় গ্রহণ করেছিলেন। নবী ﷺ এটি করেননি, তবে এটি নিষিদ্ধ নয়। আবু বকর এ বিষয়ে পরামর্শ করেছিলেন এবং এই উম্মতের মধ্যে যাকে তিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও এই খিলাফতের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করেছেন তাকে নির্বাচনে ইজতিহাদ করেছিলেন। তিনি এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সদুপদেশ দিয়েছিলেন।

ওলামায়ে কেরাম স্থলাভিষিক্তকরণের (ইস্তিখলাফ) বৈধতার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন (৩)। আর বায়আত বা আনুগত্যের শপথ 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর বায়আতের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। যদিও তারা এই স্থলাভিষিক্তকরণের প্রভাব নিয়ে মতভেদ করেছেন যে, এটি 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-এর ওপর বাধ্যতামূলক কি না...

(১) এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন (৪৬৭৯)।
(২) দেখুন: আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন, যারকাশী ১/২৩৮; আল-ইতকান, সুয়ূতী ১/২০২।
(৩) দেখুন: আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ার্দী ১৮; তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুদ দালাইল, বাকিল্লানী ৫০৪; রওজাতুত তালিবীন ৭/২৬৪; আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীসি মুসলিম ৪/১৪; শারহুস সুন্নাহ, বাগাভী ১০/৮৪।

যেমনটি জমহুরের (সংখ্যাগরিষ্ঠের) মাযহাব (১), নাকি এটি নিছক একটি প্রস্তাবনা যা বাধ্যতামূলক নয় (২)।

(১) দেখুন: মুগনী আল-মুহতাজ ৪/১৩১, কাশশাফ আল-কিনা ৫/৩০৬২, হাশিয়া ইবনে আবিদীন ২/২৮৩, বুলগাতুস সালিক ৩/৪৪২।
(২) আদ-দাখীরা ১০/২৭, আল-হাভী আল-কাবীর ৮/৩৪০, আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ, আবু ইয়ালা ২৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমর ইবনুল খাত্তাব-এর খিলাফতে আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর রাষ্ট্রনীতি শাসনের এক অনন্য নিদর্শন, যেখানে তিনি শাসনের শক্তি, এর ন্যায়বিচার এবং তাঁর সুদক্ষ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সাথে বিনয়, যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) এবং নিজের নফসের প্রতি কঠোর ইনসাফের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সমন্বয় এই রাষ্ট্রনীতিকে সুশাসনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ঘটনাবলি ও নিদর্শনের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে পরিণত করেছে।

এই রাষ্ট্রনীতি জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদের প্রাচুর্যের কারণেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল, যার মাধ্যমে এই খলিফায়ে রাশিদ শরীয়াহর ভাষ্যসমূহের (নুসুস) আলোকে জনস্বার্থ অর্জন এবং অনিষ্ট প্রতিরোধের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। এর ফলে বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো ইজতিহাদ প্রসূত হয়েছে, যা শরীয়াহ-স্বীকৃত জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং শরীয়াহর সীমানার প্রতি দায়বদ্ধ থাকার মধ্যকার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গির এক অনন্য মডেল।

এসব ইজতিহাদের মধ্যে রয়েছে:

(১) সালব (নিহত শত্রুর সরঞ্জাম) থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ:

সালব বা নিহত শত্রুর সরঞ্জামের ক্ষেত্রে মূল নীতি হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদিসে যা এসেছে: "যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে, তার সালব (শরীরের সরঞ্জাম) তারই হবে।" সুতরাং সালব হত্যাকারীর প্রাপ্য। সালবের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিমতের মতো আচরণ করা হতো না যে সেখান থেকে এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) নেওয়া হবে; বরং পুরো সম্পদই হত্যাকারীকে প্রদান করা হতো।

উমর ইবনুল খাত্তাব-এর যুগে বারা ইবনে মালিক পারস্য সেনাপতি মারজুবান-এর সাথে দ্বৈরথ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করেন এবং তার সালব গ্রহণ করেন। সেই সালবের মূল্য ত্রিশ হাজারে পৌঁছালে বিষয়টি উমর ইবনুল খাত্তাব-এর নিকট পৌঁছায়। তখন তিনি বললেন: "আমরা সালব থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতাম না। তবে বারা-এর সালব অনেক বড় অংকের সম্পদে পৌঁছেছে, তাই আমি এ থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করাকেই সঙ্গত মনে করছি।" (১)

---

(১) আব্দুর রাজ্জাক এটি তাঁর মুসান্নাফে (৯৪৬৮), আবু উবাইদ 'আল-আমওয়াল' গ্রন্থে (৩৮৯) এবং বায়হাকী 'আস-সুনান' গ্রন্থে (১২৭৮৭) বর্ণনা করেছেন।

এটি ছিল উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষ থেকে একটি মাসলাহাত (জনকল্যাণ) ভিত্তিক ইজতিহাদ এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে ‘নস’ (সুস্পষ্ট বিধান) বিদ্যমান ছিল। সুতরাং, তাঁর ওপর থেকে এই সংশয় নিরসন করা অপরিহার্য।

আর সংশয়ের বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের এই বিষয়ের কিছু ফিকহী দিক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

উলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি উত্তর উল্লেখ করেছেন, যা আমরা নিম্নোক্তভাবে সারসংক্ষেপ করতে পারি:

প্রথম উত্তর: এর উদ্দেশ্য হলো, তিনি যখন কাউকে ‘তানফীল’ (অতিরিক্ত পুরস্কার) দিতেন, তখন তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতেন। আর যখন তিনি এক-পঞ্চমাংশ নিতেন না, তখন তিনি তাকে ‘তানফীল’ হিসেবেও প্রদান করতেন না। ইমাম তহাবী বলেন:

(উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁরা ‘সালাব’ (নিহত শত্রুর ব্যক্তিগত সম্পদ) থেকে এক-পঞ্চমাংশ নিতেন না, যদিও তাঁদের অধিকার ছিল তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করার। তাঁদের এই এক-পঞ্চমাংশ বর্জন করা ছিল স্রেফ তা ছেড়ে দেওয়ার কারণে; বিষয়টি এমন নয় যে, ‘সালাব’ হত্যাকারীদের জন্য এমনভাবে অবধারিত হয়ে গিয়েছিল যেমন গনীমতের অংশ তাদের জন্য অবধারিত হয়ে থাকে)। (১)

তবে এই ব্যাখ্যায় কিছুটা কষ্টকল্পনা রয়েছে। কারণ উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কর্মের বাহ্যিক দিক এটাই প্রকাশ করে যে, ‘তানফীল’ বা অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ নেওয়ার বিধান ছিল না; বিষয়টি এমন নয় যে, অতিরিক্ত পুরস্কার না দেওয়ার কারণে এক-পঞ্চমাংশ নেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় উত্তর: কিছু ফকীহের মত অনুযায়ী ‘সালাব’ থেকেও এক-পঞ্চমাংশ নিতে হয় (২), তাই বলা যেতে পারে যে, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন কিছু থেকে এক-পঞ্চমাংশ নিয়েছিলেন যা শরীয়তের মূল বিধানেই এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণের যোগ্য ছিল।

তবে এই উত্তরের ক্ষেত্রে আপত্তি হলো আছারের প্রথমাংশ, যেখানে বলা হয়েছে যে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ‘সালাব’ থেকে এক-পঞ্চমাংশ নিতেন না। ফলে এই উত্তরটি যথাযথ হয় না।

---

(১) শারহু মাআনী আল-আসার ৩/২৩১।
(২) ‘সালাব’ বণ্টনের পদ্ধতি সম্পর্কে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন: এটি মূল গনীমতের অন্তর্ভুক্ত এবং এর এক-পঞ্চমাংশ নিতে হয় না—এটি শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অভিমত। কেউ বলেছেন: এটি এক-পঞ্চমাংশের অংশ, গনীমতের নয়—এটি মালিকী মাযহাবের মত; এবং সেই অনুযায়ী, এর থেকে পুনরায় এক-পঞ্চমাংশ নেওয়া সম্ভব নয় কারণ এটি গনীমতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার কেউ বলেছেন: এটি এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর অবশিষ্ট গনীমতের অংশ—এটি হানাফী মাযহাবের অভিমত। দেখুন: আল-হিদায়া ২/৩৯১, আল-বাহরুর রায়েক ৫/৯৯, শারহু মুখতাসার খলীল (খারাশী কৃত) ৩/১২৯, আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী ১/৪০৬, আল-হাভী আল-কাবীর ৮/৩৯৬-৩৯৭, বাহরুল মাজহাব ৬/২৩৩-২৩৪, আল-মুগনী ৯/২৩৭।

তৃতীয় উত্তর: এই বর্ণনার (আসার) ওপর আমল না করা। এক্ষেত্রে উমর (রা.)-এর ইজতিহাদের পরিবর্তে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুস্পষ্ট বাণীর (নাস) ওপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই হাদিসটি নির্দেশ করে যে, এক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) গ্রহণ করা হবে না এবং দলিল হলো নবি (সা.)-এর বাণী (১)।

তাছাড়া এই বর্ণনাটি সেই বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) কাদিসিয়ার যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তিকে বারো হাজার (মুদ্রা) নফল (অতিরিক্ত পুরস্কার) প্রদান করেছিলেন, যা উক্ত পরিমাণের চেয়েও অধিক (২)।

চতুর্থ উত্তর: তিনি (উমর রা.) মনে করতেন যে, এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ না করার বিষয়টি কেবল স্বাভাবিক সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অত্যন্ত মূল্যবান বা অত্যধিক সম্পদের ক্ষেত্রে নয়। ইমাম যদি সম্পদকে অনেক বেশি মনে করেন, তবে তিনি তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতে পারেন। এটি ইসহাক (রহ.)-এর মাযহাব (৩)।

এর সপক্ষে এভাবে দলিল দেওয়া যেতে পারে যে: এই বিশেষ অবস্থাটি হাদিসের মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর কোনো সাধারণ বিধানকে অস্বাভাবিক ও বিরল বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা সঠিক নয়।

হাদিসের মূল উদ্দেশ্য হলো যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধে শত্রু নিপাতে উৎসাহিত করা। এটি কেবল সেই স্বাভাবিক সম্পদের ক্ষেত্রেই অর্জিত হয় যা জামাতের কোনো ক্ষতি ছাড়াই ব্যক্তির কল্যাণ নিশ্চিত করে। কিন্তু অত্যধিক সম্পদের বিষয়টি এর বিপরীত। তাছাড়া হাদিসটি সাধারণ যোদ্ধাদের সাথে এবং তারা সচরাচর যা সাথে রাখে তার সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি কোনো ব্যতিক্রমী দামী বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় যা তাদের নেতারা পরিধান করে। এটি একটি বিরল চিত্র যার ওপর হাদিসের সাধারণ অর্থ প্রয়োগ করা যায় না। এই কারণেই কিছু ফকিহ মুশরিক নেতাদের পরিহিত কঙ্কণ ও মুকুটকে এই 'সালাব'-এর (নিহত শত্রুর ব্যবহৃত সম্পদ) অন্তর্ভুক্ত করেননি; এই যুক্তিতে যে এটি কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয় (৪)।

সুতরাং অল্প সম্পদই নফল হিসেবে প্রদান করা হবে। কিন্তু সম্পদ যদি এই সীমা অতিক্রম করে, তবে তা 'গনীমত'-এর (সাধারণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) পর্যায়ভুক্ত হবে (৫)।

---

(১) দেখুন: আল-আমওয়াল, আবু উবাইদ ৩৯৩; আল-মুগনি ৯/২৩৭।
(২) দেখুন: আল-উম্ম ৪/১৫০; মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার ৯/২২৭।
(৩) দেখুন: আল-মুগনি ৯/২৩৭, এবং দেখুন: মাসাইলুল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ওয়া ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহি লিল কাওসাজ ২/২৪৩।
(৪) দেখুন: আত-তাজ ওয়াল ইকলিল ৪/৫৭২; হাশিয়াতুল আদাবি আলা কিফায়াতিত তালিব ২/১৬; আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানি ১/৪০৫।
(৫) দেখুন: মানহাজু উমর ফিত তাশরি', মুহাম্মাদ আল-বালতাজি ২১২।

সুতরাং, আমরা ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অবস্থান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন হই (১): একে সিয়াসাহ শারইয়ার (শরয়ী রাজনীতি) বহির্ভূত হিসেবে দেখা যেতে পারে কারণ এটি একটি শারঈ বিধানের প্রয়োগ, অথবা এটি নসের (সুস্পষ্ট দলিলের) পরিপন্থী হওয়ার কারণে। আবার একে সিয়াসাহ শারইয়াহ হিসেবেও দেখা যেতে পারে যদি বিবেচনা করা হয় যে এটি একটি জনকল্যাণমূলক অবস্থানে ইজতিহাদ যা নসের পরিপন্থী নয়।

(২) আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা:

মহান আল্লাহ তাঁর বাণীতে আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ করা বৈধ করেছেন: "আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করা হলো। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য বৈধ। আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারীরাও (তোমাদের জন্য বৈধ)।" [মায়েদাহ: ৫]

বেশ কিছু সাহাবী আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ করেছিলেন, যেমন হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, আল-জারুদ ইবনে মুয়াল্লা এবং উযাইনা আল-আবদি; তাঁদের প্রত্যেকেই আহলে কিতাবের একজন নারীকে বিবাহ করেছিলেন (২)।

তবে বর্ণিত আছে যে, ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাহাবীদের এই বিবাহ থেকে নিষেধ করেছিলেন। এই নিষেধের কারণ উন্মোচনকারী বর্ণনাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

কাতাদাহ থেকে বর্ণিত যে, হুজাইফা ওমরের সময়ে একজন ইহুদী নারীকে বিবাহ করেন। তখন ওমর বললেন: তাকে তালাক দাও, কারণ সে হলো জ্বলন্ত অঙ্গার। তিনি (হুজাইফা) বললেন: তা কি হারাম? তিনি (ওমর) বললেন: না। ফলে হুজাইফা তাঁর (ওমরের) কথার কারণে তাকে তালাক দেননি, বরং পরবর্তীতে তাকে তালাক দিয়েছিলেন (৩)।

(১) উত্তরের ক্ষেত্রে আমরা আরও যোগ করতে পারি যে: তানফিল (অতিরিক্ত পুরস্কার) প্রদান করা ইমামের অনুমতির সাথে সম্পৃক্ত, এটি শরীয়তের মূল বিধান অনুযায়ী অবধারিত প্রাপ্য নয়। এর ভিত্তিতে, শাসক যেমন শর্ত সাপেক্ষে শুরুতেই তানফিল দিতে পারেন, তেমনি খুমুস (পঞ্চমাংশ) বের করার পর শর্ত সাপেক্ষেও তা দিতে পারেন। এই উত্তরটি সেই মতানুসারে সঠিক যারা মনে করেন যে, সালব (নিহতের আসবাবপত্র) এর মাধ্যমে তানফিল প্রদান করা ইমামের ইচ্ছাধীন, শরীয়ত নির্ধারিত কোনো হক নয়; তাঁরা হলেন হানাফী ও মালিকীগণ। এটি তাঁদের সেই মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যারা মনে করেন যে তানফিল প্রদান করা হবে খুমুস থেকে, গণিমতের মূল অংশ থেকে নয়; তাঁরা হলেন মালিকীগণ। সুতরাং এই উত্তরটি কেবল মালিকী মাযহাব অনুযায়ী সঠিক হতে পারে, তবে এখানে জটিলতা হলো ওমর এর পরে ব্যতীত খুমুস বের করেননি, তাই সেখানে পূর্ব থেকে কোনো শর্ত ছিল না।
(২) দেখুন: মাসাইলুল ইমাম আহমাদ, রিওয়ায়াতু সালেহ ২/৩২০, এবং দেখুন: আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ, আবু উবাইদ ৮৭-৮৮, আহকামুল কুরআন, আল-জাসসাস ১/৪০৩।
(৩) এটি বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক (১০০৫৭)।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানকে—যখন তিনি কুফায় ছিলেন এবং একজন আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করেছিলেন—লিখে পাঠালেন: "তাকে পৃথক করে দাও। কারণ তুমি মাজুসিদের (অগ্নিউপাসক) ভূমিতে আছ। আর আমি আশঙ্কা করি যে, কোনো মূর্খ ব্যক্তি বলবে: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী একজন কাফির নারীকে বিবাহ করেছেন', এবং তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত অবকাশ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে, ফলে তারা মাজুসি নারীদের বিবাহ করা শুরু করবে। অতএব, তাকে পৃথক করে দাও।" (১)

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে সিরিন থেকে বর্ণিত যে, হুজাইফা একজন ইহুদি নারীকে বিবাহ করেছিলেন। এ বিষয়ে উমর তাকে বললেন। তিনি (হুজাইফা) জিজ্ঞেস করলেন: "তা কি হারাম?" উমর বললেন: "না, তবে তুমি মুসলিমদের একজন নেতা, তাই তাকে পৃথক করে দাও।" (২)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, উমর তাকে লিখেছিলেন: "আমি তোমাকে জোর দিচ্ছি যে, তুমি আমার এই চিঠিটি হাত থেকে নামিয়ে রাখার আগেই যেন তাকে মুক্ত (তালাক) করে দাও। কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, মুসলিমরা তোমার অনুসরণ করবে এবং তারা তাদের সৌন্দর্যের কারণে জিম্মি নারীদের প্রাধান্য দিবে; আর মুসলিমদের জন্য ফিতনা হিসেবে এটাই যথেষ্ট।" (৩)

শাকীক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হুজাইফা একজন ইহুদি নারীকে বিবাহ করলে উমর তাকে লিখে পাঠালেন যেন তাকে মুক্ত করে দেয়। হুজাইফা তাকে লিখে পাঠালেন: "যদি তা হারাম হয় তবে আমি তাকে মুক্ত করব।" উমর তাকে লিখে পাঠালেন: "আমি দাবি করছি না যে তা হারাম, কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি যে তোমরা তাদের মধ্য থেকে ব্যভিচারিণী নারীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" (৪)

সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব হুজাইফাকে মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করার পর এবং (সেখানে) মুসলিম নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর তার কাছে বার্তা পাঠালেন যে: "আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে আপনি মাদায়েনবাসীদের মধ্য থেকে একজন আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করেছেন; তাকে তালাক দিন।" হুজাইফা তাকে লিখে পাঠালেন: "আমি তা করব না যতক্ষণ না আপনি আমাকে বলবেন যে এটি হালাল না হারাম, এবং এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কী?" উমর তাকে লিখে পাঠালেন: "না (হারাম নয়), বরং তা হালাল। কিন্তু অনারব নারীদের মধ্যে এক ধরণের আকর্ষণ রয়েছে; যদি তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো, তবে তারা তোমাদের (মুসলিম) নারীদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।" (৫)

---

(১) আব্দুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ, নম্বর: ১২৬৭৬।
(২) সাঈদ বিন মনসুর, সুনান, ১/২২৫।
(৩) আল-আসার, মুহাম্মদ বিন হাসান, ১/৩৯৪, নম্বর: ৪১২।
(৪) ইবনে আবি শাইবা, আল-মুসান্নাফ, নম্বর: ১৬১৬৩; সাঈদ বিন মনসুর, সুনান, নম্বর: ৭১৬; বায়হাকী, আস-সুনান, নম্বর: ১৪৩৬১। ইবনে কাসীর তার 'তাফসীরুল কুরআনিল আজিম'-এ (১/৫৮৩) বলেন: এর সনদ সহীহ।
(৫) তাবারী, তারিখ, ৩/৫৮৮।

এই ইজতিহাদকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে?

উলামাগণ এ বিষয়ে কয়েকটি পন্থায় মতভেদ করেছেন:

প্রথম পন্থা: যারা মনে করেন যে, উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ করাকে হারাম মনে করতেন, যা জমহুর সাহাবীদের মতের বিপরীত ছিল। এর সপক্ষে তারা সেই বর্ণনাটি দলিল হিসেবে পেশ করেন যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ একজন ইহুদি নারীকে এবং হুযাইফা বিন ইয়ামান একজন খ্রিস্টান নারীকে বিবাহ করেছিলেন। এতে উমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত রাগান্বিত হন, এমনকি তিনি তাদের ওপর চড়াও হতে উদ্যত হন। তখন তারা দুজনেই বললেন: হে আমিরুল মুমিনীন, আমরা তাদের তালাক দিয়ে দিচ্ছি, আপনি রাগ করবেন না! তখন তিনি বললেন: যদি তাদের তালাক দেওয়া বৈধ হয়, তবে তো তাদের বিবাহ করাও বৈধ ছিল।[১]

তবে এটি একটি দুর্বল বর্ণনা। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এর চেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে।[২]

সুতরাং এই পন্থাটি সঠিক নয়। বরং এ বিষয়ে উমরের মাযহাব ছিল জমহুর সাহাবী এবং তাদের পরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের ফকীহগণের মাযহাবের অনুরূপ;[৩] এ বিষয়ে মতভেদ কেবল ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে প্রসিদ্ধ।[৪]

[১] আত-তাবারী তার তাফসিরে এটি বর্ণনা করেছেন, ৪/৩৬৪-৩৬৫।
[২] দেখুন: তাফসিরে তাবারী, ৪/৩৬৫; এবং দেখুন: আল-মুহাররারুল ওয়াজিজ, ১/২৯৬।
[৩] দেখুন: আবু উবাইদ কৃত আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ, পৃষ্ঠা ৮৪-৯০; আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ৩/৬৮; আত-তাবারী

ইজমা'র কথা বর্ণনা করেছেন, দেখুন: তাফসিরে তাবারী, ৪/৩৬৬; এবং জাসসাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে (১/৪০৩) বলেছেন: "সাহাবী ও তাবিঈদের মধ্য থেকে কেউ তাদের সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার কথা বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই", এর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে ২/২০৫ পৃষ্ঠায়।

(৪) যেমনটি সহীহ বুখারীতে রয়েছে (হাদীস নং ৫২৮৫): ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে যখন খ্রিস্টান বা ইহুদি নারী বিবাহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন তিনি বলতেন: আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওপর মুশরিক নারীদের হারাম করেছেন। আর কোনো নারী যখন বলে যে তার রব ঈসা—অথচ তিনি আল্লাহর বান্দাদের মাঝে একজন বান্দা—তার চেয়ে বড় শিরক আর কিছু আছে বলে আমি জানি না। কোনো কোনো উলামা একে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় হওয়ার অর্থে গ্রহণ করেছেন, যেমন: আহকামুল কুরআন, জাসসাস ১/৪০৩; আল-হাভী আল-কাবীর ৯/২২২। আবার অন্য উলামাগণ একে হারামের অর্থে গ্রহণ করেছেন, দেখুন: আন-নাহহাস কৃত আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ, পৃষ্ঠা ১৯৫; আল-মুহাল্লা ১৩/৯; ফাতহুল বারী ৯/৪১৭। ইবনুল মুনযির বলেছেন: প্রাথমিক যুগের কারো নিকট থেকে এটি হারাম হওয়ার বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়, দেখুন: আল-ইশরাফ ৫/৯৩। আতা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এটিকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন: সেই সময় মুসলিম নারীর সংখ্যা কম ছিল। যেমনটি ইবনে আবি শাইবা তার মুসান্নাফ-এ (হাদীস নং ১৬১৬৪) উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার এর সনদকে হাসান বলেছেন এবং বলেছেন: এর অর্থ হলো তিনি এই বৈধতাকে একটি বিশেষ অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। দেখুন: ফাতহুল বারী ৯/৪১৭।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: উমর (রা.) তাদেরকে বিবাহ করা থেকে নিষেধ করেননি, বরং এটি ছিল উত্তম বর্জনের অন্তর্ভুক্ত অথবা পবিত্রতা অর্জন ও অপছন্দনীয় হওয়ার পর্যায়ভুক্ত, হারামের পর্যায়ে নয় (১)।

এই কারণে মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান উমর (রা.)-এর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন: (আমরা এই মতটিই গ্রহণ করি; আমরা একে হারাম মনে করি না, কিন্তু আমরা মনে করি যে তাদের পরিবর্তে মুসলিম নারীদেরই নির্বাচন করা উচিত, আর এটিই আবু হানিফার বক্তব্য) (২)।

সুতরাং উমর (রা.) হুযায়ফাকে নিষেধ করেছিলেন কারণ আয়াতে সতীত্বের শর্তারোপ করা হয়েছিল, অথচ এই মহিলার সতী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছিল না (৩)।

আল-মুহাসিবি বলেন: (উম্মত সর্বদা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে আসছে যে, আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ করা হালাল; তবে ইবনে উমর একে অপছন্দ করতেন। উমর এবং অন্যান্যরাও একে হারাম না করেই অপছন্দ করতেন, এই ভয়ে যে যিম্মি নারী সতী না-ও হতে পারে) (৪)।

এই পদ্ধতি অনুসারে কোনো সংশয় থাকে না, কারণ একজন কিতাবিয়া নারীর তুলনায় একজন মুসলিম নারীকে বিবাহ করাই অধিক উত্তম। আর তাদের সাথে বিবাহ বৈধ হওয়া ‘মাকরূহে তানযীহি’ বা সাধারণ অপছন্দনীয়তাকে নাকচ করে দেয় না; কিতাবিয়া নারীদের বিবাহের মূল বিধানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ফকীহগণের মাযহাব এটাই (৫)।

(১) দেখুন: তাফসীরে তাবারী ৪/৩৬৬; আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ, আবু উবাইদ ৯০; শরহু সহীহিল বুখারী, ইবনে বাত্তাল ৭/৪৩৪; আহকামুল কুরআন, জাসসাস ১/৪০৩; আত-তামহীদ, ইবনে আব্দুল বার ২/১৩১-১৩২; আল-মুগনী ৭/৫০০; আহকামু আহলিয যিম্মাহ ২/৭৯৫-৭৯৬; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল ৫/১৩৩-১৩৪।
(২) আল-আসার, মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান ১/৩৯৫।
(৩) দেখুন: আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ, আবু উবাইদ ৯১।
(৪) ফাহমুল কুরআন ওয়া মাআনিহী ২২৯।
(৫) হানাফী, মালিকী এবং শাফিঈ ফকীহগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যিম্মি কিতাবিয়া নারীকে বিবাহ করা মাকরূহ হওয়ার মত দিয়েছেন। ইবনুল কাসিম একে স্রেফ বৈধ বলেছেন, যা শাফিঈদের একটি মত। হাম্বলী মাযহাবে একে ত্যাগ করা উত্তম বলে উল্লেখ

করা হয়েছে। আর শত্রু ভূখণ্ডে (দারুল হারব) বসবাসরত হারবী কিতাবিয়া নারীর বিধানের ক্ষেত্রে, যারা যিম্মি নারীকে বিবাহ করা অপছন্দ করেন, তারা হারবী নারীর ক্ষেত্রে আরও কঠোরভাবে অপছন্দ করেন। এই কারণেই হানাফীগণ এক্ষেত্রে হারামের মত দিয়েছেন। দেখুন: আল-বাহরুর রাইক ৩/১১১; হাশিয়া ইবনে আবিদীন ৩/৪৫; মুগনী আল-মুহতাজ ৪/৩১১; রওজাতুত তালিবীন ৭/১৩৫; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল ৫/১৩৪; শরহু মুখতাসার খলীল, খারশী ৩/২২৬; বুলগাতুস সালিক ২/২৭১; আল-মুগনী ৭/৫০০; আল-মুবদি ৬/১৩৯; আল-ইনসাফ ৮/১৩৫।

তৃতীয় পথ: এটি ছিল শরয়ী শাসননীতির (সিয়াসাহ শারইয়্যাহ) দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিবাহের ক্ষেত্রে একটি নিষেধাজ্ঞা, যা অনেক সমকালীন আলিমের অভিমত (১)।

এই অভিমতটি সমকালীনদের নিকট বহুল প্রচলিত; তবে পূর্ববর্তী ফকিহদের মধ্যে কাউকে এটি উল্লেখ করতে আমি দেখিনি। ইমাম তাবারী উল্লেখ করেছেন যে, পৃথকীকরণের কথা বলার কোনো অর্থ নেই, কারণ এটি উম্মাহর সম্মিলিত অবস্থানের পরিপন্থী (২)।

কোনো কোনো সমকালীন আলিম এই পথটির সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটি কোনো নির্ভরযোগ্য পথ নয়। উমর (রা.) থেকে এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞার কথা বর্ণিত হয়নি; বরং এটি বৈধ (মুবাহ) বিষয়সমূহের ওপর একটি অবৈধ সীমাবদ্ধতা আরোপের শামিল (৩)।

সমকালীনদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, একে শরয়ী শাসননীতির (সিয়াসাহ শারইয়্যাহ) আওতাভুক্ত একটি জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ (মাসলাহী ইজতিহাদ) হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, যার উদ্দেশ্য ছিল এই বিবাহের ফলে সৃষ্ট অনিষ্টসমূহ প্রতিহত করা। পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলোর সমষ্টি থেকে আমরা এই প্রভাবশালী কারণগুলো সারসংক্ষেপ করতে পারি:

প্রথম কারণ: তাদের মধ্যকার পাপাচারিণী বা ব্যভিচারিণী নারীদের বিবাহের আশঙ্কা। কারণ, আয়াতে সতীত্বের শর্তারোপ করা হয়েছে; ফলে উমর (রা.) আশঙ্কা করেছিলেন যে, তৎকালীন পরিস্থিতিতে এই শর্তটি হয়তো বাস্তবায়িত হবে না।

---

(১) দেখুন: তালীলুল আহকাম, মুহাম্মদ শালবী ৪৪; মানহাজু উমর ফিত তাশরী' ৩০৪-৩০৬; নজরিয়াতুল ইবাহাহ ইনদাল ফুকাহা ওয়াল উসুলিয়্যীন, মুহাম্মদ মাদুর ৩৪৮; নজরিয়াতুল মাসলাহা ফিল ফিকহিল ইসলামী, হুসাইন হামিদ হাসান ২২৯; আত-তাআসসুফ ফী ইসতি'মালিল হাক্ক, আদ-দারীনী ১৬২-১৬৩; আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ফিল আহওয়ালিশ শাখসিয়্যাহ, আবদুল ফাত্তাহ আমরু ৫২-৫৩; আল-মাদখাল ইলাস সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়াল আনজিমাতুল মারইয়্যাহ ৩৪৯; আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, আবদুল্লাহ আল-কাদি ১০৩; ইজতিহাদাতু উমর বিন আল-খাত্তাব, খালিদ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ হানাফী ১৭১; আল-ইজতিহাদুল উসুলী ইনদা আমীরিল মুমিনীন উমর বিন আল-খাত্তাব, মুহাম্মদ ফুয়াদ ৩৪৪-৩৪৫; আল-মাসলাহাতুল আম্মাহ মিন মানজুর ইসলামী, ফাউজি খলীল ৫৮৩; মাকাসিদুশ শারীয়াহ ফী তাখসীসিন নাসসিল মাসলাহা, আয়মান আল-আইয়ুবী ২৩৬; তাগায়্যুরুজ জুরুফ ওয়া আসারুহু ফী ইখতিলাফিল আহকাম, লিনমানসী ৪৬৮-৪৬৯; আসলু ইতিবারিল মাআল, উমর জাদিয়া ৪৩০; ইসতিসমারুন নাসসিশ শারয়ী বাইনাল জাহিরিয়্যাহ ওয়াল মুকতাসিদাহ, আহমদ জীব ২০১-২০২; তাকয়ীদুল মুবাহ, হুসাইন আল-মুস ২১২; ইতিবারুল মাআলাত ওয়া মুরাআতুত তাসাররুফাত, সিনুসী ১৬৬; আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ওয়া আসারুহা ফিল হুকমিত তাকলীফী ৪৫৫; আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, আকরাম কাসসাব ১৪৪।
(২) দেখুন: তাফসীরে তাবারী ৪/৩৬৬।
(৩) দেখুন: মানহাজিয়াতু উমর ফিল ইজতিহাদ মাআন নাস, মুহাম্মদ আত-তাবীল ১৬৫-১৬৬।

পৃষ্ঠা 163

দ্বিতীয় কারণ: যেহেতু যারা বিয়ে করেছিলেন যেমন হুযাইফা ও তালহা, তাঁরা ছিলেন জনগণের নেতা ও অগ্রগণ্য ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তিত্ব যাদের অনুসরণ করা হয় (১)। তাই এর ফলে কোনো অনিষ্ট ঘটার আশঙ্কায় সাধারণ মানুষের জন্য একটি বৈধ বিষয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সমসাময়িক কিছু গবেষক নেতাদের বিয়ের এই নিষেধাজ্ঞাকে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের সংবেদনশীলতা এবং রাষ্ট্রের গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা অথবা রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন কোনো নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে তাদের ওপর প্রভাব খাটানোর আশঙ্কার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন (২)।

তবে এটি একটি দূরবর্তী সম্ভাবনা। বরং অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো, এই মহান ব্যক্তিরা ছিলেন জনগণের আদর্শ এবং কিছু বর্ণনায় এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সময়ের পরিস্থিতিকে বর্তমান যুগে সামরিক বা রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থানের সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে বিদেশি নারীদের বিয়ে করার ওপর যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয় তার সাথে তুলনা করা সঠিক নয়। কারণ পরিস্থিতি ভিন্ন। অন্যথায়, এমন কী ধরণের গোপনীয়তা থাকতে পারে যা যিম্মি স্ত্রীদের কাছে ফাঁস হওয়ার ভয় করা হবে?! অথচ বাস্তবে তারা ছিলেন ইসলামি রাষ্ট্রেরই প্রজাসাধারণ, কোনো বিদেশি বা বহিরাগত নন।

তৃতীয় কারণ: মানুষের অজ্ঞতা এবং ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক সময়ের কারণে তারা মুশরিক নারীদের বিয়ে করা বৈধ মনে করতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকে এটি করা হয়ে থাকতে পারে (৩)।

চতুর্থ কারণ: এটি মুসলিম নারীদের প্রতি বিরাগ বা অনীহা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থেকে করা হয়েছে (৪)।

সুতরাং এটি বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে; বিশেষ করে যদি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মুসলিম নারীর সংখ্যা কম হয়, তবে বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে বৈধ বিষয় থেকেও বিরত রাখা হতে পারে।

---

(১) দেখুন: তাফসিরে তাবারী ৪/৩৬৬।
(২) দেখুন: আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ফিল আহওয়ালিশ শাখসিয়্যাহ ৫৫; আল-ইজতিহাদ আল-উসুলি ইনদা আমিরিল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব, লেখক: মুহাম্মদ ফুয়াদ যাহির ৩৪১।
(৩) দেখুন: আত-তামহিদ, ইবনে আবদিল বার ২/১৩১-১৩২; উমর (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তটি অপছন্দনীয় হওয়ার পর্যায়ভুক্ত ছিল বলে ইবনে আবদিল বারের অভিমত আগে উল্লেখ করা হয়েছে।
(৪) দেখুন: তাফসিরে তাবারী ৪/৩৬৬। তাবারীর বর্ণনার ধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এই অর্থটি অপছন্দনীয় বা বর্জনীয় অর্থে উল্লেখ করেছেন। তবে এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, এটি এমন একটি কারণ হতে পারে যার ওপর ভিত্তি করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সম্ভব।

পৃষ্ঠা 164

এই অর্থগুলো সবই সঠিক হোক কিংবা আংশিক, মূল উদ্দেশ্য হলো ওমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল একটি বিশেষ ও আংশিক অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি একটি বৈধ বিষয় থেকে ফিতনা বা অনিষ্ট সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন, ফলে হারামের পথ রুদ্ধ করার (সাদ্দে যারিয়াহ) নিমিত্তে আপতিত কোনো কারণে এই বৈধ বিষয়টিকে তিনি সীমিত করেছিলেন।

পঞ্চম কারণ: আহলে কিতাব নারীদের ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ভয়, অথবা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার ভয়, কিংবা সন্তান ও পরিবারের ওপর এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা।

কিন্তু এটি সঠিক নয় এবং ওমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর ইজতিহাদকে এই অর্থের ওপর প্রয়োগ করা শুদ্ধ হবে না। কারণ, এই বিষয়টি তো সেই মূল শরয়ি বিধানের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল যা তাদের সাথে বিবাহকে বৈধ করেছে। কেননা কিতাবি নারীরা তাদের স্বামীদের প্রভাবিত করতে পারে এবং সন্তানদের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈধতা দেওয়া হয়েছিল; কারণ এর মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ (মাসলাহাত) ছিল অধিকতর মহান।

সুতরাং এটি বলা সঠিক হবে না যে, ওমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এই সকল অনিষ্টের কারণেই তাদের নিষিদ্ধ করেছিলেন। কেননা এটি এমন এক ইজতিহাদ যা বৈধতার মূল ভিত্তিকেই নাকচ করে দেয়। আর কোনো প্রশাসনিক নীতি (সিয়াসাহ) এমন হওয়া সমীচীন নয় যা মূল শরয়ি ভিত্তিকেই নাকচ করে দেবে। অতএব, যদি বলা হয় যে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহু) তাদের তালাক দিতে বাধ্য করেছিলেন অথবা তাদের বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন, তবে তার পেছনে অবশ্যই বিশেষ ও ব্যতিক্রমী কারণ থাকতে হবে যা শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য কোনো কল্যাণ নিশ্চিত করে। এটি মূল শরয়ি বিধানকে নাকচ করবে না, বরং সময় বা স্থানের ভিন্নতার কারণে এমন কোনো গ্রহণযোগ্য কল্যাণের ভিত্তিতে হবে যা নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে বিশেষায়িত করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, আমাদের বর্তমান যুগে বিবাহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা যেতে পারে। কারণ এই বিবাহগুলো এমন সব রাষ্ট্রে সংঘটিত হয় যেখানকার আইনসমূহ ইসলামের বিধান মেনে চলে না, ফলে সন্তানদের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে এই ইজতিহাদটি সঠিক, কারণ এটি এমন একটি প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য যা মূল বৈধতার সময় বিদ্যমান ছিল না। কেননা মূল বৈধতাটি সংশ্লিষ্ট ছিল ইসলামের আইনের অধীনে আহলে কিতাব নারীদের সাথে বিবাহের ক্ষেত্রে। একইভাবে আমাদের সমকালীন প্রেক্ষাপটে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা যেতে পারে কারণ সচ্চরিত্রতার (ইফফাত) শর্তটি অর্জিত হয়নি; তাই বিবাহের পূর্বে এটি নিশ্চিত হওয়া শর্ত। কিন্তু দ্বীনের ওপর আশঙ্কার মতো কারণ দেখিয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা এমন এক ইজতিহাদ যা শরয়ি বৈধতার মূল ভিত্তিকেই নাকচ করে দেয়, তাই তা সঠিক নয়।

(৩) তিন তালাককে কার্যকর করা:

তাউস থেকে বর্ণিত যে, আবুস সাহবা ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-কে বললেন: (আপনার বিশেষ জ্ঞান থেকে আমাদের কিছু বলুন, তালাক কি ছিল না...

পৃষ্ঠা 165

...রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আবু বকর (রা.)-এর যুগে কি তিন তালাক এক তালাক হিসেবে গণ্য হতো? তিনি বললেন: হ্যাঁ, এমনই ছিল। অতঃপর যখন উমর (রা.)-এর শাসনকাল এলো, তখন মানুষ লাগাতার তালাক প্রদানে লিপ্ত হলো, ফলে তিনি তা তাদের ওপর কার্যকর করে দিলেন (১)।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: আবু সাহবা ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললেন: (আপনি কি জানেন যে, নবী (সা.) ও আবু বকর (রা.)-এর যুগে এবং উমর (রা.)-এর খিলাফতের তিন বছর পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হতো? ইবনে আব্বাস বললেন: হ্যাঁ!)।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়: উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর জন্য তালাকের শরয়ি সীমা পরিবর্তনে ইজতিহাদ করা এবং এক তালাককে তিন তালাক করে দেওয়া কীভাবে বৈধ হলো?

এর উত্তর দেওয়ার আগে, এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়ার বিধান জানা আবশ্যক; তা কি এক তালাক হিসেবে গণ্য হবে নাকি তিন তালাক?

ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে দুইটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: তিন তালাক তিন তালাক হিসেবেই কার্যকর হবে। এটিই চার মাযহাবের সকল ইমামদের সম্মিলিত অভিমত (২), এবং তাঁদের কেউ কেউ একে ঐক্যমত (ইজমা) হিসেবে বর্ণনা করেছেন (৩)।

এই মতানুসারে, তাঁদের নিকট উমর (রা.)-এর এই কার্যে কোনো রাজনৈতিক ইজতিহাদ ছিল না; বরং উমর (রা.) তিন তালাককে তার শরয়ি বিধান অনুযায়ীই কার্যকর করেছিলেন।

তাঁরা এর সপক্ষে বেশ কিছু দলিল পেশ করেছেন, যার মধ্যে অন্যতম হলো: এই বিধানের ওপর সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমত (ইজমা) এবং উমর (রা.) যা করেছিলেন তার প্রতি তাঁদের স্বীকৃতি। আর এটিই একটি স্বতন্ত্র ও যথেষ্ট দলিল (৪)।

---

(১) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন, হাদিস নম্বর (১৪৭২)।
(২) দেখুন: আল-বাহরুর রায়িক ৩/২৫৭, শরহু মুখতাসার ইবনিল হাজিব ৪/৩১৪-এর তাওযীহ, আল-হাবী আল-কাবীর ১০/১১৮, আল-মুগনী ১০/৩৩৪, এবং দেখুন: আল-মুহাল্লা ৯/৩৬৪।
(৩) দেখুন: আল-ইশরাফ, ইবনুল মুনযির ৫/১৯০, আহকামুল কুরআন, জাস্সাস ১/৪৬৯, আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ১/২৫৯; এবং ইবনে তাইমিয়া কর্তৃক ইজমার দাবির খণ্ডন দেখুন এখানে: মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৩/৯১।
(৪) দেখুন: শারহু মাআনিল আসার ৩/৫৫।

আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আবু আস-সাহবার হাদীসটি সম্পর্কে তারা চারটি দিক থেকে উত্তর প্রদান করেছেন:

প্রথমত: এই বর্ণনাটিকে ‘শায’ (বিচ্ছিন্ন বা অস্বাভাবিক) হিসেবে গণ্য করা। ইবনে আব্বাস থেকে এর বিপরীত বর্ণনা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তদুপরি তিনি এর বিপরীত ফাতওয়াও প্রদান করেছেন। সুতরাং এর বিপরীতে যা অধিক শক্তিশালী, তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে (১)।

দ্বিতীয়ত: রহিত হওয়া (নাসখ)। কেননা ইবনে আব্বাস নিজেই এই বর্ণনার বিপরীত আমল করতেন; আর এর রহিতকারী কোনো বিষয় সম্পর্কে অবগত না থাকলে তিনি এর বিপরীত করতেন না (২)।

তৃতীয়ত: এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো নির্দেশ ছিল না এবং তিনি এ সম্পর্কে অবগত হয়ে মৌনসম্মতিও

প্রদান করেননি (৩)।

চতুর্থত: হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থের বাইরে ব্যাখ্যা করা এবং একে এমনভাবে গ্রহণ করা যাতে এটি প্রমাণ না করে যে, এক সাথে তিন তালাক এক তালাক হিসেবে গণ্য হবে—যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। এ বিষয়ে তারা অনেকগুলো ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন (৪)।

দ্বিতীয় অভিমত: এক সাথে তিন তালাক এক তালাক হিসেবেই গণ্য হবে। এটি একদল তাবিঈ-এর অভিমত (৫)। এছাড়া ইসহাক (৬), দাউদ জাহেরী (৭) এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এই মতটি সমর্থন করেছেন (৮)।

---

(১) দেখুন: আত-তামহীদ, ইবনে আব্দুল বার ১৫/২৩৪-২৩৫; ইমাম আহমাদ এই বর্ণনাটিকে ‘শায’ হিসেবে গণ্য করেছেন। দেখুন: শারহু ইলালিত তিরমিযী ২/৬২৫; ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ ১০/৩৩৪-এ আল-আছরাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহকে (ইমাম আহমাদ) ইবনে আব্বাসের হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর এবং ওমরের (রাযি.) যুগে তিন তালাক এক তালাক হিসেবে গণ্য হতো। কোন জিনিসের মাধ্যমে আপনি এটি খণ্ডন করেন? তিনি বললেন: ইবনে আব্বাস থেকে এর বিপরীতে লোকজনের বর্ণনার মাধ্যমে। অতঃপর তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত অনেকগুলো বর্ণনা উল্লেখ করেন যা এর বিপরীত। আরও দেখুন: ইখতিলাফুল ফুকাহা, আল-মারওয়াযী ২৪৬; মাসাইলুল ইমাম আহমাদ ওয়া ইসহাক, আল-কাউসাজ ৪/১৭৭০; আল-জামি লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ ১৫/৬৮।
(২) এটি ইমাম শাফিয়ীর অভিমত। দেখুন: মা’রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার ১১/৩৮।
(৩) দেখুন: আল-মুহাল্লা ৯/৩৯০-৩৯১; মা’রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার ১১/৪২।
(৪) এই ব্যাখ্যাগুলো দেখতে দেখুন: মা’রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার ১১/৩৯; আল-মু’লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম, আল-মাযিরী ২/১৯৩; আল-মুগনী ১০/৩৩৫; ফাতহুল বারী ৯/৩৬৩-৩৬৪।
(৫) দেখুন: ইখতিলাফুল ফুকাহা, আল-মারওয়াযী ২৪৬; আল-মুগনী ১০/৩৩৪; ফাতহুল বারী ৯/৩৬২।
(৬) দেখুন: ইখতিলাফুল ফুকাহা, আল-মারওয়াযী ২৪৬।
(৭) দেখুন: ইলামুল মুওয়াক্কিঈন ৩/৩৪।
(৮) এই অভিমতটি একদল সাহাবী, তাবিঈ এবং তাদের পরবর্তীগণের দিকে এবং একদল ফকীহদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

এই সমস্যাটি তাদের ক্ষেত্রে উদ্ভূত হয় যারা মনে করেন যে, একত্রে তিন তালাক প্রদান করলে তা এক তালাক হিসেবে গণ্য হয়; যা জনকল্যাণমূলক প্রশাসনিক ইজতিহাদের (সিয়াসাহ মাসলাহিয়্যাহ) আওতাভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তবে উমর (রা.)-এর কর্মে সেই প্রশাসনিক বা নীতিগত দিকটি কী?

উত্তর হলো, একে তিনটি ব্যাখ্যা বা পদ্ধতির যেকোনো একটির ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব:

প্রথম ব্যাখ্যা: এটি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের পক্ষ থেকে শরয়ি প্রশাসনিক নীতির (সিয়াসাহ শারইয়্যাহ) আলোকে মানুষের ওপর আরোপিত একটি শাস্তিমূলক দণ্ড (তা’যীর), যেন তারা বিধানদাতার (শারিয়ি) হক সংরক্ষণে বাধ্য হয়। কেননা তারা বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে শরয়ি ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় বিধান পালনে অবহেলা করেছিল, যদিও তারা এ সম্পর্কে অবগত ছিল।

অতএব, এটি এমন এক শাস্তি যা কেবল প্রয়োজনের সময়েই প্রয়োগ করা হয়।

এর ওপর ভিত্তি করে এটিই সাব্যস্ত হয় যে, মানুষ যদি এই বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে বা এ বিষয়ে তাদের কোনো ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকে, তবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না। ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: "যদি উমর (রা.)-এর এই পদক্ষেপের মূল ভিত্তি এটিই হয়ে

থাকে, তবে বলা যায়: যারা এর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে অবগত ছিল এবং জানার পরেও তা করেছে এবং নিষিদ্ধতা জানার পর অধিক মাত্রায় এর পুনরাবৃত্তি করেছে, এমতাবস্থায় কেউ যদি তাদের ওপর এই বিধান (তিন তালাককে তিন হিসেবেই) কার্যকর করে, তবে সে ক্ষেত্রে সে উমর (রা.) এবং তাঁর সাথে একমত পোষণকারী সাহাবীদের অনুসরণ করল। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এটি নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে জানত না অথবা একে বৈধ মনে করে তা করেছে, তবে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয় এবং তাকে শাস্তি হিসেবে এই বিধান পালনে বাধ্য করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না স্বয়ং বিধানদাতা তিন তালাককে অবধারিত বা কার্যকর করে দেন।"

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা: অথবা তারা মনে করেন যে, তালাক এক তালাক হিসেবে কার্যকর হতো যখন মুসলমানরা তা কদাচিৎ প্রদান করত। কিন্তু যখন এর আধিক্য দেখা দিল, তখন আর এতে কোনো শিথিলতা বা সুযোগ অবশিষ্ট রইল না। এর ওপর ভিত্তি করে এটি আর কোনো স্থায়ী বা আবশ্যিক শরয়ি বিধান হিসেবে গণ্য হবে না।

= ইমাম মালিক, আবু হানিফা ও আহমাদ (রহ.)-এর মাযহাব। দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৩/ ৮১-৮৩, ই'লামুল মুওয়াক্কিয়িন ৩/ ৩৩-৩৪।
(১) দেখুন: জামিউল মাসাইল ১/ ৩২৩, মাজমুউল ফাতাওয়া ৩২/ ৩১২ এবং ৩৩/ ৮৭, ই'লামুল মুওয়াক্কিয়িন ৩/ ৩৫। আর এটিই শাইখের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য মত বলে প্রতীয়মান হয়, দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৩/ ৯১-৯২।
(২) দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৩/ ৮৮।
(৩) দেখুন: জামিউল মাসাইল ১/ ৩২৩।
(৪) দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৩/ ৮৮।

তৃতীয় দিক: এটি বলা সম্ভব যে, এই বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্য এবং সম্ভাব্য মতপার্থক্যের অন্তর্ভুক্ত (১)। ফলে ন্যায়পরায়ণ ইমাম এতে কোনো গ্রহণযোগ্য স্বার্থের বিবেচনায় একটি গ্রহণযোগ্য মত গ্রহণ করেছেন, আর এটি 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' (শরয়ি রাজনীতি) এর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) চুরির দণ্ড স্থগিতকরণ:

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দুটি ঘটনায় চোরের হাত কাটার দণ্ড স্থগিত করেছিলেন:

প্রথম ঘটনা: দুর্ভিক্ষের বছর:

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "গাছে থাকা ফলের থোকা চুরির কারণে এবং দুর্ভিক্ষের বছরে হাত কাটা হবে না" (২)।

উলামায়ে কেরাম ধারাবাহিকভাবে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যে, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'রামাদাহ' (ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ) এর বছরে চোরের হাত কাটেননি (৩)।

দ্বিতীয় ঘটনা: আব্দুর রহমান বিন হাতিবের গোলামদের চুরির ঘটনায়:

ইয়াহইয়া বিন আব্দুর রহমান বিন হাতিব থেকে বর্ণিত (যে, তার পিতা আব্দুর রহমান বিন হাতিবের কিছু গোলাম একটি উট চুরি করে সেটি যবাই করে ফেলে। তাদের কাছে উটের চামড়া ও মাথা পাওয়া যায়। এরপর তাদের বিষয়টি উমর বিন খাত্তাবের কাছে পেশ করা হলে তিনি তাদের হাত কাটার নির্দেশ দেন। তারা কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর আমরা মনে করেছিলাম যে তাদের হাত কাটা শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। এরপর তিনি আব্দুর

রহমানকে বললেন: আল্লাহর কসম! আমি দেখছি যে আপনি তাদের দিয়ে কাজ করান, আবার তাদের ক্ষুধার্ত রাখেন এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। এমনকি তারা যদি আল্লাহর হারাম করা কোনো বস্তু পেত, তবে তা তাদের জন্য হালাল হয়ে যেত। এরপর তিনি উটের মালিককে বললেন: আপনি আপনার উটের বিনিময়ে কত নিতেন? সে বলল: চারশত দিরহাম। তিনি আব্দুর রহমানকে বললেন: উঠুন এবং তাকে আটশত দিরহাম জরিমানা প্রদান করুন) (৪)।

---

(১) ইবনে তাইমিয়্যাহ কিছু ফকীহ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—যেমন তার দাদা আবুল বারাকাত ইবনে তাইমিয়্যাহ—যে তারা কখনো তিন তালাক একসাথে দিলে তা কার্যকর হওয়ার ফতোয়া দিতেন, আবার কখনো তা কার্যকর না হওয়ার ফতোয়া দিতেন। তিনি এর অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, এটি ছিল তাদের ইজতিহাদের ভিন্নতার কারণে। দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৩/৯৩। উত্তরের এই দিকের স্বপক্ষে এ জাতীয় উদাহরণ থেকে সমর্থন গ্রহণ করা যেতে পারে যে, উমরের কাজ ছিল একটি গ্রহণযোগ্য ও সম্ভাব্য পথ অবলম্বন করা।

(২) আব্দুর রাজ্জাক এটি বর্ণনা করেছেন (১৮৯৯০)।

(৩) দেখুন: যাদুল মুসাফির ৩/৩৩৪, মুওয়াত্তার উপর যুরকানীর শারহ ৪/৭৫।

(৪) মালিক মুওয়াত্তায় (৪/১০৮৩) এবং আব্দুর রাজ্জাক মুসান্নাফে ১৮৯৮৭ নম্বরে এটি বর্ণনা করেছেন।

দণ্ড রহিত করার কারণ হলো, দুর্ভিক্ষের বছর হলো মানুষের তীব্র কষ্ট ও ক্ষুধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাব্য সময়। ফলে চোর এমন এক প্রয়োজনে নিপতিত হওয়া থেকে মুক্ত নয়, যা সম্পদের মালিকের ওপর তাকে বিনামূল্যে অথবা বিনিময়ে সম্পদ প্রদান করা আবশ্যক করে দেয়। আর এটি এমন এক শক্তিশালী সংশয় (শুবহা), যা তার থেকে হদ (নির্ধারিত দণ্ড) প্রতিহত করে দেয় (১)।

ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরে অভাবী চোরের হাত কাটা যাবে না (২)।

এখানে বলা হতে পারে: এটি ফিকহি বিধানের অন্তর্ভুক্ত, রাজনৈতিক (সিয়াসী) বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ হদ ও এর শর্তাবলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জনকল্যাণমূলক রাজনীতির বিষয় নয়।

তবে বিষয়টি এখানে হদ কায়েম করা বা না করার বিধান নিয়ে আলোচনা নয়; বরং এটি একটি বিশেষ ঘটনা যেখানে উমর (রা.) এই প্রয়োজনীয়তার (জরুরত) উপস্থিতির কারণে হদ প্রয়োগ না করার ব্যাপারে ইজতিহাদ করেছিলেন। আর এই বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে এটি ইজতিহাদের দাবি রাখে, যেমনটি সাধারণ দুর্ভিক্ষকে 'জরুরত' বা বিশেষ প্রয়োজনীয়তার পর্যায়ভুক্ত হিসেবে বিচার করাও ইজতিহাদের দাবি রাখে।

আর এই রাজনীতি ইবনে হাতিবের গোলামদের কাহিনীর চেয়ে 'আমুর রামাদাহ' (দুর্ভিক্ষের বছর) এর কাহিনীতে অধিক পরিস্ফুট হয়। কারণ এটি ছিল একটি বিশেষ ঘটনা যেখানে বিচারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার কারণ (মানাত) যাচাই করা হয়েছিল, যা সেই সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনার বিপরীত।

বর্তমান সময়ের কোনো কোনো চিন্তাবিদ এই কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে এই মত পোষণ করেছেন যে, চুরির দণ্ড কেবল এমন সমাজেই কায়েম করা হবে যেখানে ন্যূনতম সচ্ছলতা বা জীবনযাত্রার মান বিদ্যমান।

আর এটি কোনো ফিকহি পদ্ধতি নয় এবং সিয়াসাতে শারঈয়্যার সাথেও এর কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ এটি একটি অকাট্য দলিলের (নস ক্বাতঈ) পরিপন্থী; কেননা শরিয়ত প্রণেতা এই শর্ত বিবেচনা না করেই দণ্ড নির্ধারণ করেছেন। উপরন্তু, এই শর্তটি অর্জিত হয়েছে কি না তা জানা প্রায় অসম্ভব। এর পাশাপাশি এটি একটি অসংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য, যার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয় যার ওপর ভিত্তি করে বিধানকে স্থগিত রাখা যায়। সুতরাং এটি দলিল পরিপন্থী একটি শর্ত এবং এর স্বপক্ষে কোনো দলিল নেই। এটি নিছক খেয়ালখুশি এবং স্বেচ্ছাচারিতার ওপর ভিত্তি করে করা একটি অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

---

(১) দেখুন: ইলামুল মুওয়াক্কিঈন ৩/১৭-১৮।
(২) দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক ৫/৫৮, আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ১৬/৩২৪, রওদাতুত তালিবীন ১০/১৩২, হিজ্জাওয়ী রচিত আল-ইকনা ৪/২৮১।

(৫) "মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম" (যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য) এর অংশ স্থগিতকরণ:

উমর (রা.)-এর রাজনৈতিক ইজতিহাদসমূহের অন্যতম একটি হলো মহান আল্লাহর বাণীতে বর্ণিত "মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম"-দের জন্য নির্ধারিত অংশটি স্থগিত করা: "নিশ্চয়ই সাদাকাহ (যাকাত) হলো কেবল অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব, এর সংগ্রাহক ও যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য..." [সূরা আত-তাওবাহ: ৬০]।

ফকীহগণ "মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম"-দের অংশের বিধান সম্পর্কে মতভেদ করেছেন:

প্রথম মত: এটি কেবল নবী (সা.)-এর যুগে ইসলামের দুর্বলতা এবং তাদের প্রতি প্রয়োজনীয়তার সময়ের জন্য ছিল (১)।

এ বিষয়েও তারা মতভেদ করেছেন; কেউ বলেছেন এটি রহিতকরণের (নাসখ) অন্তর্ভুক্ত, আবার কেউ বলেছেন এটি কোনো বিধানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য শেষ হওয়ার কারণে বিধানটি সমাপ্ত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত (২)।

দ্বিতীয় মত: এটি কেবল নবী (সা.)-এর যুগের জন্য সুনির্দিষ্ট নয়, বরং তা বহাল রয়েছে। এ মত পোষণকারীরা আবার দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত: একদল "মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম"-কে কেবল সেই সব মুসলিমের জন্য নির্দিষ্ট করেন যাদের ঈমান শক্তিশালী হওয়ার আশা করা যায় অথবা যাদের মাধ্যমে অন্য কারো ইসলাম গ্রহণের প্রত্যাশা করা যায় (৩)।

আর অন্য দল একে সাধারণ হিসেবে গণ্য করেন—সেই মুসলিমের ক্ষেত্রে যার ঈমান শক্তিশালী হওয়ার প্রত্যাশা করা হয় বা যার মাধ্যমে অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়, এবং সেই কাফিরের ক্ষেত্রে যার ইসলাম গ্রহণের আশা থাকে অথবা যার অনিষ্ট থেকে বাঁচার প্রত্যাশা করা হয় (৪)।

সুতরাং প্রথম মত অনুযায়ী, উমর (রা.) কর্তৃক এই অংশটি স্থগিত করা মূলত শরয়ী বিধান প্রয়োগ করারই অন্তর্ভুক্ত; কারণ তখন সেই সম্পদে তাদের আর কোনো অধিকার ছিল না, তাই উমর (রা.) শরয়ী বিধান বাস্তবায়নের নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

---

(১) এটি হানাফী ও মালিকী মাযহাব; দেখুন: আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ ২/২৫৯, আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ২/৩৫৯।
(২) দেখুন: আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ ২/২৬০-২৬১, আল-বাহরুর রায়েক ২/২৫৮। আল-বাবরতী রহিত হওয়ার মতটির সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন: মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে এটি রহিতকরণ নয়।
(৩) এটি শাফেয়ী মাযহাব; দেখুন: তুহফাতুল মুহতাজ ৭/১৫৫, নিহায়াতুল মুহতাজ ৬/১৫৬।
(৪) এটি হাম্বলী মাযহাব; দেখুন: আল-ইনসাফ ৭/২৩২; আরও দেখুন দুই মতের দলীল ও আলোচনা: আল-আহকামুল ফিকহিয়্যাহ

আল্লাতি ইত্তাফাকা আলাইহাল খুলাফাউর রাশিদুন, ইয়াসীন আল-হাশেদী ২/৭০৬-৭১০।

আর এই অভিমত অনুযায়ী যে অংশটি অবশিষ্ট থাকে, তা এই ইল্লত (যুক্তি বা কারণ) কার্যকর হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাই ওমর (রা.) তাঁর যুগে এই ইল্লত কার্যকর না হওয়ার কারণে তা বাতিল করেছিলেন। এটি সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি ছিল এই ইল্লত এবং মুসলমানদের মাসলাহাত বা জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি রাজনৈতিক ইজতিহাদ। (১)

(৬) জোরপূর্বক বিজিত ভূমির ওয়াকফ:

ওমরের (রা.) রাজনৈতিক ইজতিহাদসমূহের অন্যতম হলো, তিনি বিজিত ভূমি বণ্টন করতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে তিনি সেগুলোকে গণিমতের মালের মতো গণ্য করেননি, বরং সেগুলোকে ওয়াকফ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন, যা থেকে মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণে খেরাজ (ভূমি কর) গ্রহণ করা হবে।

ওমরের (রা.) এই ইজতিহাদের পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল পরবর্তী প্রজন্মের মুসলমানদের অবস্থার প্রতি তাঁর কল্যাণকামী দৃষ্টি। তিনি (রা.) বলেন: “যদি পরবর্তী মুসলমানদের চিন্তা না থাকত, তবে আমি কোনো জনপদ জয় করার পর তা এর বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন না করে ছাড়তাম না, যেমনটি নবী (সা.) খায়বার বণ্টন করেছিলেন।” (২)

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) শুরুতে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু সাহাবী তাঁকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মুয়াজ (রা.) তাঁকে বলেছিলেন—যখন ওমর (রা.) ভূমিগুলো মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন—: “আপনি যদি আজ এগুলো বণ্টন করে দেন, তবে বিশাল এই আয় বর্তমান প্রজন্মের লোকদের হাতে চলে আসবে, এরপর তারা মারা যাবে। ফলে তা কোনো একজন পুরুষ বা নারীর হাতে গিয়ে পৌঁছাবে। এরপর তাদের পরে এমন এক জাতি আসবে যারা ইসলামের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করবে অথচ তারা কিছুই পাবে না। সুতরাং এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যা তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবার জন্য পর্যাপ্ত হয়।” (৩)

ওমরের (রা.) এই ইজতিহাদের প্রকৃত রূপ অনুধাবনের জন্য আমাদের এখানে বিজিত ভূমির বিধান সম্পর্কে ফকীহগণের মতামতগুলো স্মরণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তাঁরা তিনটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

---

(১) ড. আব্দ আল-আল আতওয়াহ মনে করেন যে, ওমরের (রা.) ইজতিহাদে সিয়াসাহ শারইয়্যাহ প্রথম অভিমতের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মনে করা হয় যে বিধানটি স্থগিত হয়েছে এই যুক্তিতে যে এটি এমন এক ধরণের ইজতিহাদ যা নসের (মূল পাঠের) ইল্লতকে বিবেচনা করে এবং এর বিরোধিতা করে না। বিপরীতে দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী বিষয়টি ভিন্ন। দেখুন: আল-মাদখাল ইলাস সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৮৮। আর আমার কাছে যা স্পষ্ট হয়—আল্লাহই সর্বজ্ঞ—বিষয়টি এর উল্টো, অর্থাৎ সিয়াসাহ শারইয়্যাহ প্রথম মতের চেয়ে দ্বিতীয় মতের ওপর অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।
(২) বুখারী কর্তৃক বর্ণিত (৩১২৫)।
(৩) আবু উবায়েদ তাঁর 'আল-আমওয়াল' গ্রন্থে (৭৫), এবং ইবনু যানজুওয়াহ 'আল-আমওয়াল' গ্রন্থে (১৯৫) এটি বর্ণনা করেছেন। আরও দেখুন: বায়হাকীর 'আস-সুনান আল-কুবরা' (৯/২২৬)। এই পরামর্শ এবং এ সংক্রান্ত মতভেদের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: আবু ইউসুফের 'আল-খেরাজ' (৩৫-৩৭, ৪৫-৪৬) এবং বায়হাকীর 'আস-সুনান আল-কুবরা' (৬/৫১৭)।

প্রথম অভিমত: এগুলো ওয়াকফ (স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত) হিসেবে থাকবে। (১)

দ্বিতীয় অভিমত: ইমাম (শাসক) এগুলো বণ্টন করা অথবা ওয়াকফ রাখার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। (২)

তৃতীয় অভিমত: এগুলো বণ্টন করে দেওয়া হবে। (৩)

সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইজতিহাদে কোনো সমস্যা নেই। কারণ প্রথম অভিমত অনুযায়ী শরিয়তের মূল বিধানই হলো ওয়াকফ। ফলে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এখানে শরয়ী বিধানই প্রয়োগ করেছেন, তাই এতে কোনো জটিলতা নেই এবং এটি সিয়াসাহ শরইয়্যাহ-এর (শরয়ী প্রশাসনিক নীতি) অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী, তিনি দুটি বৈধ পন্থার মধ্যে ইখতিয়ার বা ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত ছিলেন, অতঃপর তিনি মুসলমানদের জন্য যা অধিকতর কল্যাণকর তা বেছে নিয়েছেন। ফলে এটি সিয়াসাহ শরইয়্যাহ-এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে তৃতীয় অভিমত অনুযায়ী, তাঁর ইজতিহাদ নস বা অকাট্য দলিলের বিরোধী হবে, যা একটি সমস্যাযুক্ত বিষয়। এর উত্তরে আলেমগণ বলেছেন যে, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে গনিমতের অধিকারীদের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন এবং তারা তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। (৪)

(৭) কর্মচারীদের সম্পদ অর্ধেক করে নেওয়া:

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রশাসনিক নীতিমালার মধ্যে একটি ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের নিজ কর্মচারীদের সম্পদ অর্ধেক করে নেওয়া:

শাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন কোনো কর্মচারীকে নিয়োগ দিতেন, তখন তার সম্পদের তালিকা লিখে রাখতেন। (৫)

ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, ফলে তারা তাদের সম্পদের তালিকা তৈরি করলেন; তাদের মধ্যে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও ছিলেন। অতঃপর উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের সম্পদ দুই ভাগে ভাগ করলেন; তিনি অর্ধেক নিলেন এবং অর্ধেক তাদের দিয়ে দিলেন। (৬)

---

(১) এটি মালিকি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। দেখুন: আল-বায়ান ওয়াত তাহসিল ২/৫৩৯, জামিউল উম্মাহাত ২৫০।
(২) এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবের মত। দেখুন: আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ ৫/৪৭০, শারহু মুনতাহাল ইরাদত ১/৬৪৭।
(৩) এটি শাফেয়ি মাযহাবের মত। দেখুন: নিহায়াতুল মুহতাজ ৬/১৪৭।
(৪) দেখুন: আল-খিলাফিয়্যাত, বাইহাকি ৫/২৪৬-২৪৭; রওদাতুত তালিবিন ১০/২৭৫।
(৫) ইবনে সাদ এটি আত-তবাকাতুল কুবরা ৩/২৩৩-এ বর্ণনা করেছেন।
(৬) ইবনে সাদ এটি আত-তবাকাতুল কুবরা ৩/২৩৩ এবং আবু উবাইদ আল-আমওয়াল (৩৪২)-এ বর্ণনা করেছেন।

ওমর (রা.) যখন আবু হুরায়রাকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, তখন তার সম্পদ ভাগ করেছিলেন। এছাড়া তিনি আমর ইবনুল আস এবং মুয়াজ ইবনে জাবালের সম্পদও ভাগ করেছিলেন (১)। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ ছিলেন কর্মকর্তাদের কাছে ওমরের প্রেরিত দূত, এবং তিনিই ওমরের নির্দেশে তাদের সম্পদ অর্ধেক করে ভাগ করে নিতেন (২)।

সম্পদ ভাগাভাগির এই ঘটনাটি অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ, আলেমগণ বারবার এটি উল্লেখ করেছেন (৩)।

মূলনীতি হলো একজন মুসলিমের সম্পদ পবিত্র বা অলঙ্ঘনীয়; এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তির অসম্মতিতে তার সম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ইজতিহাদের ভিত্তি কী?

উত্তর: ওমর (রা.) লক্ষ্য করেছিলেন যে, কর্মকর্তারা শাসনকার্যের কারণে এমন কিছু সুবিধা লাভ করেছেন যা শাসনভার না থাকলে তারা লাভ করতেন না। তাই তিনি মুসলিমদের বায়তুল মালের অধিকার রক্ষার পূর্ণতা এবং গভর্নরদের প্রতি তাঁর উপদেশের অংশ হিসেবে তাদের সাথে এই সম্পদগুলো ভাগ করে নেওয়াকে সমীচীন মনে করতেন।

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন:

“অনুরূপভাবে ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া, মুদারাবা (অংশীদারিত্ব), মুসাকাত (সেচ চুক্তি) ও মুজারাআহ (বর্গা চাষ) ইত্যাদি লেনদেনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা এক প্রকার উপহারের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর সেই কর্মকর্তাদের সাথেও সম্পদ ভাগ করেছিলেন যারা অত্যন্ত মর্যাদাবান ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং যাদের বিরুদ্ধে খিয়ানতের কোনো অভিযোগ ছিল না। তিনি কেবল তাদের সাথে সম্পদ ভাগ করেছিলেন এই জন্য যে, শাসনভারের কারণে তাদের সাথে যে বিশেষ পক্ষপাত ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে। বিষয়টি এই দাবিই রাখে, কারণ তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ইমাম যিনি সমতার ভিত্তিতে বণ্টন করতেন। সুতরাং যখন ইমাম ও প্রজাদের অবস্থায় পরিবর্তন এল, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আবশ্যক হলো সাধ্যমতো ওয়াজিব পালন করা এবং তার ওপর যা হারাম করা হয়েছে তা বর্জন করা; আর আল্লাহ তার জন্য যা বৈধ করেছেন তা সে নিজের জন্য হারাম করবে না” (৪)।

---

(১) দেখুন: আনসাবুল আশরাফ ১০/৩৬১।
(২) দেখুন: আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৮/৩০।
(৩) দেখুন: আন-নাওয়াদির ওয়ায-যিয়াদাত ৩/৪০২, মুখতাসার ইখতিলাফুল উলামা, আত-তাহাবি ৩/১৭৭, সিরাজুল মুলুক, আত-তরতুশি ১৪৩, নাফায়েসুল উসুল, আল-কারাফি ৯/৪০৯২-৪০৯৩।
(৪) আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ ৬৪-৬৫; আরও দেখুন: মুখতাসার আল-ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যাহ ২৭১।

কারাফী বলেন:

(অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবসা বা কৃষি থেকে হতে পারে, উপঢৌকন থেকে নয়। আবু হুরায়রা ও অন্যান্য সাহাবীদের ক্ষেত্রে উপঢৌকনকে এমন মনে করবেন না যা গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়; তা সত্ত্বেও সম্পদ অর্ধেক করে নেওয়া উত্তম। কারণ ব্যবসাকে পদের প্রভাবের মাধ্যমে বৃদ্ধি করতে হয়, ফলে মুসলিমদের পদের মর্যাদা শ্রমিকের ন্যায় হয়ে যায় এবং বিচারক বা অন্যরা পুঁজির মালিকের ন্যায়। তাই উভয় পক্ষের মধ্যে ইনসাফ বজায় রাখতে শ্রমিককে সম্পদের অর্ধেক প্রদান করা হয়েছে।) (১)

শাম্মা' বলেন:

(উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কর্মকর্তাগণের অধিকাংশ ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী এবং তাঁর সকল গভর্নর ছিলেন ন্যায়পরায়ণ; কেননা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান বৈধ নয়। আর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন ব্যক্তি ছিলেন না যিনি অবৈধ কিছু করবেন; তাঁর অবস্থান ছিল তাকওয়া ও ইনসাফের চরম শিখরে এবং তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে স্বীকৃত। বিষয়টি যখন এরূপ, তখন তাঁদের অধিকারে থাকা সম্পদের কোনো দাবিদার ছিল না, তাঁরা কারো প্রতি যুলুম করেননি এবং কেউ তাঁদের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার অভিযোগও করেনি। তিনি তাঁদের সম্পদের হিসাব চাননি, তবে তিনি রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের হাতে থাকা সম্পদ প্রচুর মনে করলেন এবং তাঁদেরকে প্রদত্ত ভাতার অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত দেখতে পেলেন। বিষয়টি তাঁর নিকট সংশয়যুক্ত হলো যে, তা পদের প্রভাব বা অন্য কিছুর মাধ্যমে উপার্জিত হয়ে থাকতে পারে। ফলে বিষয়টি এমন দাঁড়াল যেন দুইজন বিবাদে লিপ্ত, অথবা তিনি মনে করলেন যে তাঁরা যদি বৈধ কোনো উপায়েও তা বৃদ্ধি করে থাকেন, তবুও যেহেতু মূল পুঁজি বাইতুল মালের ছিল, তাই তিনি সেটিকে মুদারাবা (মুনাফা অংশীদারিত্ব) হিসেবে গণ্য করা সমীচীন মনে করলেন, যেমনটি তিনি তাঁর পুত্রের ক্ষেত্রে করেছিলেন।) (৩)

এর সারকথা হলো, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করেছিলেন যে এই সকল সম্পদে বাইতুল মালের অধিকার রয়েছে। আর তা এই কারণে যে, তাঁর গভর্নরদের যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা দুটি অবস্থার বহির্ভূত নয়:

প্রথম অবস্থা: ব্যবসা, কৃষি এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনে শাসনক্ষমতা ও পদের মর্যাদার প্রভাব থাকা, যদিও তা বৈধ পন্থায় হয়। কিন্তু এই শাসনক্ষমতা সাধারণ মুসলিমদের প্রাপ্য, যা তাঁদের জন্য এমন সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে যা এর আগে সম্ভব ছিল না।

(১) আয-যাখীরা ১০/৮১।
(২) মুদ্রিত পাঠে "আছনা" রয়েছে এবং সংশোধনটি পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।
(৩) মাতালিউত তামাম ২২৬, এবং দেখুন: আল-ইতিসাম ২/৬২১, মাওয়াহিবুল জালীল ৪/২৫২।

দ্বিতীয় অবস্থা: এই সম্পদের কিছু অংশ পক্ষপাতমূলকভাবে বা উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়ে থাকতে পারে, যাতে সন্দেহ রয়েছে অথবা তাকওয়ার দাবি হলো তা পরিহার করা। তাই ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সতর্কতা স্বরূপ এর অর্ধেক অংশ মুসলিমদের জন্য গ্রহণ করেন এবং অর্ধেক তাদের জন্য রেখে দেন।

সুতরাং এই সম্পদসমূহ এই দুই অবস্থার বাইরে হতে পারে না; কেননা উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গভর্নরগণ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ সাহাবী এবং তাঁদের মতো ব্যক্তিদের পক্ষে হারাম উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তদুপরি উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর গভর্নরদের হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, ফলে তিনি এ ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করতেন না। যদি এই সম্পদে কোনো হারাম কাজ জড়িত থাকত, তবে তিনি কেবল অর্ধেক গ্রহণের ওপর সীমাবদ্ধ থাকতেন না এবং শাস্তি প্রদান থেকেও

বিরত থাকতেন না (১)।

মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নীতি অনুসরণ করেছিলেন; তাই যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এল, তখন তিনি তাঁর সম্পদের অর্ধেক অংশ মুসলিমদের বায়তুল মালে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। এটি তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের সাথে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আচরণের অনুসরণে এবং নিজের জন্য এটি পবিত্রতা লাভের মাধ্যম হবে—এই আশায় করেছিলেন (২)।

এখানে লক্ষণীয় যে, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই নীতি গভর্নরদের ওপর কেবল কোনো জেদ বা সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা কিংবা তাঁদের সম্পদ গ্রহণে কোনো যথেচ্ছাচার ছিল না; বরং তিনি নিজেকে মুসলিমদের বায়তুল মাল এবং ইয়াতীম, দরিদ্র ও মিসকিনদের প্রতিনিধি মনে করতেন। সুতরাং এই ইজতিহাদ ছিল তাঁদের অধিকার রক্ষার অন্তর্ভুক্ত। (তাই তিনি এ বিষয়ে মুসলিমদের জন্য ইজতিহাদ করেছেন এবং তাঁদের স্বার্থে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, যেমনটি তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে করেছিলেন যখন তিনি সাধারণ মুসলিমদের স্বার্থে সতর্কতা স্বরূপ তাঁদের সম্পদের অর্ধেক নিয়েছিলেন) (৩)। এই বিষয়টি আরও শক্তিশালী হয় এই বক্তব্যের মাধ্যমে যে: (তিনি তাঁদের সাথে কেবল তখনই সম্পদের অর্ধেক ভাগ করেছিলেন যখন শাসনভার গ্রহণের পর তাঁদের এমন সম্পদ প্রকাশ পায় যা আগে তাঁদের ছিল বলে জানা ছিল না) (৪)।

এর সাথে আরও একটি দিক যোগ করা যেতে পারে, আর তা হলো—এটি শাসনভার গ্রহণের পূর্বেই শর্তযুক্ত ছিল।

---

(১) ইবনে ফারহুন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক তাঁর কর্মকর্তাদের সম্পদ অর্ধেক ভাগ করে নেওয়াকে আর্থিক দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি একে আর্থিক দণ্ডের বৈধতার প্রমাণাদির মধ্যে গণ্য করেছেন (২/২৯৩)। এটি একটি বিরল বিষয়, কারণ উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গভর্নরগণ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং তাঁরা এমন কোনো অপরাধ করেননি যার ফলে এই অর্ধেক গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইবনে ফারহুন 'আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ' গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যিমের আলোচনার সূত্র ধরে আর্থিক দণ্ডের প্রমাণাদির মধ্যে একে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যদিও ইবনুল কাইয়্যিম নিজে একে আর্থিক দণ্ডের প্রমাণাদির মধ্যে উল্লেখ করেননি।
(২) দ্রষ্টব্য: আন-নাওয়াদির ওয়াজ জিয়াদাত (৩/৪০২), ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত।
(৩) আল-ইসতিযকার ৭/৪।
(৪) সিরাজুল মুলুক ১৪৩।

সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার এই পদ্ধতির একটি সদৃশ উদাহরণ আল-ফারূকের জীবনীতে পাওয়া যায়। সেটি হলো উমর ইবনুল খাত্তাবের দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহর সাথে আবু মুসা আল-আশআরীর ঘটনা। তাঁরা যখন বসরার আমীর আবু মুসার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁদেরকে বাইতুল মাল থেকে কিছু অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করেন। তাঁরা সেই অর্থ দিয়ে পণ্য ক্রয় করে মদীনায় নিয়ে তা বিক্রয় করলেন। এরপর তাঁরা মূলধন উমরকে বুঝিয়ে দিয়ে লভ্যাংশটুকু নিজেরা গ্রহণ করতে চাইলেন। আবু মুসা এ বিষয়ে উমরের নিকট পত্র লিখলেন। উমর (রা.) বললেন: "তিনি কি সেনাবাহিনীর প্রত্যেককে একইভাবে ঋণ দিয়েছেন যেভাবে তোমাদের দুজনকে দিয়েছেন?" তাঁরা উত্তর দিলেন: "না।" তখন তিনি তাঁদেরকে মূলধন ও লভ্যাংশ উভয়ই জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। উবায়দুল্লাহ এতে আপত্তি জানিয়ে বললেন যে, যদি সেই অর্থ লোকসান হতো তবে তো তাঁরাই তার দায়ভার বহন করতেন। তখন উমর একে ‘কিরাদ’ (মুনাফা অংশীদারিত্ব) হিসেবে গণ্য করলেন এবং লভ্যাংশের অর্ধেক গ্রহণ করে বাকি অর্ধেক তাঁদেরকে প্রদান করলেন।(১)

কিছু ফকীহ উমরের এই কার্যের ওপর ভিত্তি করে বিষয়টি আরও বিস্তৃত করেছেন। তাঁদের মতে, ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্মকর্তাদের

সম্পদের হিসাব রাখবেন; অতঃপর তাঁদের নির্ধারিত ভাতার অতিরিক্ত যা কিছু থাকবে, তা তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করবেন।

(ইবনে হাবীব বলেন: একজন গভর্নর তাঁর শাসনকালে তাঁর নির্ধারিত বেতন বা ভাতা ব্যতীত যা কিছু অর্জন করবেন, অথবা একজন বিচারক তাঁর বিচারকার্যকালে কিংবা মুসলিমদের যেকোনো বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যা লাভ করবেন, ইমাম তা তাঁদের কাছ থেকে মুসলিমদের সাধারণ তহবিলের জন্য গ্রহণ করতে পারবেন। উমর (রা.) যখন কাউকে নিযুক্ত করতেন, তখন তাঁর সম্পদের হিসাব লিখে রাখতেন যাতে পরবর্তীতে তাঁর সম্পদ কতটুকু বৃদ্ধি পেল তা লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই উমর (রা.) কর্মকর্তাদের সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করতেন যখন তা অনেক বৃদ্ধি পেত এবং নিয়োগ-পরবর্তী সময়ে অর্জিত অতিরিক্ত সম্পদ পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হতো না)।(২)

(৮) মদ্যপানের শাস্তি কঠোর করা:

উমর (রা.) মদ্যপায়ীর শাস্তির বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং এ ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন। এটি তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার পর করেছিলেন। যেমনটি আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মদ্যপানকারী এক ব্যক্তিকে আনা হলে তিনি তাকে দুটি খেজুরের ডাল দিয়ে প্রায় চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। তিনি বলেন: আবু বকর (রা.)-ও অনুরূপ করেছিলেন। অতঃপর উমরের যুগে তিনি লোকজনের সাথে পরামর্শ করলে আব্দুর রহমান (রা.) বললেন: হদ বা নির্ধারিত শাস্তিসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন হলো আশি। তখন উমর (রা.) তা কার্যকর করার নির্দেশ দেন।(৩)

---

(১) ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে: মুওয়াত্তা মালিক ৪/৯৯২, আদ-দারাকুতনী ৪/২৩ এবং আল-বায়হাকী প্রণীত আস-সুনান আল-কুবরা ৬/১৮৩। ইবনে হাজার 'আত-তালখীসুল হাবীর' (৩/১৩৯) গ্রন্থে বলেছেন: এর সনদ সহীহ।
(২) আন-নাওয়াদির ওয়াজ-জিয়াদাত ৩/৪০২; আল-জামি' লি মাসাইলিল মুদাওয়ানাহ ১৫/৭২১; আত-তাওযীহ ফী শারহি মুখতাসার ইবনিল হাজিব ৭/৪১৬; আল-মুখতাসারুল ফিকহী লিবনি আরাফাহ ৯/১২৬ দ্রষ্টব্য।
(৩) ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং (১৭০৬)।

সায়েব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে, আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে এবং উমর (রা.)-এর খিলাফতের শুরুর দিকে যখন আমাদের কাছে কোনো মদ্যপ ব্যক্তিকে আনা হতো, তখন আমরা আমাদের হাত, জুতো এবং চাদর দিয়ে তাকে প্রহার করতাম। উমর (রা.)-এর শাসনের শেষ দিকে তিনি চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর যখন মানুষ সীমালঙ্ঘন ও পাপাচার করতে লাগল, তখন তিনি আশিটি বেত্রাঘাত করেন (১)।

সাহাবীগণ মদ্যপানের শাস্তিকে অপবাদ আরোপের (কযফ) শাস্তির সাথে যুক্ত করার বিষয়ে একমত হন। যেমন আলি ইবনে আবি তালিব (রা.) বলেছিলেন: আমরা মনে করি তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা উচিত; কেননা সে যখন পান করে তখন মত্ত হয়, আর যখন মত্ত হয় তখন প্রলাপ বকে, আর যখন প্রলাপ বকে তখন মিথ্যা অপবাদ দেয়—অথবা তিনি যেমনটি বলেছিলেন। ফলে উমর (রা.) হদ হিসেবে আশিটি বেত্রাঘাত প্রয়োগ করেন (২)।

এখানে উমর (রা.)-এর ইজতিহাদের ক্ষেত্র এবং এর থেকে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনের পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে মদ্যপানের শাস্তির বিষয়ে আলেমদের অভিমতসমূহ জানা আবশ্যক। এ বিষয়ে তাঁরা তিনটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: মদ্যপানের নির্ধারিত দণ্ড (হদ) হলো আশিটি বেত্রাঘাত (৩)।

দ্বিতীয় মত: মদ্যপানের নির্ধারিত দণ্ড (হদ) হলো চল্লিশটি বেত্রাঘাত (৪)।

তৃতীয় মত: এতে কোনো সুনির্দিষ্ট হদ নেই (৫)। আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত সংবাদ পাওয়া গেছে যে, তিনি মদ্যপানের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট হদ নির্ধারণ করেননি (৬)।

এরপর আমরা এই অভিমতগুলোর ভিত্তিতে উমর (রা.)-এর ইজতিহাদের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করব:

---

(১) বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং ৬৭৭৯।
(২) মালিক এটি বর্ণনা করেছেন মুওয়াত্তা ৫/১২৩৪ গ্রন্থে, আবদুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে ১৩৫৪২ নং হাদিসে এবং নাসায়ি ৫২৬৯ নং হাদিসে।
(৩) এটি হানাফি, মালিকি এবং হাম্বলিদের মাযহাব; দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক ৫/৩১, আল-যাখিরা ১২/২০৪, শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ৩/৩৬২।
(৪) এটি শাফেয়ি মাযহাব এবং হাম্বলিদের একটি বর্ণনা; দেখুন: আল-মুগনি ১২/৪৯৯, নিহায়াতুল মুহতাজ ১৫/৮, আল-মুহাল্লা ১২/৩৬৭।
(৫) এটি কোনো কোনো ফকিহদের অভিমত; দেখুন: আল-মুহাল্লা ১২/৩৬৫, ফাতহুল বারি ১২/৭২ ও ৭৪। ইবনে হাজার ফাতহুল বারি ১২/৭৫-এ বলেছেন: আমার ধারণা এটি বুখারির অভিমত।
(৬) দেখুন: শারহু মাআনিল আসার ৩/১৫৫।

আর যারা মনে করেন যে শাস্তিটি নির্ধারিত (মুকাদ্দারা) নয়, উমরের ইজতিহাদের কারণে তাদের ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কারণ এটি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোনো অপরাধ ছিল না, তাই উমর এর জন্য যা উপযুক্ত তার নির্ধারণে ইজতিহাদ করেছেন। এটি তা’জিরি (শাসনমূলক) শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক ইজতিহাদ, যা শাসক জনস্বার্থের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করার অধিকার রাখেন।

আর যারা মনে করেন যে হদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) হলো চল্লিশ, তারা বলেন: চল্লিশের অতিরিক্ত অংশটুকু তা’জিরের (শাসনমূলক শাস্তির) অন্তর্ভুক্ত (১), যা কোনো বিশেষ কারণ বিদ্যমান থাকায় হদ্দের অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে, এবং এটি একটি গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ।

আর যারা বলেন হদ্দ হলো আশি, তাদের উত্তর দুটি দিক থেকে হতে পারে:

প্রথম দিক: নবী (সা.) চল্লিশটি চাবুক মেরেছিলেন—এই কথাটি স্বীকার না করা। বরং বিষয়টি ইজতিহাদের ওপর ন্যস্ত ছিল। তাই নবী (সা.)-এর যুগে এই প্রহার কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত ছিল না। নতুবা সাহাবিগণ এর বিরোধিতা করতেন না। বরং তারা উমরের যুগে এটি নির্ধারণে ইজতিহাদ করেছেন, অতঃপর তারা আশির ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন (২)।

দ্বিতীয় দিক: কালের পরিবর্তন ঘটেছে এবং পাপাচার বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই সাহাবিগণ এই শাস্তির ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ফলে তাদের মতো লোকদের ক্ষেত্রে এটিই ছিল নবী (সা.)-এর বিধানের অনুরূপ (৩)।

তবে এটি সমস্যাযুক্ত, কারণ এতে শরয়ী হদ্দকে তার মূল ভিত্তি থেকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করে ফেলা হয়, এবং একে কোনো জনস্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি যার কারণে বিধানটি পরিবর্তিত হতে পারে।

(৯) 'জিজিয়া' নাম উল্লেখ না করে জিজিয়া গ্রহণের ওপর সন্ধি:

এটি তাগলিব গোত্রের সাথে ঘটেছিল। তারা আরবদের একটি শক্তিশালী গোত্র ছিল। তারা উমরের নিকট প্রস্তাব দিয়েছিল যে, তারা জিজিয়ার চেয়েও অধিক পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে, কিন্তু তাদের ওপর জিজিয়া নামে তা আরোপ করা যাবে না।

---

(১) দেখুন: মা’রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার ১৩/৫৩, নিহায়াতুল মুহতাজ ৮/১৫, ফাতহুল বারী ১২/৭১।

(২) দেখুন: শরহু মা’আনিল আসার ৩/১৫৫-১৫৮, আয-যাখীরা ১২/২০৫। এর ওপর ভিত্তি করেই তারা বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলোতে চল্লিশের সংখ্যা নির্ধারণের যে উল্লেখ এসেছে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন; দেখুন: শরহু মা’আনিল আসার ৩/১৫৩-১৫৫।

(৩) দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক ৫/৩১।

যুরআ ইবনে নুমান অথবা নুমান ইবনে যুরআ আত-তাগলিবী তাকে বললেন: (হে আমীরুল মুমিনীন, বনু তাগলিবের ব্যাপারে আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি! আল্লাহর কসম, তারা আরব। তারা জিযিয়া প্রদানকে অপমানজনক মনে করে এবং তারা অত্যন্ত লড়াকু এক জাতি। সুতরাং আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। তারা এমন এক জাতি যাদের কাছে—আমার মনে হয় তিনি বলেছেন—নগদ অর্থকড়ি নেই, বরং তারা গবাদি পশুর মালিক। সুতরাং আপনি তাদের ওপর সদকা (যাকাত) ধার্য করুন।) এরপর তিনি তাদের কাছে লোক পাঠালেন এবং তারা ফিরে এলে তিনি তাদের ওপর দ্বিগুণ সদকা ধার্য করলেন।(১)

উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের সাথে এই মর্মে সন্ধি করলেন যে, সম্পদ ও গবাদি পশুর সদকা হিসেবে একজন মুসলমানের কাছ থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তাদের কাছ থেকে তার দ্বিগুণ গ্রহণ করা হবে।(২)

উলামাগণ এই বিষয়টি নিয়ে মতভেদ করেছেন যে, এই বিধানটি কি যাকাতের মতো নাকি জিযিয়ার মতো?(৩)

এক্ষেত্রে সঠিক ইজতিহাদ হলো—তিনি তাদের থেকে জিযিয়া রহিত করেননি, বরং জনকল্যাণের স্বার্থে তাদের ওপর থেকে কেবল এর ‘জিযিয়া’ নামটি উঠিয়ে দিয়েছেন। আর শরীয়তে এমনটি করতে কোনো বাধা নেই।

(১০) ছয়জনের পরামর্শের ভিত্তিতে খিলাফত নির্ধারণ করা:

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (উমরকে বলা হলো: আপনি কি কাউকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করবেন না? তিনি বললেন: আমি যদি কাউকে স্থলাভিষিক্ত করি, তবে আমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন—অর্থাৎ আবু বকর—তিনিও স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। আর যদি আমি তা ত্যাগ করি, তবে আমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন—অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)—তিনিও তা ত্যাগ করেছিলেন।)(৪)

---

(১) ইবনে যানজুওয়াহ এটি বর্ণনা করেছেন ‘আল-আমওয়াল’ ১৩০ পৃষ্ঠায়, আল-বাইহাকী ‘আস-সুনান আল-কুবরা’ গ্রন্থে (১৮৭৯৬); এবং সন্ধির মূল বিষয়টি রয়েছে মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক (৯৯৭৪) ও ইবনে আবী শাইবায় (১০৫৮৭)।
(২) দেখুন: আল-মাবসূত ২/১৮৭, আল-মুগনী ১০/৫৮১।
(৩) অধিকাংশ ফকীহ উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত এই দ্বিগুণ সদকা গ্রহণের আমলের দিকে গিয়েছেন। তবে ফকীহগণ এ নিয়ে মতভেদ করেছেন যে, এর বিধান কি জিযিয়ার মতো হবে, নাকি ব্যয়ের খাত ও গ্রহণের পদ্ধতির বিচারে এটি যাকাতের বিধানভুক্ত হবে? বলা হয়েছে: এটি যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং জিযিয়া হিসেবে ব্যয় করা হবে—এটিই হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব; দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক ৫/১২৬, শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ১/৬৫৯। আবার বলা হয়েছে: এটি জিযিয়া হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং জিযিয়া হিসেবেই ব্যয় করা হবে—এটি শাফেয়ী মাযহাব; দেখুন: নিহায়াতুল মুহতাজ ৮/৯৭। আর মালিকী মাযহাবের ক্ষেত্রে ইবনে রুশদ ‘বিদায়াতুল মুজতাহিদ’ ২/১৬৮-এ বলেন: (এ বিষয়ে ইমাম মালিক থেকে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য সংরক্ষিত নেই)। দেখুন: আল-মুদাওওয়ানা ১/৩৩৩, একারণে তারা এই দ্বিগুণ করার আমলটি সমর্থন করেন না; দেখুন: আত-তাহযীব ফি ইখতিসারিল মুদাওওয়ানা ১/৪৩০, হাশিয়াতুল আদাউয়ি আলা কিফায়াতিত তালিব ১/৪৯২।
(৪) ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (৭২১৮), এবং ইমাম মুসলিম (১৮২৩)।

তারা বললেন: (হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি অসিয়ত করুন বা উত্তরসূরি নিযুক্ত করুন। তিনি বললেন: আমি এই বিষয়ের জন্য সেই ব্যক্তিদের চেয়ে অধিক হকদার কাউকে পাচ্ছি না, যাদের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। অতঃপর তিনি আলী, উসমান, যুবায়ের, তালহা, সা'দ এবং আব্দুর রহমানের নাম উল্লেখ করলেন)।(১)

এবং তিনি বললেন: (যদি আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তবে খেলাফত হবে এই ছয়জনের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে, যাদের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন)।(২)

এটি ছিল একটি জনকল্যাণমূলক প্রশাসনিক নীতি যা 'নস' (সুস্পষ্ট বিধান) এর বিরোধী নয়। কারণ নেতৃত্বের পর্যায়ে পৌঁছানোর প্রতিটি পথই ইজতিহাদী (গবেষণামূলক), যতক্ষণ না তাতে কোনো হারামের সংমিশ্রণ ঘটে।

এখানে লক্ষণীয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে খলিফা নিযুক্ত করে যাননি, তাই সাহাবীগণ আবু বকর (রা.)-এর ওপর ঐকমত্য পোষণ করেন। এরপর আবু বকর (রা.) উমর (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করা পছন্দ করেন। এরপর উমর (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছয়জন সাহাবীর মধ্যে পরামর্শের বিধান রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং তারা নিজেদের মধ্য থেকে উসমান (রা.)-কে নির্বাচিত করেন। অতঃপর উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর সাহাবীগণ মসজিদে আলী (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। এগুলি হচ্ছে শাসক নিয়োগ পদ্ধতির বিভিন্ন মাধ্যম, যা প্রমাণ করে যে, এ সবকিছুই 'সিয়াসাতে শরয়িয়াহ' (শরয়ি প্রশাসনিক ব্যবস্থা)-এর অন্তর্ভুক্ত, যেখানে মানুষের জন্য কোনটি অধিক কল্যাণকর তা অন্বেষণ করা হয়।

(১১) হজে তামাত্তু করার নিষেধাজ্ঞা:

উমর (রা.)-এর ইজতিহাদসমূহের মধ্যে একটি ছিল হজে তামাত্তু করতে নিষেধ করা। এটি একটি জটিল মাসআলা, কারণ এই ইজতিহাদের প্রকৃত রূপ ও ব্যাখ্যা নিয়ে বড় ধরনের মতপার্থক্য বিদ্যমান।

হজে তামাত্তু নিষেধ করার ক্ষেত্রে একদল সাহাবী উমর (রা.)-এর সাথে একমত হয়েছিলেন, যেমন উসমান, মুয়াবিয়া এবং ইবনে যুবায়ের (রা.)। পক্ষান্তরে অন্য সাহাবীগণ তাঁর বিরোধিতা করেছেন, যেমন আলী ইবনে আবু তালিব(৩), ইবনে উমর(৪) এবং ইবনে...

(১) বুখারী (৩৭০০) এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) মুসলিম (৫৬৭) এটি বর্ণনা করেছেন।
(৩) মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি উসমান এবং আলী (রা.)-কে দেখেছি। উসমান তামাত্তু এবং হজ-উমরাহ একত্র করতে নিষেধ করছিলেন। আলী (রা.) যখন এটি দেখলেন, তখন তিনি উভয়ের জন্য ইহরাম বাঁধলেন এবং বললেন: "লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জাতান" (আমি উমরা ও হজের জন্য উপস্থিত)। তিনি বললেন: "আমি কোনো ব্যক্তির কথার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ত্যাগ করতে পারি না।" বুখারী (১৫৬৩) এবং মুসলিম (১২২৩) এটি বর্ণনা করেছেন।
(৪) সালিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবনে উমর (রা.)-কে হজের তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি তা করার নির্দেশ দিলেন। তাকে বলা হলো যে, আপনার পিতা তো এটি নিষেধ করতেন। তিনি বললেন:...

পৃষ্ঠা 181

...আব্বাস (১), ইমরান ইবন হুসাইন (২), সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (৩) এবং আয়েশা (৪), আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

সুতরাং এই ইজতিহাদ সাহাবায়ে কিরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মাঝে সর্বসম্মত কোনো বিষয় ছিল না। বরং তাদের মাঝে এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল; ফলে তাদের অনেকে এটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এর বিরোধিতা করেছিলেন (৫)।

ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে 'তামাত্তু' নিষেধ করেছিলেন, তার দ্বারা উদ্দেশ্য কী ছিল—সে সম্পর্কে আলেমগণ তিনটি মত প্রকাশ করেছেন:

প্রথম মত: তা হলো হজ বাতিল করে উমরায় রূপান্তর করা (৬)।

সুতরাং ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যা নিষেধ করেছিলেন, তা হলো সেই হজ বাতিল করা যা সাহাবায়ে কিরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের হজের সময় করেছিলেন; কারণ...

= "নিশ্চয়ই আমার পিতা তোমরা যা বলছ তা বলেননি; বরং তিনি বলেছিলেন: হজ থেকে উমরাকে পৃথক করো; অর্থাৎ হজের মাসগুলোতে উমরা পূর্ণ করো না যদি না সাথে কুরবানির পশু (হাদয়ি) থাকে। তিনি চেয়েছিলেন যে বছরের অন্য সময়েও যেন বায়তুল্লাহ যিয়ারত করা হয়। অথচ তোমরা সেটাকে হারাম বানিয়ে ফেলেছ এবং এর জন্য মানুষকে শাস্তি দিচ্ছ, অথচ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে হালাল করেছেন।" তাকে বলা হলো: লোকেরা যদি তাঁর (ওমরের) বিরুদ্ধে কথা বাড়াত তবে তিনি বলতেন: "আল্লাহর কিতাব কি অনুসরণের বেশি হকদার নাকি ওমর?" এটি বর্ণনা করেছেন আহমদ (৫৭০০) এবং আবদুর রাজ্জাক 'আল-আমালি ফি আসারিস সাহাবাহ' গ্রন্থে (৯৬)।

(১) আবু নাদরাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবন আব্বাস তামাত্তুর আদেশ দিতেন এবং ইবনুন যুবাইর তা নিষেধ করতেন। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন (১২১৭)।
(২) ইমরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আল্লাহর কিতাবে তামাত্তু সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছে, অর্থাৎ হজের তামাত্তু। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এর আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তামাত্তুর আয়াতকে রহিত করে এমন কোনো আয়াত নাযিল হয়নি এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত পর্যন্ত তা নিষেধও করেননি। পরবর্তীকালে এক ব্যক্তি তার নিজ খেয়ালখুশি মতো কথা বলেছে।" বুখারি (৪৫১৮) ও মুসলিম (১২২৬)।
(৩) গুনাইম ইবন কাইস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসকে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "আমরা তা করেছি, অথচ সে সময় এই ব্যক্তি (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা) কাফির ছিল।" এটি মুসলিম বর্ণনা

করেছেন (১২২৫)।
(৪) দেখুন: আল-মুগনি ৩/২৩৮।
(৫) দেখুন: আল-মুগনি ৩/২৩৮, উমদাতুল কারি ৯/১৯৯, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৬/২৭৮, আত-তাওযীহ লি-শারহিল জামিউস সহীহ ১১/২৩৫।
(৬) দেখুন: শারহু মাআনিল আসার ২/১৪৬, আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীসি মুসলিম ৩/৩১৭, ইকমালুল মুআল্লিম ৪/২৯৪, আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস ১/৩৩৮, তারহুত তাসরীব ৫/১৮। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, জাসসাসের মতো কোনো কোনো ফকীহ শাস্তির হুমকিকে এই অর্থের ওপর প্রয়োগ করেছেন। আর তামাত্তু থেকে নিষেধের বিষয়টি কেবলই তানযীহ বা অনুত্তম অর্থে। ফলে তামাত্তুর ব্যাপারে ওমরের অবস্থানটি পৃথক করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ একে কেবল একটি অর্থেই প্রয়োগ করেছেন, যা হলো ফাসখ বা হজ বাতিল করা।

এটি তাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাই অন্য কারো জন্য এমনটি করার সুযোগ নেই। আর হজের ইহরাম ফাসখ বা বাতিল করার (উমরায় রূপান্তর) নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জমহুর (অধিকাংশ) ফকিহগণের অভিমত। কেউ কেউ এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ইবনুল আরাবি উল্লেখ করেছেন: "এই মুতআ (হজের ফাসখ) পরিত্যাগ করার ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও প্রথম যুগে এ নিয়ে সামান্য মতপার্থক্য ছিল, যা পরবর্তীতে দূরীভূত হয়েছে।" তবে এই (অনুমতির) অভিমতটিকে বিচ্ছিন্ন (শায) বলা হয়েছে।

এর ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই; কারণ উমর (রা.) একে শরয়ি বিষয় মনে করতেন না, বরং এটি তাঁর নিকট নিষিদ্ধ ছিল। তিনি মানুষের জন্য তা-ই নিষিদ্ধ করতেন যা তিনি নিষিদ্ধ মনে করতেন এবং তাঁর ইজতিহাদ অনুযায়ী এর কোনো বৈধ ভিত্তি ছিল না।

দ্বিতীয় মত: তিনি নারীদের মুতআ (সাময়িক বিবাহ) থেকে নিষেধ করেছিলেন এবং উমর (রা.) হজের তামাত্তু-এর নিষেধাজ্ঞা থেকে ফিরে এসে এর বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

তৃতীয় মত: তিনি প্রচলিত তামাত্তু থেকে নিষেধ করেছিলেন। আর এখানে তামাত্তু-এর অন্তর্ভুক্ত হলো 'কিরান' হজও।

আর এটি হজের তামাত্তু বৈধ হওয়ার বিষয়ে আলেমদের ঐকমত্যের ওপর একটি প্রশ্ন বা জটিলতা তৈরি করে।

---

(১) আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবি ১/১৮০; ইবনে আব্দুল বার আল-ইসতিযকার ৪/৯৫-এ বলেন: (সাহাবিদের মধ্যে এমন কাউকে আমি চিনি না যিনি হজের ইহরাম উমরায় ফাসখ বা রূপান্তর করার অনুমতি দিতেন)। এই ফাসখ বৈধ না হওয়ার মতটি হানাফি, মালিকি ও শাফেয়ি জমহুর ফকিহদের মাযহাব; দেখুন: তাবয়ীনুল হাকায়িক ২/২১, আল-বায়ান ওয়াত তাহসিল ৪/৫৮, আসনী আল-মাতালিব ১/৪৬২। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের অভিমত হলো এটি একটি সাধারণ শরয়ি বিধান; যখন সালামাহ বিন শাবীব তাঁকে বললেন: "হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনার সবকিছুই তো সুন্দর ও উত্তম, কেবল একটি বিষয় ছাড়া— আপনি হজের ফাসখ করার কথা বলেন!" তখন ইমাম আহমাদ বললেন: "আমি তো মনে করতাম আপনার বুদ্ধি আছে! আমার নিকট হজের ফাসখ বিষয়ে আঠারোটি সহিহ ও উত্তম হাদিস রয়েছে; আমি কি আপনার কথার জন্য সেগুলো ত্যাগ করব?" দেখুন: আল-কাফি, ইবনে কুদামা ১/৪৮০।
(২) দেখুন: আহকামুল কুরআন, ইবনুল ফারাস ১/২২৯।
(৩) দেখুন: আল-মুহাল্লা ৫/৯৮, আত-তাওযীহ, ইবনুল মুলক্কিন ১১/২৩৬।
(৪) দেখুন: সহিহ মুসলিমের শারহ নববী ৮/১৬৯।

(৫) দেখুন: ইবনে বাত্তালের শারহে সহিহ বুখারি ৪/২৪৫।

পৃষ্ঠা 183

ইমাম শাফেয়ী বলেন: (কেননা কিতাব, সুন্নাহ এবং এমন সব বিষয় যাতে কোনো মতবিরোধ আছে বলে আমার জানা নেই—তা নির্দেশ করে যে, হজ্জের সাথে ওমরাহর মাধ্যমে তামাত্তু করা, হজ্জে ইফরাদ এবং হজ্জে কিরান—এর সবকটিই প্রশস্ত)।

ফকীহগণ এই নিষেধাজ্ঞা বা বাধার ব্যাখ্যায় তিনটি প্রধান মতামতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: এটি তাদের জন্য উত্তম বিষয়টি বেছে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত, আর এই নিষেধাজ্ঞা অপছন্দনীয়তার (কারাহাত) জন্য, হারামের (তাহরীম) জন্য নয়। তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো, এই বিষয়ে উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

দ্বিতীয় মত: উমর (রা.) তামাত্তু থেকে নিষেধ করেননি, বরং তিনি তাদেরকে যা অধিকতর উত্তম তার দিকেই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আর তা হলো হজ্জ ও ওমরাহর মধ্যে পৃথক করা, যাতে তারা প্রতিটিকে আলাদা সফরের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারেন। এটি তাদের জন্য হজ্জ ও ওমরাহকে একত্রে আদায় করার চেয়ে উত্তম।

ইবনে আব্দুল বার বলেন: (উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কর্তৃক তামাত্তু থেকে নিষেধ করার বিষয়টি আমার নিকট শিষ্টাচারমূলক নিষেধাজ্ঞা, হারামের নিষেধাজ্ঞা নয়। কেননা তিনি জানতেন যে তামাত্তু মুবাহ, কিরান মুবাহ এবং ইফরাদও মুবাহ। সুতরাং যখন তাঁর নিকট এই সবকটির বৈধতা ও এখতিয়ার থাকা সাব্যস্ত হলো, তখন তিনি ইফরাদকে বেছে নিলেন এবং তাঁর নিকট যা মনোনীত ছিল সেটির দিকেই তিনি উৎসাহিত করতেন)।

---

(১) মুখতাসারুল মুযানী ১/৩৪৫-৩৪৬; একদল আলেম ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন, দেখুন: মাআলিমুস সুনান ২/১৬৬-১৬৭; আত-তামহীদ লিবনি আবদিল বার ৮/২০৫; শরহু নববী আলা সহীহি মুসলিম ৮/১৬৯; আল-জামি লি আহকামিল কুরআন ২/৩৮৭; মাজমুউল ফাতাওয়া ২৬/৪৯।
(২) দেখুন: ইকমালুল মুলিম ৪/২৯৪-২৯৫; শরহু নববী আলা সহীহি মুসলিম ৮/১৬৯; আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস ১/৩৪৪-৩৪৫; আহকামুল কুরআন লিল কিয়া আল-হাররাসী ১/৯৯; আল-মুনতাকা শরহুল মুয়াত্তা ২/২৩৫; শরহুয যুরকানী আলাল মুয়াত্তা ২/৩৯৭; তরহুত তাসরীব ৫/২৮ এবং ১৮/৫।
(৩) দেখুন: যাদুল মাআদ ২/১৯৩-১৯৫; মাজমুউল ফাতাওয়া ২৬/২৭৮; এবং ইমাম শাফেয়ী 'আল-উম্ম' গ্রন্থে বলেন ৭/২২৬: (হজ্জের মাসসমূহে ওমরাহ থেকে তাঁর কোনো নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি, আর এখানে নিষেধাজ্ঞার অনুপস্থিতি হারাম ও কারাহাত উভয়কেই নাকচ করে। সুতরাং এটি ইখতিয়ার ও উত্তম বিষয় নির্বাচনের অন্তর্ভুক্ত হবে); আরও দেখুন: বাহরুল মাযহাব লির রুয়ানী ৩/৩৯৭; মাআলিমুস সুনান ২/১৬৭।
(৪) আল-ইসতিযকার ৪/৯৪।

অধিকাংশ আলিমের অভিমত এই যে, উমর (রা.) এই তামাত্তু’ হজ্জ থেকে নিষেধ করেননি, বরং তিনি কেবল ফাসখ (হজ্জ ভঙ্গ করা) থেকে নিষেধ করেছিলেন (১)।

ইবনে উমর (রা.)-এর আমল এই দুই মতের স্বপক্ষে সাক্ষী হওয়ার উপযুক্ত; কারণ তিনি উমর (রা.)-এর তামাত্তু’র নিষেধাজ্ঞাকে আঁকড়ে থাকা ব্যক্তিদের কঠোর সমালোচনা করতেন। যখন তারা তাকে বলত, ‘আপনি তো আপনার পিতার বিরোধিতা করছেন’, তখন তিনি বলতেন, ‘নিশ্চয়ই আমার পিতা তা বলেননি যা তোমরা বলছ। তিনি কেবল বলেছেন: হজ্জ থেকে উমরাকে পৃথক করো; অর্থাৎ হজ্জের মাসগুলোতে হাদী (কুরবানির পশু) ছাড়া উমরা পূর্ণ হয় না। আর তিনি চেয়েছিলেন যেন হজ্জের মাসগুলো ব্যতীত অন্য সময়েও বায়তুল্লাহর যিয়ারত করা হয়। অথচ তোমরা তাকে হারাম বানিয়ে দিয়েছ এবং এর কারণে মানুষকে শাস্তি দিচ্ছ’ (২)।

সুতরাং এ বিষয়ে কোনো জটিলতা নেই, কারণ উমর (রা.) তাদেরকে কোনো শরীয়তসম্মত কাজ থেকে বিরত রাখেননি, বরং যা অধিক উত্তম সেদিকে তাদের পথনির্দেশ করেছেন।

তৃতীয় মত: উমর (রা.) তাদের ওপর এটি আবশ্যক করেছিলেন কারণ এটি তাদের জন্য অধিক উত্তম ছিল, এবং মানুষ যাতে এতে বিমুখ না হয়, আর মক্কা যেন জনশূন্য না হয়ে পড়ে, এবং এটি মক্কাবাসীদের জন্য অধিক সহজ ও কল্যাণকর ছিল (৩)।

এই সকল মতামতের ভিত্তিতে উমর (রা.)-এর অবস্থানের অন্যতম কারণ ছিল যে, তিনি আশঙ্কা করতেন পাছে হজ্জের মৌসুম ব্যতীত অন্য সময় মক্কা জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং হজ্জের মৌসুমে অধিক ভিড় হয় (৪)। আর যাতে ইফরাদ ও কিরান হজ্জের কথা মানুষ ভুলে না যায়, কারণ তিনি দেখেছিলেন মানুষ তামাত্তু’ হজ্জের দিকে বেশি আগ্রহী হচ্ছে সহজ হওয়ার কারণে, ফলে তিনি এই প্রতীক বা বিধানটি হারিয়ে যাওয়ার ভয় করেছিলেন (৫)।

সুতরাং নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত এই বক্তব্যটি সিয়াসাহ শারইয়্যাহ (শরীয়তসম্মত রাষ্ট্রনীতি)-র ওপর ভিত্তি করে জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য হবে। এটি সিয়াসাহ শারইয়্যাহর সর্বসম্মত বিষয়গুলোর বাইরের কিছু নয়; বরং এটি একটি গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ, কারণ এটি একটি বিশেষ ও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যেখানে উমর (রা.) বড় ধরণের ফিতনা বা ক্ষতির আশঙ্কা করেছিলেন যা...

---

(১) দেখুন: আল-ইস্তযকার ৪/৯৫, এবং সম্ভবত এটি উভয় বক্তব্যকেই অন্তর্ভুক্ত করে: যারা মাকরূহ বলেন এবং যারা উত্তম হওয়ার কথা বলেন।
(২) এটি আহমাদ (৫৭০০) এবং আবদুর রাজ্জাক ‘আসারুস সাহাবা’ ৯৬-তে বর্ণনা করেছেন। আর বায়হাকী ‘আস-সুনান আল-কুবরা’ (৮৮৭৫)-তে।
(৩) দেখুন: মাজমু’উল ফাতাওয়া ২৬/২৭৮; এবং দেখুন: জামিউল মাসাইল ১/৩২০-৩২১, আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/৪৭।
(৪) দেখুন: আত-তামহীদ, ইবনে আবদিল বার ৮/২১০, ইকমালুল মু’লিম ৪/২৯৫, আহকামুল কুরআন, লিকিয়া আল-হাররাসী ১/৯৯।
(৫) দেখুন: আত-তামহীদ, ইবনে আবদিল বার ৮/২১০, ইকমালুল মু’লিম ৪/২৯৬।

কাবা প্রাঙ্গণ তাওয়াফকারী ও উমরাহ পালনকারীদের থেকে জনশূন্য হয়ে পড়ার আশঙ্কায় এবং অধিক হারে তামাত্তু পালনকারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার দরুন। পাশাপাশি তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, অধিক সহজ হওয়ার কারণে মানুষ পাছে ইফরাদ ও কিরান হজ্জের বিধান ভুলে যায়; যদিও তিনি মনে করতেন যে, তামাত্তু হলো অনুত্তম (মফযুল) বিষয় এবং তা সর্বোত্তম নয়। তাই এসব অনিষ্টকর পরিস্থিতি বিবেচনার স্বার্থে এটি ছিল একটি সাময়িক নিষেধাজ্ঞা। তিনি তাদেরকে উমরাহ পালন থেকে একদম নিষেধ করেননি, বরং তিনি তাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা উমরাহর জন্য পৃথক একটি সফর করবে এবং হজ্জের সাথে উমরাহকে একত্র করবে না।

এ কারণেই পরবর্তী সময়ে যারা এই নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেছিল, ওলামায়ে কেরাম তাদের অবস্থানকে সঠিক মনে করেননি। ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: (অতঃপর যখন উসমানের শাহাদাতের পর উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলো এবং মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল: একদল উসমান ও তাঁর সমর্থকদের প্রতি ঝুঁকে পড়ল, আর অন্যদল আলী ও তাঁর সমর্থকদের প্রতি ঝুঁকে পড়ল; তখন বনু উমাইয়্যার একদল শাসক তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করতে শুরু করল এবং যে তামাত্তু করত তাকে তারা শাস্তি দিত। এমনকি তারা হজ্জের মাসগুলোতে কাউকে উমরাহ করতেও দিত না। আর এর মধ্যে এক ধরণের মূর্খতা ও জুলুম বিদ্যমান ছিল) (১)।

এবং এ জাতীয় উমর (রা.)-এর অন্যান্য ইজতিহাদসমূহ (২)।

---

(১) মাজমু'উল ফাতাওয়া ২৬/ ২৭৮-২৭৯।
(২) উমর (রা.)-এর ইজতিহাদসমূহ বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন: ইজতিহাদাতু উমর ইবনিল খাত্তাব: দিরাসাতুন উসুলিয়্যাহ—খালেদ মুহাম্মদ হানাফি; মানহাজিয়্যাতু উমর ফিল ইজতিহাদি মাআন নাস—মুহাম্মদ আত-তাওয়ীল; আল-ইজতিহাদুল উসুলিয়্যু ইনদা আমিরিল মু'মিনিন উমর ইবনিল খাত্তাব—মুহাম্মদ ফুয়াদ যাহের; মানহাজু উমর ফিত তাশরি'—মুহাম্মদ বালতাজি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উসমান ইবনে আফফানের খিলাফতে শরয়ী রাজনীতি

খলিফায়ে রাশেদ উসমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জনগণের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী খলিফায়ে রাশেদগণের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) মতো ন্যায়বিচার, ইহসান ও দয়ার পথ অনুসরণ করেছিলেন।

তাঁর কর্মজীবনে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট (মাসলাহাত) বেশ কিছু ফিকহী ইজতিহাদ লক্ষ্য করা যায়, যার মধ্যে অন্যতম হলো:

(১) কুরআন মাজীদ সংকলন:

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে কুরআন সংকলনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, (হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আসলেন। তিনি তখন সিরিয়াবাসীদের সাথে ইরাকবাসীদের নিয়ে আরমিনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কিরাআত বা কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য হুযায়ফাকে ভীত করে তুলল। তখন হুযায়ফা উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। এরপর উসমান হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট লোক পাঠালেন এই মর্মে যে, আপনার নিকট রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপিগুলো আমাদের নিকট পাঠান, যাতে আমরা সেগুলো থেকে একাধিক মুসহাফ প্রতিলিপি করতে পারি এবং পরবর্তীতে সেগুলো আপনাকে ফেরত দেব। তখন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সেগুলো উসমানের নিকট পাঠালেন। তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, সাঈদ ইবনুল আস এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশামকে নির্দেশ দিলেন এবং তাঁরা সেগুলো মুসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করলেন। উসমান উক্ত তিনজন কুরাইশীকে লক্ষ্য করে বললেন: যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের ও যায়েদ ইবনে সাবিতের মধ্যে কুরআনের কোনো শব্দ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লেখো, কারণ কুরআন তাদের ভাষাতেই নাযিল হয়েছে। তাঁরা তা-ই করলেন। যখন তাঁরা পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে একাধিক মুসহাফ তৈরির কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন উসমান মূল পাণ্ডুলিপিগুলো হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট ফেরত দিলেন। এরপর তিনি রাষ্ট্রের প্রতিটি জনপদে নব-সংকলিত এক-একটি মুসহাফ পাঠিয়ে দিলেন এবং এছাড়া অন্য কোনো পাণ্ডুলিপি বা মুসহাফে থাকা কুরআনের কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন)(১)।

এই সংকলন সম্পর্কে ঠিক তা-ই বলা হয় যা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে মুসহাফ সংকলন সম্পর্কে বলা হয়েছিল—অর্থাৎ এটি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট (মাসলাহী) একটি বিষয়; আর নবীজি কোনো কাজ স্রেফ করেননি বলেই তা অবৈধ হওয়া বোঝায় না।

(১) বুখারী কর্তৃক বর্ণিত (৪৯৮৭)।

তবে এখানে আরও একটি অর্থ যোগ করা যেতে পারে যা উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সংকলনের সাথে বিশিষ্টভাবে সম্পর্কিত; আর তা হলো সাতটি হারফের মধ্য থেকে কেবল একটি হারফ গ্রহণ করা।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন সাতটি হারফে অবতীর্ণ হয়েছে:

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: **“জিবরীল আমাকে একটি হারফের ওপর পাঠ করিয়েছেন। এরপর আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা বৃদ্ধি করতে থাকি এবং তিনি সাত হারফ পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত আমার জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন।”** (১)

আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল ক্বারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: **“আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামকে সূরা আল-ফুরকান এমনভাবে পাঠ করতে শুনলাম যা আমি যেভাবে পাঠ করি তা থেকে ভিন্ন ছিল, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তা পাঠ করিয়েছিলেন। আমি প্রায় তাঁর ওপর চড়াও হচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি তিলাওয়াত শেষ করা পর্যন্ত আমি তাঁকে অবকাশ দিলাম। এরপর আমি তাঁর চাদর দিয়ে তাঁকে পেঁচিয়ে ধরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে এলাম এবং বললাম: আমি একে এমনভাবে পাঠ করতে শুনেছি যা আপনি আমাকে যেভাবে পাঠ করিয়েছেন তার চেয়ে ভিন্ন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু**

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন: তাকে ছেড়ে দাও। এরপর তাঁকে বললেন: পাঠ করো। তিনি পাঠ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর আমাকে বললেন: পাঠ করো। আমি পাঠ করলাম। তখন তিনি বললেন: এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। নিশ্চয়ই কুরআন সাত হারফে অবতীর্ণ হয়েছে; সুতরাং তা থেকে তোমাদের জন্য যা সহজ হয় তা পাঠ করো।" (২)

আর সাত হারফ দ্বারা উদ্দেশ্য কী, সে বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। (৩)

এই মতভেদের ওপর ভিত্তি করে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে সংকলন কার্য সম্পাদন করেছিলেন তার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম প্রধানত দুটি মূল মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: তিনি মুসহাফকে কেবল একটি হারফের ওপর সংকলন করেছেন এবং অবশিষ্ট হারফগুলো পুড়িয়ে ফেলেছেন। কেননা এই হারফগুলোতে পাঠ করা ছিল সেই সকল মুবাহ বা অনুমোদিত বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তাআলা প্রশস্ততা দান এবং উম্মতের প্রতি শুরুর দিকে অনুগ্রহ স্বরূপ অনুমতি দিয়েছিলেন। আর তা ছিল অর্থের ঐক্য বজায় রেখে কিছু শব্দের ভিন্নতা মাত্র, যাতে তাদের ভাষার বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কুরআন পাঠ করা তাদের জন্য সহজ হয় এবং শুরুর দিকে তা যেন তাদের জন্য কষ্টসাধ্য না হয়। অতঃপর যখন উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর সঙ্গে থাকা সাহাবীগণ আশঙ্কা করলেন যে...

---

(১) বুখারী (৩২১৯) এবং মুসলিম (৮১৯) এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) বুখারী (৫০৪১) এবং মুসলিম (৮১৮) এটি বর্ণনা করেছেন।
(৩) এই মতগুলো এবং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন: 'হাদীসুল আহরুফ আস-সাবআহ', আব্দুল আযীয ক্বারী, পৃষ্ঠা ৫০-৬২।

...এর ফলে দলাদলি ও মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছিল, তাই তাঁরা ইজতিহাদ করলেন এবং এই প্রশস্ততার সুযোগ গ্রহণের কল্যাণের চেয়ে এই ফিতনা বা ক্ষতি দূর করাকে অগ্রাধিকার দিলেন। এতে কোনো ওয়াজিব বিষয় ত্যাগ করা হয়নি, বরং এটি ছিল কেবল একটি মুবাহ (বৈধ) বিষয়ের ক্ষেত্রে (১)।

দ্বিতীয় মত: তিনি সাত হারফে মুসহাফ সংকলন করেছেন এবং এই হারফগুলো বর্তমানের মুসহাফেও বিদ্যমান রয়েছে (২)।

এই মতানুসারে, উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কর্মে সংকলনের ক্ষেত্রে সেই একই অর্থে ইজতিহাদ পরিলক্ষিত হয়, যে অর্থে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইজতিহাদ করেছিলেন।

(২) হারানো উট বিক্রয়:

(জায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানি থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "তুমি তার বাঁধন বা পাত্র এবং তার থলি চিনে রাখো। তারপর এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দাও। এরপর তা ভোগ করো। যদি তার মালিক আসে তবে তাকে তা দিয়ে দাও।" সে বলল: "হারানো উট সম্পর্কে কী বলেন?" তিনি রাগান্বিত হলেন এমনকি তাঁর গাল দুটি লাল হয়ে গেল, অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন: তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন: "তোমার সাথে তার কী সম্পর্ক? তার সাথে রয়েছে তার পানির আধার ও পা। সে নিজেই পানির উৎসে পৌঁছাতে পারে এবং গাছপালা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং তাকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তার মালিক তাকে খুঁজে পায়।" সে বলল: "হারানো বকরি সম্পর্কে কী বলেন?" তিনি বললেন: "সেটি তোমার জন্য, অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য, নতুবা নেকড়ের জন্য।") (৩)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারানো উটের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ উট এমন বস্তু নয় যা কুড়িয়ে নিতে হয়, বরং এটি পথ হারিয়ে ফেললে নিজেই নিজের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। সে নিজেই বিপদ-আপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, যতক্ষণ না তার মালিক তাকে খুঁজে পায় অথবা সে মালিকের কাছে ফিরে যায় (৪)।

---

(১) দেখুন: তাফসির আত-তবারি ১/৫৭ - ৬৫, শারহু মুশকিলিল আসার ৮/১২৩ - ১২৪, আলামুল হাদিস লিল খাত্তাবি ২/১২০৮, আত-তামহিদ ইবনে আবদিল বার ৮/২৯৩, মাজমুউল ফাতাওয়া ১৩/৩৯৬ - ৩৯৭, আল-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/৪৭ - ৪৮; ইবনে তাইমিয়্যাহ একে জমহুর উলামা ও সালাফদের অভিমত বলে উল্লেখ করেছেন, দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ১৩/৩৯৫।
(২) দেখুন: আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল ২/৯৩৪ - ৯৩৬, আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তআ ১/৩৪৭, আল-ইন্তিসার লিল কুরআন লিল বাকিলানি ১/৩৫১ - ৩৫২, আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিসি মুসলিম ২/৪৪৮।
(৩) বুখারি (৯১) ও মুসলিম (১৭২২) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।
(৪) দেখুন: আলামুল হাদিস লিল খাত্তাবি ১/২০৪, শারহুন নাওয়াওয়ি আলা সহিহি মুসলিম ১২/২৩।

তবে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই হারানো পশুগুলোকে তাদের মালিকদের জন্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একত্রিত করার ইজতিহাদ করেছিলেন। যদি কেউ সেগুলোর দাবি নিয়ে না আসত, তবে তিনি সেগুলো বিক্রি করে দিতেন এবং তাদের জন্য সেগুলোর মূল্য সংরক্ষণ করতেন।

যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (উমর তাঁর কর্মচারীদের কাছে লিখেছিলেন: তোমরা হারানো পশুকে পথভ্রষ্ট করো না। তিনি বলেন: উটগুলো আপন অবস্থায় বংশবৃদ্ধি করত এবং পানির ঘাটে আসত, কেউ সেগুলোর গতিরোধ করত না; যতক্ষণ না এমন কেউ আসত যে সেগুলোকে চিনত এবং নিয়ে যেত। অবশেষে যখন উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগ এলো, তিনি লিখে পাঠালেন যে, তোমরা সেগুলোকে একত্রিত করো এবং সেগুলোর ঘোষণা দাও। এরপর যদি এমন কেউ আসে যে সেগুলোকে চেনে, অন্যথায় সেগুলো বিক্রি করে দাও এবং সেগুলোর মূল্য বায়তুল মালে রেখে দাও। অতঃপর যদি এমন কেউ আসে যে সেগুলোকে চেনে, তবে তাকে সেই মূল্য প্রদান করো)। (১)

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (আমি আলীকে হারানো পশুদের জন্য একটি খোঁয়াড় নির্মাণ করতে দেখেছি। তিনি সেগুলোকে বায়তুল মাল থেকে এমন পরিমাণ খাদ্য দিতেন যাতে সেগুলো অতি স্থুলও হতো না আবার জীর্ণশীর্ণও হতো না। সেগুলো তাদের ঘাড় উঁচিয়ে রাখত। যে ব্যক্তি কোনো পশুর ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করত, সে তা নিয়ে যেত; অন্যথায় তিনি সেগুলোকে সে অবস্থায় বহাল রাখতেন, বিক্রি করতেন না। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন: আমি যদি মুসলমানদের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব পেতাম, তবে আমি এমনই করতাম)। (২)

ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে হারানো উটগুলো ছিল স্বাধীনভাবে বিচরণকারী এবং বংশবৃদ্ধিকারী, কেউ সেগুলোকে স্পর্শ করত না। অবশেষে যখন উসমান ইবনে আফফানের যুগ এলো, তিনি সেগুলোর ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর সেগুলো বিক্রি করা হতো। এরপর যখন সেগুলোর মালিক আসত, তখন তাকে তার মূল্য দিয়ে দেওয়া হতো)। (৩)

এখানে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইজতিহাদকে স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য হারানো উট তুলে নেওয়া বা কুড়িয়ে পাওয়ার বিধান সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের অবস্থানগুলো পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। হারানো উট ধরার বিধানের ক্ষেত্রে ফকীহগণ বেশ কিছু মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করা মুস্তাহাব। এটি হারিয়ে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে উত্তম; কারণ এটি...

---

(১) আবদুর রাজ্জাক এটি 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (১৮৬০৬)।
(২) ইবনে আবি শাইবা এটি 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (২১১৪৪)।
(৩) মালিক এটি 'আল-মুওয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (৪/১০৯৯)।

...মানুষের সম্পদ সংরক্ষণের পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি সেটি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তা ফেলে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

হাদিসে বর্ণিত নিষেধকে তারা দুটি বিষয়ের কোনো একটির ওপর প্রয়োগ করেছেন:

প্রথমটি: (এটি শুরুর যুগের কথা, কারণ সেই সময়ে সৎ ও নেককার লোকদের প্রাধান্য ছিল; ফলে কোনো কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি তা ফেলে রাখলে কোনো খিয়ানতকারীর হাত তাতে পৌঁছাত না। কিন্তু আমাদের যুগে কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি তার পরে সেখানে কোনো খিয়ানতকারীর হাত পৌঁছাবে না বলে আশ্বস্ত হতে পারে না। সুতরাং তা গ্রহণ করার মধ্যেই সেটি টিকে থাকা এবং এর মালিকের জন্য সংরক্ষিত হওয়া নিহিত রয়েছে। অতএব, একে নষ্ট হতে দেওয়ার চেয়ে গ্রহণ করাই অধিক শ্রেয়)।

দ্বিতীয়টি: অথবা এটি ওই বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা হবে যেটির ব্যাপারে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। তবে যদি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করাই অধিক শ্রেয়।

দ্বিতীয় অভিমত: যদি তা মরুভূমিতে পাওয়া যায় এবং নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, অথবা লুটপাটের সময় হয়, তবে তা কুড়িয়ে নেওয়া জায়েজ।

তৃতীয় অভিমত: ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি ব্যতীত এটি কুড়িয়ে নেওয়া জায়েজ নয়। তবে যদি তা এমন কোনো স্থানে পাওয়া যায় যেখানে সেটি নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে, অথবা ‘দারুল হারব’-এর কাছাকাছি হয়, অথবা এমন কোনো স্থানে যেখানে সেখানকার অধিবাসীরা মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠন বৈধ মনে করে, অথবা পানিহীন মরুভূমিতে পাওয়া যায়—তবে সংরক্ষণের জন্য সেটি গ্রহণ করাই উত্তম; ঠিক যেমন ইমাম সংরক্ষণের জন্য তা গ্রহণ করতে পারেন। আর ইমাম চারণভূমিতে তা সংরক্ষণ করার মাধ্যমে অথবা তা বিক্রি করে দিয়ে তার মূল্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জনস্বার্থের অনুসরণ করবেন।

---

(১) এটি হানাফি মাজহাবের অভিমত; দেখুন: শারহু মুখতাসারিত তাহাবি ৪/৬৪-৬৫, আল-মাবসুত ১০/১১, আল-ইখতিয়ার লি-তা'লিলিল মুখতার ৩/৩৪।
(২) দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক ৫/১৬৭।
(৩) আল-মাবসুত ১১/১১, এবং দেখুন: ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম ৬/১২৫।
(৪) দেখুন: আল-বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ ৭/৩৩৪।
(৫) এটি শাফেয়ি মাজহাবের অভিমত; দেখুন: কিফায়াতুন নাবিহ, ইবনুর রিফ'আ ১১/৪৫৭-৪৫৮, নিহায়াতুল মুহতাজ ৫/৪৩৩; এখানে আরও যোগ করা হয়েছে যে, শাফেয়িগণ সংরক্ষণ ও মালিকানার উদ্দেশ্যে কুড়িয়ে নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য করেন। সুতরাং মরুভূমিতে মালিকানার উদ্দেশ্যে তা কুড়িয়ে নেওয়া যাবে না, তবে লুটপাটের সময়ে তা নেওয়া যাবে।

(৬) দেখুন: আল-মুগনি ৬/১০৮-১০৯, আল-মুবদি' ফি শারহিল মুকনি' ৫/১২০, গায়াতুল মুনতাহা ১/৮১৪, কাশশাফুল কিনা' ৪/২১২।
(৭) শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ২/৩৮৭।

চতুর্থ অভিমত: তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না, যদি না তাতে খিয়ানত (নষ্ট হওয়া বা আত্মসাৎ) হওয়ার আশঙ্কা থাকে (১)।

এই মতপার্থক্য মূলত হাদিসে বর্ণিত নিষেধের উদ্দেশ্য বোঝার ওপর ভিত্তি করে। নবী (সা.) যখন উট কুড়িয়ে নিতে নিষেধ করেছেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য কি নিরঙ্কুশভাবে নিষেধ করা ছিল, নাকি উটের মালিকের ক্ষতির আশঙ্কায় কুড়িয়ে নেওয়া থেকে নিষেধ করা ছিল?

আমরা এই মতপার্থক্যকে দু’টি ধারায় বিভক্ত করতে পারি:

প্রথম ধারা: যারা কুড়িয়ে নেওয়া বৈধ মনে করেন। তাঁরা হাদিসের ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, এর সম্বোধন কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের ব্যাপারে নিরঙ্কুশভাবে নিষেধ করা নয়, অথবা এটি বিশেষ কোনো সময়ের জন্য একটি নিষেধ ছিল। আর এটি হানাফি মাযহাবের অভিমত।

দ্বিতীয় ধারা: মূলগতভাবে কুড়িয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ, তবে বিশেষ কিছু জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্র ব্যতীত। এটি অন্য তিনটি মাযহাবের অভিমত। তাঁরা মূলগতভাবে হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করেন এবং হাদিসের উদ্দেশ্য কোনো বিশেষ অর্থের ওপর ভিত্তি করে স্থির করার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ব্যতিক্রম নির্ধারণ করেন।

সুতরাং, সকল আলেমের বুঝ অনুযায়ী, হাদিসে হারানো উট ধরা থেকে নিষেধ করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাকে নিরঙ্কুশভাবে উপেক্ষা করা হবে যদিও এর ফলে তা ধ্বংস হয় এবং এর কারণে মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়; বরং এই নিষেধটি একটি বিশেষ অর্থের কারণে এসেছে। উলামায়ে কেরাম সেই অর্থের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য করেছেন। উসমান ও উমর (রা.)-এর ইজতিহাদও হাদিস ও এর মর্মার্থ উপলব্ধির অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি যুক্তিসঙ্গত বিষয়, কারণ এর সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এটি হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে এবং বাস্তব প্রেক্ষাপটে জনকল্যাণ অর্জনে তা প্রয়োগের ব্যাপারে একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিজ্ঞ ইমামের ইজতিহাদ। আর এটি শরয়ি রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত।

উমর ও উসমান (রা.)-এর এই ইজতিহাদকে দু’টি বিষয়ের কোনো একটির ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব:

প্রথমত: হাদিসে বর্ণিত এই নিষেধ একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। সুতরাং যখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, তখন বিধানেরও পরিবর্তন হয়েছে।

(১) এটি মালিকি মাযহাবের অভিমত; দেখুন: শারহু মুখতাসার খলিল, লিল-খারশি ৭/১২৭; হাশিয়াতুদ দসুতি আলাশ শারহিল কবির ৪/১২২।

ইবনে রুশদ বলেন:

“মানুষের মাঝে চারিত্রিক অবক্ষয় ও নীতিভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়ার কারণে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই বিষয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব এবং উসমান ইবনে আফফানের হুকুমে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং উমর ইবনুল খাত্তাবের খিলাফতের সময় হারানো পশুর বিধান ছিল এই যে, এগুলো ধরা হবে না। যদি কেউ তা ধরে ফেলে তবে তার ঘোষণা দিবে; আর যদি মালিকের সন্ধান পাওয়া না যায়, তবে পশুটি যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই ছেড়ে দিবে। অতঃপর উসমান (রা.)-এর যুগে যখন মানুষের মাঝে আমানতদারিতার অভাব প্রকাশ পেল, তখন বিধান হলো এগুলো ধরা হবে এবং এর ঘোষণা দেওয়া হবে। যদি মালিকের সন্ধান না পাওয়া যায় তবে তা বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং এর অর্জিত মূল্য মালিকের জন্য জমা রাখা হবে।” (১)

ইবনে বাত্তাল বলেন:

“উসমান (রা.) হারানো উটগুলো বিক্রি করে দিয়েছিলেন এবং এর অর্জিত মূল্য এর প্রকৃত মালিকদের জন্য গচ্ছিত রেখেছিলেন। মানুষের মাঝে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেওয়ার কারণে তিনি মনে করেছিলেন যে, এতেই মালিকদের সম্পদ সংরক্ষিত হওয়া অধিকতর নিশ্চিত হয়।” (২)

দ্বিতীয়ত: হাদীসের উদ্দেশ্য হারানো উটের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে ঢালাওভাবে নিষেধ করা নয়; বরং এটি এমন একটি নিষেধাজ্ঞা যা উটের মালিকের সম্পদের অধিকার রক্ষার স্বার্থ ও কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত, যাতে কেউ এতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

এই কারণেই হারানো উটের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে উমর (রা.) ও উসমান (রা.)-এর কর্মপদ্ধতিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে, কারণ তাঁদের প্রত্যেকেই যা অধিকতর কল্যাণকর ও যুগোপযোগী তাই অন্বেষণ করেছিলেন।

ইমাম শাফিঈ বলেন:

“যদি শাসকের নিজস্ব সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে এবং হারানো পশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পশুর মালিকের ওপর কোনো আর্থিক বোঝার দায় না চাপে, তবে শাসক উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যা করেছিলেন তেমনই করবেন: অর্থাৎ পশুটিকে চারণভূমিতে ছেড়ে রাখবেন যতক্ষণ না এর মালিক আসে... আর যদি শাসকের কোনো চারণভূমি না থাকে এবং পশুর দেখাশোনার জন্য লোক ভাড়া করতে হয়, যার ফলে সেই পারিশ্রমিক পশুটির জিম্মায় ঋণ হিসেবে বর্তাবে; তবে আমি মনে করি তিনি উসমান ইবনে আফফান (রা.) যা করেছিলেন তেমনটিই করবেন। তবে যেসব ক্ষেত্রে জানা যাবে যে মালিক নিকটেই আছে—যেমন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির উট চেনা যায়, তবে সেটিকে আটকে রেখে মালিককে অবগত করবে; অথবা যদি কোনো নির্দিষ্ট গোত্রের ছাপ (চিহ্ন) চেনা যায়, তবে তাদের জন্য একদিন, দুই দিন বা তিন দিন অথবা অনুরূপ সময়ের জন্য পশুটিকে আটকে রাখবে।” (৩)

---

(১) আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ১৫/৩৬০।
(২) শারহুল বুখারী, ইবনে বাত্তাল ৬/৫৪৮-৫৪৯; এবং একই অর্থের বর্ণনার জন্য দেখুন: আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা, বাজী ৬/১৪৩-১৪৪।
(৩) আল-উম্ম ৪/৬৯।

(৩) জুমুআর দিনে আযান বৃদ্ধি করা:

সায়েব ইবন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর যুগে জুমুআর দিনের আযানের সূচনা তখন হতো যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন। অতঃপর যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগ এল এবং মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি ‘যাওরা’ নামক স্থানে তৃতীয় একটি আযান বৃদ্ধি করেন। (১)

যুহরী বলেন: আমীরুল মুমিনীন উসমান তৃতীয় আযানটির প্রবর্তন করেন। ফলে যাওরা নামক স্থানে আযান দেওয়া হতে লাগল যাতে মানুষ একত্রিত হতে পারে। (২)

বস্তুত (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর এবং উমরের যুগে আযান ছিল সেটিই, যা ইমাম মিম্বরে বসার সময় তাঁর সামনে দেওয়া হতো। আর এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই)। (৩)

ইবন আব্দিল বার বলেন: (আর জুমুআর দিনের প্রথম আযানের ব্যাপারে আমি এমন কোনো মতভেদ জানি না যে, উসমানই প্রথম এটি করেছেন)। (৪)

এই আযানের বিধানের ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: এটি একটি বিদআত (নবোদ্ভাবিত বিষয়)। এটি ইবন উমর এবং জনৈক তাবিঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে (৫), এবং এটি সুফিয়ানেরও বক্তব্য। (৬)

---

(১) বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (৯১২)। যাওরা: মদীনার বাজারের একটি স্থান।
(২) ইবন আবী শায়বাহ এটি 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (৫৩৯০)।
(৩) ফাতহুল বারী, ইবন রাজাব ৮/২১৫।
(৪) আত-তামহীদ ১০/২৪৭। এই আযান সর্বপ্রথম কে প্রবর্তন করেছেন সে সম্পর্কে আরও কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে: উমর; আবার বলা হয়েছে: হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ; আবার বলা হয়েছে: যিয়াদ ইবন আবীহ; এবং বলা হয়েছে: মুয়াবিয়া। দেখুন: আল-উম্ম ১/২২৪, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক (৫৩৩৯), ফাতহুল বারী, ইবন হাজার ২/৩৯৫।
(৫) ইবন আবী শায়বাহ তার মুসান্নাফ গ্রন্থে (৫৪৩৭) ইবন উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: জুমুআর দিনের প্রথম আযানটি বিদআত। হাসান (৫৪৩৫) থেকে বর্ণিত যে, এটি একটি নবোদ্ভাবিত বিষয়। আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফ গ্রন্থে (৫৩৩৯) আতা থেকে এর অস্বীকৃতি বর্ণনা করেছেন। আরও দেখুন: আহকামুল কুরআন, জাসাস ৩/৫৯৪; ফাতহুল বারী, ইবন রাজাব ৮/২১৫। ইবন উমরের বক্তব্যটি অস্বীকৃতিমূলক হতে পারে অথবা এর অর্থ হতে পারে যে, এটি এমন একটি বিষয় যা আগে ছিল না কিন্তু তা ভালো। দেখুন: ফাতহুল বারী, ইবন হাজার ২/৩৯৪।
(৬) দেখুন: ফাতহুল বারী, ইবন রাজাব ৮/২১৯-২২০।

দ্বিতীয় অভিমত: এটি মোস্তাহাব নয় (১)।

তৃতীয় অভিমত: এটি মোস্তাহাব (২)। এটিই ফকীহগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের (জমহুর) অভিমত, যা উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সুন্নাহ এবং তাঁর যুগে ও পরবর্তী সময়ে সাহাবীগণের আমল থেকে গৃহীত।

যাই হোক, উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই ইজতিহাদ সম্পর্কে উত্তর প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই থেকে যায়; কেননা এটি একটি ইবাদতগত বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু যোগ করা।

উত্তর: এটি মানুষের আধিক্য এবং তাদের বাসস্থান দূরে হওয়ার কারণে ছিল; ফলে তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু বিষয়টি ইবাদতগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় এটি জটিলতা সৃষ্টি করে; এমতাবস্থায় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এমন দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে বৈধ হতে পারে?

নিম্নোক্ত দুটি দিক উল্লেখ করার মাধ্যমে উত্তরটি স্পষ্ট হয়:

প্রথম দিক: নস (মূল পাঠ)-এর পরিপন্থী বলে যা ধারণা করা হয়, সেই সংশয় দূর করার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের ইজতিহাদের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। নস উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁদের গভীর প্রজ্ঞা রয়েছে, তাই এই বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। তাঁদের কোনো ইজতিহাদকে অন্যদের ইজতিহাদের সমান গণ্য করা যাবে না; বিশেষত যখন আমরা এমন এক প্রসিদ্ধ ইজতিহাদ নিয়ে আলোচনা করছি যার কোনো বিরোধিতাকারী সম্পর্কে জানা নেই। সুতরাং এটি 'ইজমা আমলী' (ব্যবহারিক ঐকমত্য)-এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দিক: জুমুআর এমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কিছুর ওপর কিয়াস (অনুমান) করা সম্ভব নয়। এর গুরুত্বের কারণে, সপ্তাহে মাত্র একবার হওয়ার কারণে এবং এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে সেখানে এর জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছিল। অন্য কোনো বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, কারণ অন্য ক্ষেত্রে এটি বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়।

---

(১) এটি ইমাম শাফেঈর অভিমত যা 'আল-উম্ম' (১/২২৪) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এটি ইবনে যুবায়েরের কর্মপন্থা থেকেও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, কারণ তাঁর শাসনকালে এর জন্য আযান দেওয়া হতো না। আব্দুর রাজ্জাক এটি 'আল-মুসান্নাফ' (৫৩৪৪) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
(২) এটি হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অভিমত। দেখুন: হাশিয়া ইবনে আবিদিন ২/২৬১, শরহে খুরাশীর ওপর হাশিয়া আল-আদবী ১/২৩১, ইবনে আবি উমর কৃত আশ-শারহুল কাবীর ২/১৮৮।

(৪) মৃত্যু-শয্যায় তালাকপ্রাপ্তার উত্তরাধিকার:

রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার স্বামীর উত্তরাধিকারী হবে যদি স্বামী তার ইদ্দতকালীন অবস্থায় মারা যায়। পক্ষান্তরে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি ইদ্দতকালীন অবস্থায় মারা যায় তবে সে উত্তরাধিকারী হবে না। এগুলো সুস্পষ্ট বিধান যাতে কোনো সংশয় নেই।

তবে একটি জটিল মাসআলা উদ্ভূত হয়েছে, আর তা হলো— কোনো ব্যক্তি যদি তার এমন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে, চাই তা তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে হোক কিংবা সে উদ্দেশ্য না থাকলেও। কিন্তু এই অবস্থায় তালাক দেওয়া এই সন্দেহের অবকাশ রাখে। উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল এবং সাহাবীগণ ওই নারীকে তার স্বামীর সম্পদ থেকে উত্তরাধিকার প্রদানের ফয়সালা দিয়েছিলেন।

ঘটনাটি হলো— আব্দুর রহমান ইবনে আউফ অসুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রীকে চূড়ান্তভাবে তালাক দিয়েছিলেন, ফলে উসমান ইবনে আফফান ওই নারীর ইদ্দত শেষ হওয়ার পরও তাকে তার উত্তরাধিকার প্রদান করেছিলেন (১)।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল যেখানে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইবনে মুকাম্মিলের স্ত্রীদের তার সম্পদ থেকে উত্তরাধিকার প্রদান করেছিলেন, অথচ তিনি অসুস্থ অবস্থায় তাদের তালাক দিয়েছিলেন (২)।

আর এটাই জমহুর বা অধিকাংশ ফকীহগণের অভিমত; কারণ মৃত্যু-শয্যায় থাকাকালীন বায়েন তালাক দেওয়া এই সন্দেহের উদ্রেক করে যে, তিনি তাকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা করেছেন (৩)।

ইমাম শাফেঈ তার নতুন অভিমতে (কাওলে জাদিদ) এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, সে উত্তরাধিকারী হবে না (৪)।

এই উত্তরাধিকার প্রদানের বিষয়টি উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান এবং আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত হয়েছে।

---

(১) মালিক এটি বর্ণনা করেছেন আল-মুওয়াত্তায় ৪/৮২২, আব্দুর রাজ্জাক আল-মুসান্নাফে (১২১৯৫), সাঈদ বিন মানসুর তার সুনানে ২/৭০ এবং আল-বায়হাকী আস-সুনান আল-কুবরায় ৭/৫৯৪।
(২) মালিক এটি বর্ণনা করেছেন আল-মুওয়াত্তায় ৪/৮২৩, আব্দুর রাজ্জাক আল-মুসান্নাফে (১২১৯৬) এবং আল-বায়হাকী আস-সুনান আল-কুবরায় ৭/৫৯৪।
(৩) হানাফীগণের নিকট সে উত্তরাধিকারী হবে যতক্ষণ না সে ইদ্দত থেকে বের হয়, হাম্বলীগণের নিকট সে উত্তরাধিকারী হবে যতক্ষণ সে পুনরায় বিবাহ না করে, এবং মালিকীগণের নিকট সে উত্তরাধিকারী হবে যদিও সে পুনরায় বিবাহ করে; দেখুন: আল-হিদায়া ২/২৫১, আল-বাহরুর রায়িক ৪/৪৬, আত-তাওযীহ ফী শারহি মুখতাসার ইবনিল হাজিব ৪/৩৩০, আশ-শারহুল কাবীর আদ-দারদীর ২/৩৫৩, আল-মুগনী ৬/৩৯৫, কাশশাফুল কিনা ৪/৪৮০।
(৪) দেখুন: আল-উম্ম ৫/২৪১, আল-হাওয়ী আল-কাবীর ৮/১৪৯, এটি ইবনে হাযমেরও মত, দেখুন: আল-মুহাল্লা ৯/৪৮৬।

এবং আয়িশা, উবাই ইবনে কাব এবং বদরের অন্যান্য সকল সাহাবী; আর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (১) ছাড়া তাঁদের বিরোধী কোনো সাহাবীর কথা জানা যায় না।

উসমান (রা.) এবং তাঁর সাথে থাকা অন্যান্য সাহাবীদের ইজতিহাদের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করেন যে, এটি মূলত স্ত্রীর থেকে ক্ষতি দূর করার ক্ষেত্রে মাসলাহাত বা জনস্বার্থ বিবেচনা করে করা হয়েছে (২)। অথবা এটি এই মূলনীতির ভিত্তিতে যে: "ব্যক্তি যদি সময়ের আগে কোনো কিছু পেতে তাড়াহুড়া করে, তবে তাকে তা থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়", যেমন মিরাসের ক্ষেত্রে হত্যাকারী (৩)। অথবা এটি ছিল 'সাদ্দুজ যারায়ে' বা অকল্যাণের পথ রুদ্ধ করার অন্তর্ভুক্ত; কারণ স্বামী এক্ষেত্রে অভিযুক্ত এবং তালাক হলো একটি মাধ্যম (৪)।

যেমন ইবনে শিহাব তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: উসমান (রা.)-কে বলা হলো: আপনি কেন তাকে উত্তরাধিকারী করলেন অথচ আপনি জানেন যে, আবদুর রহমান তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কিংবা আল্লাহ তাআলার কিতাব থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে তালাক দেননি? উসমান (রা.) বললেন: আমি চেয়েছি এটি যেন একটি সুন্নাত (রীতি) হয়, যাতে মানুষ মহান আল্লাহ তাআলার কিতাব থেকে পলায়নের ব্যাপারে ভীত থাকে (৫)।

প্রকৃত কথা এই যে, এই ইজতিহাদের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য এই মূলনীতিগুলো যথেষ্ট নয়; বরং এগুলো কেবল সহায়ক হিসেবে বা দলিলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য। কারণ এখানে বিষয়টি তালাকপ্রাপ্তা নারীকে উত্তরাধিকারী করার সাথে সম্পর্কিত, অথচ মূল বিধান হলো সে কিছুই পাবে না। আর তাকে উত্তরাধিকারী করার ফলে অন্যান্য ওয়ারিশদের ক্ষতি হয়। সুতরাং এই অপবাদের পথ রুদ্ধ করা তাকে উত্তরাধিকারী করার সপক্ষে যথেষ্ট নয়, আর স্বামীকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি শরিয়তের বিধান পরিবর্তন করার শক্তি রাখে না। এ কারণেই এই মূলনীতিগুলোকে অন্য উদাহরণে প্রয়োগ করা বৈধ নয়, কারণ এগুলো সুশৃঙ্খল নয়।

---

(১) আল-ইস্তযকার ৬/১১৩, বায়ানুদ দালীল আলা বুতলানিত তাহলীল ২৬৩; ইবনে যুবায়েরের মতের জন্য দেখুন: মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক (১২১৯২)। ইবনে তাইমিয়্যাহ উল্লেখ করেছেন যে, উসমানের ফয়সালার ব্যাপারে কোনো সাহাবী দ্বিমত করেননি, বরং ইবনে যুবায়েরের বিরোধিতার বিষয়টি তার পরে ঘটেছে। দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ৩১/৩৭০; বাদায়িউস সানায়ি ৩/২১৯।
(২) দেখুন: আল-হিদায়াহ ২/২৫১।
(৩) দেখুন: আল-মুগনি ৬/৩৯৫।
(৪) দেখুন: বায়ানুদ দালীল আলা বুতলানিত তাহলীল ২৬৩, ইলামুল মুয়াক্কিঈন ৩/১১৪; ইবনে রুশদ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' ৩/১০২-এ উল্লেখ করেছেন যে, এই মাসআলায় মতভেদের কারণ হলো এই মূলনীতির ওপর আমল করা বা না করা।
(৫) দেখুন: মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, তহাবী ২/৪৩৪।

স্পষ্টত যে, এই ইজতিহাদের বৈধতা তখন ফুটে ওঠে যখন এর সকল দলিল একত্রিত হয়; সুতরাং এটি তিনটি রুকন বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত:

প্রথম রুকন: যে রোগী তার মৃত্যুর আশঙ্কাযুক্ত মরণব্যাধিতে (মারাজুল মউত) আক্রান্ত, তার নিজের মালিকানাধীন সম্পদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে না। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদের বিষয়ে তার হস্তক্ষেপে নিষেধাজ্ঞা (হাজর) রয়েছে। তার জন্য এটি বৈধ নয় যে, সে উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে কাউকে বঞ্চিত করবে এবং অন্যদের দেবে।(১)

অতএব, রোগীর জন্য তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত অংশে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। এটি চার মাজহাবের ঐকমত্যের বিষয়(২) এবং এ ব্যাপারে ইজমা বা সর্বসম্মত মত বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল মুনযির বলেন: "উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যাতে তার মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে এবং সেই অসুস্থতাতেই সে

মৃত্যুবরণ করে, তবে এমতাবস্থায় কোনো গায়রে ওয়ারিসকে (উত্তরাধিকারী নয় এমন ব্যক্তিকে) দান করা, সদকা করা বা গোলাম আজাদ করার মতো কাজগুলো তার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে কার্যকর হবে। আর যা এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত হবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।" (৩)

এই মূলনীতির সপক্ষে বেশ কিছু শরয়ী দলিল রয়েছে যা একে সুদৃঢ় করে, তার মধ্যে দুটি দলিল নিম্নরূপ:

প্রথম দলিল: ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে তার ছয়জন দাসকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, অথচ তারা ছাড়া তার আর কোনো সম্পদ ছিল না। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ডাকলেন এবং তিন ভাগে বিভক্ত করলেন। এরপর তাদের মধ্যে লটারি করলেন; ফলে দুজনকে মুক্ত করে দিলেন এবং বাকি চারজনকে দাস হিসেবে বহাল রাখলেন। আর সেই ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর কথা বললেন।(৪)

এতে এই দলিল পাওয়া যায় যে, অসুস্থ ব্যক্তি তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ব্যতিরেকে বাকি অংশের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে সীমাবদ্ধ।(৫)

দ্বিতীয় দলিল: আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তার ইন্তেকালের সময়কার অসুস্থতায় আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেছিলেন: "আমি তোমাকে আলিয়ার সম্পদ থেকে বিশ ওয়াসাক খেজুর দান করেছিলাম; কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করোনি..."

(১) দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ৩১/৩৫৯-৩৬০।
(২) দেখুন: আল-হিদায়া ৪/৫২৬, আশ-শারহুল কাবীর ৩/২৯২, রওজাতুত তালিবীন ৩/৪২৯, আল-মুগনী ৬/১৯৩; এবং ইবনে হাজম এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, দেখুন: আল-মুহাল্লা ৮/৪০৩।
(৩) আল-ইজমা ১৩০; ইজমার বর্ণনার ক্ষেত্রে আরও দেখুন: আল-ইসতিযকার ৭/২৮১, বাদায়েউস সানায়ে ৩/view ২১৯।
(৪) এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন (১৬৬৮)।
(৫) দেখুন: আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন সহীহ মুসলিম ৪/৩৫৭।

...তুমি তা অর্জন করোনি এবং তা তোমার হস্তগতও করোনি; বরং আজ তা উত্তরাধিকারীর সম্পদ। (১)

উত্তরাধিকারের অধিকার লাভ করা স্থান এবং কারণের (সাবাব) সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন ব্যক্তির কোনো কাজ যদি মৃত্যুর পরবর্তী কাজের বিধানভুক্ত হয়, তবে উত্তরাধিকার থেকে স্ত্রীর অধিকার রহিত করার উদ্দেশ্যে (বিবাহের) কারণটি দূর করার ক্ষেত্রে তার কাজ অনুরূপ বিধানভুক্ত হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। (২)

দ্বিতীয় রুকন: অশুভ পথ বন্ধ করার মূলনীতি (সাদ্দুয যারাই) এবং ক্ষতি প্রতিহত করা; এটি একটি নির্ভরযোগ্য মূলনীতি, তবে এখানে তা প্রয়োগ করার জন্য এককভাবে এটি যথেষ্ট নয়।

তৃতীয় রুকন: সাহাবীগণের ইজতিহাদ এবং এই উত্তরাধিকার প্রদানের বিষয়ে তাদের অধিকাংশের ঐক্যমত। এখানে সাহাবীগণের ইজতিহাদ দুটি দিক থেকে শক্তিশালী হয়:

প্রথমত: তাদের বক্তব্যসমূহ নিজেই গ্রহণযোগ্য, যদিও এই গ্রহণযোগ্যতার সীমার ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সুতরাং এই বিশেষ মাসআলার ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য দ্বারা দলীল পেশ করা যেতে পারে অথবা তাদের অনুসরণ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: তাদের ইজতিহাদ ইজতিহাদের এমন কিছু গ্রহণযোগ্য দিক উন্মোচন করে যা তাদের ইজতিহাদ না থাকলে আমাদের

নিকট অস্পষ্ট থেকে যেত। সুতরাং এই বিশেষ অবস্থার ওপর তাদের অধিকাংশের ঐক্যমত প্রমাণ করে যে, এ ধরণের বিষয় বিবেচনা করা শরীয়তসম্মতভাবে বৈধ। আর এই ইজতিহাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে এর সাথে যুক্ত করা সম্ভব।

(১) দেখুন: বাদায়েউস সানায়ে ৩/ ২১৯।
(২) দেখুন: আল-মাবসুত ৬/ ১৫৫ - ১৫৬।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আলী ইবন আবী তালিব (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতের শরয়ি রাজনীতি

এরপর আমরা খুলাফায়ে রাশিদীনের খিলাফতের সমাপ্তি তথা রাশিদ খলিফা আলী ইবন আবী তালিব (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর প্রসঙ্গে আসছি। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ স্বল্প হওয়া এবং তাঁর যুগে নানাবিধ মতভেদ ও ফিতনা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর খিলাফতে বেশ কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক ইজতিহাদ পরিলক্ষিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে:

(১) কারিগরদের দায়বদ্ধতা:

আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সংঘটিত ইজতিহাদী বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো কারিগরদের দায়বদ্ধতা (১)।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ শ্রমিক বা কারিগর (আজির মুশতারাক) কোনো বস্তু নষ্ট করলে তার জন্য সে দায়ী থাকবে; যেন মানুষের অধিকারসমূহ বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ধোপা ও স্বর্ণকারদের (কোনো কিছু নষ্ট করলে) দায়বদ্ধ করতেন এবং বলতেন: “এ ছাড়া মানুষের অবস্থার সংশোধন সম্ভব নয়” (২)।

অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) ঐ সকল কারিগরদের দায়বদ্ধ করতেন যারা মানুষের কাজ করার জন্য নিয়োজিত ছিল এবং তাদের হাতে যা বিনষ্ট হতো তার দায়ভার তাদের ওপর ন্যস্ত করতেন (৩)।

---

(১) মালিকী মাযহাবের একদল ফকীহ সকল খুলাফায়ে রাশিদীনের দিকে কারিগরদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি সম্পর্কিত করেছেন, তবে এই নিসবতটি সঠিক নয়। বরং এটি স্পষ্টভাবে উমর এবং আলী (রাদিআল্লাহু আনহুমা)-এর দিকেই সম্পর্কিত। দেখুন: ‘আল-আহকামুল ফিকহিয়্যাহ আল্লাতি ইত্তাফাকা আলাইহাল খুলাফাউর রাশিদুন’ ২/৮৪৪-৮৪৬। যেমনটি আশ-শাতিবী কারিগরদের দায়বদ্ধতার বিষয়ে সালাফদের ঐকমত্যের কথা বর্ণনা করেছেন, দেখুন: ‘আল-মুয়াফাকাত’ ৩/৫৮।

(২) ইবনু আবী শায়বাহ (২১০৫১) এবং বায়হাকী ‘আস-সুনানুল কুবরা’ (১১৬৬৬) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ ‘আল-উম্ম’ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে দুর্বল বলেছেন; দেখুন: ‘আল-উম্ম’ ৮/২১৮। যেমনটি ইবনু আবী শায়বাহ (২১০৪৯) বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) কাঠমিস্ত্রিকে দায়বদ্ধ করতেন।

(৩) ইবনু আবী শায়বাহ (২১০৫০) এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম শাফিঈ ‘আল-উম্ম’ ৮/২১৮ গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন।

সাধারণ কর্মচারীর (আজীর মুশতারাক) দায়বদ্ধতার বিধান নিয়ে চার মাযহাবের মাঝে মতভেদ রয়েছে:

হানাফী মাযহাবের মতে: তার কর্মের ফলে যা ধ্বংস হবে তার দায়ভার তাকে বহন করতে হবে, সে সীমালঙ্ঘন করুক বা না করুক। আর তার কাছে থাকা মালামাল যদি ধ্বংস হয়, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে সাধারণভাবে সে জন্য সে দায়ী হবে না। আর সাহিবাইনের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) মতে, যদি এমন কোনো কারণে ধ্বংস হয় যা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল, তবে সে দায়ী হবে; কিন্তু যা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না, তার জন্য সে দায়ী হবে না।(১)

মালিকী মাযহাবের মতে: তার হাতের মাধ্যমে যা ক্ষতিগ্রস্ত হবে—যেমন কাপড় কাটা বা পুড়িয়ে ফেলা—তার জন্য সে সাধারণভাবে দায়ী হবে। তবে যে সব কাজে ঝুঁকি রয়েছে যেমন মুক্তা ছিদ্র করা, খতনা করা এবং চিকিৎসাসেবা প্রদান, এগুলোতে অবহেলা না করলে সে দায়ী হবে না। আর যা তার হস্তগত বা নিয়ন্ত্রণে নেই, তাতে অবহেলা করলে সে দায়ী হবে।(২)

শাফিঈ মাযহাবের মতে: সীমালঙ্ঘন ছাড়া যা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার জন্য সে দায়ী হবে না।(৩)

হাম্বলী মাযহাবের মতে: তার হাতের দ্বারা যা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার জন্য সে সাধারণভাবে দায়ী। তবে তার হেফাজতে থাকাবস্থায় বা তার কাজ ছাড়া অন্য কোনোভাবে যা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাতে অবহেলা না থাকলে সে দায়ী হবে না।(৪)

আমরা বলতে পারি যে, ফকীহগণ সামগ্রিকভাবে এ বিষয়ে দুটি পথে বিভক্ত:

প্রথম পথ: সাধারণ কর্মচারী তার হাতের (কাজের) মাধ্যমে যা ক্ষতিগ্রস্ত করবে তার দায়ভার তাকে বহন করতে হবে, সে অবহেলা করুক বা না করুক। এটিই জমহুর বা অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

দ্বিতীয় পথ: অবহেলা না করলে তার হাতের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসের জন্য তাকে দায়ী করা হবে না।

আর যা তার হাতের কাজের ফলে হয়নি, সে বিষয়ে সে দায়ী হবে না যতক্ষণ না সে অবহেলা করে; অথবা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যদি সেটি এমন কিছু হয় যা থেকে সতর্ক থাকা বা বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল।

---

(১) দেখুন: ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম ৯/১২২; হাশিয়া ইবনে আবিদিন ৬/৬৫।

(২) দেখুন: হাশিয়াতুদ দিসুকি ৪/২৮; শারহু মুখতাসারি খলিল, আল-খারশি ৭/২৮।

(৩) দেখুন: রওজাতুত তালিবিন ৫/২২৮; নিহায়াতুল মুহতাজ ৫/৩১০-৩১১।

(৪) দেখুন: আল-ইনসাফ ৬/৭৩; কাশশাফুল কিনা ৪/৩৩-৩৪।

যা-ই হোক, এই রাজনৈতিক ইজতিহাদে কোনো সমস্যা নেই এবং তা তিনটি দিক থেকে স্পষ্ট হয়:

প্রথমত: বিষয়টি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। সাধারণ কর্মজীবীকে (আজীর মুশতারাক) দায়ী সাব্যস্ত করার যেমন গ্রহণযোগ্য যুক্তি আছে, তাকে দায়ী না করারও গ্রহণযোগ্য ভিত্তি আছে। সাধারণ কর্মজীবীকে দায়ী না করার ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট দলিল (নস) নেই; বরং এটি ইজতিহাদের বিষয়। কোনো কোনো খলিফা তাকে দায়ী করার মতের দিকে ঝুঁকেছেন। সুতরাং এটি জনস্বার্থের খাতিরে ইজতিহাদের অবকাশ আছে এমন একটি বিষয়ে একজন আলিম ও ন্যায়পরায়ণ ইমামের ইজতিহাদ, যা গ্রহণযোগ্য শরয়ি রাজনীতির (সিয়াসা শরইয়্যাহ) অন্তর্ভুক্ত।

শাত্বেবী আলী (রা.)-এর উক্তি—"এটি ছাড়া মানুষের সংশোধন সম্ভব নয়"—এর অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন:

"(এক্ষেত্রে জনস্বার্থের দিকটি হলো, মানুষের কারিগরদের প্রয়োজন হয়। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালামাল থেকে দূরে থাকে এবং তাদের মাঝে অবহেলা ও সংরক্ষণে শিথিলতাই বেশি দেখা যায়। তাদের ব্যবহারের তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের দায়ী সাব্যস্ত না করা হতো, তবে তা দুটি বিষয়ের যেকোনো একটির দিকে নিয়ে যেত: হয় মানুষ কারিগরদের দিয়ে কাজ করানো সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিত, যা সাধারণ মানুষের জন্য কষ্টকর। অথবা তারা কাজ করত ঠিকই কিন্তু মালামাল ধ্বংস বা হারিয়ে যাওয়ার দাবি করে দায়মুক্ত থাকত, ফলে মানুষের সম্পদ নষ্ট হতো, সতর্কতা কমে যেত এবং খিয়ানতের অনুপ্রবেশ ঘটত। তাই জনস্বার্থ তাদের দায়ী সাব্যস্ত করার মধ্যেই নিহিত।)"(১)।

দ্বিতীয়ত: যেহেতু বিষয়টি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে এবং কর্মজীবীকে দায়ী না করার বিষয়ে কোনো প্রকাশ্য দলিল (নস) নেই, আর এতে জনস্বার্থ ও মানুষের প্রয়োজনও সুস্পষ্ট, তাই কোনো কোনো ফকিহ জনস্বার্থের ওপর ভিত্তি করে এই বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ার মত পোষণ করেছেন। শাফেয়ি মাযহাবের কোনো কোনো ইমাম বলতেন: "প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ আমি এই দুই মতের কোনোটির ভিত্তিতে ফতোয়া দেইনি এবং জনস্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো ভিত্তিতে ফয়সালা করিনি।"(২)।

রবী' ইমাম শাফেয়ি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মনে করতেন কর্মজীবীরা দায়ী হবে না, কিন্তু তিনি অসৎ কর্মজীবীদের সামনে তা প্রকাশ করতেন না। আবার তিনি মনে করতেন যে, বিচারক তার নিজস্ব ইলমের ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন, কিন্তু তিনি অসৎ বিচারকদের সামনে তা প্রকাশ করতেন না।(৩)।

---

(১) আল-ইতিসাম ২/৬১৬।
(২) দেখুন: মুগনি আল-মুহতাজ ৩/৪৭৭।
(৩) দেখুন: নিহায়াতুল মাতলাব ৮/১৬০, বাহরুল মাজহাব ৭/১৯১ এবং আল-উম্ম-এ রবী'-এর বক্তব্য দেখুন ৮/১১৮, ৮/২১৯।

তৃতীয় দিক: এই বিষয়ের বিধানের মূলনীতি হলো: যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করবে তার ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে, আর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন সাব্যস্ত করার দাবি করবে, প্রমাণের ভার তার ওপর। এখন কারিগর কি এখানে দাবিদার, যার ফলে তার দাবি প্রমাণ করা আবশ্যক, নাকি সে বিবাদী, যার ফলে মূলনীতি অনুযায়ী সে নির্দোষ বলে গণ্য হবে যতক্ষণ না তার সীমালঙ্ঘন প্রমাণিত হয়?

অতএব কারিগরদের মধ্যে যখন খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা প্রবল থাকে, তখন বাহ্যত কারিগরই দাবিদার এবং তার ওপরই এ থেকে নির্দোষিতা প্রমাণের দায়িত্ব বর্তাবে। আর যখন তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা প্রবল থাকে, তখন বাহ্যত সে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে যতক্ষণ না এর বিপরীত কিছু প্রমাণিত হয়। সুতরাং উভয় মতেই দলিলের সাথে কোনো বৈপরীত্য নেই। (১)

(২) যিন্দিকদের পুড়িয়ে মারা:

ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত যে, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একদল লোককে আগুনে পুড়িয়েছিলেন। এই খবর ইবনে আব্বাসের নিকট পৌঁছালে তিনি বললেন: "আমি হলে তাদেরকে পুড়িয়ে মারতাম না, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'তোমরা আল্লাহর শাস্তি (আগুন) দিয়ে শাস্তি দিও না।' বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো'।" (২)

অন্য এক বর্ণনায় আছে: এই কথা আলীর নিকট পৌঁছালে তিনি বললেন: "ইবনে আব্বাস সত্য বলেছে।" (৩) একটি বর্ধিত বর্ণনায় আছে: আলীর নিকট এ খবর পৌঁছালে তিনি বললেন: "আফসোস ইবনে আব্বাসের জন্য!" (৪)

এখানে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জবাবের দুটি সম্ভাবনা রয়েছে:

প্রথম বিষয়: তিনি ইবনে আব্বাসের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হননি এবং হাদিসে বর্ণিত নিষেধকে 'তানযীহ' ও 'কারাহাত' (অপছন্দনীয়তা) অর্থে গ্রহণ করেছেন। ইবনে আব্বাস এই নিষেধকে তার শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করায় তিনি তার প্রতি আক্ষেপ করেছেন, অথচ আলীর নিকট বিষয়টি তেমন ছিল না।

---

(১) দেখুন: হুসাইন হামিদ হাসান রচিত 'নাযারিয়্যাতুল মাসলাহাহ ফিল ফিকহিল ইসলামী', ১২৮। এই উত্তরটি ঐ সকল ফকিহদের মতানুযায়ী সঠিক হয় যারা মনে করেন যে, কর্মচারী ততক্ষণ পর্যন্ত দায়ী হবে যতক্ষণ না সে অবহেলা করেনি বলে প্রমাণিত হয়। সেক্ষেত্রে প্রমাণের ভার তার ওপরই বর্তাবে, চাই তা তার হাতে নষ্ট হোক বা তার কর্মের কারণে। আর যারা মনে করেন যে, সে তার হাতের দ্বারা নষ্ট হওয়া জিনিসের জন্য নিঃশর্তভাবে দায়ী হবে, চাই সে অবহেলা করুক বা না করুক, তাদের মতের সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ তারা মনে করেন এই অবস্থায় সে নিঃশর্তভাবে দায়ী, এবং প্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণ করা হবে না।
(২) বুখারী (৩০১৭)।
(৩) তিরমিযী (১৪৫৮), তিনি একে হাসান সহীহ হাদিস বলেছেন।
(৪) আহমাদ (২৫৫২), আবু দাউদ (৪৩৫১) এবং আব্দুর রাজ্জাক (৯৪১৩)।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: তিনি এটি সন্তুষ্টি ও স্বীকৃতিস্বরূপ বলেছিলেন এবং ইবনে আব্বাস এমন কিছু সংরক্ষণ করেছিলেন যা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে এটি তাঁর পক্ষ থেকে হারামের (নিষিদ্ধ হওয়ার) মতের দিকে ফিরে আসা গণ্য হবে (১)। আর বিস্ময় প্রকাশ

করা একথার প্রমাণ দেয় যে, এখানে তাঁর কাছে রহিতকরণের (নাসখ) সংবাদ পৌঁছায়নি। অন্যথায়, যদি তিনি ইবনে আব্বাসের বিরোধিতা করতেন, তবে তিনি তাঁর প্রতিবাদ করতেন (২)।

তিরমিযীর একটি বর্ণনাতেও এমন কিছু রয়েছে যা দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে জোরালো করে।

অন্যান্য হাদিসেও আগুন দিয়ে শাস্তি প্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের একটি অভিযানে পাঠালেন এবং বললেন: "তোমরা যদি অমুক ও অমুককে পাও, তবে তাদের দুজনকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেল।" এরপর যখন আমরা রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আমি তোমাদের অমুক ও অমুককে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলাম। অথচ আগুন দিয়ে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ শাস্তি দেন না। সুতরাং তোমরা যদি তাদের পাও, তবে তাদের হত্যা করো" (৩)।

আগুন দিয়ে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তার কারণে অধিকাংশ ফকিহ কাবু করা ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিসাস (প্রতিশোধ) ব্যতীত অন্য অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারা হারাম হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে কুদামা বলেন: "শত্রু যখন কাবু হয়ে যায়, তখন আমাদের জানামতে কোনো মতভেদ ছাড়াই তাকে আগুনে পোড়ানো জায়েজ নয়। আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) রিদ্দাহর যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তিদের আগুনে পোড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে খালিদ বিন ওয়ালিদ তা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ আছে বলে আমি জানি না" (৪)।

ইবনুল মুনাসিফ এ বিষয়ের মতভেদের ক্ষেত্রটি বিশ্লেষণ করেছেন, অতঃপর ঐক্যমত (ইজমা) বর্ণনা করে বলেছেন: "তাদের মধ্যে যারা কাবু হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে আমি কোনো মতভেদ জানি না যে, শত্রুর ব্যক্তিদের পুড়িয়ে মারা জায়েজ নয়—যদি তাদের অন্য উপায়ে হত্যা করা সম্ভব হয় এবং তারা নিজেরা কোনো মুসলিমকে পুড়িয়ে না থাকে" (৫)।

---

(১) দেখুন: ফাতহুল বারী ১২/২৭১ - ২৭২।
(২) দেখুন: আল-ইতিবার ফিন নাসিখ ওয়াল মানসুখ মিনাল আসার, হাযিমি কৃত, ১৯৪।
(৩) বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (৩০১৬)।
(৪) আল-মুগনি ৯/২৮৬ - ২৮৭; এবং চার মাযহাবের নিকট এটি হারাম হওয়ার বিষয়ে দেখুন: তাবয়ীনুল হাকায়িক ৬/৩২, হাশিয়া ইবনে আবিদীন ৪/১৪০, আত-তাওযীহ ফী শারহি মুখতাসার ইবনিল হাজিব ৩/৪২২, মানহুল জলীল ৩/১৪৮, রওজাতুত তালিবীন ১০/২৫১, কাশশাফুল কিনা ৩/৪৯।
(৫) আল-ইনজাদ ফী আবওয়াবিল জিহাদ ১৯৬।

যেমন কোনো কোনো আলেম এটি মাকরূহ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। আবার কোনো কোনো সাহাবী, যেমন আবু বকর এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) থেকে এর বৈধতার কথা বর্ণিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে যা সংঘটিত হয়েছে তা নস (সুস্পষ্ট পাঠ)-এর বিপরীতে ইজতিহাদ ছিল। সুতরাং তা একটি ভুল যাতে তিনি অপব্যাখ্যা (তাউয়িল) করেছেন; এটি ‘সিয়াসা শরইয়্যাহ’ (শরয়ী রাজনীতি)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এই ইজতিহাদটি নসের উপস্থিতিতে করা হয়েছে। মূলত যাকে আয়ত্ত করা সম্ভব তাকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যাকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় অথবা কিসাসের (প্রতিশোধ) ক্ষেত্রে এতে ইজতিহাদের অবকাশ থাকতে পারে, কারণ তা নসের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক নয়।

(৩) সম্পদ বিতরণে সমতা বজায় রাখা:

সম্পদ বিতরণে আবু বকর (রা.)-এর নীতি ছিল এই যে, তিনি মানুষের মাঝে সমতা রক্ষা করতেন। ইসলামে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে তিনি বিতরণে কোনো পার্থক্য করতেন না। কারণ শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদান আখেরাতে প্রাপ্য। আর দুনিয়ার সম্পদ কেবল একটি মাধ্যম যা দিয়ে সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

যখন আবু বকর (রা.)-এর কাছে দাবি করা হলো যে তিনি যেন বণ্টনের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে তারতম্য করেন, তখন তিনি বললেন: "তাদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা আল্লাহর নিকট। আর জীবন ধারণের এই উপকরণের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখাই উত্তম।"

অতঃপর যখন উমর (রা.) এলেন, তিনি মনে করলেন যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলামে অগ্রগণ্যতাকে বিতরণে তারতম্যের ভিত্তি করা উচিত। তিনি বললেন: "এই সম্পদের ওপর কেউ কারো চেয়ে বেশি হকদার নয়; বরং তা নির্ধারিত হবে ব্যক্তির ইসলামে অগ্রগণ্যতা, তার স্বচ্ছলতা, তার ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং তার অভাব-অনটনের ভিত্তিতে।"

---

(১) দেখুন: মাআলিমুস সুনান ২/২৮২। বলা হয়েছে: এই নিষেধ কেবল হারাম হওয়ার জন্য নয়; বরং আল্লাহর ক্রোধের মাধ্যমে সৃষ্টিজীবকে শাস্তি দেওয়ার সদৃশ যেন না হয় সে জন্য বিনয় হিসেবে নিষেধ করা হয়েছে। দেখুন: শারহু সহিহিল বুখারি, ইবনু বাত্তাল ৫/১৭২।

(২) দেখুন: ফাতহুল বারি ৬/১৫০। ইবনু হাজার এখানে বর্ণিত ঘটনাটিকে দুর্বল বলেছেন। দেখুন: আদ-দিরায়াহ ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়াহ ২/১০৩।

(৩) আবু উবাইদ এটি বর্ণনা করেছেন ‘আল-আমওয়াল’ ৩৩৫-এ এবং দেখুন: ‘আল-খারাজ’ ৫৩।

(৪) দেখুন: আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ৭০। অনুরূপ বর্ণনা আবু ইউসুফ-এর নিকট ‘আল-খারাজ’ ৫৭-এ দুর্বল সনদে এসেছে। এর শব্দরূপ হলো: (ব্যক্তি ও ইসলামে তার স্থায়িত্ব, ব্যক্তি ও ইসলামে তার অগ্রগণ্যতা, ব্যক্তি ও ইসলামে তার স্বচ্ছলতা, ব্যক্তি ও ইসলামে তার ত্যাগ এবং ব্যক্তি ও ইসলামে তার প্রয়োজন)।

উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এই অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন: "আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে আমি পরবর্তী লোকদের পূর্ববর্তীদের সাথে এমনভাবে একীভূত করে দেব যাতে তারা সবাই এক ও অভিন্ন হয়ে যায়।" (১)

অতঃপর যখন আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তিনি বন্টনের এই অগ্রাধিকারের বিষয়টিকে আবূ বকর (রা.)-এর আমলের পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

আবু উবাইদ খলিফাদের মধ্যকার এই কল্যাণমূলক (মাসলাহাত-ভিত্তিক) মতপার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "উমর (রা.)-এর প্রাথমিক অভিমত ছিল ইসলামে অগ্রগামিতা ও ইসলামের জন্য অবদানের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া, এবং এটিই তাঁর প্রসিদ্ধ মত। আর আবূ বকর (রা.)-এর মত ছিল সমতা বজায় রাখা। অতঃপর উমর (রা.) থেকে এমন কিছু বর্ণিত হয়েছে যা আবূ বকর (রা.)-এর মতের দিকে ফিরে আসার সদৃশ। একইভাবে আলী (রা.) থেকেও সমতা রক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর উভয় পদ্ধতিরই নিজস্ব যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে।" (২)

এই কারণেই জনস্বার্থ বা প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অনুদান বন্টনে অগ্রাধিকার প্রদানের বিধান নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। (৩)

সুতরাং এটি এমন একটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রের কল্যাণমূলক ইজতিহাদ যেখানে কোনো অকাট্য দলিল (নস) নেই; খুলাফায়ে রাশিদীনের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে, কারণ তাঁদের প্রত্যেকেই যা অধিকতর কল্যাণকর তা অন্বেষণ করছিলেন।

(৪) বিদ্রোহীদের (বুগাত) বিরুদ্ধে যুদ্ধ:

আলী (রা.)-এর শাসননীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক হলো তাঁর যুগে ঘটে যাওয়া ফিতনার ঘটনাবলীতে মুসলমানদের মধ্যকার যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর অবস্থান।

এটি ছিল মুসলমানদের জন্য এক নতুন ফিতনা। আলী (রা.) তাঁর সঠিক নির্দেশিত (রাশিদা) রাজনীতির মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যকার যুদ্ধের ক্ষেত্রে শরয়ী কর্মপন্থা স্পষ্ট করেছেন। তাঁর এই ব্যাখ্যা ছিল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকারের, এমনকি ফকীহদের কিতাবসমূহে বিদ্রোহীদের বিধান আলী (রা.)-এর সুন্নাহর (বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের পদ্ধতি) ওপর ভিত্তি করেই বিন্যস্ত হয়েছে।

(১) আবু ইউসুফ এটি 'আল-খারাজ' পৃষ্ঠা ৫৭ এবং আবু উবাইদ 'আল-আমওয়াল' পৃষ্ঠা ৩৩৬-এ বর্ণনা করেছেন।
(২) আল-আমওয়াল পৃষ্ঠা ৩৩৬, এবং দেখুন: মুখতাসার আল-মুযানি ১/৭৮২-৭৮৩, যাদ আল-মুসাফির, লি গুলাম আল-খাল্লাল ১/৪২৩-৪২৪, আল-কাওয়াইদ আল-কুবরা ১/১০০।
(৩) এই বিষয়ে আলেমদের মতভেদ ও তাঁদের দলিলের জন্য দেখুন: খালেদ আল-মাজিদ রচিত 'আত-তাসাররুফ ফিল মাল আল-عام' কিতাবটি, পৃষ্ঠা ৫৯-৬৩।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ঘোষককে নির্দেশ দিলে তিনি বসরার যুদ্ধের দিন ঘোষণা করলেন: পলায়নপর ব্যক্তিকে অনুসরণ করা হবে না, কোনো আহত ব্যক্তিকে হত্যা করে শেষ করে দেওয়া হবে না, কোনো বন্দীকে হত্যা করা হবে না; যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সে নিরাপদ, এবং যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করবে সে নিরাপদ। আর তিনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি।(১)

এই কারণেই হাসান ইবনে আলী বলেছেন: **"যদি আলী ইবনে আবি তালিব না থাকতেন, তবে মানুষ জানত না কিবলাওয়ালাদের (মুসলিমদের) সাথে কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়।"**(২) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: **"তোমরা কি মনে করো যে, আমি যদি মানুষের মাঝে অনুপস্থিত থাকতাম, তবে কে তাদের মাঝে এই নীতি অনুযায়ী চলত?"**(৩)

এমনকি একদল বিশিষ্ট আলিম বলেছেন: **"যদি আলীর সাথে তাঁর বিরোধীদের যুদ্ধ না হতো, তবে কিবলাওয়ালাদের সাথে যুদ্ধের সুন্নাহ (পদ্ধতি) জানা যেত না।"**(৪)

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: **"(তিনি না থাকলে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের নীতি কেমন হবে তা কেউ জানত না)।"**(৫)

এগুলো হলো উচ্চতর নৈতিক মূলনীতি যা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রচার করেছেন এবং বাস্তবে তা মেনে চলেছেন। এগুলো এমন কিছু মূল্যবোধ যা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে মেনে চলা অত্যন্ত কঠিন; কারণ তখন মন প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার নেশায় মত্ত থাকে এবং আক্রোশ মেটানোর তাড়না প্রবল থাকে। একারণেই অন্যায়ভাবে কিংবা অপব্যাখ্যার আশ্রয়ে এগুলোর লঙ্ঘন করা সহজ হয়ে যায়। সুতরাং সাহাবীদের মধ্যকার ফিতনার (দাঙ্গা) ঘটনার সময় এই মূলনীতিগুলোর প্রতি এই বাস্তব আনুগত্য ছিল একটি

ব্যতিক্রমী বিষয়, যা তাঁদের মর্যাদা, চরম সতর্কতা এবং ইসলামের বিধানের প্রতি তাঁদের সুদৃঢ় আনুগত্যকে উন্মোচিত করে।

---

(১) এটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাজ্জাক (১৮৫৮৯ - ১৮৫৯০) এবং ইবনে আবি শায়বাহ (৩৩২৭৭ - ৩৭৮১৬)।
(২) দেখুন: ইবনে বাত্তাল রচিত শারহু সহীহিল বুখারী, ১০/১৭।
(৩) এটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে, ১০/১২৪, হাদিস নং (১৮৫৭৩); ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি আবু আসিম আস-সাকাফী থেকে, তিনি তাঁর গোত্রের একদল শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন। শায়খদের পরিচয় অজ্ঞাত হওয়ার কারণে এই সনদটি দুর্বল।
(৪) বাকিল্লানী রচিত তামহীদুল আওয়ায়েল ওয়া তালখীসুল দালায়েল, পৃষ্ঠা ৫৪৭।
(৫) দেখুন: মুওয়াফফাক আল-মাক্কী রচিত মানাকিবে ইমামে আযম, ১/৭১; আরও দেখুন: কামারুজ্জামান গাজ্জাল রচিত আল-ফিকহ আস-সিয়াসী ইনদাল ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব, পৃষ্ঠা ৫৩৮।

পঞ্চম শাখা

খুলাফায়ে রাশিদীনের রাষ্ট্রনীতিতে জনস্বার্থ (মাসলাহাহ)

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগের রাজনৈতিক প্রয়োগসমূহ থেকে আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, তাঁদের রাষ্ট্রনীতিতে মাকাসিদী ইজতিহাদ (উদ্দেশ্যভিত্তিক গবেষণা) বিদ্যমান ছিল। তাঁদের ফিকহি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইজতিহাদের পরিধি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত; তবে এ সবকিছুই ছিল এমন সীমানার মধ্যে যা নসের (কুরআন-সুন্নাহর পাঠ) সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

এই সমস্ত রাজনৈতিক ইজতিহাদের মূল যোগসূত্র হলো—এগুলো শরয়ী নসের বিরোধিতা না করে জনস্বার্থ (মাসলাহাহ) হাসিলের চেষ্টা করে। আর যা কিছু বিরোধের ধারণা দেয় তা আসলে তেমন নয়; বরং তা একটি বিশেষ শাখা-সংক্রান্ত বিষয় যা নসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নস ও মাসলাহাহর মধ্যে বিরোধের বিভ্রম সৃষ্টি হতে পারে, যেন সাহাবীগণ মাসলাহাহকে নসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন অথবা তাঁরা কেবল মাসলাহাহর দৃষ্টিভঙ্গিকেই যথেষ্ট মনে করেছেন এবং অন্য কোনো কিছু বিবেচনা না করে একেই মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর এই বিরোধ অস্বীকার করার চেষ্টাকে অনেকে কৃত্রিম ব্যাখ্যা (তাকাল্লুফ) বলে মনে করেন।

যদি আমরা সাহাবীগণের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতাম, তবে হয়তো এটি গ্রহণযোগ্য হতো। যেমন আমরা উমর ইবনে খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) সম্পর্কে কিছুই জানি না, শুধু তাঁর এমন একটি অবস্থান দেখলাম যা কোনো একটি শাখা-বিষয়ে নসের বিপরীত বলে মনে হচ্ছে—এমতাবস্থায় হয়তো বলা সম্ভব ছিল যে, তিনি নসের বিরোধিতা সত্ত্বেও মাসলাহাহর ওপর নির্ভর করেছেন।

কিন্তু এটি দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি। খুলাফায়ে রাশিদীনের অবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং তাঁদের ফিকহ ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রকৃতি উপলব্ধি না করে এই ঘটনাগুলোর ওপর সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য এটি অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে—নসের ওপর আমল করা, একে অগ্রাধিকার দেওয়া, একেই ফয়সালার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা এবং এর বিরোধিতা পরিহার করা ছিল খুলাফায়ে রাশিদীনের ফিকহের একটি সুদৃঢ় মূলনীতি।

পৃষ্ঠা 208

এটি বিষয়টি উন্মোচনকারী কয়েকটি মূলনীতি উপস্থাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়:

প্রথম মূলনীতি: নস (কুরআন ও সুন্নাহর মূল পাঠ) অনুসরণের ওপর তাঁদের গুরুত্বারোপ।

রাজনৈতিক ইজতিহাদের ক্ষেত্রে নসের প্রতি যত্নশীল হওয়ার অন্যতম প্রমাণ হলো আল্লাহর কিতাব এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহতে যা এসেছে তা অনুসরণের আবশ্যিকতার ওপর তাঁদের তাকিদ প্রদান।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: "তোমরা রায়-পন্থীদের (মনগড়া মতামতের অনুসারী) থেকে সাবধান থেকো! কারণ তারা সুন্নাহর শত্রু; হাদীসসমূহ মুখস্থ রাখা তাদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল, ফলে তারা নিজেদের রায়ের ভিত্তিতে কথা বলেছে; এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করেছে।" (১)

আবু মুসার প্রতি উমরের প্রসিদ্ধ পত্রে তিনি বলেন: "তোমার নিকট যা পেশ করা হয় অথচ তা কুরআন বা সুন্নাহতে বিদ্যমান নেই, সে বিষয়ে গভীর প্রজ্ঞা ও সঠিক অনুধাবন অর্জন করো; এরপর সমজাতীয় বিষয়সমূহের সাথে সেগুলোকে তুলনা করো।" (২)

দ্বিতীয় মূলনীতি: কোনো ঘটনায় ইজতিহাদ করার পূর্বে নস অনুসন্ধান করা।

খুলাফায়ে রাশিদীনের বিচারিক মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই যে, তাঁরা কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করার পূর্বে সে বিষয়ে নস বা দলিল অনুসন্ধান করতেন। এর সপক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

কাবীসাহ ইবনে যুয়াইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "এক দাদি (বা নানি) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে তাঁর মিরাস (উত্তরাধিকার) প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন: আল্লাহর কিতাবে তোমার জন্য কিছু নেই, আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহতেও তোমার জন্য কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং তুমি এখন ফিরে যাও, যতক্ষণ না আমি লোকজনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। অতঃপর তিনি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলে মুগীরা ইবনে শু’বা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম যখন তিনি তাঁকে ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ) প্রদান করেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন: তোমার সাথে কি অন্য কেউ আছে? তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে মুগীরা ইবনে শু’বা যা বলেছিলেন অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করলেন। ফলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্য তা কার্যকর করলেন।" (৩)

এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অগ্নিপূজকদের (মাজুস) সম্পর্কে বলেছিলেন: "আমি জানি না তাদের সাথে কী আচরণ করব।" এরপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সংবাদ দিলেন—

---

(১) ইবনে আব্দুল বার এটি ‘জামি’উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি’ (২/১০৪২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনুল কাইয়্যিম ‘ইলামুল মুওয়াক্কিঈন’ (১/৪৪) গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলেছেন।
(২) বাইহাকী এটি ‘আস-সুনানুল কুবরা’ (২০৩৪৭) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
(৩) আবু দাউদ (২৮৯৪), তিরমিযী (২১০০) এবং ইবনে মাজাহ (২৭২৪) এটি বর্ণনা করেছেন।

হাদিস অনুযায়ী: তোমরা তাদের সাথে আহলে কিতাবদের (আচরণীয়) পদ্ধতি অনুসরণ করো। (১)

– উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “হে লোকসকল! তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমি আকাঙ্ক্ষা করি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদের নিকট এগুলোর এমন কোনো সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে যেতেন যার ওপর আমরা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করতে পারতাম। সেগুলো হলো: দাদার উত্তরাধিকার, কালালাহ (পিতা-মাতা ও সন্তানহীন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার) এবং রিবায় (সুদ) এর কতিপয় প্রকার।” (২)

– উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন: “আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করছি যে ভ্রূণ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু শুনেছে।” তখন হামাল ইবনে মালিক ইবনে আন-নাবিগাহ দাঁড়িয়ে বললেন: “আমি দুই প্রতিবেশিনীর (স্ত্রীর) মাঝে ছিলাম। তাদের একজন অন্যজনকে একটি লাঠি (বা তাঁবুর খুঁটি) দিয়ে আঘাত করল, ফলে তার গর্ভপাত হয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে একটি দাস বা দাসী (গুররাহ) প্রদানের ফয়সালা দিলেন।” উমর বললেন: “আমরা যদি এই বর্ণনাটি না শুনতাম তবে হয়তো এ ব্যাপারে ভিন্নভাবে ফয়সালা দিতাম।” (৩)

ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “অজানা বিষয়ের ক্ষেত্রে ফয়সালা দিতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-র চেয়ে অধিক ভীত আর কেউ ছিলেন না, আর আবু বকরের পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-র চেয়ে অধিক ভীত আর কেউ ছিলেন না। আবু বকরের নিকট যখন কোনো বিষয়ের ফয়সালা করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং তিনি আল্লাহর কিতাবে এর কোনো মূলভিত্তি এবং সুন্নাহর কোনো বর্ণনা পেতেন না, তখন তিনি স্বীয় বিচারবুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন: ‘এটি আমার অভিমত। যদি তা সঠিক হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার পক্ষ থেকে এবং আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি’।” (৪)

মাইমুন ইবনে মাহরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট যখন কোনো বিচারের ভার আসত, তিনি মহান আল্লাহর কিতাব দেখতেন। যদি তিনি সেখানে ফয়সালা করার মতো কিছু পেতেন, তবে সে অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন। যদি আল্লাহর কিতাবে তা না পেতেন, তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ দেখতেন। যদি সেখানে ফয়সালা করার মতো কিছু পেতেন, তবে সে অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন। যদি এতে তিনি অপারগ হতেন (সুন্নাহতে খুঁজে না পেতেন), তবে লোকজনকে জিজ্ঞেস করতেন: ‘তোমরা কি জানো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কোনো ফয়সালা দিয়েছেন কি না?’ কখনো কখনো একদল লোক তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে বলত: ‘তিনি এ ব্যাপারে এমন এমন ফয়সালা দিয়েছেন।’ যদি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত কোনো সুন্নাহ খুঁজে না পেতেন, তবে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্রিত করতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যখন কোনো বিষয়ে তাদের সর্বসম্মত অভিমত পাওয়া যেত, তিনি সে অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও অনুরূপভাবে আমল করতেন। আর তিনি যখন কিতাবে তা পেতে সক্ষম হতেন না...”

---

(১) মালিক এটি আল-মুয়াত্তায় (২/৩৯৫) এবং বাইহাকী আস-সুনানুল কুবরা-তে (১৮৬৫৪) বর্ণনা করেছেন। আর সহীহ বুখারীতেও (৩১৫৬) বর্ণিত হয়েছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না আবদুর রহমান ইবনে আউফ সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজার অঞ্চলের অগ্নিপূজকদের থেকে তা গ্রহণ করেছিলেন।
(২) এটি বুখারী (৫৫৮৮) এবং মুসলিম (৩০৩২) বর্ণনা করেছেন।
(৩) আবু দাউদ (৪৫৭২) এটি বর্ণনা করেছেন।
(৪) দেখুন: ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৪৩।

সুন্নাহ হলো এই: এ বিষয়ে কি আবু বকর (রা.)-এর কোনো ফয়সালা ছিল? যদি আবু বকরের কোনো ফয়সালা থাকত, তবে তিনি তা দিয়েই ফয়সালা করতেন। অন্যথায় তিনি জনগণের বিজ্ঞ আলিমদের একত্রিত করতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যখন তারা কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতেন, তখন তিনি তা দিয়ে ফয়সালা করতেন।(১)

আর যখন উমর (রা.) শুরাইহকে কুফার বিচারক হিসেবে পাঠালেন, তখন তাকে বললেন: "আল্লাহর কিতাবে তোমার কাছে যা স্পষ্ট হয় সে অনুযায়ী ফয়সালা করো এবং সে বিষয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। আর যা তোমার কাছে আল্লাহর কিতাবে স্পষ্ট না হয়, তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করো। আর যা সুন্নাহতেও তোমার কাছে স্পষ্ট না হয়, তবে তোমার বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে ইজতিহাদ করো।"(২)

তৃতীয় মূলনীতি: নসের (মূল পাঠ) নির্দেশনার প্রতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা।

উন্মোচনকারী মূলনীতিসমূহের অন্যতম হলো—জনকল্যাণমুখী ইজতিহাদ নসের বিরোধী হয় না। খলিফাগণ নসের নির্দেশনার মাধ্যমে তাদের কাছে যা প্রতিভাত হতো, তার প্রতি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকতেন। এর অর্থ হলো, তাদের ইজতিহাদ একে অতিক্রম করতে পারত না। এর উদাহরণ হলো:

– মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়ে আবু বকর ও উমরের মধ্যকার মতপার্থক্য। উমর (রা.) হাদিসের ব্যাপক অর্থ আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং আবু বকর (রা.)-কে বলেছিলেন: "আপনি কীভাবে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'আমি মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে—আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে—আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার থেকে নিরাপদ করে নিল, তবে তার হক ব্যতীত; আর তার হিসাব আল্লাহর নিকট?'" তখন আবু বকর (রা.) বললেন: "আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যে সালাত ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা জাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহর কসম! তারা যদি আমাকে একটি উটের রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রদান করত, তবে তা প্রদান না করার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" উমর (রা.) বলেন: "আল্লাহর কসম! আমি দেখলাম যে আল্লাহ তায়ালা আবু বকরের অন্তরকে যুদ্ধের সিদ্ধান্তের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন, ফলে আমি বুঝতে পারলাম যে এটিই সত্য।"(৩)

সুতরাং নসের ওপর অবিচল থাকাই ছিল তাদের প্রাথমিক মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে উভয়ের চালিকাশক্তি। অতঃপর উমর (রা.) আবু বকরের অভিমত অনুসরণ করেন, যখন তার কাছে এর সঠিকত্ব প্রতিভাত হয়।

– নবী (সা.)-এর নির্দেশ পালনার্থে উসামার বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ়তা।

---

(১) দেখুন: ই’লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/৪৯-৫০।
(২) দেখুন: ই’লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/৫০।
(৩) এটি বুখারি (৭২৮৪) ও মুসলিম (২০) বর্ণনা করেছেন।

– নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিরাস বণ্টন না করার ব্যাপারে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কঠোর দৃঢ়তা; আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর সিদ্দিকের কাছে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তাঁর মিরাস বণ্টনের আবেদন করেন, যা আল্লাহ রাসুলকে ফায় (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) হিসেবে দান করেছিলেন। তখন আবু বকর তাঁকে বললেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমাদের কোনো উত্তরাধিকারী হয় না, আমরা যা রেখে যাই তা সদকা।" এতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমা রাগান্বিত হলেন এবং আবু বকরের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন; তিনি ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর সাথে আর কথা বলেননি (১)।

ফাতিমার এই অসন্তুষ্টি ও আবু বকরকে এড়িয়ে চলা আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য কোনো সহজ বিষয় ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু (নবীজি)-এর কন্যা। আর তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ও মন রক্ষা করা আবু বকরের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। নিঃসন্দেহে এই পরিস্থিতি তাঁর ওপর অত্যন্ত কঠিন ছিল। একারণেই তিনি আলীকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সম্বোধন করে বলেছিলেন: "সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা আমার নিজের আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেয়েও বেশি প্রিয়" (২)। তবে এটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কঠোর সংকল্প ও ধৈর্যেরই বহিঃপ্রকাশ; এবং এক্ষেত্রে তাঁর কোনো বিকল্প ছিল না। তিনি এ বিষয়টি এই উক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন: "রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা কিছু করতেন, আমি তার কোনো কিছুই করা বাদ দেব না; কারণ আমি আশঙ্কা করি যে, যদি আমি তাঁর নির্দেশের কোনো কিছু ছেড়ে দেই তবে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব" (৩)।

– নসের (অহি-র বিধানের) প্রতি উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দৃঢ়তার আরেকটি উদাহরণ হলো: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশের বিরোধিতাকারীকে শাস্তি প্রদান করা, যদিও বিষয়টি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখত। তিনি আসরের নামাজের পর নফল নামাজ পড়ার কারণে প্রহার করতেন। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "উমর আসরের পরের নামাজের কারণে (মানুষের) হাতে প্রহার করতেন" (৪)।

চতুর্থ মূলনীতি: নস-বিরোধী মত থেকে তাদের প্রত্যাবর্তন।

এটি খুলাফায়ে রাশেদীনের রাজনৈতিক ইজতিহাদের সীমা স্পষ্টকারী একটি মূলনীতি। তাঁরা নসের সীমানার ভেতরেই ইজতিহাদ করতেন; অতঃপর যখন তাঁদের কাছে স্পষ্ট হতো যে তাঁদের কথা নসের পরিপন্থী, তখন তাঁরা তা থেকে ফিরে আসতেন।

---

(১) এটি বুখারি (৩০৯২) ও মুসলিম (১৭৫৯) বর্ণনা করেছেন।
(২) এটি বুখারি (৩৭১২) ও মুসলিম (১৭৫৯) বর্ণনা করেছেন।
(৩) এটি বুখারি (৩০৯২) ও মুসলিম (১৭৫৯) বর্ণনা করেছেন।
(৪) এটি মুসলিম (৮৩৬) বর্ণনা করেছেন।

সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (ওমর ইবনুল খাত্তাব বলতেন: দিয়াত বা রক্তপণ 'আকিলা' (পিতার বংশীয় আত্মীয়দের) প্রাপ্য, স্ত্রী তার স্বামীর রক্তপণ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে কিছুই পাবে না। অবশেষে দাহ্হাক ইবনু সুফিয়ান তাকে বলেন: আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার নিকট লিখেছিলেন যে, আমি যেন আশইয়াম আদ-দুবাবি-এর স্ত্রীকে তার স্বামীর রক্তপণ থেকে অংশ প্রদান করি। তখন ওমর তার রায় থেকে ফিরে আসলেন)। (১)

ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইজতিহাদসমূহে এটি একটি সাধারণ বিষয় ছিল, এমনকি এমন বহু ঘটনার সমাবেশ ঘটেছিল যেখানে তিনি নিজের ইজতিহাদ ত্যাগ করে সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। (২)

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এমন কোনো ফাতওয়া সংরক্ষিত নেই যা কোনো দলিলের পরিপন্থী ছিল এবং পরে তিনি তা থেকে ফিরে এসেছিলেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন: (শরীয়তের কোনো মাসআলায় তিনি ভুল করেছেন এবং দলিলের পরিপন্থী কোনো ইজতিহাদ করেছেন বলে জানা যায় না, যা অন্যদের ক্ষেত্রে ভিন্ন। কারণ অন্যদের এমন কিছু ইজতিহাদ রয়েছে যা কিছু দলিলের পরিপন্থী পাওয়া যায়, আবার এমন কিছু মাসআলাও রয়েছে যেখানে তারা থেমে গিয়েছিলেন এবং সেগুলোর বিধান জানতে সক্ষম হননি)। (৩)

আর (ভুল পরিলক্ষিত হলে) ফিরে আসার এই বিষয়টি অন্যান্য সাহাবীদের আদর্শেও সুস্পষ্ট ছিল। এর উদাহরণ হলো:

তাউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (আমি ইবনু আব্বাসের সাথে ছিলাম, এমতাবস্থায় জায়েদ ইবনু সাবিত বললেন: আপনি কি এই ফাতওয়া দিচ্ছেন যে, ঋতুবতী নারী বাইতুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাৎ (বিদায়ী তওয়াফ) সম্পন্ন করার পূর্বেই প্রস্থান করতে পারবে? তখন ইবনু আব্বাস তাকে বললেন: যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে অমুক আনসারী নারীকে জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না? বর্ণনাকারী বলেন: তখন জায়েদ হাসতে হাসতে ইবনু আব্বাসের কাছে ফিরে আসলেন এবং বলছিলেন: আমি তো দেখছি আপনি সত্যই বলেছেন)। (৪)

এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি: (অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সকল ঘটনার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য যে, যখনই তারা ইজতিহাদ করতে শুরু করতেন এবং নস বা দলিল সম্পর্কে জানতে পারতেন, তখনই তারা ব্যক্তিগত মতামত থেকে বিরত হতেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত খবরের ওপরই স্থির থাকতেন)। (৫)

---

(১) আবু দাউদ (২৯২৭) ও তিরমিজি (১৪১৫) এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (তিরমিজি) বলেছেন: এটি হাসান সহিহ হাদিস, এবং আহলে ইলমগণের আমল এর ওপরই।
(২) শাইখ মুহাম্মদ আত-তাউইল (রহিমাহুল্লাহ) তার 'মানহাজিয়াতু ওমর ফিল ইজতিহাদ মাআন নাস' গ্রন্থে দলিলের বিপরীতে ওমরের ইজতিহাদের ৩১টিরও বেশি ঘটনা সংকলন করেছেন, দেখুন: পৃষ্ঠা ৬৪-৮৯।
(৩) আর-রদ্দু আলাস সুবকি ২/৬৬২।
(৪) মুসলিম (১৩২৮) এটি বর্ণনা করেছেন।
(৫) মাতালিউত তামাম, লিশ-শাম্মা ৯৫।

খোলাফায়ে রাশেদীনের সীরাতে রাজনৈতিক ইজতিহাদ এবং শরয়ী দলীলের মধ্যকার সম্পর্ক:

ইতিপূর্বে নসের (শরয়ী ভাষ্য) নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের যে সকল মূলনীতি আলোচিত হয়েছে, তা আমাদের কাছে রাশেদী রাজনৈতিক ইজতিহাদের সীমানা স্পষ্ট করে দেয়। এটি জনকল্যাণমূলক এমন এক বিবেচনা যা নসের বিরোধী নয়। এই ইজতিহাদ

অত্যন্ত প্রশস্ত যতক্ষণ না তা নসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। মূলত এটি দুটি চিন্তাধারার মধ্যবর্তী একটি পথ:

প্রথম পথ: যারা জনকল্যাণ বা মাসলাহাতের বিবেচনায় এমনভাবে অতিরঞ্জন করে যা নসের বিরুদ্ধাচরণের সীমা অতিক্রম করে ফেলে। ফলে তারা নস উপলব্ধি করতে এবং এর মর্মার্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় পথ: যারা নসকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে এমন বাড়াবাড়ি করে যে জনকল্যাণের বিবেচনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের রাজনৈতিক ইজতিহাদ ছিল প্রশস্ত, কিন্তু তা ছিল বৈধ বিবেচনার সীমানার ভেতরে। তাঁদের ইজতিহাদ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত স্বীকৃত পথগুলোর কোনো একটির বাইরে ছিল না:

প্রথম পথ: এমন কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করা যে বিষয়ে মূলত কোনো নস নেই। যেমন: আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে কুরআন সংকলন করা অথবা আবু বকর ও উমর (রা.)-এর শাসনামলে পরবর্তী খলীফা মনোনীত (ইস্তিখলাফ) করা।

দ্বিতীয় পথ: নসটি একাধিক অর্থ বা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে, এমতাবস্থায় সেখান থেকে কোনো একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রহণ করা। যেমন: উমর (রা.) কর্তৃক বিজিত ভূমি বণ্টন না করে তা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ হিসেবে রেখে দেওয়া, উসমান (রা.) কর্তৃক পথ হারানো উট আটক করা এবং আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) কর্তৃক সাধারণ শ্রমিকের (আল-আজর আল-মুশতাক) দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

তৃতীয় পথ: এমন একটি স্বীকৃত পদ্ধতি অবলম্বন করা যা নসের নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং একটি গ্রহণযোগ্য জনকল্যাণমূলক মূলনীতিকে আঁকড়ে ধরা। এটি কয়েকটি পন্থায় হতে পারে:

প্রথমত: দিকনির্দেশনা ও নসীহত; যেমন কিতাবী নারীদের বিবাহ করার ব্যাপারে উমর (রা.)-এর নিষেধাজ্ঞা। এই মত অনুযায়ী এটি ছিল তাঁদের প্রতি নসীহতস্বরূপ। আর নসীহত করার পদ্ধতি কোনো বৈধ (মুবাহ) বিষয়ের পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয়ত: প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বৈধ বিষয়কে সীমাবদ্ধ করা; যেমন কিতাবী নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি এই মতের ভিত্তিতে যে, এটি ছিল বিশেষ এক ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট। যেখানে বৃহত্তর জনকল্যাণের স্বার্থে এই বৈধ বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। আর মুবাহ বা বৈধ বিষয়কে সীমাবদ্ধ করা নসের নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

তৃতীয়: নির্ভরযোগ্য জনস্বার্থের (মাসলাহাত) কারণে দণ্ডবিধি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; যেমন—মদ্যপায়ীর শাস্তি বৃদ্ধি করা এবং বিবাহের শরয়ী ওয়াজিব বা আবশ্যিক বিধানসমূহ পালনে কেউ অবাধ্য হলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো।

চতুর্থ: মূল উদ্দেশ্য বা মাকসাদ আঁকড়ে ধরার নিমিত্তে উপায়ের ক্ষেত্রে শিথিলতা অবলম্বন করা। যেমন—বনু তাগলিবের নিকট থেকে 'জিযিয়া' নাম উল্লেখ না করেই তা গ্রহণ করা। এটি একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি এবং একে নস বা পাঠ্য প্রমাণের পরিপন্থী গণ্য করা হয় না। কারণ এর নাম জিযিয়া না রাখায় তার বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায় না।

সুতরাং এগুলো হলো গ্রহণযোগ্য পথ যা নসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং এতে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট (মাসলাহি) নির্ভরযোগ্য মূলনীতির বাস্তবায়ন রয়েছে।

চতুর্থ কর্মপন্থা: বিরোধের সময় যেটি অধিক শক্তিশালী তাকে প্রাধান্য দেওয়া। এটি মূলত এক দলিলের ওপর অপর দলিলকে প্রাধান্য দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন—উমর (রা.)-এর তামাত্তু হজ থেকে নিষেধ করার বিষয়টি; এ মতানুসারে তিনি হারাম (পবিত্র

এলাকা) জনশূন্য হওয়ার ভয়ে অথবা ইফরাদ ও কিরান হজের বিধান যাতে বিস্মৃত না হয় সেজন্য এটি করেছিলেন। এ জাতীয় পদক্ষেপ মূলত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে একটি বৈধ বিষয়কে নিষিদ্ধ করার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ উসমান (রা.)-এর যুগে আল-কুরআনকে এক হরফে (পঠনরীতিতে) একত্রিত করা; কারণ বিবাদ, মতানৈক্য এবং দ্বীনের প্রতি বিমুখতা দূর করার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

পঞ্চম কর্মপন্থা: কোনো বিধান কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তের অনুপস্থিতি বা প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া। যেমন—দুর্ভিক্ষের বছরে চুরির দণ্ড মকুফ করা। আর এর অধীনে মৃত্যুশয্যায় থাকা স্বামীর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; কারণ সেই তালাকটি কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ ছিল নস বা পাঠ্য প্রমাণের সীমানার ভেতরে থেকেই জনস্বার্থের (মাসলাহি) সুস্পষ্ট বাস্তবায়ন। শরয়ী সীমাবদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য না করে নিছক জনস্বার্থকে এখানে গণ্য করা হয়নি। অতএব এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীন যখন এই ঘটনাগুলোতে জনস্বার্থকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখন তারা নস বা পাঠ্য প্রমাণের বিরোধিতার তোয়াক্কা না করেই তা করেছেন। বরং তারা ছিলেন এমন আলিম যারা নসের সীমানা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। ফলে তারা জানতেন যে, এই জনস্বার্থ নসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ তারা কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। মূলত জনস্বার্থ বা মাসলাহাত শারী'র (আইনদাতার) পাঠ্য প্রমাণসমূহ নিয়ে ইজতিহাদ ও গভীর চিন্তাভাবনার প্রেরণা জোগাতে পারে; এমন নয় যে কোনো পাঠ্য প্রমাণের সাথে তার বিরোধ আছে কি না তা না জেনেই তা গ্রহণ করা হবে।

জনস্বার্থ (মাসলাহাহ) প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদের মূলনীতিসমূহ:

সুতরাং, মাসলাহাহ-ভিত্তিক ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য এবং বিধানের ওপর এর প্রভাব রয়েছে; তবে এর জন্য একটি সঠিক ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম কর্মপদ্ধতি প্রয়োজন। আর এই কর্মপদ্ধতিকে অবশ্যই কয়েকটি মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে:

প্রথম মূলনীতি: এই মাসলাহাহর প্রতি শরিয়তের স্বীকৃতি বা বিবেচনা; অর্থাৎ ইজতিহাদে যে মাসলাহাহটি বিবেচনা করা হবে, শরিয়ত কি তা বিবেচনা করেছে, নাকি সে বিষয়ে নীরব থেকেছে, নাকি তা প্রত্যাখ্যান করেছে?

দ্বিতীয় মূলনীতি: মাসলাহাহটির শরয়ি গুরুত্বের মানদণ্ড; এই গুরুত্ব কি এতই প্রবল যে তা 'অপরিহার্য' (দ্বারুরি) পর্যায়ে পৌঁছেছে, নাকি এটি 'প্রয়োজনীয়' (হাজিয়াত) পর্যায়ের, অথবা তার নিচের কোনো স্তরের?

তৃতীয় মূলনীতি: নস বা মূল পাঠের অর্থ এবং এর উদ্দেশ্য কী? মাসলাহাহ ও নসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনার আগে নসকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে।

চতুর্থ মূলনীতি: মাসলাহাহ এবং নসের দালালাত বা নির্দেশনার মধ্যে দ্বন্দ্বের স্বরূপ; এই দ্বন্দ্ব কি অকাট্য (কাতয়ি) নাকি ধারণাপ্রসূত (জান্নি)? আর এটি কি সব দিক থেকেই বিদ্যমান?

পঞ্চম মূলনীতি: দ্বন্দ্ব নিরসনে ইজতিহাদের প্রকৃতি।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, নস বুঝতে ভুল করা অথবা মাসলাহাহ ও তা প্রয়োগের সীমা অনুধাবনে সীমাবদ্ধতা থাকা মানুষকে বেশ কিছু ভুলের মধ্যে ফেলে দেয়। এই ভুলগুলো মূলত ওপরের পাঁচটি মূলনীতির এক বা একাধিকটির অবহেলার কারণে হয়ে থাকে। আমরা সেই ভুলগুলোকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করতে পারি:

প্রথম ভুল: শরিয়ত প্রণেতা যে বিষয়গুলোকে মাসলাহাহ হিসেবে গণ্য করেননি, সেগুলোকে মাসলাহাহ হিসেবে গ্রহণ করা।

অর্থাৎ এমন কোনো মাসলাহাহ নিয়ে আসা যা শরিয়তের মৌলিক মাসলাহাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, অতঃপর নসের বিপরীতে তা কার্যকর করতে চাওয়া। মাসলাহাহ-ভিত্তিক চিন্তাধারায় এটি একটি ভ্রান্ত পথ।

এর একটি উদাহরণ হলো, ভিত্তিহীন কিছু মাসলাহাহ বিবেচনার অজুহাতে চুরির দণ্ড (হদ) কার্যকরের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা।

যেমন কেউ শর্তারোপ করে যে, সমাজে সচ্ছলতা অর্জিত হতে হবে অথবা এমন এক ইনসাফপূর্ণ সমাজ বিদ্যমান থাকতে হবে যা চুরির দণ্ডবিধি (হদ) প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি রোধ করবে। এগুলো এমন সব কল্যাণ (মাসলাহাত) যা শরীয়ত এই শাস্তি বা দণ্ডবিধি আরোপ করার সময় ধর্তব্য হিসেবে গণ্য করেনি। সুতরাং এটি মাসলাহাত-ভিত্তিক ইজতিহাদ নয়, আর এ জাতীয় বিষয়কে মাসলাহাত-ভিত্তিক ইজতিহাদ বলাও সঠিক নয়। কারণ এটি এমন বিষয়কে ধর্তব্য মনে করছে যা শরীয়তদাতা (শারী') ধর্তব্য ধরেননি। ফলে এটি শরয়ী মাসলাহাতের পরিপন্থী একটি ইজতিহাদ।

দ্বিতীয় ভুল: শরীয়তদাতা যা ধর্তব্য ধরেছেন তা উপেক্ষা করা।

আর তা হলো এমন কোনো মাসলাহাত-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা যা এমন সব কল্যাণকে ধর্তব্য হিসেবে গণ্য করতে চায় যা শরীয়ত উপেক্ষা ও বাতিল করেছে। ফলে সে সেগুলোকে কার্যকর করতে চায় এবং সেগুলোকে (কুরআন-সুন্নাহর) অকাট্য বিধানসমূহের (নস) জন্য নির্দিষ্টকারী বা ব্যতিক্রম বানাতে চায়। যেমন: কেউ যদি নারীর জন্য সহজীকরণের অজুহাতে ওয়াজিব শরয়ী হিজাব ত্যাগ করার আহ্বান জানায় অথবা হিজাবের ধারণাকে এমনভাবে বিস্তৃত করতে চায় যা শরয়ী সীমানা লঙ্ঘন করে।

আর এটি এমন এক কথিত কল্যাণ (মাসলাহাত) যা শরীয়ত অকেজো বা বাতিল করে দিয়েছে। কারণ শরীয়তদাতা এমন পরিস্থিতিতেই হিজাব ফরয করেছেন যে পরিস্থিতিতে তারা নারীর জন্য শিথিলতা চাচ্ছে। সুতরাং সেখানে কোনো অনিবার্য আবশ্যকতা (জরুরত) বা বিশেষ প্রয়োজন (হাজাত) নেই; বরং তা কেবল সেই স্বাভাবিক কষ্ট যা বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই বিধানটি পালন করাকে আবশ্যক করা হয়েছে।

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো: ইনসাফ রক্ষা বা নারীর ক্ষতি দূর করার মাসলাহাত বিবেচনায় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতা বিধান করা। এর মাধ্যমে এখানে শরীয়তদাতা যে অসমতাকে ধর্তব্য ধরেছেন তা উপেক্ষা করা হয় এবং এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হয় না।

বর্তমান যুগে এর চরম পর্যায়ের উদাহরণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—কাজের শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে রমযানের দিনের বেলা রোযা না রাখার অনুমতি দেওয়া। অথচ শরীয়তদাতা এই সময়েই রোযা পালন করাকে উদ্দেশ্য করেছেন, যদিও ব্যক্তি কোনো কাজ বা ব্যস্ততায় থাকুক না কেন। এমতাবস্থায় সে শরীয়তদাতার বিবেচনাকে বাতিল করে দেয় এবং এ বিষয়ে কোনো পরোয়া করে না।

এ ছাড়াও আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যা এমন সব মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য রাখে যা শরীয়ত বাতিল ঘোষণা করেছে। সুতরাং এটি গ্রহণযোগ্য মাসলাহাত-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত নয়।

---

(১) দ্রষ্টব্য: মিন হুনা নাবদা, খালিদ মুহাম্মদ খালিদ, পৃষ্ঠা ১৮২।
(২) দ্রষ্টব্য: রুহুল ইসলাম, জামাল আল-বান্না, পৃষ্ঠা ১৫৯।

পৃষ্ঠা 217

তৃতীয় ভুল: নস (মূল পাঠ) বোঝার ক্ষেত্রে ত্রুটি।

যা নস এবং মাসলাহাতের (জনকল্যাণ) মধ্যে বৈপরীত্যের বিভ্রম তৈরি করে। ফলে নস বোঝার ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারণে এই বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইজতিহাদ সম্পর্কে বৈপরীত্যের দাবি করা, যেখানে তিনি 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব'-এর (যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন) অংশ বাতিল করেছিলেন। তারা মনে করে যে, এটি উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক নসের ওপর আমল পরিত্যাগ করার একটি দৃষ্টান্ত; আর উমরের ওপর দায়িত্ব ছিল তাদের যাকাত প্রদান করা, কিন্তু তিনি নিজ ইজতিহাদের ভিত্তিতে তা পরিত্যাগ করেছেন।

প্রকৃত ভুলটি হলো নস বোঝার অক্ষমতার মধ্যে। এর ফলে ধারণা করা হয়েছে যে, মুয়াল্লাফাতুল কুলুবের অংশ প্রদান করা সব যুগে এবং সব স্থানে ইমামের জন্য ওয়াজিব। যখন তারা দেখল যে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ওপর আমল করেননি, তখন তারা একে নসকে দুর্বল করার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করল। অথচ নসের সঠিক ফিকহ বা বুঝ হলো—মুয়াল্লাফাতুল কুলুবের অংশটি ইসলামের প্রতি তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করার কারণের (ইল্লাত) সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা একে বিদ্যমান বলি বা রহিত বলি, এটি একটি নির্দিষ্ট কারণের সাথে যুক্ত এবং এটি সকল সময় ও সকল স্থানের জন্য অপরিহার্য বা ওয়াজিব নয়।

চতুর্থ ভুল: শারী' (শরীয়ত প্রণেতা) যা সাব্যস্ত করেছেন তাতে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কিছু শরয়ী বিধান লঙ্ঘন করার আহ্বান জানানো। যেমন—মুরতাদ হওয়া বা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে যাওয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া, অথবা মতামত প্রচারের স্বাধীনতা—তা যত গর্হিতই হোক না কেন, অথবা বিকৃত আচরণের স্বাধীনতা; এই দাবিতে যে, এগুলো সেই স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত যা শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে এসেছে।

বস্তুত শরীয়ত প্রণেতা স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু এই অতিরেক বা বৃদ্ধি শরয়ী স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটি ভিন্ন আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত স্বাধীনতা। সুতরাং মাসলাহাতসমূহকে অবশ্যই শারী'-এর বিবেচনার আলোকে বিবেচনা করতে হবে, একে হ্রাস বা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে না।

পঞ্চম ভুল: সকল মাসলাহাতের (কল্যাণ) প্রয়োগ বর্জন করা।

এটি ঘটে যখন কেউ এমন ধারণা পোষণ করে যে, মাসলাহাতসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। ফলে সে শরীয়তের কিছু বিধানের সাথে অন্যগুলোর বৈপরীত্যের অজুহাতে তা বর্জন করে, অথচ উভয় মাসলাহাতের ওপর একসাথে আমল করা সম্ভব ছিল।

""

চতুর্থ অধ্যায়

সিয়াসাহ শারইয়্যাহর মূলনীতিসমূহ

""

এখানে শরয়ী রাজনীতির মূলনীতি (উসুল) এবং শরয়ী রাজনীতির নিয়মাবলীর (কাওয়ায়িদ) মধ্যে পার্থক্য করা বাঞ্ছনীয়। শরয়ী রাজনীতির মূলনীতি বলতে ঐ সকল প্রমাণকে বোঝায় যা এই রাজনীতির বৈধতা নির্ধারণ করে এবং শরিয়ত যে একে গ্রাহ্য করেছে তা সাব্যস্ত করে। নবম ভূমিকায় এই মূলনীতিসমূহ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে; এগুলো এমন প্রমাণ যার মাধ্যমে এই রাজনীতির বৈধতার পক্ষে যুক্তি পেশ করা হয়।

আর নিয়মাবলী বলতে আমি সেই বিষয়গুলোকে বোঝাচ্ছি যেগুলোর ওপর শরয়ী রাজনীতি প্রয়োগের সময় নির্ভর করা হয়। এগুলো হলো এমন মাধ্যম যা শরয়ী রাজনীতি সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলো পূর্বোক্ত মূলনীতিসমূহের মতো শরয়ী রাজনীতির বৈধতার প্রমাণ নয়; বরং এগুলো এমন কিছু নিয়ম যেগুলোকে শরিয়ত গ্রহণযোগ্য হিসেবে নির্দেশ করেছে এবং যা কর্মক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

যখন আমরা শরয়ী রাজনীতিতে নির্ভরশীল এই ধরনের নিয়মাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি, তখন আমরা সেগুলোকে পাঁচটি নিয়মে

সীমাবদ্ধ করতে পারি, আর তা হলো:

১. বৈধ (মুবাহ) বিষয়কে সীমিতকরণের বৈধতা।
২. শাসক কর্তৃক মতভেদ নিরসন।
৩. শাসকের কর্মকাণ্ড জনস্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।
৪. কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য বিধানের বৈধতা।
৫. শাসনক্ষমতার মাধ্যমে বাধ্য করার কর্তৃত্ব।

প্রতিটি নিয়মের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রথম নীতি

মুবাহ (বৈধ) বিষয়কে সীমাবদ্ধ করার বৈধতা

সিয়াসাহ শারইয়্যাহর (শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি) গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত এবং ফিকহী-রাজনৈতিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী হাতিয়ার হলো—মুবাহ বিষয়কে সীমাবদ্ধ করার বৈধতা।

এই নীতির উদ্দেশ্য হলো, শাসক কোনো নির্ভরযোগ্য জনস্বার্থের (মাসলাহাহ) খাতিরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু মুবাহ বা বৈধ বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করবেন এবং সাধারণ মানুষকে বা তাদের একাংশকে তা থেকে বিরত রাখবেন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়: আল্লাহ যা মুবাহ বা বৈধ করেছেন, শাসক তা মানুষের জন্য নিষিদ্ধ করবেন কীভাবে?

উত্তর হলো: মুবাহ বিষয়কে সীমাবদ্ধ করা মূলত মূল বৈধতাকে বাতিল করে না এবং তা এর সাথে সাংঘর্ষিকও নয়। এর কারণ দুটি:

প্রথম কারণ: এটি এমন কিছু শারঈ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যা এই ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপের বৈধতা নির্ধারণ করে। সুতরাং, এটি একটি শরীয়তসম্মত ইজতিহাদ, আর এর ওপর আমল করা মানে শরীয়তের বিধানেরই অনুসরণ করা।

দ্বিতীয় কারণ: এই সীমাবদ্ধতা একটি নির্দিষ্ট সাময়িক ও প্রায়োগিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা মূল বৈধতাকে বাতিল করে না। বরং এটি নির্দিষ্ট সময়, স্থান বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে মাত্র। এটি মুবাহ হওয়ার মূল ভিত্তিটিকে সামগ্রিকভাবে বাতিল করে না এবং মূল বিধানের (আসল হুকুম) ওপর কোনো হস্তক্ষেপও করে না।

অতএব, এই নিষেধাজ্ঞাটি একটি বিশেষ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যা সাধারণ বিধানের একটি ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হয়। এর কারণ হলো এমন এক আকস্মিক জনস্বার্থ যা মূল বৈধতার সময় বিদ্যমান ছিল না। এটি এমন একটি বিষয়কে বিবেচনা করে যা বাতিল করার জন্য মূল বৈধতার বিধান আসেনি এবং এই বিবেচনাটি মূল বৈধতাকে নাকচ করে দেয় না।

বৈধ বিষয়কে (মুবাহ) সীমিতকরণের বৈধতার সপক্ষে দলিলসমূহ:

এই নীতিটিকে বিবেচনার সপক্ষে বেশ কিছু শরয়ী মূলনীতি নির্দেশ করে, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথম মূলনীতি: বৈধ (মুবাহ) ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'ক্ষতি না হওয়ার' শর্তে একে সীমিতকরণ সংক্রান্ত বিধান।

কুরআনের বেশ কিছু বিধানে বৈধতাকে 'ক্ষতি না হওয়ার' শর্তে সীমিত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:
- স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকারকে সীমিতকরণ: "এবং তোমরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না যাতে তোমরা সীমালঙ্ঘন করো।" [আল-বাকারা: ২৩১]।
- মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির অসিয়ত করার অধিকারকে সীমিতকরণ: "অসিয়ত বা ঋণের পরে, যদি তা অন্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়।" [আন-নিসা: ১২]।

সুতরাং এটি এমন একটি মূলনীতি যা এই বৈধ বিষয়গুলোকে এই শর্তে সীমাবদ্ধ করে যে, তাতে যেন কোনো ক্ষতি না থাকে। যদি তাতে ক্ষতি থাকে, তবে তার জন্য ওই বৈধ কাজটি করার সুযোগ নেই। বৈধতাকে সীমিত করার নীতিটি এই ধরণের দৃষ্টান্তের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এটি কোনো ক্ষতি বা জনকল্যাণের (মাসলাহাত) উপস্থিতিতে বৈধতার একটি অংশকে সাধারণ অনুমতির গণ্ডি থেকে বাদ দিয়ে দেয়।

অতএব, বৈধতা শরয়ীভাবে ক্ষতি না হওয়ার শর্তে সীমাবদ্ধ। এটি এমন সব শরয়ী বিধানের পর্যায়ভুক্ত যা জনকল্যাণ অর্জনের জন্য প্রণীত হয়েছে। সুতরাং একে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কল্যাণের পরিমণ্ডলেই অবস্থান করতে হবে। যদি তা কর্ম সম্পাদনকারীর উদ্দেশ্যের কারণে, অথবা এর মাধ্যমে উৎপন্ন ক্ষতির কারণে সেই সীমা লঙ্ঘন করে, তবে তা থেকে বাধা দেওয়া আবশ্যক। এই মূলনীতি থেকেই 'অধিকারের অপব্যবহার' (আত-তাআসুফ ফী ইস্তিমালিল হাক্ক) সংক্রান্ত বিখ্যাত নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে (১)।

দ্বিতীয় মূলনীতি: উলুল আমর বা কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করার নির্দেশ সংক্রান্ত বিধান।

এটি ন্যায়সঙ্গত কাজে তাদের আনুগত্য করার প্রমাণ দেয়, যা একটি সাধারণ নির্দেশ এবং এই ধরণের বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

তৃতীয় মূলনীতি: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহতে বৈধ বিষয়কে সীমিতকরণ সংক্রান্ত বিধান:

---

(১) দেখুন: 'অধিকারের অপব্যবহার', পৃষ্ঠা ২৭০; এবং আল-দুরাইনী রচিত 'অধিকার এবং তা সীমিতকরণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিধি', পৃষ্ঠা ২২২-২২৪। এই নীতির বিস্তারিত দলিলের জন্য দেখুন: 'অধিকারের অপব্যবহার', পৃষ্ঠা ৯৭-২৩০; তারিক বিকীরি রচিত 'বিধানদাতার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি ও তার বৈপরীত্য', পৃষ্ঠা ২৩৩-২৪৩।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো:

- কুরবানীর গোশত সঞ্চয় করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা:

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরবানীর সময় পল্লী অঞ্চলের কিছু লোক লোকালয়ে আসলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা তিন দিন পর্যন্ত (গোশত) সঞ্চয় করে রাখো, এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সদকা করে দাও। এর কিছুকাল পরে তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা তাদের কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে মশক তৈরি করছে এবং তাতে চর্বি গলিয়ে বহন করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাতে কী হয়েছে? তারা বলল: আপনি তো তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বললেন: আমি তোমাদেরকে কেবল সেই অভাবী লোকদের আগমনের কারণেই নিষেধ করেছিলাম যারা (খাবারের সন্ধানে) এসেছিল। সুতরাং এখন তোমরা খাও, সঞ্চয় করো এবং সদকা করো।)

- সংরক্ষিত চারণভূমি (হিমা):

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত: (সা'ব ইবনে জাছছামা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারো জন্য কোনো চারণভূমি সংরক্ষিত করার অধিকার নেই।)

ইমাম যুহরী বলেন: (আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নাকি' নামক স্থানকে সংরক্ষিত চারণভূমি ঘোষণা করেছিলেন এবং উমর (রা.) 'সারাফ' ও 'রাবাযাহ' নামক স্থান দুটিকে সংরক্ষিত ঘোষণা করেছিলেন।)

এই দুটি হাদীসের মূল প্রমাণের বিষয়টি হলো—এই দুটি ঘটনায় যে কারণে বৈধ (মুবাহ) বিষয়কে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল, সে ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা। আর এটি বৈধ বিষয়কে (বিশেষ প্রয়োজনে) সীমাবদ্ধকরণের বৈধতার প্রমাণ বহন করে।

---

(১) ইমাম বুখারী (৫৪২৩) ও ইমাম মুসলিম (১৯৭১) এটি বর্ণনা করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞাটি এখনো বহাল আছে কি না—এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে এটি রহিত (মানসুখ); বর্তমানে সঞ্চয় করা মুবাহ (বৈধ) এবং এ জাতীয় পরিস্থিতিতে তা থেকে নিষেধ করা সমীচীন নয়। তবে কোনো কোনো আলেমের মতে এটি রহিত নয়, বরং এটি স্থগিত বিধানের (মনসা) অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেমন অভাব দেখা দিয়েছিল, তেমন অবস্থা দেখা দিলে সঞ্চয় নিষিদ্ধ করার বিধানটি পুনরায় কার্যকর করা শরীয়তসম্মত হবে। দ্রষ্টব্য: শাফেঈর 'আর-রিসালাহ' ২৩৪, 'শারহু মাআনিল আসার' ৪/১৮৭, মাক্কী বিন আবি তালিবের 'আল-ঈজাহ লিনাসিখিল কুরআন ওয়া মানসুখিহি' ১১৬/১৫, 'আল-হাভী আল-কাবীর' ১৫/১১৬, 'আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা' ৩/৯৪, ইবনে বাত্তালের 'শারহু সহীহ আল-বুখারী' ৬/৩১, 'আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীসি মুসলিম' ৫/৩৭৯।
(২) ইমাম বুখারী (২৩৭০) এটি বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ মূলনীতি: খোলাফায়ে রাশেদীনের রাজনীতি।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সংরক্ষিত চারণভূমি (হিমা) নির্ধারণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ‘হানি’ নামক তাঁর এক মুক্তদাসকে সংরক্ষিত চারণভূমির দায়িত্বে নিয়োগ করেন এবং বলেন: “হে হানি! মুসলমানদের প্রতি তোমার হাত সংকুচিত রাখো (অর্থাৎ তাদের প্রতি সদয় হও), আর মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো। কেননা মজলুমের দোয়া কবুল করা হয়। আর অল্প উট ও অল্প বকরির মালিকদের (চারণভূমিতে) প্রবেশের অনুমতি দাও। তবে ইবনে আউফ ও ইবনে আফফানের গবাদি পশু থেকে সাবধান থেকো; কারণ তাদের গবাদি পশু যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তারা তাদের

খেজুর বাগান ও ফসলি জমির দিকে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু সেই অল্প উট ও বকরির মালিকদের পশু যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে আমার কাছে আসবে এবং বলবে: ‘হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবেন?’ অথচ তাদের জন্য পানি ও ঘাস সরবরাহ করা আমার কাছে সোনা ও রূপা (দান করা) অপেক্ষা অধিক সহজ। আল্লাহর কসম! তারা নিশ্চয়ই মনে করছে যে আমি তাদের ওপর জুলুম করেছি। অথচ এটি তাদেরই ভূমি, যার জন্য তারা জাহিলী যুগে লড়াই করেছে এবং ইসলামের যুগেও এর ওপর অটল থেকেছে। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি সেই চতুষ্পদ জন্তুগুলোর (জিহাদের ঘোড়া ও উট) প্রয়োজন না থাকত যার ওপর সওয়ার হয়ে আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করি, তবে আমি তাদের ভূমির এক বিঘত জায়গাও সংরক্ষিত করতাম না।” (১)

ইমাম মুযানী বলেন: আল্লাহর কসম! এটি এমন এক নির্মল কথা যে, যে কেউ এটি শুনবে সে মনে করবে সে নিজেও এমনটি বলতে সক্ষম, কিন্তু যখন সে তা করতে চাইবে তখন নিজেকে অপারগ দেখতে পাবে। (২)

এর মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার এক মহান দিক নিহিত রয়েছে: এতে সবার প্রতি ইনসাফ প্রদর্শন করা হয়েছে, অতঃপর নিয়ম প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে যাতে তা ন্যায়সঙ্গত হয়। আর এতে এই শিক্ষাও রয়েছে যে, সম্পদ হলো মুসলমানদের এবং এতে যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তাদেরই জনকল্যাণে।

পঞ্চম মূলনীতি: শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শরীআতের যে উদ্দেশ্য এবং শাসকের ওপর যে সকল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা মুবাহ বা বৈধ বিষয়সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করা ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

সুতরাং নিরঙ্কুশ বা সাধারণ বিষয়গুলোকে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করা এবং যা মূলত আবশ্যক ছিল না তা আবশ্যক করা ব্যতীত সেনাবাহিনী সুসজ্জিত করা বা অধিকারসমূহ রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর এটিই হলো ‘তাকয়ীদ’ বা নিয়ন্ত্রণের মূল ধারণা। (৩)

(১) ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন (৩০৫৯)।
(২) মুখতাসারুল মুযানী ১/৬৭৯।
(৩) মুবাহ বা বৈধ বিষয়কে সীমাবদ্ধ করার দলীলসমূহ বিস্তারিত জানতে দেখুন: আল-হুসাইন আল-মুস রচিত 'তাকয়িদুল মুবাহ' পৃষ্ঠা ৫৭-৭১ এবং ২০৭-২২০; বশীর আল-মাক্কী রচিত 'সুলতাতু ওয়ালিয়িল আমর ফী তাকয়িদিল মুবাহ' পৃষ্ঠা ১৫৭-১৮৪।

আলূসী মুবাহ (বৈধ) কাজ পালনে বাধ্য করার বিষয়ে আলেমগণের মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: (আর এটি কি মুবাহ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে কি না? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: এতে তাদের (শাসকদের) আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়; কারণ আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তা হারাম করা অথবা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করা কারো জন্য বৈধ নয়। আবার বলা হয়েছে: এটিও ওয়াজিব হবে, যেমনটি হাসকাফী ও অন্যান্যরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। শাফেঈ মাযহাবের জনৈক গবেষক আলেম বলেছেন: ইমামের আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না তিনি কোনো হারামের নির্দেশ দেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন: যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, যে বিষয়ে তিনি আদেশ করেছেন অথচ তাতে কোনো জনস্বার্থ নেই, সে ক্ষেত্রে কেবল বাহ্যিকভাবেই তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব (১); তবে যাতে জনস্বার্থ নিহিত রয়েছে তার বিষয়টি ভিন্ন, সেক্ষেত্রে তা অভ্যন্তরীণভাবেও ওয়াজিব হয় (২)।)

আর নিরঙ্কুশভাবে নিষেধ করার বিষয়টি সমস্যাযুক্ত; কেননা মুবাহ বিষয়ের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা ছাড়া মুসলিমদের ওপর সাধারণ কর্তৃত্ব (বিলায়াতুল আম্মাহ) কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া ফকীহগণ উল্লেখ করেন যে, হারামের বাইরে অন্যান্য বিষয়ে আনুগত্য করতে হবে, আর এটি মুবাহকেও অন্তর্ভুক্ত করে; বরং তারা মুবাহের বিষয়েও স্পষ্টভাবে মত প্রদান করেছেন (৩)।

সম্ভবত এই মতভেদটি এমন চিত্রের ক্ষেত্রে নয়, যেমন কোনো মুবাহ কাজ করার আদেশ দেওয়া; এবং জনস্বার্থে কোনো মুবাহ বিষয় নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য নয়।

মুবাহ বিষয়কে সীমাবদ্ধ করার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলী:

এই সীমাবদ্ধকরণ যেন শরয়ী বিবেচনার গণ্ডির মধ্যে থাকে, সেজন্য এতে কিছু শর্ত থাকা আবশ্যক, আর সেগুলো হলো:

প্রথম শর্ত: মুবাহ বিষয়টি সীমাবদ্ধ করার উপযোগী হতে হবে। সুতরাং যে মুবাহের সাথে অন্যের অধিকার সংশ্লিষ্ট নয় তা সীমাবদ্ধ করার উপযোগী নয়; তবে যা অন্যদের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট তা এর ব্যতিক্রম। অনুরূপভাবে, যে মুবাহ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা সর্বব্যাপী (উমুমুল বালওয়া), তাকেও সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

(১) ফকীহদের নিকট এই ধরণের পরিভাষার ব্যবহার প্রচুর রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আনুগত্য না করার কারণে যে ক্ষতি হতে পারে তা থেকে বেঁচে থাকা। ফলে জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং বৃহত্তর অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য তা মেনে চলা হয়। দেখুন: রাসায়েলে আবি আলী আল-ইউসী ১/২২৫।
(২) দেখুন: রূহুল মাআনী ৩/৬৫; এবং দেখুন: হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী ৩/৭০।
(৩) দেখুন: তুহফাতুল মুহতাজ মাআ হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী ৩/৭১; শারহু মুখতাসারি খলীল ৮/৬০; মাওয়াহিবুল জলীল ৬/২৯৭; এবং মুস্তাহাব (মানদুব) বিষয়ের নির্দেশ এবং এর প্রভাব সংক্রান্ত প্রায়োগিক আলোচনা অধ্যায়ে যা সামনে আসবে তা দেখুন।

...যাতে মানুষ তা থেকে বিরত থাকতে কঠোর কষ্টের সম্মুখীন হয়; বরং বৈধতা (মুবাহ) সীমিতকরণ এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে হবে যা মানুষের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট, এবং যা থেকে মানুষকে বিরত রাখার মধ্যে জনস্বার্থ নিহিত থাকে, অথচ সেটির প্রতি তাদের কোনো তীব্র প্রয়োজন থাকে না।

দ্বিতীয় শর্ত: বৈধ বিষয়টি গ্রহণ করা বা বর্জন করার ফলে কোনো ক্ষতি সাধিত হওয়া।

তৃতীয় শর্ত: এটি সাময়িক বা অস্থায়ী হওয়া।

চতুর্থ শর্ত: এটি এমন কোনো শরয়ি উদ্দেশ্যের জন্য হওয়া যা তার চেয়ে শক্তিশালী অন্য কোনো বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় (১)।

বৈধ বিষয় (মুবাহ) সীমিতকরণের প্রয়োগসমূহ:
বৈধ বিষয় সীমিতকরণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত কিছু প্রয়োগ আমরা নির্বাচন করতে পারি এবং সেগুলোর মধ্য থেকে যা আলোচনার দাবি রাখে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এই প্রয়োগগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(১) বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ:
শরিয়ত বিবাহে বহুবিবাহকে বৈধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: “তোমরা নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের পছন্দমত দুই, তিন অথবা চারজনকে বিবাহ করো” [সূরা আন-নিসা: ৩]। আমাদের বর্তমান যুগে বহুবিবাহ নিয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে। কিছু মানুষ তাদের দৃষ্টিতে বিদ্যমান নানাবিধ ক্ষতির ওপর ভিত্তি করে মূল শরয়ি বিধানের ওপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন এবং এর ফলে তারা শরয়ি দলিলগুলোর অপব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তাদের সাথে আমাদের কোনো আলোচনা নেই।

এখানে যে বিষয়টি উপস্থাপনের দাবি রাখে তা হলো: ‘বৈধ বিষয় সীমিতকরণ’-এর নীতি অনুসারে কি বহুবিবাহকে সীমিত করা বৈধ হবে?
সমসাময়িক পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ এই সীমাবদ্ধকরণকে সঠিক বলে অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেছেন: বহুবিবাহ মূলত বৈধ,

কিন্তু আমাদের যুগে এতে এমন জুলুম পরিলক্ষিত হচ্ছে, শরিয়ত প্রণেতা যা বাধ্যতামূলক করেছেন তা রক্ষা করা হচ্ছে না এবং এর ফলে পরিবার ধ্বংস হওয়া, সন্তানদের বিচ্ছিন্নতা ও আশঙ্কাজনক হারে তালাক সংঘটিত হওয়ার মতো বিষয়গুলো ঘটছে, যা কোনো প্রবল জনস্বার্থের খাতিরে বৈধ বিষয়কে সীমিতকরণের বৈধতাকে অপরিহার্য করে তোলে। আর এটি ‘সিয়াসাহ শরইয়াহ’ (শরয়ি প্রশাসনিক নীতি)-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

(১) শর্তাবলির ব্যাপারে দেখুন: ‘তাকয়িদুল মুবাহ’ ২৪৭-২৫৩; ‘সুলতাতু ওয়ালিউল আমর ফি তাকয়িদিল মুবাহ’ ২০৯-২২৯; ‘দওয়াবিত সালাহিয়্যাত তাসাররুফুল ইমাম ফিল ইলযামি বিল ইবাহাহ’, হাসান হিনদাউয়ি ৩৫১-৩৬০; মাজাল্লাতুল আদল-এ প্রকাশিত একটি অনুমোদিত গবেষণা প্রবন্ধ, সংখ্যা ৬৬, যিলকদ ১৪৩৫ হিজরি।

কিছু সমসাময়িক পণ্ডিত এই মতটি এই বলে খণ্ডন করেছেন যে, বহুবিবাহ এমন একটি বিষয় যা কুরআনের অকাট্য ভাষ্যের মাধ্যমে শরিয়তসম্মত করা হয়েছে। আর এ ধরণের বিষয় কোনো সীমাবদ্ধতা বা নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত নয়; বরং নিয়ন্ত্রণ কেবল সেই সকল বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলোর বৈধতা সাধারণ দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

আমার দৃষ্টিতে এই উত্তরটি নির্ভুল নয়; কারণ এমনকি যে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ভাষ্য বা দলিল দ্বারা অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, তাকেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তবে আলোচনার মূল বিষয় হলো: নিয়ন্ত্রণের প্রতিটি দাবিই কি গ্রহণযোগ্য হবে?

সুতরাং এই পদ্ধতিতে বহুবিবাহকে সীমিত করা একটি ভুল অভিমত। কারণ এখানে অনুমোদিত বিষয়কে সীমাবদ্ধ করা বৈধ নয়। তারা যে সকল ক্ষতির কথা উল্লেখ করেন, তা বহুবিবাহের বৈধতার মূল উৎস বা কাঠামোর মধ্যেই বিদ্যমান। ফলে তাদের এই সীমাবদ্ধতা আরোপের বিষয়টি মূল অনুমতির মূলনীতিকেই নাকচ করে দেয়। অথচ মহান আল্লাহ বহুবিবাহকে শরিয়তসম্মত করেছেন এতে বিদ্যমান প্রবল কল্যাণসমূহের কারণে, যদিও বিধাতা জানতেন যে বহুবিবাহের সাথে কিছু অপকারিতাও যুক্ত থাকতে পারে। সুতরাং তারা যা কিছু উল্লেখ করছেন, তা বহুবিবাহের মূল কাঠামোর মধ্যেই বিদ্যমান অপকারিতা। প্রকৃতপক্ষে তারা বিধাতা কর্তৃক প্রদত্ত মূল শরিয়তি অনুমতিকেই সীমাবদ্ধ করছেন, অথচ আমাদের সামনে এমন কোনো ব্যতিক্রমী অবস্থা নেই যা ঢালাও কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপের দাবি রাখে।

হ্যাঁ, আমরা যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট ছোট গ্রামে এমন এক গোষ্ঠী বাস করে যাদের মধ্যে বহুবিবাহের হার অত্যধিক এবং তাদের বহুবিবাহের ক্ষেত্রে জুলুম ও সীমালঙ্ঘন প্রবল হয়ে উঠেছে, তবে সেখানে বলা যেতে পারে যে, শাসকের জন্য তাদের ক্ষেত্রে বহুবিবাহের সুযোগ সংকুচিত করা বৈধ। তবে এটি কোনো ঢালাও সংকোচন নয়; বরং বহুবিবাহকে এই শর্তে সীমাবদ্ধ করা যে, তা বিচার বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হবে অথবা এমন কিছু শর্তারোপ করা যা নিশ্চিত করবে যে তারা শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন করছে না। এটি এমন একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত হবে যা মূল অনুমতির পরিপন্থী নয়। এই সীমানার মধ্যেই 'শরিয়তসম্মত শাসননীতি' কার্যকর হয়। কিন্তু এই ধরণের কিছু ক্ষতির অজুহাতে দেশের সকল মানুষের জন্য ঢালাওভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা মূলত আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার নামান্তর, যা কোনোভাবেই শরিয়তসম্মত শাসননীতির অন্তর্ভুক্ত নয়।

এর উদাহরণ হলো, যদি কেউ মাংস ভক্ষণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির অজুহাতে অথবা নির্দিষ্ট কিছু অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে মাংস ভক্ষণকে ঢালাওভাবে নিষিদ্ধ করার প্রয়াস চালায় এবং এই যুক্তিতে আইন প্রণয়ন করে যে, নবী (সা.) মদিনায় আগত অভাবগ্রস্তদের কথা বিবেচনা করে কুরবানির মাংস তিন দিনের অধিক জমা রাখতে সাহাবীদের নিষেধ করেছিলেন। তবে এটি হবে আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম করা। এখানে উক্ত হাদিসের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই; বরং হাদিসটি কার্যকর করার পরিসর কেবল তখনই সঠিক হয় যখন...

...একটি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ পরিস্থিতি, যেমন যদি কোনো দেশে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে এবং একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক এই প্রয়োজন দূর হওয়া পর্যন্ত গোশত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে চান, তবে বিষয়টি এই প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটি গোশতকে নিরঙ্কুশভাবে হারাম করা নয়।

(২) বিয়ের আগে চিকিৎসাগত পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা:

মূলনীতি হলো, শর্তাবলি পূরণ হওয়ার পর যখনই স্বামী-স্ত্রী চাইবেন, তখনই তাদের মধ্যে বিয়ের চুক্তি সম্পন্ন হবে। স্বামী-স্ত্রীর জন্য কোনো প্রকার চিকিৎসাগত পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক নয়। কারণ বিয়ে তাদের জন্য একটি বৈধ (মুবাহ) অধিকার, তাই এই বৈধ বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

কিন্তু যদি বলা হয় যে, এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যাশিত জনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের ওপর এই মুবাহ কাজটি করা বাধ্যতামূলক করা হবে এবং এই মুবাহ বিষয়টি সম্পন্ন করার আগে বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের পদক্ষেপের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হবে; তবে কি এই ধরনের পদক্ষেপ বৈধ হবে?

হ্যাঁ, এটি বৈধ হবে। এটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে 'মুবাহ' বা বৈধ বিষয়কে সীমাবদ্ধ করার অন্তর্ভুক্ত; কারণ এতে জনকল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং এতে কারো কোনো ক্ষতি নেই।

অনুরূপভাবে বিয়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, বিয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করা, শর্তাবলি লেখার নিয়ম ঠিক করা এবং এই জাতীয় বিষয়গুলো মুবাহ বা বৈধ বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপের অন্তর্ভুক্ত। তবে এতে অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ নিহিত রয়েছে।

(৩) নেকাব নিষিদ্ধ করা:

আমাদের যুগে কিছু মানুষের মুখে মুখে এই কথাটি শোনা যায় যে, নেকাব নিষিদ্ধ করা এমন এক মুবাহ বা বৈধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার বৈধতার দাবি করা যেতে পারে এই যুক্তিতে যে এটি 'মুবাহ'কে সীমাবদ্ধ করার নামান্তর। সত্য কথা হলো, এটি একটি স্পষ্ট ভুল যার সাথে এই মূলনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এই বক্তব্যের পেছনে গ্রহণযোগ্য কোনো ফিকহি যুক্তি নেই। দুটি বিষয় আলোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে:

প্রথম বিষয়: মুবাহ বা বৈধ বিষয়কে সীমাবদ্ধ করা এমন সব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যাতে উভয় দিকই সমান (অর্থাৎ করা বা না করা উভয়ই সমান স্তরের বৈধ)। যেমন মানুষকে কোনো নির্দিষ্ট জমিতে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া; এটি একটি মুবাহ বিষয়, সেখানে প্রবেশ করা যেমন বৈধ তেমনি প্রবেশ না করাও বৈধ। সুতরাং এটি মুবাহ বিষয়কে সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্র হতে পারে। কিন্তু যেসব বিষয় শরিয়ত কর্তৃক বিধিবদ্ধ বা আদিষ্ট (মাশরু'), সেগুলো সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্র নয়। বরং এটি হবে শরিয়তের বিধানের ওপর হস্তক্ষেপ। কিছু মানুষ হয়তো ভুলবশত মনে করতে পারেন যে এটি...

পৃষ্ঠা 230

মুখমণ্ডল আবৃত করা ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত কথাটি ভুল; বরং নেকাব সর্বসম্মতিক্রমে শরয়িভাবে অনুমোদিত, এমনকি যারা মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ বলেন তাদের নিকটও। অতএব, এটি নিষিদ্ধ করার কথা বলা মসজিদে জামাতে সালাত আদায় নিষিদ্ধ করা, নফল রোজা রাখা এবং কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ করা ও এই জাতীয় বিষয়গুলোর সমতুল্য।

দ্বিতীয় বিষয়: বৈধ (মুবাহ) বিষয়কে সীমিত করা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এটি মুসলিমদের সাধারণ জনকল্যাণের স্বার্থে গৃহীত পদক্ষেপ। আর মুসলিমদের জন্য তাদের দ্বীনি বিধানে সংকীর্ণতা তৈরি করা কোনোভাবেই তাদের জনকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও এর পেছনে কোনো কারণ থাকার ধারণা করা হয়। কারণ এই সবকটিই হলো কাল্পনিক অনিষ্ট, যা মুসলিমদের দ্বীনি বিষয়ে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা সৃষ্টি না করেই পরিহার করা সম্ভব। এই কারণেই এমনকি একজন উদারপন্থী চিন্তাবিদও স্বাধীনতার প্রতি অবিচল থেকে একে প্রত্যাখ্যান করেন।

পৃষ্ঠা 231

দ্বিতীয় নীতি

শাসকের ফয়সালা মতভেদ দূর করে

শরয়ী রাজনীতির (সিয়াসা শরইয়াহ) অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী উপকরণ যা ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচ্য, তা হলো ইখতিলাফী (মতভেদপূর্ণ) মাসআলাসমূহে শাসকের ফয়সালা সংক্রান্ত বিষয়টি। আর তার ফয়সালা সেই বিষয়ের মতভেদ দূর করে দেয়। এটি চার মাযহাবের ফকীহগণের কিতাবসমূহে একটি প্রসিদ্ধ নীতি (১)।

এটি সাধারণত ইখতিলাফী মাসআলাসমূহে বিচারকের (কাযী) ফয়সালার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়। এমতাবস্থায় তার ফয়সালা মানা আবশ্যক, যদিও সেখানে মতভেদ বিদ্যমান থাকে। যাতে মতভেদের উপস্থিতিকে অযুহাত হিসেবে ব্যবহার করে বিচার বিভাগীয় রায়ের শক্তিকে প্রভাবিত করা না হয় এবং তা থেকে নির্গত হুকুম বা নির্দেশসমূহকে নড়বড়ে করে না দেয়া হয়। সুতরাং শাসকের ফয়সালা মতভেদ দূরকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়। এর অর্থ হলো, এটি বিবাদমান উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক; নিজের ভিন্ন ফিকহী মতামতের কারণে বিচার বিভাগীয় ফয়সালার বিরোধিতা করার অধিকার কারো নেই।

যদি এটি না হতো, তবে: (শাসকদের কোনো ভিত্তি সুসংহত হতো না এবং বিচারের পরেও বিবাদসমূহ আগের মতোই থেকে যেত। আর এর ফলে ঝগড়া ও বিবাদ স্থায়িত্ব লাভ করত, ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ত এবং শত্রুতা অব্যাহত থাকত। যা মূলত সেই হিকমতের পরিপন্থী যার জন্য শাসকদের নিযুক্ত করা হয়েছে) (২)।

---

(১) চার মাযহাবের ফিকহগ্রন্থের জন্য দেখুন: হাশিয়া ইবনে আবিদিন ৩/৪১২, আল-বাহরুর রায়িক ৪/১৯২, আল-খারশি কতৃক শারহু মুখতাসার খলিল ৭/১৫৭, হাশিয়াতুদ দিসুকি ২/২৫৮, তুহফাতুল মুহতাজ ৬/২৪৬, নিহায়াতুল মুহতাজ ৬/২২২, শারহু

মুনতাহাল ইরাদাত ৩/৫০৩, নাইলুল মাআরিব ২/৪৫৭। আল-কারাফি এই নীতির একটি বিশেষ অংশে জুমহুর ফকীহগণের বিপরীতে কিছু শাফেয়ী আলেমের মতভেদ বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি হলো: বিচারকের রায় যদি এমন কারো নিকট পেশ করা হয় যিনি তা সঠিক বলে বিশ্বাস করেন না, তবে তিনি তা কার্যকর করবেন না এবং বাতিলও করবেন না, বরং তা যে অবস্থায় আছে সেভাবেই রেখে দেবেন। দেখুন: আল-ফুরুক ২/১০৩-১০৪ ও ১০৬; শাফেয়ীগণের কিছু বক্তব্য দেখুন: রওজাতুত তালিবিন ১১/১৫২, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর ১/৪১৬।
(২) আল-ফুরুক ২/১০৪, আরও দেখুন: খতিব বাগদাদি কৃত আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/১২৪, আল-কাওয়াইদুল কুবরা ২/৪৭।

পৃষ্ঠা 232

বিচারবিভাগীয় পর্যবেক্ষণ কেবল বিতর্কিত বিধানাবলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি প্রমাণের বিতর্কিত মাধ্যমগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে। (১)

জাসসাস বলেন:

(এবং আমরা চুক্তি সম্পাদন ও তা বাতিলের যে বিবরণ দিয়েছি, সেগুলোর ক্ষেত্রে বিচারকের রায়ের কার্যকারিতার একটি প্রমাণ হলো এই বিষয়ে সকলের ঐকমত্য যে, ফকীহগণ যেসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন, বিচারক যদি সেই মতভেদের কোনো একটি দিকের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন, তবে তার রায় কার্যকর হবে। তিনি যা সম্পাদন করেছেন, ইজতিহাদের মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ রহিত হয়ে যায়। যার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে তার জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হয়ে যায় এবং যার বিপক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে তার জন্য তা প্রতিহত করা বৈধ থাকে না, যদিও তাদের উভয়ের বিশ্বাস এর বিপরীত হয়। যেমন: প্রতিবেশিত্বের কারণে শুফ'আ (অগ্রক্রয়) অধিকার এবং অভিভাবক ছাড়া বিবাহ এবং ফকীহগণের মধ্যকার অনুরূপ অন্যান্য মতপার্থক্য।) (২)

এই নিয়মটি কেবল বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি বিভিন্ন স্তরে মতভেদ নিরসনকারী:

- এটি বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে মানতে বাধ্য করে।
- এটি পরবর্তী বিচারককে মানতে বাধ্য করে, ফলে তিনি পূর্ববর্তী বিচারকের রায় বাতিল করবেন না।
- এটি বিচারকের প্রদত্ত রায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকেও মানতে বাধ্য করে। সুতরাং বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত রায়ই ধর্তব্য, মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস নয়। যদি বিচারক কোনো বিতর্কিত বিবাহের বৈধতার রায় দেন, তবে তার সেই রায় যেমন দম্পতির ওপর কার্যকর হবে, তেমনি সাধারণ মানুষের ওপরও কার্যকর হবে। ফলে কেউ নিজের ফিকহী মতামতের ভিত্তিতে উক্ত মহিলা বৈধভাবে বিবাহিতা নন—এমন দাবি করে তাকে বিবাহ করতে পারবে না।

তবে ফকীহগণ এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রসিদ্ধ বিষয়ে মতভেদ করেছেন:

প্রথম মাসআলা: বিচারক যদি মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেন, তবে কি তার সেই রায় হারামকে হালাল করে দেবে? আর তা হচ্ছে এমন বিষয়ের ওপর বিচারকার্য সম্পন্ন হওয়া, যা সম্পর্কে বিচারক অবগত হলে...

---

(১) দেখুন: আল-ফুরুক ৪/৪৮।
(২) আহকামুল কুরআন ১/৩০৭ - ৩০৮।

এর দ্বারা ফয়সালা করা হবে। তাই তারা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, সম্পদের ক্ষেত্রে এটি বাহ্যিকভাবে বৈধ হবে কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে নয় (১)। তবে তারা চুক্তি এবং চুক্তি বাতিল বা বিচ্ছেদের বিষয়ে মতভেদ করেছেন।

অধিকাংশ ফকীহ এই মত পোষণ করেছেন যে, এটি কেবল বাহ্যিকভাবেই কার্যকর হবে; এটি কোনো হারামকে হালাল করবে না এবং কোনো হালালকে হারাম করবে না। হানাফী মাযহাবের অভিমত এবং ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনা অনুযায়ী এটি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ভাবেই কার্যকর হবে (২)।

দ্বিতীয় মাসআলা: বিচারক যদি এমন ফয়সালা করেন যা সেই ব্যক্তির বিশ্বাসের পরিপন্থী যার পক্ষে ফয়সালা করা হয়েছে, তবে কি তা তার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে বৈধ হবে?

এ বিষয়ে তারা তিনটি মতে বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম মত: এটি তার জন্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ভাবেই বৈধ হবে। আর এটিই জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের মত (৩)।

দ্বিতীয় মত: 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' (শরয়ি প্রশাসনিক নীতি) এর দিক থেকে এটি কেবল বাহ্যিকভাবে বৈধ হবে, কিন্তু বিষয়ের অভ্যন্তরীণ হাকিকতে এটি তার জন্য বৈধ হবে না (৪)।

তৃতীয় মত: যে ব্যক্তি এটি বিশ্বাস করে তার জন্য অথবা সাধারণ ব্যক্তির জন্য এটি বৈধ হবে। তবে যে এটি বিশ্বাস করে না অথবা যে আলিম এর বিপরীত মত পোষণ করেন, তাদের জন্য তা বৈধ হবে না (৫)।

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন:

(১) দেখুন: আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন ২/৩৩৮, মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৫/৩৭৭; আরও দেখুন: ফয়সাল আদ-দুওয়াইবি রচিত আল-মাসলাহাতু ইন্দাল উসূলিয়্যিন, পৃষ্ঠা ৫০৯।
(২) দেখুন: আল-মাবসুত ১৬/১৮০, আল-বাহরুর রায়েক ৩/১১৬, রওদাতুত তালিবিন ১১/১৫২, আদ-দারদীরের আশ-শারহুল কাবীর ৪/১৫৬, আল-খারশীর শারহু মুখতাসারি খলীল ৭/১৬৬, আল-মুগনী ১০/৫৩, আল-ইনসাফ ১১/৩১২।
(৩) এটি মালেকী এবং শাফেয়ী মাযহাবের অধিকতর বিশুদ্ধ মত এবং হাম্বলী মাযহাবের মত। দেখুন: শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ৩/৫৩৫, আল-খারশীর শারহু মুখতাসারি খলীল ৭/১৬৬, হাশিয়াতুদ দিসুকী ৪/১৫৬-১৫৭, রওদাতুত তালিবিন ১১/১৫৩, নিহায়াতুল মুহতাজ ৫/৩৬৮; আরও দেখুন: ইহকামুল আহকাম ২/২৭১।
(৪) এটি শাফেয়ী মাযহাবের একটি অভিমত এবং হাম্বলী মাযহাবের একটি বর্ণনা, ইবনুস সালাহও এ কথা বলেছেন। দেখুন: রওদাতুত তালিবিন ১১/১৫৩, নিহায়াতুল মুহতাজ ৫/৩৬৮, আল-ইনসাফ ১১/৩১২, জামিউল মাসায়েল ৫/৩৮৫।
(৫) শাফেয়ী মাযহাবের একটি অভিমত হলো, এটি তার জন্য হালাল হবে যে এটি বিশ্বাস করে, তার জন্য নয় যে এটি বিশ্বাস করে না। ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদিস সালাম এই মত পোষণ করেছেন যে, এটি সাধারণ মানুষের জন্য হালাল হবে কিন্তু আলিমের জন্য নয়। দেখুন: আল-কাওয়াইদুল কুবরা ২/৮২, রওদাতুত তালিবিন ১১/১৫৩।

শাসক যদি এমন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন যা বিচারপ্রাপ্ত ব্যক্তি (যাঁর পক্ষে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে) হারাম মনে করেন, তবে ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুসারে এতে মতভেদ রয়েছে যে, উক্ত ফয়সালার মাধ্যমে কি তা তার জন্য বৈধ হবে? এ ক্ষেত্রে দুটি রিওয়ায়াত রয়েছে। এ বিষয়ে সঠিক বিশ্লেষণ হলো: কোনো ব্যক্তির জন্য ইমামের কাছে এমন কিছু চাওয়া সমীচীন নয় যা সে হারাম বলে বিশ্বাস করে। যে ব্যক্তি তা করল, সে মূলত তা-ই করল যা সে হারাম মনে করে, আর এটি জায়েজ নয়। তবে আবেদনকারী যদি অন্য কেউ হয় অথবা ইমাম নিজেই কোনো ফয়সালা বা বণ্টনের উদ্যোগ নেন, তবে এ ক্ষেত্রে তা বৈধ হওয়ার অভিমতটি জোরালো হয়।**(১)**

সুলতানের নির্দেশাবলির মাধ্যমে কি মতভেদ নিরসন হবে?

যদিও ফকিহগণ 'বিচার বিভাগ' (আল-কাজা) অধ্যায়ে এই মূলনীতিটি উল্লেখ করেন, তবে এর অর্থ এই নয় যে সুলতানের নির্দেশাবলি এর আওতাভুক্ত নয়। বরং সুলতানের ফয়সালাও একইভাবে মতভেদ নিরসন করে। জনস্বার্থ (মাসলাহাত) রক্ষায় সুলতানের ইজতিহাদী মতামত মানা বাধ্যতামূলক। কারণ বিচারক (কাজি) হলেন সুলতানের প্রতিনিধিদের একজন; ফলে বিচারকের ক্ষেত্রে যদি এটি বৈধ হয়, তবে যিনি তাঁর চেয়ে উচ্চমর্যাদার (অর্থাৎ সুলতান), তাঁর ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া সুলতানের নির্দেশসমূহ বিচারিক ফয়সালারই পর্যায়ভুক্ত, বরং তা আরও শক্তিশালী। অতএব, সুলতানের আনুগত্য করা তাঁর নির্দেশাবলিতে ওয়াজিব, যদিও তা কোনো মতভেদমূলক বিষয়ে হয়, যদি তাতে জনস্বার্থ নিশ্চিত হয়।

বরং ফকিহগণ সুলতানের চেয়ে নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও মতভেদ নিরসনের বিধান উল্লেখ করেছেন, যেমন যাকাত আদায়কারী কর্মচারী (সা'য়ী)। যদি তিনি ইজতিহাদের ভিত্তিতে যাকাত গ্রহণ করেন, তবে তা বাতিল করা যাবে না;**(২)** কারণ যাকাত আদায়কারী হলেন ইমামের প্রতিনিধি, আর তাঁর কাজ ইমামের ফয়সালার মতোই, যা মতভেদ নিরসন করে।**(৩)**

তবে ইমামের কোনো কাজের ক্ষেত্রে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে—যেমন তিনি কোনো সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করলেন বা জিজিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করলেন। এটি কি তাঁর বিচারিক ফয়সালার মতোই যা মতভেদ নিরসন করবে এবং পরবর্তী কারও জন্য তা বাতিল করা বৈধ হবে না? নাকি এটি স্রেফ একটি কাজ যা পরবর্তী কাউকে তা পরিবর্তন করতে বাধা দেবে না?**(৪)**

(১) আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ৫/৫৬৩; আরও দেখুন: জামিউল মাসাইল ৫/৩৮৮।
(২) দেখুন: আল-ফুরূক ২/১০৩ এবং ৪/৫২।
(৩) কাশশাফুল কিনা ২/২০২।
(৪) দেখুন: আল-ইসতিখরাজ ৮৯-৯০; আল-কাওয়াইদ ওয়াল ফাওয়াইদ আল-উসুলিয়্যাহ, ইবনুল লাহহাম ৩৭৬; আত-তাহবীর শারহুত তাহরীর ৪/১৫৯৪-১৫৯৫। হাম্বলি ফকিহগণ স্পষ্ট করেছেন যে ইমামের কর্মকাণ্ড তাঁর ফয়সালার মতোই। দেখুন: আল-মুগনি ৩/২৭; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ২/১০। হানাফি ও মালিকি ফকিহদের বক্তব্য হলো যে ইমামের কর্মকাণ্ডগুলো...

এই মূলনীতির ব্যাপকতা এবং এটি কেবল বিচারিক বিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকার বিষয়টি এই দ্বারা সমর্থিত হয় যে, কিছু

ফকীহ এমন সব বিষয় উল্লেখ করেছেন যা বিচারকের ফয়সালার অন্তর্ভুক্ত এবং যা মতভেদ নিরসন করে। যেমন: পানিনিষ্কাশন নালা (মিজাব) স্থাপনের অনুমতি দেওয়া, অথবা রাস্তায় কোনো স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা; ফলে নির্মাণকারী কোনো ক্ষতির জন্য দায়ী হবে না। অনুরূপভাবে বিচারক কর্তৃক হারাম মদ ঢেলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া, কিংবা বিজিত ভূমি (আরদুল আনওয়াহ) বিক্রয় বা ওয়াকফ করা এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়। এই সিদ্ধান্তগুলো সাধারণ বিচারিক পর্যালোচনার সীমা অতিক্রম করে সেই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা মূলত ইমাম বা রাষ্ট্রের প্রধানের বিশেষ এখতিয়ারভুক্ত।

এই অর্থটিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে আলেমদের কিছু বক্তব্য নিম্নরূপ:

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন:
"ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি তার প্রতিনিধিদের সাথেও সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যা কিছু শাসকদের উপর ন্যস্ত, তাতে বিচারকের নির্দেশ—যিনি ঐ বিষয়ে ইমামের প্রতিনিধি—তা ইমামের নির্দেশের মতোই গণ্য হবে। যেমন: অভিভাবকহীন নারীদের বিয়ে দেওয়া, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি তদারকি করা এবং ওয়াকফকারীদের শর্ত অনুযায়ী তা পরিচালনা করা, মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর ওয়াকফ পরিচালনা করা। যেহেতু এই বিষয়গুলোতে ইমামের পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার আছে, তাই ইমাম যেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখেন, সেখানে তার প্রতিনিধিরও তা করার অধিকার রয়েছে। আর যদি বিষয়টি এমন ইজতিহাদমূলক হয় যাতে মতভেদ বিদ্যমান, তবে ইমাম কিংবা তার প্রতিনিধি—হোক তিনি বিচারক বা অন্য কেউ—তাদের কারো কাজের প্রতিবাদ করার অধিকার কারো নেই। তদুপরি ইমাম এবং তার প্রতিনিধিরা এ ক্ষেত্রে যা করেছেন তা বাতিল করা যাবে না।"

তিনি আরও বলেন:
"কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য এবং উম্মাহর সালাফদের ইজমা (ঐক্যমত) একথার প্রমাণ দেয় যে, উলিল আমর বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি (সালাতের ইমাম, বিচারক, যুদ্ধ ও গণিমত বিষয়ক আমীর এবং জাকাত আদায়কারী কর্মচারী)—যাদের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আনুগত্য করা হবে, এবং এটি নয় যে..."

= বাক্যটি কোনো বিচারিক রায় নয়। দেখুন: আল-ইহকাম ফী তামিযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম, ১৮৬; তাবসিরাতুল হুক্কাম, ১/১০৬-১০৮; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির (ইবনে নুজাইম), ৯১। সয়মিরী হানাফী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম যা সম্পাদন করেছেন, তার পরবর্তী কেউ তা বাতিল করতে পারবে না। দেখুন: মাসাইলুল খিলাফ ফী উসুলিল ফিকহ, ২৯৬-২৯৭। ইবনে রুশদের মতে, ইমাম কর্তৃক জমি বরাদ্দ দেওয়া একটি বিচারিক রায়। দেখুন: আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল, ৭/৩৬৫। শাফেয়ীদের মতে সংরক্ষিত এলাকা (হিমা) জনস্বার্থ বা প্রয়োজনে বাতিল করা যায়, আবার বলা হয়েছে বাতিল করা যায় না। দেখুন: রওদাতুত তালিবীন, ৫/২৯৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, ৫/৩৪২।
(১) শারহু মুনতাহাল ইরাদত, ৩/৫০৩।
(২) মাজমুউল ফাতাওয়া, ২০/৪০৭।

ইজতিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার অনুসারীদের কর্তব্য হলো তার আনুগত্য করা; বরং এক্ষেত্রে তাদের ওপর তার আনুগত্য করা এবং নিজ মত পরিহার করে তার মত গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা জামাত ও ঐক্যের কল্যাণ এবং বিভক্তি ও মতভেদের অনিষ্ট ছোটখাটো মাসআলাসমূহের বিষয়ের চেয়েও বড়। এই কারণেই এক শাসকের পক্ষে অন্য শাসকের রায় বাতিল করা জায়েজ নয় (১)।

আল-জুওয়াইনী বলেন: (যদি অনুসন্ধানী মাসআলাসমূহে ইমামের অনুসরণ অনিবার্য না হতো, তবে ইজতিহাদী বিষয়ে বিবাদ মীমাংসা করা সম্ভব হতো না। প্রত্যেক বিবাদী তার নিজ মাযহাব ও দাবির ওপর অনড় থাকত এবং বিবাদীদ্বয় ফকীহদের মতভেদের বেড়াজালে পড়ে শেষহীন বিবাদে লিপ্ত থাকত; অথচ বান্দাদের অধিকাংশ বিচার-আচারই ইজতিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হয়ে থাকে) (২)।

ইমাম কর্তৃক মতভেদ নিরসনের পদ্ধতিসমূহ:

ইমামের নির্দেশের অবস্থাগুলো কেবল একটি রূপ ধারণ করে না, বরং এগুলোকে কয়েকটি পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ করা যায়:

প্রথম পদ্ধতি: এটি যদি বিচারিক রায় হয়, যখন তা দুই বিবাদীর মধ্যে ফয়সালা করার ক্ষেত্রে হয় অথবা নির্দিষ্ট কোনো দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে হয়। এক্ষেত্রে এটি যেকোনো বিচারিক রায়ের মতোই মতভেদ নিরসনের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: শাসকদের ওপর ন্যস্ত বিধানসমূহের ক্ষেত্রে দুই মতের যেকোনো একটি গ্রহণ করা। যেমন জমির ওয়াকফ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেমনটি উমর (রা.) সাওয়াদ ভূমির ক্ষেত্রে করেছিলেন। এমতাবস্থায় তার কথা গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হবে এবং তার বিরোধিতা করা বৈধ হবে না।

তৃতীয় পদ্ধতি: কোনো গ্রহণযোগ্য ইখতিলাফী বা মতভেদপূর্ণ বিষয়ে কোনো একটি মত বেছে নেওয়া; সেটিও গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর শর্তাবলি সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে।

চতুর্থ পদ্ধতি: কোনো গ্রহণযোগ্য ফিকহি মতকে নিষিদ্ধ করা যদি তার ফলে কোনো ক্ষতি বা ফিতনা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর তা হলো ফিকহি মতভেদের ফলে যদি...

---

(১) জামেউল মাসাইল ৫/২৭৩ - ২৭৪; আরও দেখুন: জামেউল মাসাইল ৫/৩৮৫, ৫/৩৮৮, ৫/৩৮৯ এবং ৫/২৭৯।
(২) আল-গিয়াসি ৩৫০ - ৩৫১।

...মুসলমানদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো ফিতনা বা তাদের ক্ষতির কারণ হয়, তবে এই বৃহত্তর অনিষ্ট প্রতিহত করার জন্য কোনো গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান বা আমল করা নিষিদ্ধ করা বৈধ। যেমন উদাহরণস্বরূপ, উচ্চস্বরের জামাতের সালাতে বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করার মতভেদ; যদি এর ফলে মানুষের মধ্যে ফিতনা ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়, যেমনটি ফিকহী ইতিহাসে এর কারণে ঘটা বিবাদগুলো সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এই ফিতনা দমনের জন্য তা নিষিদ্ধ করা বা কোনো একটির বাধ্যবাধকতা আরোপ করা শরিয়তসম্মত, যদিও মূলত এটি এমন গ্রহণযোগ্য মাসআলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিষয় নয়।

আর যখন মানুষের মাঝে হৃদ্যতা সৃষ্টি ও ফিতনা দমনের স্বার্থে মুস্তাহাব আমলসমূহ বর্জন করা শরিয়তসম্মত (১), তখন অনুরূপ স্বার্থ রক্ষায় একটি গ্রহণযোগ্য মত বর্জন করা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।

পঞ্চম পদ্ধতি: কোনো নির্ভরযোগ্য ফিকহী মাযহাবের ভিত্তিতে বিচারিক রায়ের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা। জমহুর বা অধিকাংশ ফকিহ এটি নিষিদ্ধ হওয়ার এবং কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা জায়েজ না হওয়ার মত দিয়েছেন (২)। তবে ফকিহদের এই বক্তব্য মূলত মুজতাহিদ বিচারকের (কাজী) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু মুকাল্লিদ বিচারকের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের বাধ্যবাধকতা থেকে তাকে নিষেধ করা হবে না (৩)।

এই মাসআলার ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক বিচারিক আইন প্রণয়নের বিধানে সমসাময়িক মতবিরোধ তৈরি হয়েছে (৪)।

এই কায়দায় 'মতভেদ নিরসন' করার অর্থ কী?

এখানে মতভেদ নিরসনের দুটি অর্থ রয়েছে:

---

(১) দেখুন: শারহু সহিহিল বুখারি, ইবনে বাত্তাল ১/২০৫; আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবি ৪/৩৬৯-৩৭০; শারহু মুসনাদিশ শাফিঈ, রাফেঈ ২/৩৪৮; আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ২/১৬৬ এবং ২/৩৫১।
(২) এটি শাফিঈ ও হাম্বলিদের মাযহাব এবং হানাফি ও মালিকিদের একটি অভিমত। দেখুন: আল-হাভি আল-কাবির ১৬/২৫; রওদাতুত তালিবিন ১১/১২০; আল-মুগনি ১০/৯৩; কাশশাফুল কিনা ৬/২৯২; আত-তাওদিহ ফি শারহি মুখতাসার ইবনিল হাজিব ৭/৩৯১; হাশিয়াতুদ দিসুকি ৪/১৩০; ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম ৭/২৫৭।
(৩) এই অর্থের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য দেখুন: আস-সিয়াগাতুল ফিকহিয়্যাহ, হাইসাম আল-রুমি ৪২২-৪২৩।
(৪) এই মতবিরোধের গতিধারা এবং উভয় পক্ষের দলিলসমূহ দেখুন: আস-সিয়াগাতুল ফিকহিয়্যাহ, আল-রুমি ৪৩৫-৪৫৫; তাকনিনুল আহকাম আল-কাদাইয়্যাহ, আল-ফায়েজ ৫৭-৯৮; আন-নাওয়াযিল আত-তাশরিয়্যাহ, আল-মাইমান ৮৯-১৩৩।

প্রথম অর্থ: বিচারিক অর্থ; অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিবাদ সৃষ্টি হলে বিচারক সেখানে একটি ফিকহী মতের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন। ফলে তার রায় মেনে চলা আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং বিচারক যা রায় দেন তা ছাড়া অন্য কিছু কার্যকর বা সঠিক বলে গণ্য হয় না।

দ্বিতীয় অর্থ: এর চেয়েও বিস্তৃত অর্থ; আর তা হলো কোনো গ্রহণযোগ্য জনস্বার্থের (মাসলাহাত) খাতিরে কোনো নির্দিষ্ট ফিকহী মত মেনে চলাকে বাধ্যতামূলক করা অথবা তা থেকে বিরত রাখা।

উভয় অর্থেই উদ্দেশ্য হলো— কোনো সাধারণ শরয়ী জনস্বার্থের উপস্থিতির কারণে কোনো একটি গ্রহণযোগ্য ফিকহী মতকে মেনে চলা, যা এই বিষয়টিকে অপরিহার্য করে তোলে। আর মতভেদটি স্বস্থানে বহাল থাকে, তা দূরীভূত হয় না। একারণে, এই নীতিটির প্রয়োগ কেবল সেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যেখানে এর প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং বিচারক যখন দুই বিবাদমান পক্ষের মধ্যে ফয়সালা করেন, তখন তিনি তাদের মধ্যকার সেই নির্দিষ্ট বিবাদমান বিষয়ে মতভেদ নিরসন করেন; এর অর্থ এই নয় যে সামগ্রিক মতভেদটিই দূরীভূত হয়ে গেছে।

মতভেদ নিরসনকারী বাধ্যবাধকতার সীমা:

এই নীতিটি একটি নির্দিষ্ট পরিসরে কাজ করে যা বিচারকের রায়ের আওতাভুক্ত। আর তার রায়ের বিধান হলো: "তা কেবল তখনই প্রভাব ফেলে যখন তিনি এমন কোনো ইজতিহাদী বিষয়ে তা প্রদান করেন যেখানে পার্থিব কোনো জনস্বার্থের কারণে উপলব্ধিসমূহ পরস্পরের কাছাকাছি থাকে"(১)।

আমরা একে নিম্নোক্ত বাক্যে বিন্যস্ত করতে পারি:
গ্রহণযোগ্য মতভেদ, যার সম্পর্ক জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদের ভিত্তিতে যা বাধ্যতামূলক করার পেছনে শরয়ী জনস্বার্থ বিদ্যমান।

১- গ্রহণযোগ্য মতভেদ:
আর তা হলো সেই সম্ভাব্য মতভেদ যা এমন কোনো ‘নস’ (দলিল)-এর বিরোধী নয় যার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দলিল নেই, অথবা যা ইজমায়ের (সর্বসম্মত ঐক্য) পরিপন্থী নয়।

এর ভিত্তিতে, শরীয়তের অকাট্য বিধানসমূহের বিরোধিতা করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে অগ্রহণযোগ্য মতভেদের ওপর আমল

করাও জায়েজ নয়; এটি মতভেদ নিরসনকারী হওয়া তো দূরের কথা।

---

(১) আল-ফুরূক ৪/৪৯।

আর এটি একারণে যে, যখন কোনো শাসকের ফয়সালা কোনো অকাট্য দলীল (নস) কিংবা ইজমার (ঐকমত্য) পরিপন্থী হয়, তখন তা বাতিল হয়ে যায়। সুফিয়ান সাওরি বলেন: "যখন কোনো বিচারক আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ কিংবা সর্বসম্মত কোনো বিষয়ের পরিপন্থী ফয়সালা প্রদান করেন, তখন পরবর্তী বিচারক তা বাতিল করে দেবেন। আর যদি বিষয়টি মানুষের ব্যক্তিগত রায়ের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তবে তিনি তা বাতিল করবেন না এবং বিষয়টি যেভাবে আছে সেভাবেই গ্রহণ করা হবে।" (১)

ইমাম শাফেয়ী বলেন: "বিচারকদের মধ্য থেকে কেউ যদি ইজতিহাদ করেন এবং পরে দেখেন যে তার ইজতিহাদ ভুল ছিল, অথবা সেই ফয়সালাটি অন্য কোনো বিচারকের নিকট পেশ করা হয়; এমতাবস্থায় যদি তা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ, ইজমা কিংবা এই পর্যায়ের কোনো বিষয়ের পরিপন্থী হয়, তবে তিনি তা বাতিল করে দেবেন। এছাড়া তার জন্য অন্য কিছু করা বৈধ নয়। আর যদি বিষয়টি এমন হয় যা তার গৃহীত মত এবং ভিন্ন মত উভয়টিই গ্রহণ করার অবকাশ রাখে, তবে তিনি তা বাতিল করবেন না।" (২)

এটি আলেমদের ঐকমত্যের একটি বিষয়। ইবনে আব্দুল বার বলেন: "ওলামায়ে কেরাম এই মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, স্পষ্ট জুলুম এবং ইজমা ও এমন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ সুন্নাহর পরিপন্থী সুস্পষ্ট ভুল যার কোনো বিপরীত দলীল নেই— তা যে কেউ ফয়সালা করুক না কেন, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" (৩)

ইমাম আল-কারাফি এই মূলনীতির প্রয়োগসীমা স্পষ্ট করে বলেন: "আমার বক্তব্য: 'ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে', এটি ইজমার ক্ষেত্রসমূহ থেকে বাঁচার জন্য। কেননা সেখানে বিধানটি ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে আছে; ফলে তা সুনির্দিষ্ট ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার কারণে সেখানে নতুন কোনো বিধান উদ্ভাবন করা অসম্ভব। আর আমার বক্তব্য: 'যার প্রমাণাদি কাছাকাছি পর্যায়ের', এটি দুর্বল দলীল-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট বিচ্ছিন্ন (শায) মতভেদ থেকে বাঁচার জন্য। কারণ এটি প্রকৃত কোনো মতভেদ নয়, বরং যদি এমন দুর্বল প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেওয়া হয়, তবে সেই ফয়সালা বাতিল হয়ে যাবে।" (৪)

আর দ্বীনের অপরিহার্য ও স্বতঃসিদ্ধ (মা’লুম মিনাদ দ্বীন বিদ্দারুরা) বিধানসমূহ, অকাট্য ফয়সালাসমূহ এবং ইজমার ক্ষেত্রসমূহ হলো চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বিষয়। সুতরাং এই পরিসরে উলিল আমরের (কর্তৃপক্ষ) দায়িত্ব ও ক্ষমতা হলো এই যে, তিনি তা কায়েম করবেন...

---

(১) দেখুন: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৮/ ১০০৮, নম্বর: (১৫২৯৮)।
(২) আহকামুল কুরআন: ৪০৮।
(৩) আত-তামহীদ ৯/ ৯১। যেমন আলেমদের একটি জামাত ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, নস বা ইজমা বিরোধী বিষয় বাতিল করা হবে। দেখুন: আল-ইহকাম ফি তামিযিল ফাতওয়া আনিল আহকাম: ৮২; মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৯/ ৩১ এবং ২৭/ ৩০২; আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/ ১২৪; ইলামুল মুওয়াক্কিঈন ৩/ ২২৪; আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, আল-আমিদি ৪/ ২০৩। এই বাতিলকরণের সীমানা এবং ওলামাদের মতভেদের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: বাহসু নাকদিল ইজতিহাদ, ওয়ালিদ আল-ওয়াদআন, আলুকা নেটওয়ার্ক।
(৪) আল-ফুরূক ৪/ ৫১ এবং দেখুন: আল-কাওয়ায়িদুল কুবরা ২/ ২৭৩।

পৃষ্ঠা 240

...দ্বীন সংরক্ষণ এবং এর বিধানাবলি বাস্তবায়ন করা, এবং এই বিধানাবলি সুস্পষ্ট করা, সেগুলোর হেফাযত করা এবং তা কার্যকর করার মাধ্যমে শরীয়তের বিধি-বিধানের দাবির প্রতি মানুষকে বাধ্য করা।(১)

২- যা জনস্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় সাধারণ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট:

এটি হলো এমন মতপার্থক্য যা কোনো সাধারণ বিষয়ের সাথে জড়িত যেখানে সিয়াসাহ শরইয়াহ (শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি) অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যদি বিষয়টি ব্যক্তিগত বা বিশেষ কোনো বিষয় হয়, তবে তা সিয়াসাহ শরইয়াহ-এর কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এর মধ্যে অন্যতম হলো ইবাদতসমূহ; কারণ ইবাদত মূলত এমন কোনো ক্ষেত্র নয় যেখানে শাসক মতপার্থক্য নিরসন করবেন।(২)

এর একটি উদাহরণ হলো: জুমার নামাজের জন্য অনুমতি প্রদান। আলেমদের মধ্যে এই মাসআলায় মতপার্থক্য রয়েছে যে, শাসক কি এমন শর্ত আরোপ করতে পারেন যে তার অনুমতি ব্যতীত জুমা কায়েম করা যাবে না? আল-কারাফি উল্লেখ করেছেন যে, শাসকের এই অধিকার নেই। তবে যদি বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ সৃষ্টি হয়, তবে সেই কারণে তিনি এর বিরোধিতা করতে বাধা দিতে পারেন। কিন্তু এটি শাসকের পক্ষ থেকে মতপার্থক্য নিরসনের (রফউল খিলাফ) অন্তর্ভুক্ত নয়(৩); আর ইবনে আশ-শাত তার বিরোধিতা করেছেন এবং বিষয়টিকে এই উসূলি বা মৌলনীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।(৪)

আর তা এই কারণে যে: (এটি ইজতিহাদের ক্ষেত্র। সুতরাং সুলতান বা শাসক যখন এক্ষেত্রে কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করেন, তখন তার বিরোধিতা করা যাবে না। এবং তার অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে, ঠিক যেমন বিচারক যখন আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এমন কোনো বিষয়ে ফয়সালা প্রদান করেন, তখন তার ফয়সালা কার্যকর হয় এবং তা প্রত্যাখ্যান করা যায় না)।(৫)

আল-জুওয়াইনি উল্লেখ করেছেন যে, ইবাদতসমূহ যখন প্রকাশ্য নিদর্শনের (শিআর) অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তা ইমামের বা রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্তের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়।

আর এটি দুই প্রকার:

প্রথমত: যে বিষয়গুলোর সাথে বিশাল সংখ্যক মানুষ এবং জনসমাগম জড়িত, যেমন জুমা এবং দুই ঈদ। এক্ষেত্রে ইমামের অনুমতি শর্ত নয়, তবে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারেন না। কারণ বিশাল জনসমাগম অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ঘটার স্থান হয়ে থাকে।

---

(১) দেখুন: সুলতাতু ওয়ালিয়্যিল আমরি ফিল আহকামিল ইজতিহাদিয়্যাহ ১/৩১৩-৩২২।
(২) দেখুন: আল-ফুরুক ৪/৪৮; এবং এ বিষয়ে মতভেদ দেখুন: ইলযামু ওয়ালিয়্যিল আমরি ওয়া আসারুহু ফিল মাসায়িলিল খিলাফিয়্যাহ, আব্দুল্লাহ আল-মাযরুউ ৬২-৬৫।
(৩) দেখুন: আল-ফুরুক ৪/৪৯।
(৪) দেখুন: আল-ফুরুক ৪/৪৯; এবং দেখুন: শারহুয যুরকানি আলা মুখতাসারি খালিল ২/১১০।
(৫) মাওয়াহিবুল জলিল ২/১৭৪।

দ্বিতীয়ত: এমন সব বিষয় যা জামাতবদ্ধভাবে সম্পাদিত হয় না, যেমন আযান এবং জুমআ ব্যতীত অন্যান্য জামাত; এই ধর্মীয় প্রতীকগুলো (শাআ'ইর) পরিত্যক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম (শাসক) তাদের তা পালনে বাধ্য করবেন।

আর যেসব শারীরিক ইবাদত ধর্মীয় প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত নয়, ইমাম সেগুলোতে হস্তক্ষেপ করবেন না; যদি না তাঁর নিকট কোনো নির্দিষ্ট মামলা উত্থাপিত হয়, যেমন কোনো ব্যক্তি ওজর ছাড়াই সালাত ত্যাগ করলে তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করবেন।(১)

জনৈক শাফিঈ আলিম যখন উল্লেখ করলেন যে, শাসকের অধিকার রয়েছে মানুষকে তাঁর মাযহাব অনুযায়ী সূর্য ঢলে যাওয়ার (যাওয়াল) আগে বা পরে জুমআর সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়ার, তখন আশ-শিরওয়ানী এর সমালোচনা করে বলেন:

(নিশ্চয়ই ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইমামের জন্য জনগণকে তাঁর মাযহাবের দিকে আহ্বান করা বৈধ নয়, এবং জনগণের সালাতের সময়ের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নয়। ইমামের নির্দেশ মান্য করা কেবল তখনই অন্তরের সাথে আবশ্যক হয় যখন তিনি এমন কোনো মুস্তাহাব বা মুবাহ কাজের নির্দেশ দেন যাতে জনস্বার্থ নিহিত রয়েছে; সুতরাং যোহরের সময়ের আগে জুমআ আদায় করা অথবা যোহরের সময়ের পরে তা পিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশের ক্ষেত্রে অন্তরের সাথে আনুগত্য করা কীভাবে ওয়াজিব হতে পারে?)(২)

সারকথা হলো, শাসকের নির্দেশ ইবাদতের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অনুগামী বা গৌণ হিসেবেই প্রবেশ করে।(৩)

ইবনে ফারহুন বলেন:

(শাসকদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ইবাদত ও অন্যান্য বিষয়ে ফতোয়া প্রদানও অন্তর্ভুক্ত, যেমন—বৈবাহিক সম্পর্কের নিষিদ্ধতা, পানির পবিত্রতা থেকে উপকৃত হওয়ার বৈধতা এবং বিভিন্ন বস্তুর অপবিত্রতা নির্ধারণ। তবে এগুলো বিচার বিভাগীয় কোনো চূড়ান্ত নির্দেশ নয়; বরং যারা এটি বিশ্বাস করেন না, তাদের জন্য শাসক বা ইমামে আযমের ফতোয়ার বিপরীতে ফতোয়া দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। একইভাবে, শাসক যদি কোনো সৎ কাজের নির্দেশ দেন বা কোনো অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন যা তিনি নিজে ভালো বা মন্দ মনে করেন, তবে যারা তা বিশ্বাস করেন না তাদের জন্য শাসকের অনুরূপ কাজ না করার সুযোগ রয়েছে। তবে ইমাম যদি কাউকে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য আহ্বান করেন এবং এর বিরোধিতা করলে অনৈক্য বা বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, তবে সেক্ষেত্রে আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে। আর শাসকের ক্ষেত্রে নীতি হলো, তিনি এমন কোনো কাজে সহায়তা করবেন না যা আমাদের মতে তাঁর অবস্থানের বিপরীত, যদি না এমন ফিতনার আশঙ্কা থাকে যে ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করতে শরীয়ত নিষেধ করেছে।)(৪)

---

(১) দেখুন: আল-গিয়াসি ৩৩৮ - ৩৪০।
(২) হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী ২/৪১৯ - ৪২০।
(৩) হাশিয়াতুল আদাবী আলা শারহিল খারশি ২/৭৫।
(৪) তাবসিরাতুল হুক্কাম ১/১০৫ - ১০৬, এবং দেখুন: আল-ইহকাম ফি তামিযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম ১৮৪, আল-মাওয়ার্দী প্রণীত আল-আহকামুস সুলতানিইয়্যাহ ৩৫৬ - ৩৫৭, আল-ফাররা প্রণীত আল-আহকামুস সুলতানিইয়্যাহ ২৮৮।

ফকীহগণ ইবাদতের শর্তাবলি, রুকনসমূহ, ওয়াজিবসমূহ এবং সুন্নাতসমূহের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ করে থাকেন। সুতরাং শাসকের জন্য জনগণের ওপর এমন কোনো ফিকহী অভিমত চাপিয়ে দেওয়া বৈধ নয় যেখানে তাদের জন্য অন্য মত অনুসরণের অবকাশ রয়েছে। মূলত বিষয়টি এমনই; তবে ফকীহদের কারো কারো মতে এমন কিছু অবস্থা রয়েছে যা ইবাদতের ক্ষেত্রে শরয়ি রাজনীতির (সিয়াসাহ শারিয়্যাহ) প্রবেশের সম্ভাবনা রাখে। আমরা এখানে তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ করতে পারি:

১- যখন ইবাদতের সময়, স্থান বা তাতে সমবেত হওয়ার পদ্ধতির সাথে কোনো সাধারণ জনকল্যাণ (মাসলাহাহ আম্মাহ) জড়িত থাকে, তখন শরয়ি রাজনীতি এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে।

২- যখন শাসক কোনো মুস্তাহাব (মানদুব) কাজ করার নির্দেশ দেন; তখন কি এটি এর বিধানে কোনো প্রভাব ফেলবে? প্রয়োগিক আলোচনার অধ্যায়ে এ বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ ও বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

৩- যখন কোনো কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি (বা মুহতাসিব) ইজতিহাদী বা গবেষণালব্ধ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন—এই অভিমত অনুযায়ী যে, তার এই অধিকার রয়েছে (১)।

পক্ষান্তরে যেসব শরয়ি বিধানের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে, সেগুলো এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা সেগুলোতে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩- এবং তা পালনে বাধ্য করার পেছনে কোনো শরয়ি জনকল্যাণ বিদ্যমান থাকা:
কেননা শাসকের যে কোনো পদক্ষেপ জনকল্যাণের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই ধরনের বাধ্যবাধকতার জন্য কোনো গ্রহণযোগ্য জনকল্যাণ থাকা অপরিহার্য যা এমন বাধ্যবাধকতার দাবি রাখে।

৪- ব্যবহারিক ক্ষেত্রে:
বাধ্যবাধকতা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত, আর এটি ব্যবহারিক দিকের সাথে নির্দিষ্ট।

---

(১) দেখুন: আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আল-মাওয়ারদী ৩৫১; আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আবু ইয়ালা ২৮৭-২৮৮; আল-কাওয়াইদুল কুবরা ২/২৭৩। এর দৃষ্টান্ত হলো—যখন তাকে এমন বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় যা ইমাম উত্তম (মা’রুফ) মনে করেন কিংবা এমন বিষয় থেকে নিষেধ করা হয় যা তিনি মন্দ (মুনকার) মনে করেন এবং তাকে তা বর্জন করার আহ্বান জানানো হয় এবং বিভেদের আশঙ্কা থাকে, তখন আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়ে যায়। দেখুন: আল-আহকাম ১৮৪; তাবসিরাতুল হুক্কাম ১/১০৬। কখনো আবার এই বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে, কারণ তখন আনুগত্য ফিতনা ও বড় ধরনের অনিষ্ট প্রতিহত করার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, মূল বিধানের সাথে নয়।

আর ব্যক্তি ইজতিহাদ বা তাকলিদের মাধ্যমে যে ইলমি বা জ্ঞানতাত্ত্বিক অভিমত পছন্দ করে নেয়, তার প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয়ে যায় না এবং তা থেকে বারণও করা হয় না। কারণ তা থেকে বারণ করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

এই কারণেই সাহাবায়ে কিরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যুগ থেকে ইসলামের আলিমগণ ইলমি মাসআলাসমূহে মতবিরোধ করে আসছেন, বিতর্ক করেছেন এবং একে অপরের জবাব দিয়েছেন। এর ফলে বিভিন্ন ফিকহী মাযহাবের উদ্ভব হয়েছে এবং কেউই সমস্ত মানুষকে নিজের মত মানতে বাধ্য করেননি।

এই প্রেক্ষিতেই আবু জাফর আল-মানসুর কর্তৃক ইমাম মালিকের নিকট মানুষকে 'মুয়াত্ত' মানতে বাধ্য করার আবেদনের সেই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। ইমাম মালিক বলেছিলেন: **"হে আমিরুল মুমিনীন! এমনটি করবেন না। কেননা মানুষের নিকট বিভিন্ন বক্তব্য পৌঁছেছে, তারা হাদিস শুনেছে এবং বর্ণনাও করেছে। আর প্রত্যেক জনপদ তাদের কাছে যা পৌঁছেছে তা-ই গ্রহণ করেছে, তদনুসারে আমল করেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী ও অন্যদের মতভেদের ভিত্তিতে সে অনুযায়ী দীন পালন করছে। সুতরাং তারা যা বিশ্বাস করে নিয়েছে তা থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন। তাই মানুষকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন এবং প্রতিটি জনপদের অধিবাসী নিজেদের জন্য যা পছন্দ করে নিয়েছে তার ওপর থাকতে দিন।"** (১)

আল-জুওয়াইনী দীন থেকে বিদআত দূর করার ক্ষেত্রে ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) দায়িত্ব উল্লেখ করার পর বলেন: **"শরীয়তের শাখা-প্রশাখা এবং প্রবল ধারণার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত মাসআলার ক্ষেত্রে আলিমদের মতভেদের ধারাতেই সালফে সালেহীন অতিবাহিত হয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মানিত সাহাবীগণ এই রীতির ওপরই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাদের এই মতভেদ শরীয়তের দলীলসমূহ নিয়ে গবেষণার পথ উন্মোচন করে, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ ও নিয়ামত। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'আমার উম্মতের মতভেদ একটি রহমত।' সুতরাং আহকামের খুটিনাটি বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম যে মতবিরোধ করেন, তাতে ইমামের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বরং প্রতিটি ইমাম ও তাদের অনুসারীদের তাদের মাযহাবের ওপর বহাল থাকতে দেওয়া উচিত এবং তাদের পথ ও লক্ষ্য থেকে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না।"** (২)

৫- কোনো মুজতাহিদ বা তাদের মুকাল্লিদদের নির্ভরযোগ্য শরয়ী ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে:

এটি সিয়াসাতে শারইয়্যার অন্তর্গত প্রতিটি জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড এবং ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে একটি শর্ত।

---

(১) দ্রষ্টব্য: আল-ইন্তিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিত সালাসা আল-ফুকাহা, ইবনে আবদিল বার ৪১; আল-মাহদীও তার কাছে একই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, দেখুন: আল-ইন্তিকা ৪০।

(২) আল-গিয়াসি ৩৩২-৩৩৩, এবং দেখুন: আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফী বায়ানিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ, আল-মুনাভী ৬৭।

এবং বিচারব্যবস্থা; তাই এটি উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা নেই বললেই চলে, কারণ এটি প্রতিটি ইজতিহাদের জন্য একটি শর্ত এবং এটি কেবল এই নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

তবে শরিয়াহ নির্দেশিত ইজতিহাদের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে মানুষের মনে যেসব ভ্রান্ত ধারণার উদয় হতে পারে, তা থেকে সতর্ক থাকার জন্য এখানে বিষয়টি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং **‘মতভেদ নিরসন’** এর ক্ষেত্রে এমনটি কল্পনা করা যায় না যে, শাসক কোনো ওয়াজিব বিষয় বর্জন করতে বাধ্য করবেন,

এমনকি যদি তা মতভেদপূর্ণ বিষয়ও হয়। যেমন আমাদের যুগের কিছু মূর্খ ব্যক্তি দলিল দিয়ে থাকে যে, নেকাব নিষিদ্ধ করা বৈধ এই যুক্তিতে যে এটি শাসকের পক্ষ থেকে একটি বাধ্যবাধকতা যা মতভেদ নিরসন করে। এটি তাদের মূর্খতা; কারণ এটি একটি শরয়ি ওয়াজিব। এমনকি যারা একে ওয়াজিব মনে করেন না, তারাও একে শরয়ি বিধান হিসেবে গণ্য করেন। সুতরাং এটি ভাবাও অসম্ভব যে, মতভেদ নিরসন এমন সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে যেখানে মতভেদ নিরসনের দোহাই দিয়ে জামাতে সালাত আদায় নিষিদ্ধ করাকে বৈধ গণ্য করা হবে!

এমনকি কোনো শরয়ি মুস্তাহাব বিষয় বর্জনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য নয়। কারণ মুস্তাহাব কাজগুলো পালনের জন্য উৎসাহিত করা হয়, তা থেকে বাধা দেওয়ার জন্য নয়। তবে যদি সেই নিষেধাজ্ঞাটি গৌণ বিষয় হয় এবং মূল উদ্দেশ্য না হয়, বরং তা কোনো ফিতনা বা সাধারণ ক্ষতি রোধ করার উদ্দেশ্যে হয় (তবে ভিন্ন কথা)। সেক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট মুস্তাহাব কাজ পালন করতে বলা যেতে পারে, যার ফলে পরিণামে অন্যের কাছে থাকা অন্য একটি মুস্তাহাব কাজ পালনে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। যেমনটি পূর্বে জামাতে সালাতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠের মাসআলার উদাহরণে অতিবাহিত হয়েছে। এই ধরণের বিষয় বৈধ; কারণ এই নির্দেশটি মূলত মুস্তাহাব নিষিদ্ধ করার জন্য নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট মুস্তাহাব কাজ পালনের জন্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটি একটি মুস্তাহাব কাজ করার বাধ্যবাধকতা, মূলত কোনো মুস্তাহাবকে সরাসরি নিষিদ্ধ করা নয়।

অনুরূপভাবে, মতভেদ নিরসনের দোহাই দিয়ে মানুষের ওপর কোনো হারাম বিষয় চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ থাকে, তবে তা মানুষের ইখতিয়ার বা পছন্দের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত এমন সব মাসআলার অন্তর্ভুক্ত হবে যাতে মতভেদ বিদ্যমান। মতভেদ নিরসনের অজুহাতে তাদের ওপর হারাম কাজ করা বাধ্যতামূলক করা যাবে না! তবে যদি কোনো বৈধ (মুবাহ) বিষয়ে শরয়ি জনস্বার্থের খাতিরে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, যার ফলে অনুবর্তী হিসেবে সকলকে তা মেনে চলতে হয়—এমনকি যারা একে হারাম মনে করেন তাদেরও—তবে সেটি প্রাথমিকভাবে হারাম কাজ করতে বাধ্য করা নয়। বরং যা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা একটি গ্রহণযোগ্য মত, তাই সেটি পালন করা হারাম কাজ করার অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর শুরুতে মুস্তাহাব কার্যাবলি বর্জন অথবা হারাম কাজ সম্পাদনের জন্য বাধ্য করার ক্ষেত্রে, কোনো গ্রহণযোগ্য কল্যাণকর যুক্তি থাকতে পারে বলে মোটেও ধারণা করা যায় না। সুতরাং এটি এই মূলনীতির বহির্ভূত; কারণ এটি ফাসাদ বা অনিষ্টের ওপর বাধ্যবাধকতা তৈরি করা এবং এর সাথে জনস্বার্থ কামনার (ইসতিসলাহ) কোনো সম্পর্ক নেই।

বিরোধ নিরসনের জন্য শাসক কি মুজতাহিদ হওয়া শর্ত?

বিষয়টি হলো, ফকীহগণ বিচারক (কাযী) ও ইমামের জন্য শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ হওয়া শর্ত করেন (১)। এই বিষয়টি এই মূলনীতির প্রয়োগ স্থগিত করার ক্ষেত্রে একটি জটিলতা তৈরি করে, অথচ এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য এবং জনস্বার্থ অর্জনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জটিলতা দূর করার জন্য কোনো কোনো আলেম শর্ত দিয়েছেন যে, যদি তিনি মুজতাহিদ না হন, তবে যেন তিনি মুজতাহিদগণের মুকাল্লিদ (অনুসারী) হন (২)।

এই শর্তের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই মূলনীতিকে অপপ্রয়োগ থেকে রক্ষা করা, যা প্রশংসনীয়; তবে এটিও সমস্যাযুক্ত, কারণ এই শর্ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অপপ্রয়োগ হতে পারে (৩)।

সঠিকতর অভিমত হলো, এই মূলনীতিটি শাসনের কোনো বিশেষ সুবিধা বা প্রিভিলেজ নয় যে, বলা হবে নির্দিষ্ট গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এই সুবিধার উপযুক্ত নয়; বরং এটি মানুষের কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে একটি আবশ্যকীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা। যদি এর প্রয়োগ বাতিল করা হয় তবে অনেক জনস্বার্থ বিঘ্নিত হবে। তাই প্রাধান্য দেওয়া উচিত সেই সকল শর্তের প্রতি যা এই মূলনীতির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করে এবং যার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য জনস্বার্থ সংরক্ষিত হয়, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি নয়। সুতরাং যখন শরয়ী ও নির্ভরযোগ্য জনস্বার্থ অর্জিত হয়, তখন উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়। তাই উদ্দেশ্য সংরক্ষণের জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার

করা হচ্ছে তাতে কোনো ত্রুটি থাকার কারণে মূল উদ্দেশ্যকে বাতিল করা যাবে না।

---

(১) জমহুর ফকীহগণ বিচারকের জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত করেছেন। হানাফী এবং কোনো কোনো মালেকী আলেম এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। দেখুন: ইবনুল হুমাম কৃত ফাতহুল কাদীর ৬/৩৫৭, আল-বাহরুর রায়েক ৬/৪৩৩, তাবসিরাত আল-হুক্কাম ১/২১, মাওয়াহিবুল জলীল ৮/৬৭, রওদাতুত তালিবীন ৮/৮২, আল-ইনসাফ ১১/১৭৭, আল-মুহাল্লা ৯/৩৬৩। অনুরূপভাবে অধিকাংশ আলেম ইমামের ক্ষেত্রেও এটি শর্ত করেছেন এবং কেউ কেউ এ ব্যাপারে ইজমাও বর্ণনা করেছেন। দেখুন: গিয়াছুল উমাম ৮৪, তামহীদুল আওয়াইল ৪৭৩। আবার কেউ কেউ এটি শর্ত না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, যেমন ইবনে হাযম কৃত আল-ফাসল ৫/১১, শাওকানী এবং সিদ্দীক হাসান খান কৃত ইকলীলুল কারামাহ ১১৩।
(২) দেখুন: মুহাম্মদ সালাম মাদকার কৃত নাযারিয়্যাতুল ইবাহাহ ইনদাল ফু কাহা ওয়াল উসূলিয়্যীন, পৃষ্ঠা ৩৪১।
(৩) দেখুন: আল-মাদখাল আল-ফিকহী আল-আম ১/২২২-২২৩।

এবং এটি এমনকি সেই সব ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি যেখানে কোনো শরয়ী ইমাম (শাসক) বিদ্যমান নেই, যেমন বিশৃঙ্খলা ও ফিতনার সময়, অথবা অমুসলিম দেশে বসবাসরত মুসলিম সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে; যেখানে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে মানুষ কোনো একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃপক্ষের ব্যাপারে একমত হতে পারে যাতে তাদের নিকট বিরোধ নিষ্পত্তির কর্তৃত্ব থাকে।

'শাসকের সিদ্ধান্ত বিরোধ নিরসন করে'—এই মূলনীতি প্রয়োগের ভুলসমূহ:

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) এমন ব্যক্তিদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন যারা এই মূলনীতিটির অপব্যবহার করেছিল। তাঁর সমসাময়িক যুগের বিচারকদের পক্ষ থেকে তিনি নানাবিধ কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, যারা মূলত এই জাতীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই তাঁর সাথে এমন আচরণ করত। আর একারণেই তিনি তাঁর বেশ কিছু কিতাবে এই মাসআলাটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন (১)।

তাঁদের প্রতি ইবনে তাইমিয়ার সমালোচনা থেকে এই মূলনীতিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের পাঁচটি ভুল আমরা চিহ্নিত করতে পারি:

১. শরয়ী বিধানের বিরোধিতা করা এবং শরিয়ত পরিপন্থী বিষয়ের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা:

শাইখ এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন: (যেমন এই ফয়সালা প্রদান করা যে, তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে [ইবাদতের উদ্দেশ্যে] সফর করা শরিয়তসম্মত ও মুস্তাহাব এবং এর সম্পাদনকারী সওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি বলবে যে এটি মুস্তাহাব নয়, তাকে কষ্ট দেওয়া হবে, শাস্তি দেওয়া হবে অথবা বন্দী করা হবে। এ জাতীয় সবকিছুই মুসলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (ইজমা) অনুযায়ী বাতিল। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবগত কোনো ব্যক্তির জন্য এটি অনুসরণ করা বৈধ নয়, আর কোনো শাসকের জন্য এটি কার্যকর করাও জায়েয নয়) (২)।

২. 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' (শরয়ী রাজনীতি) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য গবেষণালব্ধ (ইজতিহাদী) তাত্ত্বিক বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা:

সুতরাং শাসক সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়া কোনো মাযহাব বা মতভেদপূর্ণ মাসআলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করবেন না: (যেমন সেই সব মাসআলা যেগুলোতে বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীরা মতভেদে লিপ্ত হন; কেউ একথা বলে না যে, কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারীর জন্য এটি আবশ্যক যে সে অন্য মাযহাব অনুসরণ করবে...)

---

(১) দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৫/৩৫৭-৩৮৮, ২৭/২৯০-৩১১, ৩০/৭৯-৮১ এবং ৩/২৩৪-২৭৬; আত-তিসঈনিয়্যাহ ১/১৪৯-১৫২, ১/১৭৫, ১৮৬-১৮৭; মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/১৩২; জামিউল ফাসুল, প্রথম সংকলন ২৩৬-২৪৩।
(২) মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৫/৩৭৮; এবং দেখুন: আত-তিসঈনিয়্যাহ ১/১৮০।

অন্যের মাযহাবের ওপর নিজের মতকে বিচারক হওয়ার কারণে প্রাধান্য দেওয়া হলে বিষয়টি উল্টে যেতে পারে; কেননা অন্য কেউ বিচারক হয়ে ফয়সালা দিতে পারেন যে তাঁর কথাটিই সঠিক। সুতরাং এমন হওয়া সম্ভব নয় যে, দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের প্রত্যেকটি অনুসরণ করা সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক হবে।(১)

এবং তাঁকে (শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহকে) এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, যিনি মুসলমানদের কোনো বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন অথচ তাঁর মাযহাবে 'শারিকাতুল আবদান' (শারীরিক শ্রমের অংশীদারিত্ব) বৈধ নয়; এমতাবস্থায় তাঁর জন্য কি মানুষকে তা থেকে বাধা দেওয়া বৈধ হবে? তিনি উত্তর দিয়েছেন: "তাঁর জন্য মানুষকে এ জাতীয় কাজ থেকে বা এর সদৃশ এমন কোনো কাজ থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই যাতে ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে। আর তাঁর কাছে এই নিষেধাজ্ঞার স্বপক্ষে কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা থেকে কোনো স্পষ্ট দলিল নেই, এমনকি এমন কিছুও নেই যা এগুলোর অর্থের অন্তর্ভুক্ত"।(২)

আর এই কারণেই মানুষকে তাদের নিজ নিজ মাযহাবের ওপর বহাল রাখা হয়: "মানুষ যে অবস্থায় আছে সেভাবেই তাদের থাকতে দেওয়া হবে, ঠিক যেমন তাদের ব্যবহারিক (আমলি) মাযহাবগুলোর ওপর তাদের বহাল রাখা হয়। কিন্তু যদি এমন কোনো প্রকাশ্য বিদআত হয় যা শরীয়ত বিরোধী হিসেবে সাধারণ মানুষও জানে—যেমন খারিজি, রাফেজি, কাদারিয়া ও জাহমিয়াদের বিদআত—তবে শাসকের দায়িত্ব হলো তা প্রত্যাখ্যান করা। কারণ এগুলোর ইলম বা জ্ঞান সর্বজনবিদিত, ঠিক যেমন তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব হলো ওই ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া যে অশ্লীলতা, মদ এবং নামাজ বর্জন ও এই জাতীয় বিষয়গুলোকে হালাল মনে করে"।(৩)

আর এই মূলনীতিটি তাঁর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ: "পক্ষান্তরে হাত ও জবরদস্তির মাধ্যমে ফয়সালা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো অধিকার নেই, কেবল সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত যেখানে ফয়সালার জন্য তাঁর নিকট আসা হয়েছে। যেমন কোনো মৃত ব্যক্তি যার ওয়ারিশরা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে; এমতাবস্থায় তারা যখন বিচারের জন্য তাঁর কাছে আসবে তখন তিনি তা তাদের মাঝে বণ্টন করে দেবেন। আর এক্ষেত্রে তিনি যদি আলেমদের কোনো একটি মত অনুযায়ী ফয়সালা দেন, তবে সেই ফয়সালা দ্বারা বিবাদমান পক্ষকে বাধ্য করবেন"।(৪)

৩- শরয়ী দলিল ও প্রমাণ ব্যতিরেকে বিচার বিভাগীয় রায় দ্বারা দলিল পেশ করা:

(এই সামগ্রিক বিষয়গুলোতে কোনো বিচারকেরই—তিনি যেই হোন না কেন, এমনকি সাহাবীগণের মধ্য থেকে হলেও—অধিকার নেই যে তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতাকারীর ওপর নিজের কথা চাপিয়ে দেবেন। অর্থাৎ তিনি বলবেন না: "আমি তাকে বাধ্য করছি যেন সে আমার মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য ছাড়া অন্য কোনো কাজ না করে বা ফতোয়া না দেয়।" বরং এই সকল মাসআলায় ফয়সালার মালিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল...)

---

(১) মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৫/৩৭৯ - ৩৮০।
(২) মাজমুউল ফাতাওয়া ৩০/৭৯।
(৩) মাজমুউল ফাতাওয়া ৩/২৩৯।
(৪) মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৫/৩৬০।

এবং শাসক মুসলমানদেরই একজন; যদি তাঁর নিকট জ্ঞান থাকে তবে তিনি তাঁর নিকট যা আছে তা দিয়ে কথা বলবেন। আর যদি তাঁর প্রতিপক্ষের নিকট জ্ঞান থাকে তবে সেও তা দিয়ে কথা বলবে। অতঃপর যদি তাতে সত্য প্রকাশ পায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান জানা যায়, তবে সকলের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে, তবে প্রত্যেককে তার নিজ নিজ বক্তব্যের ওপর বহাল রাখা হবে; এই মতের প্রবক্তাকে তাঁর মতের ওপর এবং ঐ মতের প্রবক্তাকে তাঁর মতের ওপর বহাল রাখা হবে। জ্ঞান, প্রমাণ ও সুস্পষ্ট বর্ণনার ভাষা ব্যতিরেকে একজনের জন্য অন্যজনকে বাধা দেওয়া বৈধ নয়; অর্থাৎ তাঁর নিকট থাকা জ্ঞান তিনি প্রকাশ করবেন।(১)

(এবং শাসনাধিকারী যদি কিতাব ও সুন্নাহর বিধান জানেন তবে তিনি মানুষের মাঝে তা দিয়ে বিচার করবেন। আর যদি তিনি তা না জানেন এবং এই পক্ষ কী বলছে আর ঐ পক্ষ কী বলছে তা জেনে সত্য উদঘাটন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় তবে তিনি সত্য অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। আর যদি তাঁর পক্ষে কোনোটিই সম্ভব না হয় তবে তিনি মুসলমানদের তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন; প্রত্যেকেই তাঁর ইজতিহাদ অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করবে। শাসক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য কাউকে অন্য কারো মত গ্রহণে বাধ্য করার অধিকার নেই।)(২)

৪. গ্রহণযোগ্য মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে এবং অগ্রহণযোগ্য মাসআলাসমূহে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে শাস্তিদানি:

(মতভেদপূর্ণ প্রতিটি মাসআলায় কোনো এক পক্ষ নিজ মতের সঠিকতার ওপর প্রমাণ কায়েম করলেই যে তাঁর বিরোধিতাকারীকে শাস্তি দেওয়া বৈধ হয়ে যায়—বিষয়টি এমন নয়। বরং উম্মাহর অধিকাংশ মতভেদপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে বিবদমান কোনো পক্ষের জন্যই অপর পক্ষকে তাঁদের মত অনুসরণ না করার কারণে শাস্তি প্রদান করা জায়েয নয়।)(৩)

এমনকি বিষয়টি যদি এমন হয় যা বিশ্বাস করা ওয়াজিব, তবুও প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে শাস্তি প্রদান করা বৈধ নয়:

(তাঁরা যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা যদি এমন সত্য না হয় যা বিশ্বাস করা আবশ্যক, তবে তা মানতে বাধ্য করা আবশ্যক নয়। আর যদি তা এমন সত্য হয় যা বিশ্বাস করা আবশ্যক, তবে অবশ্যই তার দলিলের দিকটি স্পষ্ট করতে হবে; কেননা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে শাস্তি প্রদান করা জায়েয নয়।)

(১) মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৫/৩৬০।
(২) মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৫/৩৮৭; আরও দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ২৭/২৯৯-৩০০, মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৫/৩৭৪-৩৭৫, ৩৮২-৩৮৩ এবং ৩৮৭; আত-তিসাঈনিয়্যাহ ১/১৮১ এবং ১/১৫১; জামেউল ফুসুল, প্রথম খণ্ড, ২৪০।
(৩) আত-তিসাঈনিয়্যাহ ১/১৮৪; আরও দেখুন: ১/১৭৭ এবং ১/১৮১; মাজমুউল ফাতাওয়া ২৭/৩০৭-৩০৮ এবং ২৭/৩১১।

মুসলমানদের ঐকমত্য অনুযায়ী, যদি বক্তব্যটি এমন হয় যা রাসুল প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করেছেন, তবে তাঁর রাসুলের বর্ণনার মাধ্যমেই দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর যদি বিষয়টি এমন না হয়, তবে অবশ্যই এর স্বপক্ষে এমন দলিল পেশ ও প্রকাশ করতে হবে, যা মেনে চলা বাধ্যতামূলক এবং যার বিরোধিতা করা হারাম। (১)

৫- এই বিষয়গুলো নিয়ে এমন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা যে এর যোগ্য নয়:

কারণ কোনো বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা নির্ভর করে মাসআলা ও বিচারিক বিষয়ে শরীয়তের বিধান জানা এবং ইজমা ও মতপার্থক্যের ক্ষেত্রগুলো অনুধাবন করার ওপর। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি এই কাজের যোগ্য হবে না, তখন সে সত্যে উপনীত হতে সক্ষম হবে না। (২)

(সুতরাং তারা যে মতের ভিত্তিতে ফয়সালা দিয়েছেন, তা যদি মুসলিম ইমামদের কেউ না বলে থাকেন, আর এটি যদি তাদের অনুসারিত ইমামদেরও মাজহাব না হয়, এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্য থেকেও কেউ তা না বলে থাকেন; আর এতে যদি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহর কোনো দলিল না থাকে, বরং তাদের এই বক্তব্য যদি কিতাব, সুন্নাহ এবং ইমামদের ইজমার পরিপন্থী হয়; তবে এরপরেও কীভাবে মুসলিম আলেমদের এই মত অনুসরণে বাধ্য করা এবং কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী এই বিধান কার্যকর করা বৈধ হতে পারে?) (৩)।

---

(১) আত-তিসয়িনিয়্যাহ ১/১৮৩, দেখুন: ৩৫/৩৮২-৩৮৩, ৩৫/৩৭৮-৩৭৯।
(২) ইবনে তাইমিয়্যাহ এই বিষয়ে তাদের সীমাবদ্ধতা, তাদের ফিকহি মাজহাবের বক্তব্যের বিরোধিতা, ইজমার বিরোধিতা এবং স্বীকৃত বিচারিক বিধিবিধানের বিরোধিতার কারণে তাদের প্রচুর সমালোচনা করেছেন। দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৫৯, ২৭/২৫৩-২৫৪, ৩/২৫৮, ৩/২৬৭-২৬৯, আত-তিসয়িনিয়্যাহ ১/১৮৪-১৮৫।
(৩) মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৫/৩৮০-৩৮১।

তৃতীয় মূলনীতি

শাসকের কর্মকাণ্ড জনকল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ (শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি)-এর অন্যতম মৌলিক নীতি হলো, শাসকের কর্মকাণ্ড জনকল্যাণের (মাসলাহা) সাথে সম্পৃক্ত। এটি বড় বা ছোট প্রতিটি দায়িত্বশীলের জন্য একটি শরয়ী মূলনীতি যে, তার কর্তৃত্বাধীন বিষয়ের কর্মকাণ্ড অবশ্যই জনকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। যেহেতু এটি অন্যের বিষয়াবলির সাথে সম্পৃক্ত, তাই তাদের প্রতি তার হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া আবশ্যক।

এই মূলনীতির শরয়ী দলিলসমূহ:

এই মূলনীতির সপক্ষে বেশ কিছু শরয়ী দলিল রয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো:

প্রথম দলিল: এতিমদের পরিচালনার বিধান।

মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, তবে কেবল এমন পন্থায় যা অত্যন্ত উত্তম।" [আল-ইসরা: ৪৩]

সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী: "আর তোমরা এতিমদের পরীক্ষা করো যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছায়। অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি দেখতে পাও, তবে তাদের সম্পদ তাদের নিকট সোপর্দ করো। তারা বড় হয়ে যাবে এই ভয়ে তোমরা অপচয় করে ও তাড়াহুড়া করে তাদের সম্পদ ভক্ষণ করো না। যে অভাবমুক্ত, সে যেন বিরত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত, সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করে। অতঃপর যখন তোমরা তাদের নিকট তাদের সম্পদ সোপর্দ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রেখো। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" [আন-নিসা: ৬]

আল্লাহ তাআলার বাণী: "যদি তোমরা তাদের সাথে একত্রে বসবাস করো তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ জানেন কে অনিষ্টকারী এবং কে সংশোধনকারী।" [আল-বাকারাহ: ২২০]

এই আয়াতগুলো এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে মাত্র একজন এতিমের সম্পদের তত্ত্বাবধান করে। তার জন্য আবশ্যক হলো যেন সে সর্বোত্তম পন্থায় ব্যতীত অন্য কোনোভাবে সেই সম্পদ ব্যয় না করে। যদি মাত্র একজন ব্যক্তির অধিকারের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন হয়, তবে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিষয়টি কেমন হবে যে পুরো একটি জাতির দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সেখানে বহু এতিম ও অন্যান্য মানুষ রয়েছে?

এজন্যই উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন: "আমি আল্লাহর সম্পদের ক্ষেত্রে নিজেকে এতিমের অভিভাবকের মর্যাদায় গণ্য করেছি; যদি আমার প্রয়োজন হয় তবে আমি তা থেকে গ্রহণ করি, আর যখন আমি স্বচ্ছল হই তখন তা ফিরিয়ে দেই, আর যদি অমুখাপেক্ষী হই তবে আমি তা থেকে বিরত থাকি।" (১)

এ থেকেই আলেমগণ শাসককে এতিমের অভিভাবকের সমতুল্য গণ্য করার বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। অথবা যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন: "জনগণের প্রতি শাসকের অবস্থান হলো এতিমের মালের অভিভাবকের অবস্থানের ন্যায়।" (২) এটি জনগণের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কঠোরতার অংশ।

সুতরাং, "যে ব্যক্তিই কোনো বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, সে সেখানে সর্বোত্তম পন্থা ব্যতীত অন্য কোনোভাবে তা পরিচালনা করবে না।" (৩)

দ্বিতীয় মূলনীতি: নেতৃত্ব বা শাসনভারের কঠোরতা, তা অন্বেষণ করার ব্যাপারে সতর্কতা এবং এর দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামে নেতৃত্বের ভয়াবহতা বা গুরুত্ব বর্ণনা করে একাধিক পাঠ্য বর্ণিত হয়েছে:

এটি আল্লাহর সামনে একটি জওয়াবদিহিতা, যেমনটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম (শাসক) একজন দায়িত্বশীল এবং তাকে তার প্রজাসাধারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (৪)

নেতৃত্বের বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে; আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন: "তোমরা নেতৃত্বের লোভ করবে, অথচ কিয়ামতের দিন এটি অনুশোচনার কারণ হবে। এটি (শুরুতে) কতই না চমৎকার দুগ্ধদানকারিণী এবং (শেষে) কতই না

মন্দ দুগ্ধবিচ্ছিনাকারিণী।" (৫)

এর দায়বদ্ধতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর হওয়ার কারণে এটি যাচনা করতে বা চাইতে নিষেধ করা হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সা.) বলেছেন: "হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি নেতৃত্ব প্রার্থনা করো না। কারণ যদি তোমাকে চাওয়ার কারণে তা প্রদান করা হয়, তবে এর সমস্ত দায়ভার তোমার ওপরই ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তোমাকে তা দেওয়া হয়, তবে সে বিষয়ে তোমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে।" (৬)

---

(১) ইবনে আবি শায়বাহ তাঁর 'আল-মুসান্নাফ' (৩২৯১৪) গ্রন্থে, আল-বায়হাক্বী 'আস-সুনানুল কুবরা' (৭/৬) গ্রন্থে এবং ইবনে সাদ 'আত-তাবাক্বাতুল কুবরা' (৩/২৭৬) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) আল-উম্ম ৫/৩৫১।

(৩) আয-যখীরা ৬/২২৩; এবং দেখুন: আল-ক্বাওয়ায়িদুল কুবরা ২/১৫৮, আস-সিয়াসা আশ-শরইয়্যাহ ২০, আল-মানসুর ফিল ক্বাওয়ায়িদ ১/৩০৯।

(৪) এটি বুখারি (২৪০৯) এবং মুসলিম (১৮২৯) বর্ণনা করেছেন।

(৫) এটি বুখারি (৭১৪৮) বর্ণনা করেছেন।

(৬) এটি বুখারি (৬৬২২) এবং মুসলিম (১৬৫২) বর্ণনা করেছেন।

পৃষ্ঠা 252

নবী ﷺ কোনো কোনো সাহাবীকে নিরঙ্কুশভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আবু যার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "হে আবু যার, আমি তোমাকে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি, আর আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। তুমি কখনোই দুই ব্যক্তির ওপরও আমীর হবে না এবং কোনো এতিমের সম্পদের দায়িত্ব নেবে না।"

নেতৃত্বের বিশালত্বের বিষয়ে এই শরয়ি তাকিদ এর হক আদায় করা, এর আমানত রক্ষা করা এবং এতে দায়মুক্ত হওয়ার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়াকে ওয়াজিব করে। আর জনকল্যাণে সবচেয়ে উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করা ছাড়া এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এটি কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয় যে, শাসক যা ইচ্ছা তা-ই করবেন; বরং এটি একটি আমানত, যার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেননা নেতৃত্ব হলো মহান আমানতসমূহের অন্তর্ভুক্ত যার হক আদায় করা ওয়াজিব। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানতসমূহ তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।" [আন-নিসা: ৫৮]।

আবু ইউসুফ বলেন: "নিশ্চয়ই রাখাল (শাসক) তার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং তার জন্য অপরিহার্য হলো তার প্রজাদের তদারকি করা এমন সবকিছুর মাধ্যমে যা দ্বারা আল্লাহ তাদের উপকার করবেন এবং যা তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে। কারণ যাকে প্রজাদের দায়িত্ব দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে, তাকে এক মহান বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।"

তৃতীয় মূলনীতি: প্রজাদের সাথে প্রতারণা করা থেকে সতর্কীকরণ।

হাসান বসরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ মাকিল বিন ইয়াসার (রা.)-কে তার মৃত্যুশয্যায় দেখতে গেলেন। তখন মাকিল বললেন: "আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলছি যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। যদি আমি জানতাম যে

আমার আয়ু আরও আছে তবে আমি তোমাকে এটি বলতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: 'আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে কোনো প্রজাসাধারণের দায়িত্ব অর্পণ করেন, আর সে যখন মৃত্যুবরণ করে তখন সে যদি তার প্রজাদের সাথে প্রতারণাকারী হয়, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন'।"

আর যে ব্যক্তি প্রজাদের ব্যাপারে সবচেয়ে কল্যাণকর পন্থায় কাজ করে না, সে মূলত তাদের সাথে প্রতারণা করল। সুতরাং এটি জনস্বার্থ অনুযায়ী কাজ করার আবশ্যকতা প্রমাণ করে।

(১) এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন (১৮২৬)।
(২) আল-খারাজ ১৩২।
(৩) এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন (১৪২)।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এই ধরণের এক প্রকার প্রতারণার কথা বর্ণিত হয়েছে যা জনকল্যাণমূলক আচরণের পরিপন্থী। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো গোষ্ঠী থেকে কাউকে নিয়োগ দিল অথচ সেই গোষ্ঠীর মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে আল্লাহর নিকট তার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়, তবে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।" (১)

একই অর্থে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো, অতঃপর সে কেবল তাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার কারণে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ দিল, তবে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।" (২)

চতুর্থ মূলনীতি: আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা (নাসিহাত) সংক্রান্ত বর্ণনা।

যেমন তামীম আদ-দারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দীন হলো হিতাকাঙ্ক্ষা (নাসিহাত)। আমরা বললাম: কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের ইমামগণের (নেতৃবর্গ) জন্য এবং তাদের সাধারণ জনগণের জন্য।" (৩)

আর যে ব্যক্তি সবচেয়ে কল্যাণকর কাজটি সম্পাদন করল না, সে তার ওপর অর্পিত এই ওয়াজিব হিতাকাঙ্ক্ষা পূরণ করল না।

কার্যক্রমসমূহ জনকল্যাণের (মাসলাহাত) সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অর্থ কী?

আলেমগণ এই মূলনীতির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইবনু নুজাইম বলেন: "সাধারণ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে যদি ইমামের কাজ জনকল্যাণের ওপর ভিত্তি করে হয়, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার আদেশ তখনই কার্যকর হবে যখন তা সেই কল্যাণের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে।" (৪)

আর 'উলুল আমর' (কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি)-এর অর্থ সম্পর্কে তাবারী বলেন:

"এ বিষয়ে সঠিক মতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য হলো সেই মত যা বলে যে: তাঁরা হলেন আমির ও শাসকবর্গ; কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে নেতা ও শাসকদের আনুগত্য করার নির্দেশ সম্বলিত সহীহ বর্ণনা রয়েছে, যতক্ষণ

পর্যন্ত সেই আনুগত্য আল্লাহর অনুগত হয় এবং তাতে মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত থাকে।" (৫)

---

(১) তাবারানী এটি আল-মুজামুল কাবীর (১১২১৬), বাইহাকী আস-সুনানুল কুবরা (১০/২০১) এবং হাকেম আল-মুস্তাদরাক (৪/১০৪) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
(২) দেখুন: আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৮।
(৩) মুসলিম (৫৫) এটি বর্ণনা করেছেন।
(৪) আল-আশবাহ ওয়ান নাজাইর, ১০৬।
(৫) তাফসীরে তাবারী, ৮/৫০২।

আল-ইযয বিন আবদুস সালাম বলেন:

"নিশ্চয়ই প্রতিটি সাধারণ বা বিশেষ কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে শাসক বা কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কল্যাণ সাধন এবং তাদের থেকে অপকার বা ক্ষতি দূর করার জন্য।" (১)

এই নীতিমালার প্রয়োগসমূহ:

ফকীহগণ এই নীতিমালার কার্যকরীকরণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো শাখা মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

- কোনো ফাসিক ব্যক্তিকে সালাতে মানুষের ইমামতি করার জন্য নিয়োগ দেওয়া জায়েয নেই, যদিও তার পেছনে সালাত আদায় করাকে আমরা সহীহ বলে গণ্য করি; কারণ এটি মাকরূহ। আর শাসক জনস্বার্থ বিবেচনা করতে আদিষ্ট, এবং মানুষকে মাকরূহ কাজে লিপ্ত করার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। (২)

- যার কোনো অভিভাবক নেই এমন ব্যক্তির হত্যাকারীকে সুলতান বা রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমা করতে পারবেন না; বরং তার কেবল কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ বা আপস করার অধিকার রয়েছে। (৩)

- বাইতুল মালের সম্পদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম অভাবী ব্যক্তিকে বেশি অভাবী ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য দেওয়া শাসকের জন্য জায়েয নেই। (৪)

- একইভাবে বিচারকের জন্য ওয়াকফের সম্পদ বা নাবালকের সম্পদ দান করা জায়েয নেই, কারণ এই সম্পদে তার হস্তক্ষেপ অবশ্যই তাদের কল্যাণের বিষয়ের সাথে সীমাবদ্ধ হতে হবে। (৫)

সর্বোত্তম কল্যাণকর (আসলাহ) কাজ করার বিধান কী?

যেহেতু এটি স্থির হয়েছে যে, এই নীতিমালা জনস্বার্থ বিবেচনা এবং সর্বাধিক কল্যাণকর (আসলাহ) কাজ করার বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই ওয়াজিব বা আবশ্যক হলো সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর কাজটি করা; কেবল সাধারণ কল্যাণ সাধনই যথেষ্ট নয়।

(১) আল-কাওয়ায়িদুল কুবরা ১/১০৫, এবং দেখুন: ১/১৭১।
(২) দেখুন: সুয়ূতী রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির ১২১।

(৩) দেখুন: ইবনে নুজাইম রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির ১০৫, সুয়ূতী রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির ১২১।
(৪) দেখুন: আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির ১২১।
(৫) দেখুন: দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম ১/৫২।

আল-কারাফি বলেন:
(এই সকল নসের (ধর্মীয় ভাষ্য) দাবি হলো, সকলকে সেই অনিষ্ট (মফসাদাহ) থেকে দূরে রাখা যা প্রবল, এবং সেই কল্যাণ (মাসলাহাহ) থেকেও যা অপ্রবল বা সমান সমান, কিংবা যাতে কোনো অনিষ্টও নেই এবং কোনো কল্যাণও নেই। কারণ এই চারটি প্রকার 'সর্বোত্তম' বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্ব কেবল বিশুদ্ধ কল্যাণ কিংবা প্রবল কল্যাণ আনয়ন এবং বিশুদ্ধ অনিষ্ট কিংবা প্রবল অনিষ্ট প্রতিরোধের বিষয়কেই পরিব্যাপ্ত করে।)(১)

ইয ইবনে আবদুস সালাম বলেন:
(যাদের ওপর কর্তৃত্ব ন্যস্ত, তাদের জন্য যা অধিকতর কল্যাণকর (আছলাহ), ওয়ালি (অভিভাবক) ও তাদের প্রতিনিধিরা আমাদের উল্লিখিত কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সেইভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এটি ক্ষতি ও বিপর্যয় দূর করার উদ্দেশ্যে এবং কল্যাণ ও সঠিক পথ আনয়নের লক্ষ্যে। তাদের কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেবল সাধারণ কল্যাণের (সালাহ) ওপর সীমাবদ্ধ থাকবে না যতক্ষণ তার চেয়ে অধিকতর কল্যাণ (আছলাহ) অর্জন করা সম্ভব হয়; তবে যদি তা চরম কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবে ভিন্ন কথা।)(২)

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন:
(মুসলমানগণ এই মর্মের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এতিমের অভিভাবক, ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়ক এবং কোনো ব্যক্তির সম্পদের প্রতিনিধি—তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য যা অধিকতর কল্যাণকর (আছলাহ) সেই অনুযায়ী কাজ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তোমরা এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, তবে এমন পন্থায় যা সর্বোত্তম।" [সূরা আল-ইসরা: ৩৪]। তিনি কেবল 'যা উত্তম' তা বলেননি, বরং যা 'সর্বোত্তম' (আহসান) তা-ই বলেছেন।)(৩)

(ইবনে আবদুস সালাম বলেন: যদি এটি কোনো সেনাপতির জন্য বৈধ হয়, তবে আমিরুল মুমিনিনের জন্য এটি হওয়া আরও বেশি সংগত। এসব বিষয়ের কোনো কিছুতেই প্রবৃত্তির অনুসরণ করা বৈধ নয়, এবং অধিকতর কল্যাণকর বিষয় বর্জন করে কেবল সাধারণ কল্যাণের অনুসরণ করাও অনুমোদিত নয়।)(৪)

---

(১) আল-ফুরুক ৪/৩৯; এবং দেখুন: আল-ফুরুক ২/১৬২, আয-যাখিরা ৬/২২৩। আল-কারাফি মালিকি মাযহাবের একদল আলিম থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা দেখুন: আত-তাজ ওয়াল ইকলিল ৬/৪০১, শরহু মিয়ারা আলা তুহফাতিল হুক্কাম ২/৪০, আল-মি'য়ারুল মু'রিব ৭/১৯-২০।
(২) আল-কাওয়াইদুল কুবরা ২/১৫৮, এবং দেখুন: ১/১১৪।
(৩) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ২০।
(৪) তাবসিরাতুল হুক্কাম ২/৪৬৯।

এবং এটিই অধিকাংশ ফকীহদের অভিমত (১)।

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-তে (শরয়ি রাজনীতি) এই মূলনীতির প্রভাব:

এই মূলনীতিটি অত্যন্ত প্রভাবশালী, সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-তে এর ওপর ভিত্তি করে বেশ কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যার মধ্যে প্রধান হলো:

প্রথম প্রভাব: জনকল্যাণ (মাসলাহাত) বিবেচনা করা শরয়ি ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং জনকল্যাণ অনুযায়ী কাজ করা সেই 'মা'রূফ' বা সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত যার প্রতি শরীয়ত গুরুত্বারোপ করেছে; আর তা বর্জন করা শরীয়ত পরিপন্থী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা।

এর মাধ্যমেই ইসলামী আইন ব্যবস্থায় 'সৎকাজে আনুগত্য' এবং 'জনকল্যাণ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ'-এর মধ্যে একটি সমন্বয় ও পূর্ণতা সাধিত হয়। এই দুটি একে অপরের পরিপূরক মূলনীতি। ইমাম বা শাসকের পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশসমূহ অবশ্যই মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকারী হতে হবে এবং আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে এই কল্যাণ বাস্তবায়ন করা জনগণের ওপর আবশ্যক। যদি কোনো এক পক্ষ বিঘ্নিত হয়—অর্থাৎ শাসক যদি জনকল্যাণ অনুযায়ী পদক্ষেপ না নেন, অথবা তিনি জনকল্যাণ অনুযায়ী পদক্ষেপ নিলেন কিন্তু জনগণের পক্ষ থেকে আনুগত্য পাওয়া গেল না—তবে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে, জনকল্যাণ বিঘ্নিত হবে এবং অনিষ্ট বা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে।

---

(১) দেখুন: আত-তাজ ওয়াল ইকলিল ৬/৪০১; তুহফাতুল হুক্কামের ওপর মায়ারার শারহ ২/৪০; আল-মিয়ার আল-মুরিবে ৭/১৯-২০; রাওদাতুত তালিবিন ১০/৪৬ এবং ১০/৩৩৪; আসনিউল মাতালিব ৪/২২৪; নিহায়াতুল মুহতাজ ৮/১০৭; আল-ফুরু ১০/২৫৭ এবং ১০/২৯৬; আল-ইনসাফ ৪/১৩২ এবং ৪/১৯১; গায়াতুল মুনতাহা ১/৪০৬; কাশফুল মুখাদ্দরাত ২/৮১৮। কোনো কোনো হাম্বলি ফকীহ এই মত পোষণ করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যা অধিকতর কল্যাণকর (আসলহ) তা নির্বাচন করা মুস্তাহাব। দেখুন: আল-ফুরু ১০/২৫৭; আল-ইনসাফ ৪/১৩২। আল-মারদাভী এর সমালোচনা করে বলেন: যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে এর জন্য তিনি সওয়াব পাবেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয় যে: তার জন্য 'অধিকতর কল্যাণকর' নয় এমনটি বেছে নেওয়া জায়েজ, অথচ তাতে ক্ষতি বিদ্যমান—তবে এমন কথা কেউ বলেননি। যেমনটি কোনো কোনো শাফেঈ ফকীহ মাযহাবের একটি অভিমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, ওয়াজিব হলো অনিষ্ট বা ফাসাদ দূরীভূত রাখা। দেখুন: আস-সুবকির আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির ১/৩১০। অনুরূপভাবে মালেকিগণ দস্যুদের (মুহারিব) শাস্তির বিষয়ে ইমামের ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে, অধিকতর কল্যাণকরটি বেছে নেওয়া মানদুব (উত্তম); যদি তিনি অন্যটি বেছে নেন, তবে তা মাকরুহ হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট হবে। দেখুন: আদ্দাসুকির হাশিয়া সহ মুখতাসার খালিলের ওপর আশ-শারহুল কাবীর ৪/৩৫০।

দ্বিতীয় প্রভাব: কুপ্রবৃত্তি বা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাব রোধ করা।

অতএব, শাসকের নির্বাচন বা তাঁর অগ্রাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিধান জনস্বার্থের ওপর ভিত্তি করে হতে হবে। সেখানে

কোনো কুপ্রবৃত্তি বা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচনা করা হবে না।

আল-জুওয়াইনি বলেন:
"শাসকের জন্য বিচারিক ধারাসমূহের কোনো কিছুতেই কামনাবাসনা ও আকাঙ্ক্ষাকারীর ন্যায় আক্রমণাত্মক হওয়া বা স্বেচ্ছাচারিতা করার সুযোগ নেই। বরং তিনি তাঁর প্রতিটি বিষয়ের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এবং গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তি স্থাপন করবেন প্রতিটি অধ্যায়ের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্ভুলতার ওপর।" (১)

ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন:
"ইমামের বিবেচনা জনস্বার্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ, তা কুপ্রবৃত্তি অনুযায়ী হওয়ার জন্য নয়। যেখানে বলা হয় যে, বিবেচনা বা সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার ইমামের, তার অর্থ কেবল এটাই যে— তিনি জনস্বার্থের দাবি অনুযায়ী কাজ করবেন, খেয়ালখুশি অনুযায়ী নয়।" (২)

আল-কারাফি বলেন:
"ইমামের ক্ষেত্রে যা জনস্বার্থের অনুকূল তা করা অবধারিত; এখানে তাঁর জন্য কোনো প্রকার নিরঙ্কুশ বৈধতা নেই। তিনি যে তা'যির বা শাসনমূলক শাস্তির ক্ষেত্রে স্বীয় খেয়ালখুশি ও ইচ্ছা অনুযায়ী যখন যা মনে আসে তা-ই করবেন, যাকে ইচ্ছা এড়িয়ে যাবেন এবং যা ইচ্ছা গ্রহণ করবেন— এমনটি হতে পারে না। এটি পাপাচার এবং ইজমার পরিপন্থী।" (৩)

তৃতীয় প্রভাব: ইজতিহাদের আবশ্যকতা।

সুতরাং যা অধিকতর কল্যাণকর তা সম্পাদন করা ওয়াজিব। কেবল সাধারণ জনস্বার্থই যথেষ্ট নয়। আর ইজতিহাদ বা গবেষণায় শ্রম ব্যয়, মুসলিমদের প্রতি ঐকান্তিক শুভকামনায় পূর্ণ সামর্থ্য নিয়োগ এবং সঠিক তদারকি ছাড়া কোনটি অধিকতর কল্যাণকর তা জানা সম্ভব নয়।

---

(১) আল-গিয়াছি ২৭০ - ২৭১।
(২) ইহকামুল আহকাম শারহু আহাদিসি সাইয়িদুল আনাম ৪/৪০৬।
(৩) আল-ফুরুক ৪/১৮২, এবং দেখুন: আল-ুفরুক ৪/৯৫।

...তাদের অধিকারসমূহের জন্য। সুতরাং অধিকতর কল্যাণকর বিষয়টি অনুধাবন করা তার সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। আর এ ক্ষেত্রে কেবল সৎ উদ্দেশ্যই যথেষ্ট নয়, বরং এর সাথে এমন ইজতিহাদ থাকা আবশ্যক যা এই অধিকতর কল্যাণকর বিষয়ের অস্তিত্বকে উন্মোচিত করবে।

তাকিউদ্দীন আস-সুবকী বলেন:
"ইমাম বা নেতৃবৃন্দের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা এজন্য নয় যে তারা তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা ভাসাভাসা মতামতের ভিত্তিতে অথবা তাদের কাছে যা পৌঁছায় তার অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে এবং প্রত্যেকের কথা শোনার মাধ্যমে আদেশ প্রদান করবেন। বরং তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যেন তারা ইজতিহাদ করেন এবং প্রজাসাধারণের যাতে কল্যাণ রয়েছে তা সঠিক সৎকাজের মাধ্যমে সম্পাদন করেন, জনগণের প্রতি একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করেন এবং মানুষকে সুদৃঢ় আদর্শ ও সরল পথের ওপর পরিচালিত করেন।" (১)

চতুর্থ প্রভাব: জনকল্যাণ বা মাসলাহা নির্ধারণে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সুফল গ্রহণের গুরুত্ব।

সুতরাং জনকল্যাণ বিষয়ে ইজতিহাদ করা পরামর্শ গ্রহণ, বিশেষজ্ঞদের থেকে সুফল লাভ এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোকে অপরিহার্য করে তোলে, যা অধিকতর কল্যাণকর বিষয়টিকে উন্মোচিত করে।

পঞ্চম প্রভাব: জনস্বার্থ বিবেচনার আবশ্যকতা।

জনকল্যাণ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করার অর্থ কেবল প্রতিটি স্বতন্ত্র বিষয়ে জনকল্যাণ অনুযায়ী ইজতিহাদ করা নয়; বরং এটি এ দাবিও করে যে, প্রকাশ্য সাধারণ কল্যাণকর বিষয়গুলোর প্রতি যত্নশীল হতে হবে। আর এটি শরয়ি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সেই সব বিষয় অনুসরণের দিকে প্রসারিত করে, যা অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার ভিত্তিতে সর্বজনীন ও সামগ্রিক জনস্বার্থ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

পূর্বালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, 'মাসলাহা' বা জনকল্যাণ একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধারণা। যদিও এর অনেক প্রয়োগের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতা ও সম্ভাব্যতা প্রবেশ করেছে, তবুও এর অর্থ এই নয় যে এটি একটি অনিয়ন্ত্রিত ও অস্পষ্ট ধারণা। বরং জনকল্যাণের কিছু দিক এমন অকাট্য যাতে কোনো মতভেদের অবকাশ নেই, আবার কিছু দিক এমন যা নির্দিষ্ট বলয়ে মতভেদপূর্ণ হতে পারে যদিও তার একটি অকাট্য ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে। তেমনিভাবে জনকল্যাণ বা মাসলাহা উপলব্ধির বিভিন্ন পথ রয়েছে...

---

(১) ফাতাওয়া আস-সুবকী ১/১৮৫।

...এবং প্রকাশ্য কারণসমূহ। এখানে এই অর্থের ওপর গুরুত্বারোপ করা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা কিছু লোক ধারণা করে যে, কোনো বিধানকে মাসলাহাত বা জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট করার অর্থ হলো তা নিছক ব্যক্তিগত পছন্দের জন্য অজুহাত হওয়া।

সিয়াসা শারইয়্যাহ বা শরয়ি রাজনীতিতে মাসলাহাত (জনস্বার্থ) নীতির প্রভাব:

এটি সিয়াসা শারইয়্যাহর একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় মূলনীতি এবং এর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এই মূলনীতিটি বহু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব। এর গুরুত্বের কারণে বহু আলিমের আলোচনায় এটি স্থান পেয়েছে, তাঁরা এর মাধ্যমে দলিল প্রদান করেছেন অথবা এর ওপর নির্ভর করেছেন। বরং যাঁরা রাজনীতি নিয়ে লিখেছেন, তাঁদের নিকট এটি অন্যতম একটি মৌলিক বিষয়।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই মূলনীতির গুরুত্বের কারণে ইবনে তাইমিয়্যাহ তাঁর 'আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ' গ্রন্থে প্রশাসনিক পদসমূহে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদানের রূপরেখা নির্মাণে এর ওপর নির্ভর করেছেন।

শাইখ কেবল প্রশাসনিক পদসমূহে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিয়োগ দানের আবশ্যকতা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এই মূলনীতিটি প্রয়োগ করতে শুরু করেন।

তিনি প্রথমে জনস্বার্থের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন: প্রশাসনিক পদসমূহে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করা ওয়াজিব। (অতএব মুসলিমদের প্রতিটি কাজের জন্য শাসক বা অভিভাবকের ওপর ওয়াজিব হলো, সেই কাজের জন্য তিনি যাকে সবচেয়ে যোগ্য পাবেন তাকেই নিয়োগ প্রদান করা)।(১)

আর ইমাম যাদেরকে নিয়োগ দেবেন, (তাদের প্রত্যেকের ওপর দায়িত্ব হলো যাকে সবচেয়ে যোগ্য পাবেন তাকেই প্রতিনিধি হিসেবে

গ্রহণ করা ও কাজে লাগানো)।(২)

এরপর তিনি এই মূলনীতির মাধ্যমে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অ-শরয়ি কারণসমূহের প্রসঙ্গে প্রবেশ করেন এবং বলেন: (যদি তিনি সবচেয়ে বেশি হকদার ও যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিয়োগ দেন: তাদের মধ্যবর্তী আত্মীয়তার কারণে, অথবা দাসমুক্তির উত্তর-সম্পর্কের কারণে, কিংবা বন্ধুত্বের কারণে, অথবা একই দেশের বাসিন্দা বা একই মাযহাব বা একই তরীকা অথবা একই জাতিসত্তা হওয়ার কারণে—যেমন আরব, ফারসি বা তুর্কি...

(১) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ১৫।
(২) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ১৬।

...অথবা অর্থ কিংবা কোনো উপকারের লোভে ঘুষ গ্রহণ করার কারণে অথবা এজাতীয় অন্য কোনো কারণে, কিংবা যোগ্যতম ব্যক্তির প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণের দরুন অথবা তাদের মধ্যকার কোনো শত্রুতার কারণে; তবে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে খেয়ানত করল।

এরপর তিনি সাব্যস্ত করেন যে, 'যোগ্যতম' (আল-আসলাহ) বলতে সামর্থ্য অনুযায়ী যা সম্ভব তা-ই উদ্দেশ্য। যদি তা সহজসাধ্য না হয়, তবে তার কর্তব্য হলো তুলনামূলক অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া। (তার উপর কেবল বিদ্যমানদের মধ্যে যোগ্যতমকেই নিয়োগ দান করা আবশ্যক। বিদ্যমান ব্যক্তিদের মাঝে সেই পদের জন্য হুবহু যোগ্য ব্যক্তি নাও থাকতে পারে; এমতাবস্থায় সে প্রতিটি পদের গুরুত্ব অনুযায়ী বিদ্যমানদের মধ্য হতে ক্রমান্বয়ে যে অধিকতর যোগ্য তাকেই নির্বাচন করবে। যদি সে পূর্ণ প্রচেষ্টার পর তা সম্পাদন করে এবং পদের হক আদায় করে তা গ্রহণ করে, তবে সে আমানত রক্ষা করল এবং এক্ষেত্রে তার উপর অর্পিত ওয়াজিব পালন করল। সে এ অবস্থায় আল্লাহর নিকট ন্যায়নিষ্ঠ ইনসাফকারী ইমামদের অন্তর্ভুক্ত হবে; যদিও অন্যের কারণে কোনো বিষয়ে ত্রুটি থেকে যায়, যদি এছাড়া অন্য কোনো পথ সম্ভব না থাকে)।

এরপর তিনি 'যোগ্যতম' হওয়ার অর্থের গভীরে প্রবেশ করেন এবং উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি পদের জন্য এর কোনো স্থির মানদণ্ড নেই; বরং প্রতিটি পদের জন্য যোগ্যতম হওয়া সেই পদের প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং (যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি হলো অন্তরের সাহসিকতা, যুদ্ধবিদ্যার অভিজ্ঞতা এবং রণকৌশল অবলম্বন করা—কেননা যুদ্ধ হলো একটি কৌশল—সেই সাথে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধে পারদর্শিতা: যেমন তীর নিক্ষেপ করা, বর্শা মারা, আঘাত করা, অশ্বচালনা করা, আক্রমণ করা, পিছু হটা এবং এজাতীয় বিষয়সমূহ)।

(আর মানুষের মাঝে বিচারকার্যের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি হলো কিতাব ও সুন্নাহ নির্দেশিত ন্যায়বিচার সম্পর্কে জ্ঞান রাখা এবং রায় বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখা)।

তিনি ওয়ালীর (শাসক/কর্মকর্তা) অবস্থার উপরও দৃষ্টিপাত করেছেন; ওয়ালী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি 'সিয়াসাতে শারইয়্যাহ'র দুই মূল স্তম্ভ অর্থাৎ শক্তি ও আমানতদারিকে একত্রিত করেছেন। তবে এই দুই গুণের সম্মিলন সর্বদা একই মাত্রায় নাও হতে পারে। কখনো দেখা যায়...

---

(১) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ১৭।
(২) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ২৩; আরও দেখুন: আল-কাওয়ায়িদ আল-কুবরা ১/১০৫ এবং ১/১৭১।
(৩) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ২৪; এবং প্রতিটি পদের জন্য তার চাহিদা অনুযায়ী যোগ্যতম হওয়ার অর্থের বর্ণনার জন্য

দেখুন: ইজ্জ বিন আব্দুস সালাম রচিত আল-কাওয়ায়িদ আল-কুবরা ১/১০৬ ও ১০৭; কারাফি আল-ফুরুক ২/১৫৭ ও ৩/১০২ গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন; আল-যাখিরাহ ২/২৫৫-২৫৬; তুফি রচিত মুখতাসারুত তিরমিজি ৩/১৭৩।
(৪) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ২৫।

তাদের একজন কোনো একটি গুণে অধিক উপযুক্ত এবং অন্যজন অন্য কোনো গুণে। (সুতরাং প্রত্যেক পদের ক্ষেত্রে সেই পদের প্রকৃতি অনুযায়ী অধিক যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা ওয়াজিব। অতএব যদি এমন দু'জন ব্যক্তি নির্ধারিত হয় যাদের মধ্যে একজন অধিক আমানতদার এবং অন্যজন অধিক শক্তিশালী; তবে ওই পদের জন্য যে অধিক উপকারী এবং যার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা সবচেয়ে কম, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাই যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে—যদিও তার মধ্যে পাপাচার থাকে—দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তির ওপর, যদিও সে আমানতদার হয়)।(১)

(আর বিচারিক পদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তাকে, যে অধিক জ্ঞানী, অধিক পরহেযগার এবং অধিক দক্ষ। যদি তাদের একজন অধিক জ্ঞানী হয় এবং অন্যজন অধিক পরহেযগার; তবে যে সকল বিষয়ে ফয়সালা প্রকাশ্য এবং যেখানে প্রবৃত্তি বা খেয়াল-খুশির অনুসরণের ভয় থাকে, সেখানে অধিক পরহেযগার ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর যে সকল বিষয়ের বিধান সূক্ষ্ম এবং যেখানে সংশয়ের ভয় থাকে, সেখানে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে)।(২)

তিনি অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেছেন: (অধিক দক্ষ ব্যক্তির তুলনায় [অর্থাৎ অধিক জ্ঞানী ও অধিক পরহেযগারকে] প্রাধান্য দেওয়া হবে যদি বিচারক যুদ্ধ বিষয়ক শাসক অথবা সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থন প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে অধিক দক্ষ ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে যদি বিচারকার্য পরিচালনায় বিচারকের জন্য জ্ঞান ও পরহেযগারির অতিরিক্ত বৃদ্ধির চেয়ে শক্তি ও সহযোগিতার প্রয়োজন বেশি হয়)।(৩)

বরং একই পদের ক্ষেত্রে, কোনো এক দিক বিবেচনায় আমানতদার ব্যক্তি অধিক উপযুক্ত হতে পারে, আবার অন্য দিক বিবেচনায় শক্তিশালী ব্যক্তি অগ্রগণ্য হতে পারে: (যখন আমানতদারিতার প্রয়োজনীয়তা অধিক হবে, তখন আমানতদার ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে—যেমন সম্পদ হেফাযত করা ও অনুরূপ কাজ। তবে সম্পদ উদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে শক্তি ও আমানতদারিতা উভয়টিরই প্রয়োজন)।(৪)

আর যদি এমন কোনো একক ব্যক্তি না পাওয়া যায় যে এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম, তবে তার সাথে অন্য কাউকে যুক্ত করা যেতে পারে: (অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল পদের ক্ষেত্রেও, যদি একক ব্যক্তির দ্বারা জনকল্যাণ সাধিত না হয় তবে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয় ঘটানো হবে। সুতরাং সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে অথবা দায়িত্বশীলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, যদি একক ব্যক্তির দ্বারা পূর্ণ পর্যাপ্ততা অর্জিত না হয়)।(৫)

---

(১) আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ ২৭।
(২) আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ ৩১।
(৩) আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ ৩২।
(৪) আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ ৩১।
(৫) আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়াহ ৩১।

পৃষ্ঠা 262

আপনি লক্ষ্য করবেন যে, ইবনে তাইমিয়া একটি নির্দিষ্ট খুঁটিনাটি বিষয়ে এই নীতিটি প্রয়োগ করেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ব্যাপক দিগন্ত উন্মোচন করেছেন:

- তিনি এতে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বেচ্ছাধীন অবস্থা এবং সংকীর্ণতা ও নিরুপায় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।
- তিনি প্রতিটি প্রশাসনিক দায়িত্বে (বিলায়াতে) সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণ বা মাসলাহাতকে বিবেচনা করেছেন।
- প্রতিটি প্রশাসনিক দায়িত্বে আমানতদারি ও শক্তির যোগ্যতাকে পৃথক করেছেন।
- প্রতিটি প্রশাসনিক পদের অবস্থা অনুযায়ী আমানতদারি নাকি শক্তি—কোনটি বেশি উপযোগী, তা অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনা করেছেন।
- তিনি অন্যান্য মাসলাহাতমূলক উপকরণের মাধ্যমে এমন সব কল্যাণ পূর্ণ করার বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন, যা অর্জনে তিনি সক্ষম ছিলেন না।

এটি এই নীতির ব্যাপকতা এবং বিস্তৃত ইজতিহাদী ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের সম্ভাবনার একটি উদাহরণ, যদি কোনো ব্যক্তি তা সঠিকভাবে করতে পারেন। আমাদের বর্তমান সময়ের মতো যুগে এই অনন্য ফিকহী প্রয়োগের এক বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে।

শরয়ী মাসলাহাত এবং সমকালীন বিশেষায়িত শাস্ত্রসমূহ:

মাসলাহাত বা কল্যাণের মূল্যায়ন কখনো কখনো সবার কাছে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হতে পারে, অথবা সামান্য ইজতিহাদের মাধ্যমেই তা বোঝা সম্ভব হতে পারে। তবে অনেক মাসলাহাতই এমন নয়; বরং মানুষের জন্য কোনটি অধিক কল্যাণকর তা নির্ণয় করতে এমন অভিজ্ঞতা বা বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, যা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। এটি জনকল্যাণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় সমকালীন বিশেষায়িত শাস্ত্রসমূহকে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য করে তোলে।

বর্তমানে অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রে মাসলাহাতের মূল্যায়ন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি জটিল হয়ে পড়েছে। তাই কোনো ব্যক্তি যদি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাসলাহাত অর্জনের জন্য নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা ও ইজতিহাদ করেন, তবুও তিনি সঠিক মাসলাহাতে পৌঁছাতে পারবেন না এবং নির্ভরযোগ্য মাসলাহাত-ভিত্তিক ইজতিহাদ পালনে তিনি ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে গণ্য হবেন।

কারণ ইজতিহাদ হলো সত্যে পৌঁছানোর জন্য সামর্থ্যের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা, আর এটি কেবল তাদের জন্যই সম্ভব যারা এর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অধিকারী। সুতরাং, শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অনবগত কোনো সাধারণ ব্যক্তি কেবল বিধানাবলি পর্যালোচনায় শ্রম দিলেই মুজতাহিদ হয়ে যাবেন না, যতক্ষণ না তিনি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেন। মাসলাহাত সংক্রান্ত পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ।

পৃষ্ঠা 263

ফকীহ এবং বিশেষজ্ঞের মধ্যকার সম্পর্ক একটি নিবিড় ও পরিপূরক সম্পর্ক। ফিকহী মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের নিকট

দুটি মৌলিক বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করা হয়:

প্রথম বিষয়: প্রভাবশালী শরয়ি মানাত (ভিত্তি) সমূহের পরিমাপ নিরূপণ করা; যেমন: জরুরত (অপরিহার্যতা), হাজত (প্রয়োজন), মাশাক্কাহ (কষ্ট), দারার (ক্ষতি), সামান্য, অনুগামী এবং উরফ (প্রথা)।

দ্বিতীয় বিষয়: বিধানের সংশ্লিষ্ট বাস্তব ঘটনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা, যাতে বিধান প্রদানের পূর্বে তার স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পক্ষান্তরে ফকীহ এমন কিছু বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন যেগুলোর সাথে বিশেষজ্ঞের কোনো সম্পর্ক নেই, আর সেগুলো হলো:

১- বিধান বর্ণনা করা এবং এর শর্তাবলী ও অন্তরায়সমূহ নির্ধারণ করা।

২- মানাত (ভিত্তি) বাস্তবায়নের মানদণ্ড নির্ধারণ করা; অর্থাৎ কখন হাজত বা জরুরত ধর্তব্য হবে এবং কখন তা ধর্তব্য হবে না? এবং এগুলোর প্রত্যেকটির মানদণ্ডই বা কী?

৩- তাখরিজ বা বিধানের নির্ধারকসমূহ সাব্যস্ত করা; যেমন এটি জানা যে এটি ক্রয়-বিক্রয় নাকি ইজারা (ভাড়া), অথবা এটি ইচ্ছাকৃত হত্যা নাকি আধা-ইচ্ছাকৃত হত্যা; কারণ এগুলো ফিকহী বৈশিষ্ট্য ও আহকাম।

৪- মাসলাহাত (কল্যাণ) ও মাফাসাদ (অকল্যাণ) এর মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে বিধানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। কারণ এই দ্বন্দ্ব শরয়ি প্রাধান্যদানকারী কারণ অনুসন্ধানে বাধ্য করে এবং এটি একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়।

চতুর্থ নীতি

কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য বিধানের বৈধতা

শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী হলো এটি জনকল্যাণ সাধন এবং অনিষ্ট প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এসেছে। সুতরাং মানুষের দ্বীন বা দুনিয়ার জন্য যা কিছু কল্যাণকর এবং যার ফলে বৃহত্তর কোনো অকল্যাণ বা অনিষ্টের সৃষ্টি হয় না, শরীয়ত তা কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো কল্যাণের গুরুত্ব ও মর্যাদার অনুপাতে তার বিবেচনার গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। এটি শরীয়তের সকল বিধানের ওপর একটি নিয়ন্ত্রণকারী বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ শরীয়তের প্রতিটি বিধান হয় কল্যাণ সাধন করে, না হয় অনিষ্ট প্রতিহত করে। আর যখন কল্যাণ ও অকল্যাণ পরস্পর মিশে যায়, তখন শরীয়ত অধিকতর শক্তিশালী দিকটিকে বিবেচনায় আনে।

ইবনে তাইমিয়া বলেন:
"শরীয়ত এসেছে কল্যাণসমূহ অর্জন ও সেগুলোকে পূর্ণতা দান করতে এবং অকল্যাণসমূহ রহিত ও সেগুলোকে হ্রাস করতে। আর যখন দুটি কল্যাণকর বিষয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়, তখন নিম্নতরটি ত্যাগের মাধ্যমে শরীয়ত অধিকতর কল্যাণকর দিকটিকে প্রাধান্য দেয়।" (১)

অতএব, "সমস্ত বিধানই কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত, যদিও আমাদের নিকট কল্যাণের দিকটি অস্পষ্ট থাকে।" (২)

আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবী শরীয়তের বিধানসমূহে কল্যাণের বিবেচনার ধরণ ব্যাখ্যা করে বলেন:

"শরীয়ত জনকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং সে উদ্দেশ্যেই বিধান প্রদান করে, তবে অনেক ক্ষেত্রে কারণ বর্ণনায় নীরব থাকে। আলেমগণ যখন শরীয়তের বিষয়াদি পর্যালোচনা করেছেন, তখন তারা এটি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করেছেন। ফলে এর মাধ্যমে তাদের কাছে একটি সামগ্রিক মূলনীতি প্রতিভাত হয়েছে, আর তা হলো: শরীয়ত প্রণেতা যখনই কোনো বিধান প্রদান করেন, তা কোনো না কোনো কল্যাণের উদ্দেশ্যেই করেন। এরপর আলেমগণ কখনো শরীয়ত প্রণেতার বাণীতে এমন কিছু পান যা সেই কল্যাণের দিকে নির্দেশ করে, আবার কখনো তা খুঁজে পান না। তখন তারা যে বিষয়ে শরীয়ত বিধান দিয়েছে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, যতক্ষণ না তাদের নিকট এমন কোনো বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয় যা শরীয়ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে অথবা যোগ্য হওয়ার কারণে বিবেচনা করতে পারে।"

(১) মাজমু' আল-ফাতাওয়া ৩০/১৩৬, এবং দেখুন: মাজমু' আল-ফাতাওয়া ৩০/১৯৩।
(২) আত-তাওদিহ ফি শারহিত তানকিহ ১/২৫০, এবং দেখুন: মুখতাসারুত তিরমিজি ৪/৫৪০।

তারা বলেন: শরিয়ত জনকল্যাণের ভিত্তিতে বিধান প্রদান করে, আর জনকল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বৈশিষ্ট্যাবলীর ঊর্ধ্বে নয়। আর উক্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটি ছাড়া বিবেচনার যোগ্য অন্য কিছু নেই, তাই এটিই নির্ধারিত হয়েছে। (১)

শরিয়তে জনকল্যাণের বিবেচনার একটি দিক হলো: জনকল্যাণের মাত্রার ভিন্নতা অনুযায়ী শরয়ী বিধানসমূহেও তারতম্য ঘটে। সুতরাং ওয়াজিব বা আবশ্যিক কার্যাবলীর কল্যাণ মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় কার্যাবলীর কল্যাণের চেয়ে অধিক মহান। অনুরূপভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ কার্যাবলীর অনিষ্ট মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কার্যাবলীর অনিষ্টের চেয়ে অধিক গুরুতর। ঠিক তেমনিভাবে হারামসমূহও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অনিষ্টের মাত্রা অনুযায়ী সগীরা ও কবীরা গুনাহের মধ্যে তারতম্যপূর্ণ হয়।

আশ-শাতিবী বলেন:
(নির্দেশ ও নিষেধসমূহ গুরুত্বের বিচারে করণীয় বা বর্জনীয় দাবির ক্ষেত্রে একই স্তরের নয়; বরং এটি আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন থেকে উদ্ভূত কল্যাণ এবং তার লঙ্ঘনের ফলে উদ্ভূত অনিষ্টের তারতম্য অনুযায়ী নির্ধারিত হয়)। (২)

ইয ইবন আবদিস সালাম বলেন:
(কল্যাণ ও অনিষ্টসমূহ বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। আর কল্যাণের স্তরের ওপর ভিত্তি করেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও পরকালের প্রতিদান নির্ধারিত হয়। সুতরাং সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হলো অনিষ্টের বিচারে সবচেয়ে গুরুতর, এরপর ক্রমান্বয়ে কম অনিষ্টকরগুলো। কবীরা গুনাহের অনিষ্টসমূহ এভাবে হ্রাস পেতে থাকে যতক্ষণ না এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যা থেকে আরও সামান্য হ্রাস পেলে আমরা সগীরা গুনাহের অনিষ্টের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতাম, যা হলো দ্বিতীয় স্তর। এরপর সগীরা গুনাহের অনিষ্টসমূহও হ্রাস পেতে থাকে যতক্ষণ না এমন এক অনিষ্টের স্তরে পৌঁছায় যা অতিক্রান্ত হলে আমরা মাকরূহসমূহের সর্বোচ্চ অনিষ্টের স্তরে পৌঁছাতাম, যা হলো অনিষ্টের স্তরের দ্বিতীয় প্রকার। আর মাকরূহসমূহের অনিষ্টগুলো হ্রাস পেতে থাকে যতক্ষণ না এমন এক সীমায় পৌঁছায় যা দূরীভূত হলে আমরা মুবাহ বা বৈধ কাজের স্তরে উপনীত হতাম)। (৩)

---

(১) আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিসি মুসলিম ৫/৩৭৯।
(২) আল-মুওয়াফাকাত ৩/৫৩৬।
(৩) আল-কাওয়াইদুল কুবরা ১/৭৮; এবং দেখুন: আল-কাওয়াইদুল কুবরা ১/৭৭ এবং ১/৪১-৪২।

আল-কারাফি বলেন:

(কেননা শরীয়তের নির্দেশসমূহ বিশুদ্ধ বা প্রবল জনকল্যাণকে অনুসরণ করে, আর এর নিষেধসমূহ বিশুদ্ধ বা প্রবল অকল্যাণকর বিষয়সমূহকে অনুসরণ করে। এমনকি জনকল্যাণের সর্বনিম্ন স্তর এবং মুস্তাহাব কার্যের ওপর সওয়াব অর্পিত হয়। এরপর জনকল্যাণ ও মুস্তাহাব কার্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পেতে যখন তা মুস্তাহাবসমূহের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়, তখন তার পরবর্তী স্তরটিই ওয়াজিবের সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে গণ্য হয়। অন্যদিকে, অকল্যাণের সর্বনিম্ন স্তরের ওপর মাকরূহাতের সর্বনিম্ন স্তর বিন্যস্ত হয়। এরপর অকল্যাণ ও মাকরূহাতের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেতে পেতে যখন তা মাকরূহাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়, তখন তার পরবর্তী স্তরটিই হারামের সর্বনিম্ন স্তর)।

আত-তূফী বলেন:

(এতে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, প্রশংসা ও নিন্দা এবং সওয়াব ও শাস্তির তারতম্য নির্ভর করে আনুগত্য ও পাপাচারের মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ ও অকল্যাণের তারতম্যের ওপর)।

সুতরাং এই মূলনীতিটি সিয়াসা শরইয়্যাহ বা ইসলামি শাসননীতির একটি কার্যকর হাতিয়ার। এটি দাবি করে যে, রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে এর নিম্নস্তরের প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করতে এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ অকল্যাণ প্রতিহত করতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাবেন। অতএব, মানুষের কল্যাণ সাধন এবং তাদের থেকে ক্ষতি দূর করার লক্ষ্যেই যাবতীয় পর্যবেক্ষণ ও কর্মপন্থা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

সিয়াসা শরইয়্যাহ বা শাসননীতিতে কল্যাণধর্মী এই দৃষ্টিভঙ্গির দুটি স্তর রয়েছে:

প্রথম স্তর: প্রাথমিক পর্যায়ে কল্যাণধর্মী ইজতিহাদ; অর্থাৎ যখন কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না এবং একই ক্ষেত্রে একাধিক অকল্যাণের সমাবেশ ঘটে না। আর তা হলো, সকল কল্যাণ অর্জন করা এবং সকল অকল্যাণ প্রতিহত করা।

---

(১) আল-ফুরূক ২/১৪৮; এবং দেখুন: তানকিহুল ফুসুল ৪৫১।

(২) মুখতাসারুত তিরমিযী ২/৩৮৮; এবং একই অর্থে দেখুন: মুখতাসারুত তিরমিযী ১/১০৭ এবং ২/৯৫; আরও দেখুন কল্যাণের তারতম্য অনুযায়ী বিধানের তারতম্য বিষয়ে: অকল্যাণ দূর করা কল্যাণ অর্জনের চেয়ে অগ্রগণ্য মূলনীতি, লেখক: মুহাম্মদ আমিন সুহাইলি ৯৫-৯৬।

স্বাভাবিক বা সাধারণ অবস্থায় শরীয়তসম্মত পন্থা হলো, গুরুত্ব অনুযায়ী সকল কল্যাণ অর্জনের চেষ্টা করা এবং গুরুত্ব অনুযায়ী সকল অকল্যাণ প্রতিহত করা। এ বিষয়টি কোনো জটিলতা সৃষ্টি করে না।

দ্বিতীয় স্তর: বিরোধপূর্ণ অবস্থায় কল্যাণ-অকল্যাণ বিষয়ক ইজতিহাদ। আর তা হলো যখন একই ক্ষেত্রে কল্যাণ ও অকল্যাণের সমাবেশ ঘটে, ফলে অকল্যাণে লিপ্ত হওয়া ছাড়া কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব হয় না, অথবা কল্যাণ বর্জন করা ছাড়া অকল্যাণ প্রতিহত করা সম্ভব হয় না। এখানেই এই কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পদ্ধতির ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়। আমরা কি কল্যাণের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে তা গ্রহণ করব, যদিও তার সাথে অকল্যাণ জড়িয়ে থাকে? নাকি আমরা অকল্যাণ প্রতিরোধের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে তা প্রতিহত করব, যদিও তার কারণে কল্যাণ হাতছাড়া হয়ে যায়?

তাই আমাদের এমন এক মানদণ্ড জানা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে অগ্রগণ্য কল্যাণকে গ্রহণ করা সম্ভব হবে যদিও তার সাথে নিম্নতর অকল্যাণ থাকে; অথবা নিম্নতর কল্যাণকে বর্জন করা যাবে উচ্চতর অকল্যাণ বিদ্যমান থাকার কারণে। এজন্য বাহ্যিক প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এখানেই শরীয়তের সেই প্রসিদ্ধ মূলনীতিটি আসে: **"উচ্চতর অকল্যাণ প্রতিরোধের জন্য দুটি অকল্যাণের মধ্যে নিম্নতরটি গ্রহণ করা"** অথবা **"অগ্রগণ্য কল্যাণ সম্পাদন এবং (প্রয়োজনে) নিম্নতর অকল্যাণ মেনে নেওয়া।"**

কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোতে বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে এই মূলনীতির মাধ্যমে অধিক পরিমাণে দলিল পেশ করা হয়। একে যেন বিধানের স্বপক্ষে একটি দলিল মনে করা হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে এটি ইজতিহাদের অনুগামী এবং এটি স্বয়ং কোনো মূল উৎস (আসল) নয়। এর অর্থ হলো, বিধানটি অন্যান্য দলিলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যার মাধ্যমে জানা যায় যে এই অকল্যাণটি অগ্রগণ্য নাকি নিম্নতর। সুতরাং যখন জানা যায় যে এই অকল্যাণটি নিম্নতর, তখন তা বর্জন করা হয়। অতএব, এই মূলনীতিটি মূলত গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদের ফলাফল এবং তার প্রভাব মাত্র।

ইবনে দাকীকুল ঈদ এই আলোচনার সূক্ষ্মতা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু জটিলতা স্পষ্ট করে বলেন:

"(কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে এবং কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূর করার উভয় বিষয়কে একত্রে সমন্বয় করা সম্ভব না হলে সামগ্রিক মূলনীতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো: দুটি কল্যাণের মধ্যে উচ্চতরটিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং নিম্নতরটিকে বর্জন করা; এবং দুটি অকল্যাণের মধ্যে গুরুতরটিকে প্রতিহত করা ও হালকাটিকে মেনে নেওয়া। তবে এর মধ্যে কিছু বিষয় এমন রয়েছে যেখানে কোনটি অগ্রগণ্য তা স্পষ্ট হয়ে যায়; হয় সাধারণ অভ্যাস ও বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে পার্থিব কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করার মাধ্যমে, অথবা সেই সকল শরয়ী মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য করার মাধ্যমে যা একটি বিষয়কে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেওয়ার দাবি রাখে। অতঃপর এর মধ্যে কিছু বিষয় এমন যা সুস্পষ্ট এবং যা অনুধাবনে সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট...)"

...এর মাধ্যমে; এবং এর মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা প্রচ্ছন্ন এবং শরীয়ত কর্তৃক একটি বিষয়কে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দান ব্যতীত তা জানা যায় না। এর কারণ হলো: কল্যাণ (মাসলাহাত) ও অকল্যাণ (মাফাসাদাহ)-এর সংখ্যা ও পরিমাণ নিরূপণ করা এবং বিভিন্ন পরিমাণের মাঝে তুলনামূলক প্রাধান্য নির্ণয় করা কেবল বিবেক বা বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়; বরং শরীয়তে বাহ্যিকভাবে সমপর্যায়ের মনে হওয়া সত্ত্বেও একটি বিষয়কে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ আসতে পারে।[১]

ইজ্জ বিন আব্দুস সালাম অধিকাংশ কল্যাণ ও অকল্যাণ যে স্পষ্ট এবং তা আবৃত নয়—এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার পর বলেন: "মূলত সেই সকল প্রচ্ছন্ন কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষেত্রেই বিবাদ দীর্ঘায়িত হয়েছে এবং মতভেদ অধিক হয়েছে, যেগুলোর উপলব্ধি এবং

সেগুলোর মাঝে প্রাধান্য বা সমতা নিরূপণের ক্ষেত্রে মানুষ তাদের প্রজ্ঞা ও মেধার ভিন্নতা অনুযায়ী মতভেদ করে থাকে।"(২)

এই কারণে কেবল সাধারণ কল্যাণের ভিত্তিতে প্রাধান্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়, বরং শরয়ি মর্যাদা ও মৌলিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আবশ্যক।(৩)

উলামায়ে কেরাম প্রাধান্য নিরূপণের জন্য বেশ কিছু নির্দিষ্ট মূলনীতি সাব্যস্ত করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথম মূলনীতি: বিষয়ের শক্তি ও গুরুত্বের ভিত্তিতে প্রাধান্য নিরূপণ:

আর তা হলো শরীয়ত প্রণেতার মানদণ্ডে বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করা; ফলে বিরোধের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিষয়ের ওপর অধিক শক্তিশালী বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

শক্তির মানদণ্ড তিনটি উপায়ে জানা সম্ভব:

প্রথম উপায়: বিষয়ের শরয়ি বিধান (হুকুম):

এর ভিত্তিতে মানদুবের ওপর ওয়াজিবকে, মুবাহের ওপর মানদুবকে, মাকরূহের ওপর হারামকে, মুবাহের ওপর মাকরূহকে এবং ফরজে কিফায়ার ওপর ফরজে আইনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, ইত্যাদি।

(১) শারহুল ইলমাম বি-আহাদিসিল আহকাম, ইবনু দাকীক, ২/৪৯৭-৪৯৮।
(২) আল-কাওয়াইদুল কুবরা, ২/১৯৪; এবং দেখুন: আল-কাওয়াইদুল কুবরা, ১/৩০ ও ১/৮০।
(৩) দেখুন: আন-নুকাত ফিল মুখতালাফ, ইবনুস সামআনী, ২/১১১-১১২।

তবে এই পদ্ধতিটি সকল বিষয়ের জন্য উপযুক্ত নয়, যেমন হারামের সাথে ওয়াজিবের সংঘাত হওয়া।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: প্রমাণের শক্তিমত্তা; এটি কি অকাট্য নাকি ধারণাপ্রসূত।

তৃতীয় পদ্ধতি: শারিয়াত প্রণেতার গুরুত্ব প্রদানের বিচারে বিষয়টির মর্যাদা; যা সাধারণত তিনটি প্রসিদ্ধ স্তরে বিভক্ত:

অপরিহার্যতা (আয-জারুরিয়্যাত): এর সুসংহত মাপকাঠি হলো সেই সব কল্যাণ, যা দ্বীন ও দুনিয়ার স্বার্থসমূহ কায়েম রাখার জন্য একান্ত আবশ্যক। এমনভাবে যে, যদি এগুলো হারিয়ে যায় তবে দুনিয়ার স্বার্থসমূহ সঠিকভাবে পরিচালিত হবে না, বরং বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও প্রাণহানি ঘটবে। আর পরকালে মুক্তি ও নেয়ামত হাতছাড়া হয়ে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।(১)

প্রয়োজনীয়তা (আল-হাজিয়্যাত): এগুলো এমন সব কল্যাণ যা পরিধি প্রশস্ত করা এবং সংকীর্ণতা দূর করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে, যে সংকীর্ণতা সাধারণত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার ফলে সংকট ও কষ্টের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং যদি এগুলো রক্ষা না করা হয়, তবে সামগ্রিকভাবে মুকাল্লাফদের ওপর সংকট ও কষ্ট আপতিত হবে, তবে তা সাধারণ কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত স্বাভাবিক বিপর্যয়ের পর্যায়ে পৌঁছাবে না।(২)

শোভাবর্ধক (আত-তাহসিনিয়্যাত): আর তা হলো: সুন্দর অভ্যাসসমূহের মধ্য থেকে যা উপযুক্ত তা গ্রহণ করা এবং কলুষিত অবস্থাসমূহ বর্জন করা যা প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা অপছন্দ করে। আর সচ্চরিত্রের অধ্যায়টি এসব কিছুকে একত্রিত করে।(৩)

কোন কোন ফকিহর নিকট এই তিনটি স্তরের মাঝে পার্থক্য করার আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে, যা এই ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, এই পার্থক্য উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট, মূল উদ্দেশ্যের সাথে নয়। যেমন খাদ্য—উদাহরণস্বরূপ—এর একটি অপরিহার্য সীমা রয়েছে যা জীবনকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে; একটি প্রয়োজনীয় সীমা রয়েছে যাতে কিছুটা প্রশস্ততা আছে; এরপর আরও বেশি প্রশস্ততা হলো শোভাবর্ধক পর্যায়ে। একইভাবে বাসস্থান এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।(৪)

---

(১) আল-মুওয়াফাকাত ২/ ১৭ - ১৮।
(২) আল-মুওয়াফাকাত ২/ ২১।
(৩) আল-মুওয়াফাকাত ২/ ২২।
(৪) দেখুন: নাহওয়্যু তাফঈলি মাকাসিদিশ শারিয়াহ, জামাল আতিয়্যাহ ৫১ - ৫৪।

এর নিকটবর্তী অর্থে ইয ইবন আবদুস সালাম বলেন: (পার্থিব কল্যাণ ও স্বার্থসমূহ চার ভাগে বিভক্ত: জরুরি, প্রয়োজনীয়, সম্পূরক এবং পরিপূরক। জরুরি বিষয়গুলো হলো: যেমন আহার্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান, বিবাহ এবং জীবিকা নির্বাহের উপকরণ সংগ্রহের বাহনসমূহ ও অন্যান্য বিষয় যা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন যতটুকুতে প্রয়োজন পূরণ হয় তা জরুরি। আর এর মধ্যে যা সর্বোচ্চ পর্যায়ের, যেমন উপাদেয় খাদ্য, অতি সূক্ষ্ম ও নরম পোশাক, সুউচ্চ কক্ষ, প্রশস্ত প্রাসাদ, মূল্যবান বাহন, সুন্দরী নারী বিবাহ এবং শ্রেষ্ঠ দাসী লাভ করা—এগুলো সম্পূরক ও পরিপূরকের অন্তর্ভুক্ত। আর যা এই দুইয়ের মাঝামাঝি তা প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।)(১)

সুতরাং এখানে জরুরিকে প্রয়োজনীয়র ওপর এবং প্রয়োজনীয়কে সৌন্দর্যবর্ধকের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। (আর এই স্তরবিন্যাসের প্রভাব বিভিন্ন কিয়াস বা যুক্তির বিরোধের সময় প্রকাশ পায়। তখন জরুরিকে প্রয়োজনীয়র ওপর এবং প্রয়োজনীয়কে সম্পূরকের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।)(২)

এই স্তরটি—অর্থাৎ মাসআলার গুরুত্ব ও গুরুত্বানুসারে অগ্রাধিকার প্রদান—প্রাধান্য নির্ণয়ের (তারজিহ) ক্ষেত্রে দুটি দিক থেকে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার:

প্রথম দিক: আপেক্ষিক সুশৃঙ্খলতা; এগুলো মাসআলাসমূহের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কিছু মূলনীতি, যার মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানা সম্ভব হয় যে, মাসআলাটি জরুরি, প্রয়োজনীয় নাকি সৌন্দর্যবর্ধক স্তরের অন্তর্ভুক্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়টি জরুরি, প্রয়োজনীয় নাকি সৌন্দর্যবর্ধক স্তরের কততম পর্যায়ে রয়েছে তাও জানা যায়।

আমরা 'আপেক্ষিক সুশৃঙ্খলতা' বলেছি একারণে যে, অগ্রাধিকার প্রদানের এই কিছু মানদণ্ড একদম সূক্ষ্মভাবে সুশৃঙ্খল নয়। যেমন জরুরি, প্রয়োজনীয় ও সৌন্দর্যবর্ধক—এই ত্রিবিধ বিভাজন; কেননা এই সামগ্রিক বিভাগগুলোর প্রত্যেকটির সীমানার অধীনে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে, সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও মতপার্থক্যের ব্যাপক অবকাশ রয়েছে।

দ্বিতীয় দিক: প্রভাবের দিক থেকে; এটি প্রাধান্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী মূলনীতি। সুতরাং জরুরিকে প্রয়োজনীয়র ওপর, প্রয়োজনীয়কে সৌন্দর্যবর্ধকের ওপর, ওয়াজিবকে মুস্তাহাবের ওপর এবং হারামকে মুবাহের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এর ওপর নির্ভর করা সম্ভব। অনুরূপভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

---

(১) আল-কাওয়াইদুল কুবরা ২/১২৩।
(২) শারহু তানকিহিল ফুসুল, কারাফি ৩৯৩; এবং দেখুন: আত-তাকরীর ওয়াত-তাহবীর, ইবনু আমির হাজ ৩/২৩১।

দ্বিতীয় মূলনীতি: যে সামগ্রিক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তার মাধ্যমে অগ্রাধিকার প্রদান।

এর কারণ হলো শরীয়তের গভীর অনুসন্ধান প্রমাণ করেছে যে, শরীয়ত পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের সংরক্ষণের বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। সেগুলো হলো: দ্বীন, জীবন, বুদ্ধি, সম্মান ও মর্যাদা এবং সম্পদ (১)।

যদি দুটি বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়, তবে শরীয়ত যে বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে তা থেকে আমরা সমাধান লাভ করতে পারি। ফলে আমরা সেই প্রকারটিকে অগ্রাধিকার দেব যার প্রতি শরীয়ত অধিক গুরুত্বারোপ করেছে, ঐ প্রকারের ওপর যার গুরুত্ব তুলনামূলক কম। তবে শর্ত হলো, উভয় বিষয় গুরুত্বের দিক থেকে একই স্তরের হতে হবে। অর্থাৎ উভয়টিই হয় 'জরুরি' (অপরিহার্য), নয়তো 'হাজি' (প্রয়োজনীয়) অথবা 'তাহসিনি' (শোভাবর্ধক) হতে হবে। এমতাবস্থায়, দ্বীনের 'জরুরি' বিষয়কে জীবনের 'জরুরি' বিষয়ের ওপর এবং বুদ্ধির 'হাজি' বিষয়কে সম্পদের 'হাজি' বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং এভাবেই অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

এক্ষেত্রে এই অগ্রাধিকার প্রদান প্রভাবশালী হলেও তা কোনো অপরিবর্তনীয় মূলনীতি নয় যে, জীবনের সুরক্ষাকে এর নিম্নস্তরের অন্য সব কিছুর সুরক্ষার ওপর নিঃশর্তভাবে প্রাধান্য দেওয়া হবে। বরং এটি একটি অগ্রাধিকার প্রদানকারী মাধ্যম মাত্র। বলা যেতে পারে যে, এটি তখনই অগ্রাধিকার পাবে যখন এর চেয়ে শক্তিশালী অন্য কোনো অগ্রাধিকার প্রদানকারী উপাদান উপস্থিত না থাকে। আর এটিই বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে কল্যাণভিত্তিক ইজতিহাদকে জটিল করে তোলে। কোনটি অগ্রগণ্য তা জানার জন্য এমন গভীর ইজতিহাদ ও যোগ্যতার প্রয়োজন যা বৈপরীত্যহীন সাধারণ বিধানের ইজতিহাদের চেয়েও অনেক বড়।

বিন্যাসের সমীকরণে প্রভাব বিস্তারকারী অন্যতম কিছু বিষয় হলো:

১- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ:

জীবনের সুরক্ষার 'জরুরি' স্তরটি দ্বীন সুরক্ষার ঐ স্তরের ওপর প্রাধান্য পাবে যা 'জরুরি' নয়। আর এ কারণেই বৈধ...

(১) আলিমদের নিকট প্রসিদ্ধ পদ্ধতি হলো এই সামগ্রিক বিষয়গুলোকে 'পাঁচটি অপরিহার্য বিষয়' হিসেবে নামকরণ করা। কারণ সকল শরীয়ত এগুলোকে বিবেচনা করেই অবতীর্ণ হয়েছে। এটি হয় একটি মৌলিক 'জরুরি' বিষয় হবে, অথবা 'জরুরি' বিষয়ের পরিপূরক কোনো অনুগামী বিষয় হবে। আর 'হাজি' ও 'তাহসিনি' বিষয়গুলোকে—যদিও সেগুলো এই পাঁচটির কোনো একটির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়—'জরুরি' বিষয়ের বহির্ভূত ধরা হয়। দেখুন: আল-মুসতাসফা ১/৪১৭, আল-ইহকাম (আমেদি) ৩/২৭৪, আল-বাহরুল মুহিত ৭/২৬৬, আল-মাহসুল ৫/১৬০। আর এই পদ্ধতিতে কিছুটা সমস্যা রয়েছে, কারণ এতে পারস্পরিক অনুপ্রবেশ ঘটে; কেননা 'জরুরি' বিষয়গুলো 'হাজি' ও 'তাহসিনি'র সমান্তরাল অংশ হিসেবে আসে। আবার একই সময়ে এই পাঁচটি 'জরুরি' বিষয়ের অভ্যন্তরেও 'হাজি' ও 'তাহসিনি' বিষয় থাকে। দেখুন: ইশকালিয়াতুত তাসিল ফি মাকাসিদিশ শরীয়াহ ৪১৮-৪২০।

নিজের জীবনের ক্ষতি এড়াতে মৃত জন্তু ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে। অন্যদিকে আমরা শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে জিহাদের বৈধতা দেখতে পাই, যদিও তা দ্বীন রক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য না হয়; যেমন কোনো ব্যক্তি যদি হারবি কাফিরদের পর্যুদস্ত করার ইচ্ছা করে, তবে তা বৈধ হবে যদিও তার প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। আর তা জিহাদ নামক একটি প্রভাবশালী বিষয়ের উপস্থিতির কারণে।

২- সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ:

যদি কেউ কোনো মুসলিমের ইজ্জত বা মর্যাদার ওপর আক্রমণ করে, তবে তার ওপর নিজের মর্যাদা রক্ষা করা ওয়াজিব, যদিও সে নিজের প্রাণ হারানোর ভয় করে। অথচ মূলনীতি অনুযায়ী প্রাণ রক্ষা করা সম্মান রক্ষার ওপর অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। এটি এই জন্য যে, এখানে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মতো একটি প্রভাবশালী বিষয় বিদ্যমান। অন্যদিকে, কোনো নারী যদি নিহত হওয়ার আশঙ্কা করে তবে নিজের জীবন রক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে (আক্রমণকারীর হাতে) নিজেকে সঁপে দেওয়া তার জন্য বৈধ হতে পারে। সুতরাং অগ্রাধিকারের মানদণ্ডে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের এক সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।

৩- আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা:

যদি কেউ কারো সম্পদ, জীবন বা সম্মানের ওপর চড়াও হয়, তবে লঘুতর পন্থায় তা প্রতিহত করা বৈধ, এমনকি যদি তা আক্রমণকারীর প্রাণনাশের কারণও হয়। এখানে একটি প্রভাবশালী বিষয়ের উপস্থিতির কারণে (আক্রমণকারীর) জীবন রক্ষার ওপর (মালিকের) সম্পদ রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কেননা এখানে মাসলাহাত (কল্যাণ) কেবল জীবন রক্ষা বা সম্পদ রক্ষার সাধারণ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এখানে একদিকে রয়েছে আক্রমণকারী প্রাণ এবং অন্যদিকে রয়েছে নিরপরাধ বা সংরক্ষিত প্রাণ; আর এ দুই কখনোই সমান হতে পারে না।

৪- সক্ষমতা ও সামর্থ্য:

যদি কোনো ব্যক্তি শরয়ী ওয়াজিব পালনে অক্ষম হয়, তবে তা পরস্পরবিরোধী বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণে প্রভাব ফেলে। যেমন, দখলদার কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জন্য তাদের ভূখণ্ড রক্ষা করা ওয়াজিব। কিন্তু তারা যদি সে কাজে অক্ষম হয় এবং যুদ্ধ করার সামর্থ্য না রাখে, তবে সেই মুহূর্তে তাদের জন্য জীবন রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বৈধ। এটি এই কারণে নয় যে, জীবন রক্ষা করা দ্বীন রক্ষার ওপর অগ্রাধিকারযোগ্য; কারণ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে দ্বীন রক্ষা...

---

(১) আল-কিয়া আল-হাররাসী বলেন: (আমরা এ বিষয়ে কোনো মতভেদ জানি না যে, যখন কাফির বা ডাকাত দল এমন কোনো দুর্বল জনপদকে লক্ষ্যবস্তু বানায় যাদের অধিবাসীদের সেই আক্রমণকারীদের মোকাবেলা করার সক্ষমতা নেই, তবে তাদের সামনে থেকে সরে যাওয়া তাদের জন্য বৈধ; যদিও নির্ধারিত হায়াত বা মৃত্যু বাড়েও না এবং কমেও না)। আহকামুল কুরআন ১/ ২২০।

দ্বীন বা ধর্ম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ এর অন্যতম উদাহরণ; এখানে মূলত অক্ষমতা ও অসামর্থ্যের বিষয়টি প্রভাব ফেলেছে যা এই মাসআলার বিন্যাস ও গুরুত্ব নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছে।

৫. মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এমন পাপে লিপ্ত হওয়া যা তার অধিকার হ্রাসের কারণ হয়:

এর উদাহরণ হলো, হকের ওপর সীমালঙ্ঘনকারীকে সত্য স্বীকার করতে এবং তার সীমালঙ্ঘন দূর করতে বাধ্য করা; যদিও এতে জান রক্ষার তুলনায় (পরিপূরক বা তাহসিনি পর্যায়ের হলেও) সম্পদ রক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

অপরাধের দণ্ডসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত। অপরাধ সংঘটনের ফলে মৃত্যুদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ বা বেত্রাঘাতের মতো শাস্তি হতে পারে যা জীবন কেড়ে নেয় অথবা জীবনের কোনো বড় উপযোগিতা নষ্ট করে; কারণ এমন অপরাধ করা হয়েছে যা তার অধিকারকে খর্ব করেছে।

৬. পুনরায় সংশোধন বা পুষিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা:

যে কল্যাণ বা স্বার্থ (মাসলাহাত) পুনরায় সংশোধন করা বা ফিরে পাওয়া সম্ভব, তা এমন মাসলাহাত থেকে ভিন্ন যা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব, সালাতরত অবস্থায় যদি সামান্য সম্পদের ক্ষতিরও আশঙ্কা থাকে, তবে তার জন্য সালাত ভঙ্গ করা বৈধ (১)।

এই শেষোক্ত বিষয়টি উল্লেখ না করলেও চলত, কারণ এখানে উদ্দেশ্য হলো বৈপরীত্য আলোচনা করা; অথচ এখানে কোনো প্রকৃত বৈপরীত্য নেই, কারণ উভয় কল্যাণের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব।

৭. আল্লাহর হকের ওপর মানুষের হককে অগ্রাধিকার দেওয়া, কারণ আল্লাহর হক ক্ষমা ও সহনশীলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত:

এর একটি উদাহরণ হলো, মুরতাদের হদ্দের (ধর্মত্যাগের নির্ধারিত দণ্ড) ওপর কিসাসের (প্রতিশোধমূলক দণ্ড) হককে অগ্রাধিকার দেওয়া (২)।

যদিও মূলগতভাবে আল্লাহর হকই মহান, কিন্তু এখানে অন্য একটি প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে।

এগুলো হলো শরয়ি মূলনীতির কিছু নমুনা যা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অগ্রাধিকার ও পশ্চাদবর্তীতা নির্ধারণের মানদণ্ডে প্রভাব ফেলে। এর অর্থ হলো, এই সামগ্রিক মূলনীতিগুলোর অগ্রাধিকার সর্বদা অপরিবর্তনীয় নয়; বরং সমতার ক্ষেত্রে অথবা এর চেয়ে শক্তিশালী কোনো মানদণ্ড না থাকলে এগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় অগ্রাধিকার নির্ধারিত হয় সেই কল্যাণের (মাসলাহাত) প্রকারভেদের মাধ্যমে যার অন্তর্ভুক্ত সেটি হয়ে থাকে।

---

(১) দেখুন: আত-তাকরির ওয়াত-তাহবির ৩/২৩১।
(২) দেখুন: আত-তাকরির ওয়াত-তাহবির ৩/৩২১।

বিষয়টি যেমনটি দেখছেন, তা অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের ইজতিহাদ বা গবেষণার দাবি রাখে, যা অনেক মানুষের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

এর সাথে যখন আমরা এই পাঁচটি কল্যাণের (মাসালিহ) ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে আলেমদের মতভেদ যুক্ত করি, তখন গবেষণার কাঠিন্য আরও বৃদ্ধি পায়।

এই মৌলিক বিষয়গুলোর (কুল্লিয়াত) মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে আলেমদের পদ্ধতি মূলত দুটি ধারায় বিভক্ত:

প্রথম ধারা: ক্রমবিন্যাস ছাড়াই গণনা করা। অর্থাৎ অগ্রগণ্যতা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়াই কেবল এগুলোকে উল্লেখ করা। আর সেগুলো হলো: দ্বীন, জীবন (নফস), বুদ্ধি (আকল), বংশধারা (নাসল) এবং সম্পদ (মাল)(১)।

অথবা এভাবে উল্লেখ করা: জীবন, সম্পদ, বংশমর্যাদা (নাসাব), দ্বীন এবং বুদ্ধি(২)।

অথবা: দ্বীন, বুদ্ধি, জীবন, বংশমর্যাদা এবং সম্পদ(৩)।

দ্বিতীয় ধারা: ক্রমবিন্যাস করা।

এর পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁরা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

প্রথম মত: দ্বীন সংরক্ষণ, তারপর জীবন, তারপর বংশমর্যাদা, তারপর বুদ্ধি এবং তারপর সম্পদ(৪)।

দ্বিতীয় মত: দ্বীন সংরক্ষণ, তারপর জীবন, তারপর বুদ্ধি, তারপর বংশধারা এবং তারপর সম্পদ(৫)।

তৃতীয় মত: বাকি চারটির ওপর দ্বীনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা(৬)।

---

(১) দেখুন: আল-মুস্তাসফা ১/৪১৭; তাশনিফুল মাসামি‘, যারকাশি ৩/১৫।
(২) দেখুন: আল-মাহসুল, রাজি ৫/১৬০।
(৩) দেখুন: মুখতাসারুর রওদাহ, তুফি ২০৪; আল-ইহকাম ফি ইখতিসারি উসুলিল আহকাম, ইবনুল লাহহাম ৩৪৯।
(৪) দেখুন: আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, আমেদি ৪/২৭৬-২৭৭; নিহায়াতুস সুল, আসনাভি ৩৯১; তায়সিরুল উসুল ইলা মিনহাজিল উসুল, ইবনু ইমামিল কামিলিয়্যাহ ৬/২৬৪; আত-তাকরির ওয়াত তাহবির, ইবনু আমির হাজ ৩/২৩১।
(৫) দেখুন: আত-তাহবির শারহুত তাহরির, মারদাভি ৭/৩৩৩৯; আত-তাওদিহ ফি শারহিত তানকিহ, হালুলু ৩/১৯৪।
(৬) দেখুন: নাফাইসুল উসুল ফি শারহিল মাহসুল, কারাফি ৯/৩৭৮২; আত-তাকরির ওয়াত তাহবির ৩/২৩১; আত-তাহবির শারহুত তাহরির ৮/৪২৪৯।

চতুর্থ মত: অবশিষ্ট পাঁচটির পেছনে দ্বীনকে রাখা (১)।
এবং এটি ছাড়াও অন্যান্য মতামত রয়েছে (২)।

যখন আমরা এই মতভেদকে সামনে রাখি, তখন অগ্রগণ্যতা প্রদানের (তারজীহ) ক্ষেত্রে এর ওপর নির্ভর করার জটিলতা ও কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হলো, অনেক মানুষ মনে করে যে এই নিয়মটি অত্যন্ত সহজ; কারণ সে প্রতিটি বিরোধপূর্ণ বিষয়ের বিপরীতে

একটি করে উদাহরণ মুখস্থ করে রাখে এবং মনে করে যে এটি খুবই সহজসাধ্য! প্রকৃতপক্ষে এই উদাহরণগুলো মূল নিয়ম থেকে গৃহীত হয়নি; বরং এগুলো অন্য দলিলের মাধ্যমে পূর্বেই পরিচিত ছিল, পরবর্তীতে ফকীহগণ নিয়মটির উদাহরণ হিসেবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, যখন কোনো ব্যক্তি তার সামনে আসা সমস্ত বা অধিকাংশ সমস্যার ক্ষেত্রে এই নিয়মটিকে একটি স্থায়ী মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, তখন সে স্পষ্ট ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়।

তৃতীয় নিয়ম: ব্যাপকতার ভিত্তিতে অগ্রগণ্যতা প্রদান।
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সেটি কি সাধারণ নাকি বিশেষ, সামগ্রিক নাকি আংশিক?
অতএব, সাধারণ স্বার্থ (মাসলাহাত) বিশেষ স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার পাবে এবং সামগ্রিক স্বার্থ আংশিক স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার পাবে।

চতুর্থ নিয়ম: ঘটার প্রবলতার ভিত্তিতে অগ্রগণ্যতা প্রদান।
সুতরাং যে স্বার্থের বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত, তা কেবল ধারণাপ্রসূত স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার পাবে।

পঞ্চম নিয়ম: মৌলিক স্বার্থ অনুবর্তী (অধীনস্থ) স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার পাবে এবং মৌলিক স্বার্থ পরিপূরক স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার পাবে।

অগ্রগণ্যতা প্রদানের মানদণ্ডসমূহ বর্ণনায় আরও বিস্তৃতি ঘটানো সম্ভব, যেমন পরকাল বা ইহকালের সাথে সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে অগ্রগণ্যতা প্রদান। তবে এটি পর্যাপ্ত মানদণ্ড বলে মনে হয় না; কারণ কোনো বৈশিষ্ট্য পরকালীন নাকি ইহকালীন হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, কেননা বিধানসমূহ...

---

(১) নেহায়াতুস সুল, আল-ইসনবী ৩৯১; আত-তাহবীর শারহুত তাহরীর ৮/৪২৪৯।
(২) এই সামগ্রিক নীতিগুলোর (কুল্লিয়াত) বিন্যাসের ক্ষেত্রে মতভেদ এবং আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: মাকাসিদুশ শারীয়াহ ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ, সা'দ আল-কুবাইসী ৬৫৫-৬৬২; নাহওয়া তাফঈলি মাকাসিদুশ শারীয়াহ, জামাল আতিয়্যাহ ২৮-৪৮; ইশকালিয়াতুত তاصيل ফী মাকাসিদুশ শারীয়াহ, আ'রাক জাবর শাল্লাল ৩৮০-৩৮৫।

দুনিয়া আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত, আর আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর পাপসমূহের জন্য যেহেতু তা'যিরি (শিক্ষামূলক) দণ্ড রয়েছে; তাই এই বিভাজনটি মূলত সুশৃঙ্খল নয়।

পরস্পর বিরোধী মাসলাহাতসমূহের (জনস্বার্থ) মধ্যে প্রাধান্য নির্ণয়ের মূলনীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ সারসংক্ষেপ:

১. এই নিয়মগুলো প্রাধান্য নির্ণয়ে সহায়ক মাত্র, এগুলো কোনো স্বাধীন নিয়ম নয়, অথবা এমন কোনো অকাট্য দলিল নয় যার ওপর কিতাব ও সুন্নাহর দলিলের ন্যায় নির্ভর করা যায়, কিংবা কার্যকরী কারণ (ইল্লাত), ইজমা এবং কিয়াস ইত্যাদির ন্যায় দালিলিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়।

২. মাসলাহাত (উপকার) ও মাফাসাদ (অপকার)-এর মধ্যকার বিরোধ মূলত বিধানসমূহের বিরোধের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং মাসলাহাত ও মাফাসাদের মানদণ্ড অনুযায়ী আমল করা মানেই হলো সমস্ত দলিলের ওপর আমল করা এবং এমন এক ইজতিহাদ যা শরয়ি মানদণ্ডে অধিক অগ্রগণ্য বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে সচেষ্ট থাকে।

৩. বিধানসমূহের মধ্যকার বিরোধ নিরসনের মানদণ্ডের সূক্ষ্মতা; এটি দুই কল্যাণের মধ্যে সর্বোত্তমটিকে প্রাধান্য দিতে এবং দুই

মন্দের মধ্যে ক্ষুদ্রতরটিকে প্রতিহত করতে বিভিন্ন মানদণ্ডের দাবি রাখে। এই মানদণ্ডের মাধ্যমেই ক্ষতিকর বিষয়গুলোর মধ্যে রাজেহ (প্রবল) ও মারজুহ (দুর্বল) নির্ণয় করা সম্ভব হয়। সর্বদা কেবল মাসলাহাতকে প্রাধান্য দেওয়া সঠিক নয়—যেখানে মানুষ কেবল মাসলাহাতের খাতিরে কোনো বিষয়কে গ্রহণ করবে যদিও তার সাথে অপকার যুক্ত থাকে; আবার সর্বদা অপকার দূর করাকেও অগ্রগণ্য করা ঠিক নয়—যেখানে মানুষ অপকার থেকে দূরে থাকার জন্য অনেক কল্যাণকেও ত্যাগ করবে। বরং এটি এমন এক মানদণ্ড যা দুটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেয়।

এটি দাবি করে যে, একজন আলেম একাধিক মূলনীতি প্রয়োগ করবেন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করবেন যা প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃতিকে বিবেচনা করবে। আর এসব মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হলো পূর্বে উল্লেখিত প্রাধান্য দানকারী বিষয়সমূহ (মুরাজ্জিহাত), যা প্রভাব ও শক্তির দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

এর মাধ্যমে সেই সমস্ত মানুষের কর্মপদ্ধতির ভুল স্পষ্ট হয়, যারা মাসলাহাত ও মাফাসাদ মিশ্রিত সকল বিষয়ে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে, যা হয় কেবল মাসলাহাত গ্রহণ অথবা কেবল মাফাসাদ (ক্ষতি) দূর করার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

এ কারণেই কোনো কোনো ফকীহ উল্লেখ করেছেন যে, অধিকতর কল্যাণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা কিংবা অধিকতর মন্দকে প্রতিহত করা কেবল সাধারণভাবে প্রযোজ্য, এটি প্রতিটি বিষয়ের জন্য ব্যাপক নয়। (১)

সুতরাং কল্যাণ বা অকল্যাণের মাঝে কোনটি অধিক অগ্রগণ্য তা নিরূপণ করা একটি সূক্ষ্ম বিষয়, যা প্রতিটি গবেষণার ক্ষেত্রে সহজসাধ্য নয়। কেননা, (সম্ভাবনার বিচারে দুটি ক্ষতির মাঝে যা বৃহত্তর, তা সুনিশ্চিত বিচারে যা ক্ষুদ্রতর তার সমান কিংবা কাছাকাছি হতে পারে। আর অকল্যাণ ও কল্যাণের পরিমাণ এবং তাদের সংখ্যার প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো পথ মানুষের নেই)। (২)

৪- যখন কল্যাণ বা অকল্যাণের মাঝে কোনটি অধিক অগ্রগণ্য তা জানা সহজসাধ্য হয় না, তখন আবশ্যক হলো নস (কুরআন-সুন্নাহর পাঠ) যে মূলনীতির ওপর প্রমাণ বহন করে তা আঁকড়ে ধরা: (আর যখন অকল্যাণ ও কল্যাণ পরস্পরের বিরোধী হয়, তখন তাদের মাঝে যা অধিক অগ্রগণ্য তা অগ্রাধিকার প্রদান করা ওয়াজিব। আর যখন সেগুলোর পরিমাণ সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান থাকে না, তখন আমরা নসের দিকে ফিরে যাই)। (৩)

অতএব, এই বাস্তব ঘটনায় নসকেই আঁকড়ে ধরতে হবে এবং নিছক কোনো অগ্রগণ্য কল্যাণ বা অকল্যাণের দাবির কারণে তা বর্জন করা যাবে না। বরং এই কল্যাণ কিংবা ওই অকল্যাণের অগ্রাধিকারের সপক্ষে অবশ্যই দলীলের প্রয়োজন।

৫- কল্যাণ ও অকল্যাণের বিরোধপূর্ণ অবস্থায় মুস্তাহাব ও পূর্ণতার স্তর হিসেবে 'ওয়ারা' (আল্লাহভীতি) ও পবিত্রতার পথ অবলম্বন করা সম্ভব হতে পারে। তবে সব মাসআলার ক্ষেত্রে এটি সম্ভব নয়। কেননা বিরোধের কিছু চিত্র ওয়াজিব ও হারামের মাঝে হয়ে থাকে, তাই অধিকতর অগ্রগণ্য বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য একটি মানদণ্ড থাকা আবশ্যক; আর এখানে সেটিই হলো 'ওয়ারা'। আর বর্জন করাই সর্বদা 'ওয়ারা' নয়।

---

(১) দেখুন: আল-ফাতাওয়াল আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুবরা, ইবনে হাজার আল-হাইতামী ৩/২৪।
(২) ইহকামুল আহকাম, ইবনে দাকীক আল-ঈদ ২/২৬৫।

(৩) শারহুল ইলমাম, ইবনে দাকীক আল-ঈদ ৪/৪৮৯।

পঞ্চম নীতি

উলায়াহ (কর্তৃত্ব) এর মাধ্যমে বাধ্য করার ক্ষমতা

সিয়াসাহ শারইয়্যাহ বা শরয়ি রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি মাধ্যমগুলোর একটি হলো উলায়াহর মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা। এর কারণ হলো, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর যার উলায়াহ (কর্তৃত্ব) রয়েছে, তার শরিয়ত থেকে প্রাপ্ত বাধ্য করার ক্ষমতা থাকে। বিধিবিধানের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, যা উক্ত উলায়াহর প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে শক্তিশালী হয়। তাই সিয়াসাহ শারইয়্যাহর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি হলো উলায়াহর ফিকহ এবং এর সীমারেখা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

উলায়াহ বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো: এটি এমন এক শারয়ি ক্ষমতা যা কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ভোগ করেন এবং এর মাধ্যমে অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সেই বিষয়ে বাধ্য করেন।(১)

ইসলামে উলায়াহ বা কর্তৃত্বসমূহ:

ইসলামি শরিয়তে উলায়াহসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা সম্ভব:

প্রথম প্রকার: সাধারণ উলায়াহ (উলায়াহ আম্মাহ), যা সাধারণ জনগণের বিষয়াবলি দেখাশোনার অন্তর্ভুক্ত; এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় প্রকার: বিশেষ উলায়াহ (উলায়াহ খাসসাহ), যা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট।

উলায়াহসমূহের লক্ষ্য:

উলায়াহর এই দুই প্রকার এবং এর অধীনে যা কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তার সবকিছুর লক্ষ্য হলো মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিশ্চিত করা।

---

(১) নাজারিইয়াতুল উলায়াহ, নাজিহ হাম্মাদ পৃষ্ঠা ৮; আহলুজ জিম্মাহ ওয়াল উলায়াতুল আম্মাহ ফিল ফিকহিল ইসলামি পৃষ্ঠা ২৭।

ইবনে তাইমিয়া বলেন: (রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতার আবশ্যকীয় উদ্দেশ্য হলো: মানুষের দ্বীন বা জীবনব্যবস্থার সংশোধন করা। যখন তা তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন তারা সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং দুনিয়াতে তারা যা ভোগ করেছে তা তাদের কোনো উপকারে আসে না; এবং তাদের দুনিয়াবী বিষয়াদিরও সংশোধন করা, যা ব্যতীত দ্বীন কায়েম থাকা সম্ভব নয়।)(১)

এবং তিনি আরও বলেন: (যদি ক্ষমতা ও সম্পদের উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করা, তবে তা দ্বীন ও দুনিয়ার সংশোধনের কারণ হবে। আর যদি ক্ষমতা দ্বীন থেকে এবং দ্বীন ক্ষমতা থেকে পৃথক হয়ে যায়, তবে মানুষের অবস্থা বিনষ্ট হবে।)(২)

প্রথম প্রকার: সাধারণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ:
এগুলো কয়েক প্রকার:

১ - ইমামত ও মহান নেতৃত্ব:
এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, যা থেকে অন্যান্য সকল দায়িত্ব উৎসারিত হয়। জনকল্যাণমূলক কার্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে ইমামের এখতিয়ার অত্যন্ত ব্যাপক। এই কারণে এই দায়িত্ব পালন করা শরয়ী রাজনীতির অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম।

এই পদের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে অর্জিত বিশাল জনকল্যাণের কারণে শরীয়ত সেই ন্যায়পরায়ণ ইমামের প্রশংসা করেছে, যিনি মানুষের অধিকার রক্ষা করেন এবং তাদের ওপর জুলুম প্রতিরোধ করেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন: (সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না: ন্যায়পরায়ণ ইমাম...)(৩)

এবং নবী (সা.) বলেছেন: (নিশ্চয়ই ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহর নিকট নূরের মিম্বরসমূহের ওপর থাকবেন, রহমান আয্যা ওয়া জাল্লা-র ডান দিকে, আর তাঁর উভয় হাতই ডান; যারা তাদের বিচারকার্যে, পরিবারে এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বে ন্যায়বিচার করে।)(৪)

---

(১) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৩৭; এবং দেখুন: আত-তুরুক আল-হুকমিয়্যাহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬২৩।
(২) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ১৯৬।
(৩) ইমাম বুখারি (৬৬০) ও মুসলিম (১০৩১) এটি বর্ণনা করেছেন।
(৪) ইমাম মুসলিম (১৮২৭) এটি বর্ণনা করেছেন।

এই ধরণের বর্ণনাগুলো দায়িত্বশীলদের—বিশেষত সর্বোচ্চ নেতৃত্বের অধিকারীদের—ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের জুলুমের ব্যাপারে সতর্ক করে। কেননা তাদের ন্যায়বিচারের সওয়াব অনেক বড় হয়, যেহেতু এতে বিশাল প্রভাব ও বড় ধরণের

জনকল্যাণ নিহিত থাকে। আর তাদের জুলুমের পরিণামও ভয়াবহ হয়, যেহেতু এতে ব্যাপক অনিষ্ট ও বিপর্যয় ঘটে (১)।

ইয ইবনে আবদুস সালাম বলেন:

(আর মুসলিমগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, শাসনকার্য পরিচালনা করা সর্বোত্তম ইবাদত ও আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। আর ন্যায়পরায়ণ শাসকগণ অন্যদের তুলনায় অধিক প্রতিদান ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী; কারণ তাদের হাতে প্রচুর পরিমাণ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাতিল অপসারিত হয়। তাদের কেউ একটি মাত্র কথা বলেন, যার দ্বারা তিনি এক লক্ষ বা তার চেয়ে কমবেশি জুলুম প্রতিহত করেন অথবা এক লক্ষ বা তার চেয়ে কমবেশি কল্যাণ বয়ে আনেন। কতই না সহজ কথা, অথচ তার সওয়াব কতই না বিশাল!

পক্ষান্তরে মন্দ শাসক এবং জালেম বিচারকরা মানুষের মধ্যে গুনাহের দিক থেকে সবচেয়ে বড় অপরাধী এবং আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ তাদের হাতে ব্যাপক অনিষ্ট সাধিত হয় এবং বড় বড় জনকল্যাণ বাধাগ্রস্ত হয়। তাদের কেউ এমন একটি কথা বলেন যার কারণে তিনি এক হাজার বা তার চেয়েও বেশি গুনাহে লিপ্ত হন—সেই কথার অনিষ্টের ব্যাপকতা অনুযায়ী এবং সেই কথার মাধ্যমে তিনি মুসলিমদের যে পরিমাণ কল্যাণ রুখে দেন সেই অনুযায়ী। এটি কতই না লোকসানজনক চুক্তি এবং ধ্বংসাত্মক ব্যবসা!) (২)।

তিনি আরও বলেন: (পরিশেষে, ইসলাম অনুসারীদের ঐকমত্য অনুযায়ী, ইমাম ও শাসকদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ, তারা সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক সওয়াবের অধিকারী) (৩)।

---

(১) ন্যায়পরায়ণ ইমামের ফযিলত এবং জুলুমের ব্যাপারে সতর্কীকরণ সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দেখুন: হাসানুস সুলুক আল-হাফিজ দাওলাতুল মুলুক, আল-মাওসিলি ৫৫-৬৬; ইজাহু তুরুকিল ইস্তিকামাহ, ইবনুল মুবাররাদ ৮৪-৮৬; রিসালাতু ফিল ইমামাতিল উজমা, মিয়ারা ১৩২-১৩৫; সিরাজুল মুলুক ১৫৯-১৮০; আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফি বায়ানিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ, আল-মুনাউয়ি ১০৯-১৪০; আশ-শিহাবুল লামিআহ ফিস সিয়াসাতিন নাফিয়াহ, ইবনু রিদওয়ান আল-মালিকি ৩৩-৪৩; আন-নাহজুল মাসলুক ফি সিয়াসাতিল মুলুক, আশ-শাইযারি ৯৫-৭৭।
(২) আল-কাওয়াইদুল কুবরা ১/১৯৮।
(৩) আল-কাওয়াইদুল কুবরা ১/১৯৯।

ইবনে তাইমিয়া বলেন:

(এটি অবশ্যই জানা উচিত যে, মানুষের বিষয়াবলি পরিচালনার দায়িত্ব (বিলায়াত) পালন করা দ্বীনের অন্যতম প্রধান আবশ্যিক কর্তব্য; বরং এটি ব্যতীত দ্বীন ও দুনিয়া কোনোটিই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা আদম সন্তানদের পারস্পরিক স্বার্থ বা কল্যাণ সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না)(১)।

উলামায়ে কেরাম এই ‘ইমামতে উজমা’ বা সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণকারীর জন্য বেশ কিছু শর্ত উল্লেখ করেছেন(২)। এই শর্তগুলোর মধ্যে প্রধান হলো: ইসলাম, সুস্থ মস্তিষ্ক (আকল), প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (বুলুগ), পুরুষ হওয়া এবং ন্যায়পরায়ণতা (আদালাত) ইত্যাদি(৩)।

এই শর্তাবলির ক্ষেত্রে সাধারণ অবস্থা (পছন্দের সুযোগ থাকাকালীন) এবং জরুরি অবস্থার (অপারগতা) মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক:

সাধারণ বা স্বাভাবিক অবস্থায় এই শর্তগুলো পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক; বরং কেবল নেতৃত্বের যোগ্য হওয়ার সর্বনিম্ন মানদণ্ড অর্জিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং এক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নিশ্চিত করা আবশ্যক। তবে এই আদর্শ অবস্থা সর্বদা বাস্তবায়িত হয় না এবং সকল যুগে ও স্থানে তা সহজলভ্যও নয়। এ কারণে যখন এটি সম্ভবপর হয় না, তখন বিষয়টি নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনার প্রয়োজন পড়ে; আর সেটি হলো:

নিরুপায় বা জরুরি অবস্থা; অর্থাৎ যখন মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ, পারস্পরিক লড়াই এবং তাদের রক্তপাত ও ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া ব্যতীত আদর্শ ব্যবস্থা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এমন পরিস্থিতিতে শরীয়াহর নির্দেশনা হলো এ জাতীয় বিষয়গুলো বিবেচনা করা এবং বৃহত্তর ক্ষতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে যখন সক্ষমতা থাকে না, তখন কিছু শর্তের অপূর্ণতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।

---

(১) আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৯১।
(২) দেখুন: আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল ৫/৩৫৯; রওদাতুত তালিবিন ৭/২৬২; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ৩/৩৮৮; তাহরীরুল আহকাম লি-ইবনি জামাআহ ১৬; মাআসিরুল ইনাফাহ লিল-কলকাশান্দি ২৩-২৬; রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার ২/২৮০; আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ লি-আবিল ইয়ালা ২০; ঈজাহু তুরুকিল ইস্তিকামাহ ৩৪-৩৬; আল-গিয়াসি ২৫৪-২৬৪; বাদায়িউস সুলুক লি-ইবনিল আজরাক ৭২, ১৮০; রওদাতুল কুদাত ওয়া ত্বরিকুন নাজাত ১/৬১-৬৬; রিসালাতুল ইমামাতিল উজমা লি-মুহাম্মাদ মিয়ারা ৯৬-৯৮; আল-আজউবাতুল হিসান ফিল খলিফাতি ওয়াস সুলতান লি-আবদিল কাদির আল-ফাসি ১৪৬-১৫০; তুহফাতুত তুরাক ফীমা ইয়াজিবু আন ইয়ামালা ফিল মুলক লিত-তুরতুশি ১১৫-১১৬; আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফী বায়ানিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ৮৯-৯২; আল-বিলায়াত লিল-ওয়ানশারিসি ১২৭-১২৮; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানি ১/১০৬; নিহায়াতুল মুহতাজ ৭/৪০৯-৪১০।
(৩) শর্তাবলির বিস্তারিত আলোচনা এবং এ সংক্রান্ত মতপার্থক্য ও সেগুলোর বিধানের জন্য দেখুন: আল-ইনতিখাবাত ওয়া আহকামুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী ২৮৬-৩০৪।

এই কল্যাণকর অর্থটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এমন অনেক সহীহ নববী বাণী বর্ণিত হয়েছে, যা শাসকের পক্ষ থেকে অন্যায়-অবিচার সংঘটিত হওয়ার কারণে বিদ্রোহ ও লড়াই করাকে নিষেধ করে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

আওফ বিন মালিক থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"তোমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে; যারা তোমাদের জন্য দুআ করে এবং তোমরাও তাদের জন্য দুআ করো। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে; যাদেরকে তোমরা অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়।"** জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তলোয়ারের মাধ্যমে তাদের মোকাবিলা করব না? তিনি বললেন: **"না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করবে। আর যখন তোমরা তোমাদের শাসকদের মধ্যে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখবে, তখন তার কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করো, কিন্তু আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেবে না।"** (১)

উম্মে সালামাহ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"অচিরেই এমন কিছু শাসক আসবে যাদের অনেক কাজ তোমরা চিনতে পারবে (ভালো হিসেবে) এবং অনেক কাজ তোমরা অপছন্দ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি (পাপকে) চিনতে পেরে তা থেকে দূরে থাকল সে দায়মুক্ত হলো, আর যে ব্যক্তি (অন্তর দিয়ে) ঘৃণা করল সে রক্ষা পেল; কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হলো এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো)।"** তারা বলল: আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি বললেন: **"না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।"** (২)

তবে ইসলামের শর্তটির এখানে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম রয়েছে, আর তা এই শর্তের গুরুত্ব ও প্রভাবের কারণে। একারণেই উবাদাহ বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদিসে এর ব্যতিক্রমটি আলোচিত হয়েছে; তিনি বলেন: **"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি**

ওয়াসাল্লাম আমাদের ডাকলেন এবং আমরা তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাদের নিকট থেকে যে বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল—আমরা যেন সক্রিয়তা ও অনাগ্রহে, কষ্টে ও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আমাদের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও শ্রবণ করি ও আনুগত্য করি; আর আমরা যেন নেতৃত্বের অধিকারীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত না হই—যতক্ষণ না তোমরা প্রকাশ্য কুফরি দেখতে পাও যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।” (৩)

কাজী আয়াজ বলেন: **“উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, কোনো কাফেরের জন্য নেতৃত্ব (ইমামত) সাব্যস্ত হয় না। আর যদি নেতৃত্বেরত অবস্থায় কারো মধ্যে কুফরির উদ্ভব ঘটে, তবে সে পদচ্যুত হবে।”** (৪)

(১) এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন (১৮৫৫)।
(২) এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন (১৮৫৪)।
(৩) এটি বুখারী (৭২০২) এবং মুসলিম (১৭০৯) বর্ণনা করেছেন।
(৪) সহীহ মুসলিমের ওপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা, ১২/২৩৮; এবং দেখুন: ফাতহুল বারী, ১৩/১২৩।

তবে এটি অন্যান্য ওয়াজিবের ন্যায় সামর্থ্য ও সক্ষমতার সাথে শর্তযুক্ত। ইবনে হাজার বলেন: “তারা এ থেকে কোনো কিছুকে ব্যতিক্রম করেননি, কেবল তখনই যদি সুলতানের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য কুফরি প্রকাশ পায়; সেক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে তার আনুগত্য করা বৈধ নয়, বরং যার সামর্থ্য আছে তার ওপর তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব।” (১)

আর মুসলমানগণ যদি তাতে সক্ষম না হন: “যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তবে তা হবে স্রেফ রাজনৈতিক অনুসরণ, কোনো বৈধ কর্তৃত্ব (বিলায়াত) নয়। তাদের ওপর এর আবশ্যকতা আসবে তাদের আনুগত্যের কারণে, শাসকের নির্দেশের কারণে নয়।” (২)

ফলে এই শাসক কেবল নামমাত্র শাসক হিসেবে অবশিষ্ট থাকেন। আর ইনসাফ ও জনস্বার্থের অনুকূলে থাকা বিধিবিধানগুলো কার্যকর হতে থাকে তার মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও মানুষের উপকারের কারণে, তার পক্ষ থেকে সেগুলো জারি হওয়ার কারণে নয়।

শাসকের দায়িত্বসমূহ:

আল-মাওয়ার্দি ‘আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া’ গ্রন্থে ইমাম বা শাসকের ওপর যা ওয়াজিব তা বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোকে দশটি মৌলিক দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন, যা হলো:

১. উম্মতের সালাফগণ যে সকল মূলনীতির ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, সেই অনুযায়ী দ্বীন সংরক্ষণ করা।
২. বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে বিচার-মীমাংসা করা এবং তাদের মধ্যকার বিবাদ নিরসন করা।
৩. রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং সংরক্ষিত বিষয়াদি (নারী ও সম্পদ) হিফাজত করা, যাতে মানুষ তাদের জীবনযাত্রায় নিরাপদ থাকতে পারে।
৪. দণ্ডবিধি (হুদুদ) কায়েম করা।
৫. সীমান্ত এলাকাগুলো সুরক্ষিত করা।
৬. দাওয়াত প্রদানের পরও যারা ইসলামের অবাধ্যতা করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।
৭. ফাই এবং সদকা সংগ্রহ করা।
৮. বাইতুল মাল থেকে ভাতা এবং প্রাপ্য অধিকারের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

---

(১) ফাতহুল বারী ১৩/৭।

(২) শারহুল মাহাল্লির ওপর কলিউবি-র হাশিয়া ২/৪৯৭।

---

৯. বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের দায়িত্ব প্রদান করা।

১০. ব্যক্তিগতভাবে বিষয়সমূহ তদারকি করা এবং প্রজাদের শাসনকার্য পরিচালনা করা (১)।

কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির অধিকারসমূহ:

প্রজাদের ওপর ইমামের কিছু অধিকার রয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হলো:

১. সৎকাজে আনুগত্য করা।
২. তাঁর জন্য দোয়া করা।
৩. সদুপদেশ প্রদান করা।
৪. সৎকাজে সহযোগিতা করা (২)।

ইমামতের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের পদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:

সমসাময়িক গবেষকগণ ইমামতের চুক্তির ভিত্তি নির্ণয়ের বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন, যেমন একে ওকালাত (প্রতিনিধিত্ব) বা ইজারা (চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ) এর ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা। তাঁরা ফকিহদের বক্তব্যে প্রতিষ্ঠিত 'কর্তৃত্ব হলো শরীয়তের প্রতিনিধিত্ব'—এই অভিব্যক্তির সমালোচনা করেছেন।

প্রকৃত সত্য হলো, এটি একটি অপ্রাসঙ্গিক পরিভাষাগত মতভেদ। কারণ ইমামতের চুক্তি মূলত একটি বিশেষ কর্তৃত্বের চুক্তি। একে নির্দিষ্ট ওকালাত চুক্তি বা নির্দিষ্ট ইজারা চুক্তির ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা সঠিক নয়, বরং এটি হলো এমন এক প্রতিনিধিত্ব...

---

(১) দেখুন: আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ৫১-৫২, আল-গিয়াসি ৩২৮ এবং ৩৩৬-৩৪৩, তাহরিরুল আহকাম ২১-২৩, রওজাতুল কুজাত ১/৬৮-৬৯, আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ৬৬-৭৩ এবং ১৫১-১৮৬, মুয়িদুন নিআম ওয়া মুবিদুন নিকাম (তাজ আল-সুবকি কৃত) ২১-২৪, নকদুত তালিব লি-জাগলিল মানাসিব (ইবনে তুলুন কৃত) ২৭-৩০। এই দশটি কর্তব্যের বর্ণনায় আলেমদের অনুসৃতি সম্পর্কে দেখুন: ইজাহু তুরুকিল ইস্তিকামাহ ৬৮-৭০, মাসায়িরুল ইনাফাহ ৩৫-৩৬, আশ-শুহুবুল লামিআহ ফিস সিয়াসাতিন নাফিআহ ২৫।

(২) ইমামের অধিকার সম্পর্কে দেখুন: ইজাহু তুরুকিল ইস্তিকামাহ ১৪০, মাসায়িরুল ইনাফাহ ৩৬, তাহরিরুল আহকাম ১৯-২১, আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফি বায়ানি আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ১৪১-১৫০, রওজাতুল কুজাত ১/৬৮-৬৯।

অথবা এটি বিশেষ ধরনের এক ইজারা (চুক্তি), যার বিধানসমূহ এই চুক্তির প্রকৃতি থেকেই গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এটিকে পরিচিত কোনো চুক্তির ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করার কোনো সার্থকতা নেই।

শরীয়তের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব (নিয়াবাত) বলার উদ্দেশ্য হলো ইমামের কর্তৃত্বাধীন শরয়ী ওয়াজিব বা দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে তাঁর দায়বদ্ধতা। শাসকের কর্মকাণ্ডে ‘মাসুমিয়াত’ বা অভ্রান্ততা আরোপ করা কিংবা ইউরোপীয় ইতিহাসের ধর্মতান্ত্রিক (থিওক্র্যাটিক) শাসনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই অভিব্যক্তিটি জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি (ওয়াকিল) হওয়া এবং তাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করাকেও অস্বীকার করে না। এ কারণেই কোনো কোনো ফকিহ উভয় অভিব্যক্তির সমন্বয় করেছেন। ইবনে তাইমিয়া বলেন: "নিশ্চয়ই সৃষ্টিজগত আল্লাহর বান্দা, আর শাসকবর্গ আল্লাহর বান্দাদের ওপর আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা নিজেদের জান-মালের ওপর জনগণের প্রতিনিধি, যেমন এক অংশীদার অন্য অংশীদারের স্থলাভিষিক্ত হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে অভিভাবকত্ব (বিলায়াহ) এবং প্রতিনিধিত্ব (ওয়াকালাহ) উভয় অর্থই বিদ্যমান।" (১)

ইমামের পদমর্যাদার নিচের কর্তৃত্ব বা পদসমূহ পূর্ববর্তী ফকিহগণের নিকট চার ভাগে বিভক্ত:

প্রথম বিভাগ: যাদের কর্তৃত্ব সাধারণ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সাধারণ বা ব্যাপক, তারা হলেন উজির বা মন্ত্রীগণ।

দ্বিতীয় বিভাগ: যাদের কর্তৃত্ব বিশেষ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সাধারণ বা ব্যাপক, তারা হলেন বিভিন্ন অঞ্চলের আমির বা গভর্নরগণ।

তৃতীয় বিভাগ: যাদের কর্তৃত্ব সাধারণ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে বিশেষ বা সীমিত, তারা হলেন প্রধান বিচারপতি, সেনাবাহিনীর প্রধান (নকীব), সীমান্ত রক্ষক এবং যাকাত আদায়কারী।

চতুর্থ বিভাগ: যাদের কর্তৃত্ব বিশেষ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে বিশেষ বা সীমিত, যেমন কোনো শহরের বিচারপতি (কাযি) কিংবা কোনো নির্দিষ্ট খরাজ (ভূমি কর) আদায়কারী। (২)

২ - উজিরের পদ (আল-উযারা):

এটি ফকিহগণের নিকট পরিচিত একটি কর্তৃত্ব, যা আব্বাসীয় শাসনামল থেকে প্রচলিত ছিল এবং এটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল:

---

(১) আল-সিয়াসাহ আল-শারইয়াহ, পৃষ্ঠা ২১।
(২) দেখুন: আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ, আল-মাওয়ারদী পৃষ্ঠা ৬; আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ, আবু ইয়া’লা পৃষ্ঠা ২৮।

ক্ষমতার্পণ ভিত্তিক উজিরতন্ত্র: এটি এমন এক উজিরতন্ত্র যেখানে ইমাম উজিরের ওপর নিজের মতামত ও ইজতিহাদ অনুযায়ী যাবতীয় বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে উজির এককভাবে বিষয়াদি সম্পাদন, বিচারিক অভিযোগ (মাযালিম) পর্যালোচনা, গভর্নর নিয়োগ এবং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। (১)

বাস্তবায়নকারী উজিরতন্ত্র: উজিরের ভূমিকা এখানে কেবল ইমাম ও প্রজাসাধারণের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে। তিনি ইমামের আদেশ পৌঁছে দেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করেন। ইমাম হয়তো তার মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন, তবে তিনি ইমামের কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন নন। (২)

সমসাময়িককালের মন্ত্রণালয়গুলো এই উজিরতন্ত্র থেকে ভিন্নতর। কারণ মন্ত্রণালয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলোর অনেক ক্ষমতা রয়েছে এবং এগুলো কেবল আদেশ ও নির্দেশনাবলী প্রচার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এতে বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে 'ক্ষমতার্পণ ভিত্তিক উজিরতন্ত্রের' ন্যায় অনেক ক্ষমতা বিদ্যমান, যদিও তা প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত সমসাময়িক মন্ত্রীগণ এককভাবে নিয়োগদান, যুদ্ধ এবং জুলুম-অবিচারের বিষয়াদি পরিচালনা করেন না, যেমনটি ইসলামী ইতিহাসের 'ক্ষমতার্পণ ভিত্তিক উজির'-এর ক্ষেত্রে ছিল।

৩- ইমারত: এটি ফকীহগণের নিকট দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: সাধারণ ইমারত। এটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত: যোগ্যতার ভিত্তিতে ইমামের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় চুক্তির মাধ্যমে আমিরের ওপর অর্পিত শাসনভার (বিলায়াতুল ইস্তিকফা)।

এবং বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিতে ইমামের সাথে চুক্তির মাধ্যমে অর্পিত ক্ষমতা (বিলায়াতুল ইস্তিলা)। এটি এমন যে, কেউ শক্তির জোরে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল দখল করে নেয়, অতঃপর ইমাম তাকে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন যাতে তার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হয়।

এই ইমারতের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। এর অন্তর্ভুক্ত হলো— বিচারক (কাজী) নিয়োগের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা, জাকাত সংগ্রহ করা, দণ্ডবিধি (হদ) কায়েম করা, জুমা ও জামাতের ইমামতি করা, হজ পরিচালনা করা, জিহাদ এবং অন্যান্য বিষয়াদি।

---

(১) দেখুন: আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আল-মাওয়ার্দী, পৃ. ৩৫-৩৮।
(২) দেখুন: আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আল-মাওয়ার্দী, পৃ. ৩৬; গিয়াছুল উমাম, পৃ. ৭২; তাহরীরুল আহকাম, পৃ. ২৪; মাআছিরুল ইনাফাহ, পৃ. ৪১; আয-যাখীরাহ, ১০/৩০।

দ্বিতীয় প্রকার: বিশেষ আমীরত্ব (ইমারত): এটি কেবল সেনাবাহিনী পরিচালনা, প্রজাদের শাসন এবং জনপদ রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে; এবং বিচারকার্য, আইনি বিধান (আহকাম), খাজনা ও সাদাকাত (দান-সদকা) সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। (১)

বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী আমীরত্ব (ইমারাতুল ইস্তিলা) সংক্রান্ত মতটি একটি ঐতিহাসিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। অধিকার রক্ষার স্বার্থে এ ধরনের মতের অবকাশ রাখা হয়েছে। অন্যথায় মূল মূলনীতি হলো, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কোনো

আমীরের পক্ষে ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) আনুগত্যের বাইরে যাওয়া বৈধ নয়।

আমীরত্বের এই শ্রেণিবিভাগ, প্রতিটি আমীরত্বের আওতাভুক্ত বিষয়াবলি এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত মন্ত্রিত্বের (ওজারাতে) প্রকারভেদসমূহ মূলত প্রচলিত প্রথাগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে শাসক জনকল্যাণ অনুযায়ী এই প্রশাসনিক ক্ষেত্রগুলো পরিচালনা করতে পারেন। অতএব, প্রশাসনিক পদসমূহ এবং প্রতিটি পদের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়গুলো কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্তনশীল বিষয়। সুতরাং বিচারিক ক্ষমতা বা হিসবাহ (তদারকি) কিংবা অন্যান্য পদের আওতাভুক্ত বিষয়গুলো প্রতিটি দেশের প্রথা ও নিয়মানুযায়ী পরিবর্তিত হয়। ফকিহগণের নিকট নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট বিশেষায়িত কার্যাবলিই যে হুবহু থাকতে হবে এমন কোনো আবশ্যকতা নেই। (২)

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন: (প্রশাসনিক পদগুলোর সাধারণ বা বিশেষ হওয়া এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই পদের মাধ্যমে যা লাভ করেন, তা মূলত শব্দাবলি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং প্রচলিত প্রথা থেকে গৃহীত হয়। শরিয়তে এর কোনো সুনির্দিষ্ট সীমা নেই। কখনও কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে বিচারিক ক্ষমতার আওতাভুক্ত বিষয় অন্য কোনো সময় ও স্থানে যুদ্ধ পরিচালনার আওতাভুক্ত হতে পারে, আবার এর বিপরীতও হতে পারে। একইভাবে হিসবাহ (তদারকি) ও অর্থ সংক্রান্ত পদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মূলত এই সকল প্রশাসনিক পদই ধর্মীয় পদমর্যাদা এবং শরয়ি দায়িত্ব। সুতরাং যে ব্যক্তি এই প্রশাসনিক দায়িত্বগুলোর কোনো একটিতে ন্যায়বিচার করবে এবং জ্ঞান ও ন্যায়ের সাথে তা পরিচালনা করবে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে পুণ্যবান ও ন্যায়পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও জুলুমের সাথে শাসন করবে, সে জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে)। (৩)

(১) দেখুন: আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ার্দি ৭২-৭৮; আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আবু ইয়ালা ৩৪-৩৮।
(২) দেখুন: আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ ১৯৩-১৯৪; আয-যাখিরা ১০/৫৮; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ২/৬২৬-৬২৭; তাবসিরাতুল হুক্কাম ১/১৮ ও ২/১৪৬।
(৩) আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ২/৬২৬-৬২৭।

প্রাথমিক যুগে খলিফা একজন মাত্র বিচারক নিয়োগ করতেন যাকে প্রধান বিচারপতি বলা হতো। তিনিই অন্যান্য সকল জনপদের বিচারকদের নিয়োগ দিতেন। পরবর্তীতে এই পদ্ধতি ত্যাগ করা হয় এবং প্রতিটি জনপদে একজন করে বিচারক নিয়োগের নিয়ম চালু হয় যাকে প্রধান বিচারপতি বলা হতো; তিনি তার অধীনস্থদের তদারকি করতেন। এরপর মাযহাবসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রতিটি জনপদে চার মাযহাবের প্রত্যেকটি থেকে একজন করে বিচারক নিয়োগ করার প্রথা শুরু হয় (১)।

ইতিহাসে বা বর্তমান যুগে মন্ত্রণালয় বা নেতৃত্বের রূপ যাই হোক না কেন, এটি একটি প্রথাগত পার্থক্য মাত্র যা কোনো তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলে না। বরং যা প্রভাব ফেলে তা হলো, বর্তমানের যেকোনো নাম বা পদ্ধতির রাষ্ট্রীয় পদসমূহকে সেগুলোর কাজের সাদৃশ্য অনুযায়ী ফকীহগণ কর্তৃক বর্ণিত পদসমূহের শর্তাবলীর আলোকে বিবেচনা করা। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের ইতিহাসে নির্বাহী নেতৃত্ব (বিলায়াতুত তানফীয) এমন একটি পদ ছিল যেখানে শাসক কোনো বিষয়ে স্বাধীন ছিলেন না, বরং তিনি কেবল নির্দেশ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতেন। ফলে ফকীহগণ এই পদের ক্ষেত্রে ইসলাম ও স্বাধীনতার মতো কিছু শর্তের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন (২); যেহেতু এই পদটি এককভাবে নেতৃত্বের অধিকারী ছিল না। পক্ষান্তরে যদি তার স্বাধীনতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকে, তবে এই শর্তগুলো বাদ যাবে না। আর এটি প্রতিটি পদের প্রকৃতি জানার মাধ্যমেই অনুধাবন করা সম্ভব।

এই কারণেই ফকীহগণ নেতৃত্ব ও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধানসমূহের জ্ঞান থাকাকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন; কারণ বিচারিক বিধানসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি নেতৃত্ব ও মন্ত্রণালয় মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালার দাবি না রাখে—যেমন সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব এবং দেশ রক্ষা—তবে সেক্ষেত্রে এই জ্ঞান (শরয়ী ইলম) থাকা শর্ত নয় (৩)।

সুতরাং ফকীহগণ নেতৃত্ব বা মন্ত্রণালয়ের বিষয়ে যে সকল শর্ত উল্লেখ করেছেন, তা তাদের সমকালীন প্রথা অনুযায়ী ঐ পদের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত। অতএব, যেসব কার্যাবলীর উদ্দেশ্যে শর্তগুলো আরোপ করা হয়েছিল যদি সেই কার্যাবলীর পরিবর্তন ঘটে, তবে তা ঐ শর্তটির আবশ্যকতা না থাকার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। আবার কখনো কোনো প্রভাব ফেলে না

যখন শর্তটি সেই পদের কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে না।

(১) দ্রষ্টব্য: ইজাহু তুরুকিল ইস্তিকামাহ ৭৬-৭৭; এবং দেখুন: আসরুল উরফ ফী বিলায়াতু ইকামাত সালাতিল জুমুআ: আল-মুহিতুল বুরহানী, ইবনে মাজাহ ২/৬৯।
(২) দ্রষ্টব্য: আদ-দাখীরা ১০/৩০, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ার্দী ৩৮।
(৩) দ্রষ্টব্য: আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ার্দী ৭৬, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আবু ইয়ালা ২৯-৩৭, গিয়াসুল উমাম ৭৪-৭৫, আদ-দাখীরা ১০/২৯-৩২, তাহরীরুল আহকাম ২৬-২৭, তাবসিরাতুল হুক্কাম ১/২১।

---

৪. বিচার ব্যবস্থা (আল-কাদা):

এটি একটি সুপরিচিত প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং এর অধীনে বেশ কিছু শাখা দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফকিহগণ এই দায়িত্বটির প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা এর বিধানাবলী, এই পদের অধিকারীদের শর্তাবলী এবং বিচারক ও বিচারপ্রার্থীর আদবসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। আলেমগণই মূলত এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন, এমনকি অনেক মানুষ ধারণা করতে শুরু করেছিল যে 'বিচার ব্যবস্থা'ই একমাত্র শরিয়াহসম্মত প্রশাসনিক দায়িত্ব। এটি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা একটি ভ্রান্ত ধারণা। ইবনে তাইমিয়্যাহ এই ভ্রান্তির স্বরূপ ও এর উৎস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

“যে কোনো কাজেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য অনুসৃত হলে তা শরিয়াহসম্মত দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হবে। আর যে কাজে এর বিপরীত করা হবে বা তাতে আবশ্যকীয় কর্তব্য বর্জন করা হবে, তা শরিয়াহসম্মত দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু যেহেতু বিচারকগণ জ্ঞান ও আলেম সমাজের অধিক নিকটবর্তী এবং শরিয়াহ সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন, তাই অনেক মানুষ মনে করতে শুরু করে যে, বিচার বিভাগ ছাড়া অন্য কোনো প্রশাসনিক দায়িত্বে শরিয়াহর বিধানের প্রয়োগ বা আবশ্যকতা নেই। তারা মনে করতে থাকে যে, শরিয়াহ মানেই কেবল বিচারক যা ফয়সালা করেন। অনেক সময় তারা এই শরিয়াহ থেকে পলায়ন করে—হয়ত সত্য বিচ্যুত হওয়ার কারণে অথবা কোনো কোনো বিচারকের পক্ষ থেকে ঘটা গাফিলতির কারণে। অথচ বিষয়টি মোটেও তেমন নয়; বরং শরিয়াহ হলো সেই কিতাব ও হিকমতের নাম যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন এবং যার বিধান মান্য করা সমস্ত সৃষ্টির ওপর আবশ্যক। সুতরাং প্রত্যেক প্রশাসনিক কর্মকর্তার দায়িত্ব হলো এই শরিয়াহর অনুসরণ করা। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিনিধি, গভর্নর ও মুহতাসিবগণ (তদারককারী) শরিয়াহর সাথে একমত হয়ে কাজ করেন, আবার অনেক সময় খোদ বিচারকগণই এর বিরুদ্ধাচরণ করেন—হয়ত অজ্ঞতাবশত, অথবা কোনো মন্দ উদ্দেশ্যে, কিংবা কোনো আলেমের অন্ধ অনুকরণের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে।”

৫. অভিযোগ প্রতিকার বিভাগ (উলায়াহ আল-মাজালিম):

এটি সাধারণ বিচার বিভাগের চেয়েও অধিক শক্তিশালী। বিবাদীদের হঠকারিতা দমন এবং জালিমদের প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এর এমন প্রভাব ও শক্তি রয়েছে যা সাধারণ বিচারকদের নেই। একারণেই এটি প্রজাদের ওপর শাসকদের জুলুম নিরসন এবং সম্পদ ও কর আদায়ের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের অবিচার দূরীকরণের জন্য বিশেষায়িত। এছাড়া প্রজাদের জীবিকা ও বেতন সংক্রান্ত অভিযোগ শ্রবণ এবং বিচারক বা হিসবাহ পরিদর্শকগণ যা কার্যকর করতে অক্ষম হন, তা বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও এর ওপর ন্যস্ত। ফলে এর কর্মপরিধি ও সক্ষমতা বিচার বিভাগের চেয়েও অনেক বিস্তৃত।

---

(১) বিচার বিভাগ থেকে উৎসারিত আরও বেশ কিছু শাখা দায়িত্ব রয়েছে, দেখুন: তাবসিরাতুল হুক্কাম ১/২০-২১।
(২) আস-সিয়াসা আশ-শারঈয়্যাহ ১৯২।
(৩) দেখুন: আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ, আল-মাওয়ারদী ১৫২-১৫৬; আরও দেখুন: আয-যাখিরা ১০/৩৯, তাবসিরাতুল

হুক্কাম ২/১৪৭, আল-উলায়াত, আল-ওয়ানশারিসি ১৬৯-১৭২।

সুতরাং সেই সময়ে ‘মাজালিম’ (অন্যায়ের বিচার) বিভাগ ছিল একটি প্রথাগত কর্তৃত্ব, যার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় জুলুমের বিষয়গুলো বিবেচনা করা। ফলে এমন একটি উচ্চতর বিচারিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ছিল, যা তাদের থেকে মানুষের অধিকার ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবে। এ কারণে এই কর্তৃত্ব দুটি দিক থেকে সাধারণ বিচার ব্যবস্থার চেয়েও ব্যাপক ছিল:

১. প্রভাব ও শক্তি: এটি এমন সব রায় কার্যকর করতে এবং বিষয়াদি বিবেচনা করতে পারত যা সাধারণ বিচারকদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ সেই বিষয়গুলো ছিল শক্তিশালী ক্ষমতাধরদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. সত্যে পৌঁছানোর জন্য বিচারিক পরিধি বৃদ্ধি: এতে বিবাদমান পক্ষগুলোকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং এমন সব প্রমাণ ও আলামত ব্যবহার করা হতো যা সাধারণ বিচারকরা করতেন না।

ইবনুল আরাবি এই কর্তৃত্বের প্রথাগত অবস্থার ব্যাখ্যা এবং এর সমালোচনা করে বলেন:

“(আর মাজালিম বা অন্যায়ের বিচার বিভাগ হলো একটি অদ্ভুত কর্তৃত্ব, যা পরবর্তীকালের শাসকরা শাসনব্যবস্থা ও মানুষের চারিত্রিক অবনতির কারণে উদ্ভাবন করেছে। এটি মূলত এমন প্রতিটি ফয়সালার অভিব্যক্তি যা প্রদানে সাধারণ বিচারক (কাজী) অক্ষম হন, ফলে এমন কেউ তা দেখেন যাঁর হাত তাঁর (বিচারকের) চেয়ে বেশি শক্তিশালী। এর কারণ হলো, যখন বিবাদ দুই দুর্বলের মধ্যে হয়, তখন কাজী তাদের একজনকে শক্তিশালী করেন। আর যখন বিবাদ একজন শক্তিশালী ও একজন দুর্বলের মধ্যে হয়, কিংবা দুই শক্তিধর ব্যক্তির মধ্যে হয় এবং তাদের একজনের শক্তি থাকে পদমর্যাদার কারণে—যেমন আমির বা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে কৃত জুলুম—তবে এটি এমন বিষয় যার জন্য খলিফারা নিজেরাই বসতেন। সর্বপ্রথম এতে বসেছিলেন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান, কিন্তু তিনি তা তাঁর কাজী ইবনে ইদ্রিসের কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর উমর ইবনে আবদুল আজিজ এতে বসেন এবং বনু উমাইয়ার পক্ষ থেকে কৃত অন্যায়গুলো মজলুমদের কাছে ফিরিয়ে দেন; কারণ তা ছিল সেই সব শাসক ও অবাধ্যদের হাতে যাদের বিচার করতে কাজীরা অক্ষম ছিলেন। এরপর এটি একটি রীতিতে পরিণত হয়, ফলে বনু আব্বাসীয়রা এর বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বসতে শুরু করেন। এক প্রাচীন বর্ণনায় এসেছে যে, এর মূল ভিত্তি বিচার বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু শাসকরা বিচারবিভাগীয় কাঠামোকে দুর্বল করে দিয়েছিল যাতে তারা প্রজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে এবং মানুষ তাদের মুখাপেক্ষী হয়। ফলে শাসকরা মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং জুলুমগুলো তার আপন অবস্থাতেই রয়ে যেত) (১)।”

এবং অন্যান্য পদমর্যাদা বা কর্তৃত্ব (২)।

---

(১) আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবি, ৪/৬১।
(২) আর সেগুলো হলো দশটি: মন্ত্রণালয় (উজিরের পদ), প্রশাসনিক নেতৃত্ব, বিচার বিভাগ, মাজালিম (অন্যায়ের বিচার), যুদ্ধের নেতৃত্ব, প্রতিনিধি বা গোত্রপ্রধানের পদ, নামাজ ও জুমার সালাত কায়েমের তদারকি, হজ পালনের নেতৃত্ব, জাকাত আদায় এবং হিসবাহ বা জনকল্যাণমূলক তদারকি।

দ্বিতীয় প্রকার: বিশেষ অভিভাবকত্ব

বিশেষ অভিভাবকত্ব বলতে এমন এক কর্তৃত্বকে বোঝানো হয়, যার মাধ্যমে অভিভাবক তার অধীনস্থ ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও আর্থিক বিষয়াবলি পরিচালনা করতে সক্ষম হন (১)।

বিশেষ অভিভাবকত্বের প্রকারভেদ:

বিশেষ অভিভাবকত্ব দুই প্রকারের হয়ে থাকে:

প্রথম: ব্যক্তির ওপর অভিভাবকত্ব; আর এটি হলো অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সত্তা ও তার নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি—যেমন বিবাহ দান, শিক্ষা প্রদান, চিকিৎসা এবং কর্মসংস্থানের ওপর অভিভাবকত্ব।

দ্বিতীয়: মালের ওপর অভিভাবকত্ব; আর এটি হলো তার আর্থিক বিষয়াবলি যেমন বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন, লেনদেন এবং ব্যয় নির্বাহের ওপর অভিভাবকত্ব (২)।

আর অভিভাবকত্ব মূলত তিনটি মৌলিক কারণে সাব্যস্ত হয়:
১. শৈশব (অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া)।
২. উন্মাদনা (পাগল হওয়া)।
৩. জড়বুদ্ধিতা (৩)।

প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহের মধ্যে আরও একটি হলো: নারীত্ব; তবে এটি একটি সীমিত ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা নারীত্বের সাথে বিবাহের অভিভাবকত্ব এবং বাবা-মায়ের কাছ থেকে পৃথক আবাসে থাকার বিষয়টি জড়িত (৪)।

দ্রষ্টব্য: মাআছিরুল ইনাহ ৪১-৪৩; এবং দেখুন: আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবি ৪/৬০-৬৩; আল-ওয়ালায়াত, ওয়ানশারিসি ১২৯-১৩৯।
(১) দ্রষ্টব্য: আল-মাদখালুল ফিকহিল আম, যারকা ২/৮৪৩; ওয়ালায়াতুত তাদীবিল খাসসাহ, ইবরাহীম আত-তাম ২৬।
(২) দ্রষ্টব্য: আল-মাদখালুল ফিকহিল আম ২/৮৪৫; নাযারিইয়াতুল ওয়ালায়াহ, নাযীহ হাম্মাদ ৫১-৫২।
(৩) দ্রষ্টব্য: আল-ওয়ালায়াতু আলান নাফস, মুহাম্মদ আবু যাহরা ১৫; নাযারিইয়াতুল ওয়ালায়াহ ৭০-৭১।
(৪) দ্রষ্টব্য: আল-ওয়ালায়াতু আলান নাফস, মুহাম্মদ আবু যাহরা ৪৪।

দ্বিতীয় বিষয়টি তার অভিভাবকের নিকট থেকে মেয়ের স্বাধীন থাকার বিধানের সাথে সম্পৃক্ত।(১)

অভিভাবকত্বের অন্যতম একটি ফলাফল হলো শিষ্টাচার শেখানোর বা শাসনের অধিকার (সালাহিয়্যাতুত তা’দিব)। অভিভাবকত্ব বিষয়টি অধিক ব্যাপক এবং এর পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সংশোধনের উদ্দেশ্যে শাসন করা, যা মূলত প্রতিপালনের (তরবিয়ত) একটি পদ্ধতি। আর তা হলো কোনো ব্যক্তির ওপর এমনভাবে তদারকি করা যা তার সংশোধন ও কল্যাণের জন্য সহায়ক।(২)

শাসন (তা’দিব) এবং শাস্তির (তা’যির) মধ্যে পার্থক্য হলো, শাসন বা শিষ্টাচার শেখানোর কাজটি অভিভাবক করে থাকেন। পক্ষান্তরে শাস্তি বা তা’যির প্রদান করেন ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) অথবা তাঁর প্রতিনিধি। তদুপরি, শাস্তি বিচারিক রায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, ফলে এর জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ শ্রবণ করা আবশ্যক, যা শাসনের (তা’দিব) ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না।(৩)

সুতরাং এই শরয়ি অভিভাবকত্ব এমন একজন ব্যক্তির হাতে কারও ব্যক্তিগত ও আর্থিক বিষয়াবলি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করার মাধ্যমে তার অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করে, যিনি তার হকসমূহ রক্ষা করবেন। আর এটি করা হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতায় (আহলিয়্যাত) ঘাটতি থাকার কারণে, যতক্ষণ না তার সেই যোগ্যতা পূর্ণতা লাভ করে।(৪)

---

(১) আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। মালিকি ও হাম্বলিদের মতে, তার জন্য অভিভাবক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা বৈধ নয়। এটি শাফেয়ি মাযহাবের একটি অভিমত যা কুমারী মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিধবাদের ক্ষেত্রে নয়। শাফেয়ি মাযহাবের (অন্যান্য) আলেমদের মতে, যদি কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে, তবে সে কুমারী হোক বা বিধবা, যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারবে। হানাফিদের মতও এর কাছাকাছি যদি তার ব্যাপারে কোনো আশঙ্কার ভয় না থাকে; তবে যদি সে অল্পবয়সী কুমারী হয় তবে তার জন্য এমনটি করার অধিকার নেই। দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক ৪/১৮৬; হাশিয়া ইবনে আবিদিন ৩/৫৬৮; আশ-শারহুল কাবীর ৩/২৯৩; হাশিয়া আল-আদাউয়ি ৫/২৯১; রওদাতুত তালিবিন ৯/১০২; নিহায়াতুল মুহ তাজ ৮/৩৬৩; আসলাল মাতালিব ৩/৪৪৯; আল-মুগনি ৮/২৩৯; আল-ইনসাফ ৯/৪৩২।

(২) দেখুন: বিলায়াতুত তা’দিব আল-খাসসা পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭; আরও দেখুন: পৃষ্ঠা ৭২। শাসনের পদ্ধতি ও এর সীমারেখা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন একই গ্রন্থের ৩২২-৪৫২ পৃষ্ঠা।

(৩) দেখুন: বিলায়াতুত তা’দিব আল-খাসসা পৃষ্ঠা ৬৯-৭০।

(৪) আহলিয়্যাত বা যোগ্যতার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে দেখুন: আল-মাদখালুল ফিকহিল আম্ম ২/৭৮৩-৭৮৫। যোগ্যতার বিভিন্ন স্তর ও এ সংক্রান্ত বিধানাবলি সম্পর্কে দেখুন: আহলিয়্যাতুল মারআহ ফিল ফিকহিল ইসলামি, লেখক: গাইদা আল-মাসরি ১/৪২-৫৭।

পঞ্চম অধ্যায়

সিয়াসাহ শারইইয়্যাহর প্রয়োগসমূহ

পৃষ্ঠা 294

""

পৃষ্ঠা 295

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐতিহ্যগত ফিকহী প্রয়োগসমূহ

ফিকহী ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং ফিকহী সংকলনসমূহ ‘সিয়াসাতে শারঈয়্যাহ’ (শরীয়াহ ভিত্তিক রাজনীতি) প্রয়োগের অসংখ্য নিদর্শনে ভরপুর, যেখানে খলিফাগণ বা ফকীহগণ শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে জনস্বার্থ অর্জনে ইজতিহাদ করেছেন। এগুলো সংখ্যায় অত্যন্ত বেশি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত যা গণনা করা সম্ভব নয়। এই কারণে আমরা এই প্রয়োগগুলোর মধ্য থেকে কিছু নির্বাচিত প্রয়োগ আলোচনা করব (১), যার মধ্যে রয়েছে:

- নারীদের মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান:

এ বিষয়ে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি দেখতেন নারীরা পরবর্তীতে কী সব নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছে, তবে তিনি অবশ্যই তাদের (মসজিদে যেতে) বাধা দিতেন যেমন বনী ইসরাঈলের নারীদের বাধা দেওয়া হয়েছিল।” (২)।

এর অর্থ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে যে বৈধতা ছিল, তা এমন এক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ছিল যেখানে কোনো ফিতনা ছিল না এবং ওয়াজিবসমূহ পালনে কোনো শিথিলতা ছিল না। সুতরাং যখন মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন এই অনিষ্ট রোধকল্পে বিধানটিও পরিবর্তিত হয়।

ইবনে বাত্তাল বলেন:
“আর এটি মূলনীতির ওপর তখনই প্রযোজ্য যখন তাদের বিষয়ে বা তাদের দ্বারা ফিতনার আশঙ্কা না থাকে; কারণ তৎকালীন যুগের মানুষের অধিকাংশের অবস্থা এমনই ছিল। আর আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদিসে এমন দলিল রয়েছে যে নারীদের বের হওয়া উচিত নয়...”

---

(১) এই প্রয়োগগুলোর কয়েকটি শাসকের কর্মপদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং এর মধ্যে কিছু বিষয় পারিবারিক সংশ্লিষ্ট। আমি সেগুলোকে এখানে ‘সিয়াসাতে শারঈয়্যাহ’ সংক্রান্ত প্রয়োগের অন্তর্ভুক্ত করেছি, কারণ সেগুলো জনস্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে বিদ্যমান প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গি এতেও বিদ্যমান, যেমনটি ইতিপূর্বে প্রভাবের বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো বিচারকদের কাজের সাথেও সংশ্লিষ্ট।

(২) এটি বুখারী (৮৬৯) ও মুসলিম (৪৪৫) বর্ণনা করেছেন।

...মসজিদসমূহে যখন মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আর তা এই কারণে যে, তখন ক্ষতির আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

ইবনে রজব বলেন:
(আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইঙ্গিত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু বিষয়ে অনুমতি দিতেন যেগুলোতে তাঁর যুগে কোনো বিশৃঙ্খলা ছিল না, পরবর্তীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এবং তাঁর পরে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং তিনি যদি তাঁর পরে যা ঘটেছে তা দেখতেন, তবে তিনি এই অনুমতি অব্যাহত রাখতেন না, বরং তা নিষেধ করতেন; কারণ তিনি তো কেবল সংশোধনের আদেশ দিতেন এবং বিশৃঙ্খলা থেকে নিষেধ করতেন)।

আর মহিলারা যা নতুনভাবে প্রবর্তন করেছিল, তা হলো সুন্দর পোশাক, সাজসজ্জা এবং সুগন্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের সীমালঙ্ঘন।

এই ইজতিহাদটি হলো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিজস্ব অভিমত ও ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত কোনো সুন্নাহ নয়। তিনি একে এমন একটি শর্তের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছেন যা বিদ্যমান ছিল না; তিনি নিজের একটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে বলেছিলেন যে, 'যদি তিনি দেখতেন তবে অবশ্যই নিষেধ করতেন'। এর উত্তরে বলা হয়: যেহেতু তিনি দেখেননি এবং নিষেধও করেননি, তাই বিধানটি অব্যাহত থাকবে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করেই আলেমদের মধ্যে (নারীদের মসজিদে) বের হওয়া এবং এর শর্তাবলি নিয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এই ইজতিহাদ থেকে দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ফকীহগণ দুই ধারায় বিভক্ত:

প্রথম ধারা: যারা এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেন যে, সময়ের পরিবর্তন এবং ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে এখানে বিধান পরিবর্তন হওয়া বৈধ। তারা মনে করেন যে, বিধানটি সেই অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যা (রাসূলের) যুগে ছিল...

---

(১) শারহ সহীহ আল-বুখারী, ইবনে বাত্তাল ২/৪৭১; এবং দেখুন: শারহ আন-নববী আলা সহীহ মুসলিম ৬/১৬৮।
(২) দেখুন: শারহ আন-নববী আলা সহীহ মুসলিম ৬/১৭৮।
(৩) ফাতহুল বারী, ইবনে রজব ৮/৪১।
(৪) দেখুন: ইকমালুল মু'লিম ২/৩৫৫, শারহ আন-নববী আলা সহীহ মুসলিম ৪/১৬৪।
(৫) ফাতহুল বারী ২/৩৪৯।
(৬) আল-তামহিদ-এ আলেমদের মতামত দেখুন: ইবনে আব্দুল বার ২৩/৪০১-৪০৪, ফাতহুল বারী, ইবনে রজব ৮/৪১-৪২।

...নবী ﷺ-এর সময়ে। অধিকাংশ ফকিহগণের কর্মপন্থা এটাই, যদিও এর বিধানের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। ফলে তাদের কেউ কেউ কিছু মহিলার ক্ষেত্রে অথবা কিছু স্থানের ক্ষেত্রে একে 'মাকরূহ' বা অপছন্দনীয় হওয়ার বিধানের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন, আবার কেউ কেউ সকল মহিলার জন্যই এটি নিষিদ্ধ করেছেন (১)।

দ্বিতীয় মত: যারা এর বাহ্যিক রূপ অনুযায়ী আমল করেন না, বরং তারা নবী ﷺ-এর যুগে এই কাজের বৈধতার মূলনীতির ওপর অটল থাকেন। স্ত্রীর পক্ষ থেকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বামীর জন্য তাকে বাধা দেওয়া মাকরূহ হবে, যতক্ষণ না ফিতনার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং তারা নিষেধাজ্ঞাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন এমন ব্যক্তির সাথে যার থেকে ফিতনার আশঙ্কা থাকে অথবা যার ওপর ফিতনার আশঙ্কা থাকে। আর এখানে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন বিধান পরিবর্তনের কারণ হবে না। এটিই হাম্বলি (২) এবং অন্যদের মাযহাব।

ইবনে কুদামা বলেন:
"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। আর আয়েশা (রা.)-এর কথাটি কেবল তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে, অন্যদের জন্য নয়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের জন্য বের হওয়া মাকরূহ" (৩)।

ইবনে হাজার বলেন:
"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জানতেন তারা পরবর্তীতে কী করবে, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নবীকে তাদেরকে বাধা দেওয়ার ওহি পাঠাননি। যদি তাদের নব উদ্ভাবিত বিষয়গুলো মসজিদ থেকে তাদের বাধা দেওয়াকে অপরিহার্য করত, তবে মসজিদের বাইরে অন্যান্য স্থান যেমন বাজার থেকে তাদের বাধা দেওয়া আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত হতো। তদুপরি, এই নতুনত্বের উদ্ভব হয়েছে কিছু মহিলার পক্ষ থেকে, সবার পক্ষ থেকে নয়। যদি নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি অবধারিত হয়ই, তবে যেন কেবল তাদের জন্যই হয় যারা তা উদ্ভাবন করেছে। আর উত্তম হলো এমন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা যাতে ফাসাদ বা অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে, অতঃপর তা বর্জন করা। কেননা নবী ﷺ সুগন্ধি ব্যবহার এবং সাজসজ্জা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে এবং রাতের বেলা বের হওয়ার সীমাবদ্ধতা আরোপ করার মাধ্যমে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন" (৪)।

---

(১) মালিকি মাযহাব মতে: যুবতী নারীদের ঈদ ও ইস্তিসকার নামাজের জন্য বের হতে বাধা দেওয়া হবে, তবে মসজিদের জন্য বাধা দেওয়া হবে না। শাফিঈ মাযহাব মতে: যুবতী নারী অথবা যাদের প্রতি কামনা জাগ্রত হয়, তাদের মসজিদে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ এবং স্বামীর জন্য তাকে এর সুযোগ দেওয়াও মাকরূহ। হানাফি মাযহাব মতে: তাদের সাধারণভাবে বাধা দেওয়া হবে। দেখুন: হাশিয়াহ ইবনে আবিদিন ২/২৩২, ফাতহুল কাদির—ইবনুল হুমাম ১/৩৬৫, আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ১/৪২১, আত-তাওদিহ ফি শারহি মুখতাসার ইবনুল হাজিব ১/৪৭৬, আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব ৪/১৯৮-১৯৯, আসনা আল-মাতালিব ১/২১০।
(২) দেখুন: আল-মুগনি ২/২৭৮-২৭৯, শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ১/২৬৭।
(৩) আল-মুগনি ২/২৭৯।
(৪) ফাতহুল বারি ২/৩৪৯; এছাড়া আয়িশা (রা.)-এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ না করার বিষয়ে ইবনে হাজমের বিস্তারিত আলোচনা দেখুন: আল-মুহাল্লা ২/১৭২-১৭৪ এবং ৩/১১৫-১১৬।

মানুষের পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাদের জন্য বিচারিক ফয়সালাও সে অনুপাতে পরিবর্তিত হয়।

এটি একটি সুপ্রসিদ্ধ উক্তি যা খলিফা রাশেদ উমর বিন আব্দুল আজিজ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এটি কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সাধারণ প্রয়োগ নয়, বরং রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি; যার ওপর বহুক্ষেত্রে নির্ভর করা হয়। উমর (রা.)-এর সাথে এই উক্তিটির প্রসিদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কোনো মুসনাদ (সূত্রবদ্ধ) বর্ণনায় এটি তাঁর থেকে বর্ণিত হিসেবে পাওয়া যায় না। এছাড়া উক্তিটি অন্য অনেকের প্রতিও এই কথাটি সম্বন্ধ করা হয়েছে।

শুরাইহ (রহ.) থেকে এই মর্মের অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। বুখতারি থেকে বর্ণিত যে, তিনি শুরাইহ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন: "বিচারকার্যে এই নতুনত্বের (নতুন বিধানের) কারণ কী?" তিনি বললেন: "মানুষ যখন নতুন নতুন বিষয়ের (অপরাধের) অবতারণা করে, তখন বিচারকার্যেও নতুনত্বের সৃষ্টি হয়।"

ইবনে সিরিন (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "সর্বপ্রথম কে সাক্ষ্যের দাবি তুলেছিল?" তারা বলল: "শুরাইহ"। তিনি বললেন: "তোমরা নতুন নতুন বিষয়ের সৃষ্টি করেছ, তাই সেও (বিচারের ক্ষেত্রে) নতুন পদ্ধতির সূচনা করেছে।"

---

(১) ফকীহগণের কিতাবসমূহে এই উক্তির উল্লেখ ও এর ওপর নির্ভরতা বহুল প্রচলিত। এটি উল্লেখ করেছেন এমন প্রাচীনতম উৎসগুলোর মধ্যে ইবনে আবি যায়িদ আল-কায়রাওয়ানি-র ‘আন-নাওয়াদির ওয়াজ যিয়াদাত’ (৮/২৩৭) অন্যতম, তিনি সাহনুন থেকে উদ্ধৃত করেছেন যেখানে উমরের দিকে এটি সম্বন্ধ করা হয়নি। ইবনে ফারহুন ‘তাবসিরাতুল হুক্কাম’ (২/১৫৩)-এ ইবনে ওয়াদদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সাহনুন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে আসিম আল-মুহতাসিব মানুষকে তালাকের কসম দিতেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি এটি কোথা থেকে পেয়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন: উমর বিন আব্দুল আজিজ থেকে বর্ণিত আছার থেকে: (মানুষের পাপাচার যে পরিমাণে হয়, তাদের জন্য বিচারিক ফয়সালাও সে পরিমাণে ঘটে)। তবে কাজী আয়াজ ‘তারতিবুল মাদারিক’ (৪/১২২)-এ এটি উল্লেখ করে উক্তিটিকে ইমাম মালিকের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন। এরপর আলেমগণ ধারাবাহিকভাবে এটি উল্লেখ করেছেন, দেখুন: আল-কায়রাওয়ানির ‘আর-রিসালা’ (১৩১-১৩২); আল-কানাজির ‘তাফসিরুল মুয়াত্ত্বা’ (২/৫০৪); ‘আল-মুন্তাকা শারহুল মুয়াত্ত্বা’ (৬/১৪০); ‘আল-মুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত’ (২/৩০৯)।

(২) দেখুন: ‘আন-নাওয়াদির ওয়াজ যিয়াদাত’ (৮/২০৩); ইবনে বাত্তালের ‘শারহু সহিহিল বুখারি’ (৮/২৩২); ‘আল-জামি লি আহকামিল কুরআন’ (১৬/১৮১); ‘আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ’ (২/৫৫৬)। এটি সম্ভব যে ইমাম মালিক এটি অন্যের থেকে বর্ণনা করতেন, এজন্যই ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলতেন: বলা হতো যে, মানুষের পাপাচার অনুপাতে বিচারিক ফয়সালা ঘটে থাকে। দেখুন: ‘আল-মুন্তাকা শারহুল মুয়াত্ত্বা’ (৬/৪৬)। আর আল-দারদির উল্লেখ করেছেন যে, উক্তিটি উমরের এবং ইমাম মালিক একে উত্তম বলেছেন, দেখুন: ‘আশ-শারহুল কাবীর’ (৪/১৭৪)। উক্তিটি রাবিআহ আর-রাঈ-এর প্রতিও সম্বন্ধ করা হয়েছে এই শব্দে: (মানুষের সৃষ্ট পরিস্থিতির অনুপাতে বিচারিক ফয়সালা ঘটে থাকে)। দেখুন: ইবনে ফারহুনের ‘তাবসিরাতুল হুক্কাম’ (২/২০৯)।

(৩) ইবনে সাদ এটি তার ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’ (৬/১৩৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(৪) ইবনে আবি শায়বা এটি তার ‘আল-মুসান্নাফ’ (৭/২৭১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

তবে যাই হোক, কথাটি সর্বাবস্থায় সঠিক হিসেবেই গণ্য থাকে এবং ফকীহগণের কিতাবসমূহে, বিশেষ করে মালিকী ফকীহগণের নিকট এর উল্লেখ ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ। ফকীহগণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট (মাসলাহাত) বেশ কিছু ইজতিহাদের ক্ষেত্রে এর ওপর ভিত্তি করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

১- সহনুন থেকে যা বর্ণিত হয়েছে যে: (তিনি বিবাদীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ করতেন না, তবে অসুস্থ ব্যক্তি, অথবা এমন নারী

যার সমপর্যায়ের নারীরা সচরাচর বাইরে বের হয় না, অথবা সফরে থাকা ব্যক্তি, অথবা যার সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য ওজর রয়েছে এমন ব্যক্তি ব্যতীত। আর তিনি বাদীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন: মানুষের জন্য তাদের উদ্ভাবিত নবতর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নতুন বিচারিক ফয়সালা বা বিধিবিধান তৈরি হয়) (১)।

যখন তাকে এই বিধানের নেপথ্যে থাকা জনস্বার্থ (মাসলাহাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন: (আমি এই নিয়মটি কেবল এই সব উদ্ধত ও শক্তিশালী লোকদের জন্যই প্রবর্তন করেছি, যাতে তারা মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়া থেকে দূরে থাকার সুযোগ না পায়। মানুষের পাপাচার ও অনৈতিকতা যে হারে বৃদ্ধি পাবে, তাদের জন্য বিচারিক ফয়সালাগুলোও সেই অনুপাতে প্রবর্তিত হবে। তবে নারী, অসুস্থ ব্যক্তি এবং মর্যাদাবান ব্যক্তি প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন) (২)।

২- যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ হস্তগত করে তা আটকে রাখে এবং সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে বলে দাবি করে, তাকে কারারুদ্ধ করা হবে এবং বারবার দোররা মারা হবে যতক্ষণ না সে তা পরিশোধ করে (৩)।

৩- অপরাধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে তা'যীর বা বিবেচনামূলক শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করার বৈধতা প্রসঙ্গে (৪)।

৪- তালাকের মাধ্যমে শপথ করানোর বৈধতা (৫)।

৫- দুই বিবাদীর মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন বা সংশ্লিষ্টতার (খুলতাহ) শর্ত ছাড়া শপথ করার নিয়ম নেই (৬)।

৬- সন্দেহের উদ্রেক হলে সাক্ষীকে শপথ করানো (৭)।

(১) আন-নাওয়াদির ওয়াজ-জিয়াদাত ৮/১৩১।
(২) আন-নাওয়াদির ওয়াজ-জিয়াদাত ৮/২৩৭।
(৩) দেখুন: আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত ২/৩০৭-৩০৮।
(৪) দেখুন: আদ-যাখিরা ১২/১২১-১২২; এবং দেখুন: আল-ফুরুক ৪/১৭৯।
(৫) দেখুন: তাবসিরাত আল-হুক্কাম ২/১৫৩; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল ৮/২৬৯।
(৬) দেখুন: আর-রিসালা, আল-কায়রাওয়ানি ১৩১; তাফসীরুল মুওয়াত্তা লীল-কানাযঈ ২/৫০০৩। এটি মালিকী মাযহাবের অভিমত, যা জমহুর বা সংখ্যাগুরু ফকীহগণের মতের পরিপন্থী।
(৭) দেখুন: তাবসিরাত আল-হুক্কাম ২/১৪৯; আশ-শারহুল কাবীর, আদ-দারদীর ৪/১৭৪; ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক ২/৩০৭।

পৃষ্ঠা 300

৭- জনস্বার্থের বিবেচনায় আলেমদের মতামতসমূহের মধ্য থেকে কঠোরতম মতটি গ্রহণ করা।(১)

৮- এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে মানুষের মাঝে পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও সম্মানের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথাগুলো বিবেচনা করা হয়, বিশেষ করে বড়দের ক্ষেত্রে—এমন সব প্রথা যা আগে পরিচিত ছিল না। এই বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কারাফি বলেন: (এই বিষয়টি হলো আমাদের যুগে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমনে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা, এবং যদি কারো মর্যাদা অত্যন্ত বেশি হয় তবে তার উদ্দেশ্যে মাথা কিছুটা নত করা, তাকে 'জামালুদ্দিন', 'নুরুদ্দিন', 'ইযযুদ্দিন' ইত্যাদি উপাধিতে সম্বোধন করা এবং নাম বা উপনাম (কুনিয়াত) পরিহার করে এই ধরনের গুণবাচক উপাধি ব্যবহার করা)।

তিনি এমন বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করার পর বললেন:

(আমি একদিন শাইখ ইযযুদ্দিন বিন আব্দুস সালামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন এবং দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠাবান এবং সাধারণ ও বিশেষ সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত। তিনি কিতাব ও সুন্নাহর ওপর অটল ছিলেন এবং রাজা-বাদশাহ বা অন্য কারো তোয়াক্কা করতেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে তিনি কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করতেন না। তাঁর কাছে একটি ফতোয়া পেশ করা হলো যাতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: দ্বীনের ইমামগণ—আল্লাহ তাঁদের তাওফিক দান করুন—বর্তমান যুগে মানুষের উদ্ভাবিত 'দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন' করার বিষয়ে কী বলেন? যদিও সালাফদের যুগে এর প্রচলন ছিল না, তবে এটি কি বৈধ হবে নাকি অবৈধ ও হারাম হবে?)

তিনি ফতোয়াটির উত্তরে লিখলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, হিংসা করো না, একে অপরের পেছনে কথা বলো না এবং সম্পর্ক ছিন্ন করো না। বরং হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও)। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন বর্জন করা পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া ও বিমুখতার দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং যদি কেউ এটিকে ওয়াজিব (আবশ্যক) বলে, তবে তা সত্য থেকে দূরে হবে না।

এটিই তাঁর লেখা মূল বক্তব্য, কোনো সংযোজন বা বিয়োজন ছাড়াই। তিনি তা লেখার পর আমি তা পাঠ করলাম এবং এমনই পেলাম। এটি মূলত উমর বিন আব্দুল আজিজের সেই বাণীর মর্মার্থ: "মানুষের জন্য তাদের উদ্ভাবিত পাপাচারের মাত্রা অনুযায়ী নতুন নতুন বিচারিক ফয়সালাও তৈরি হয়।"[২]

উপরোক্ত এই শাখা-প্রশাখাগুলো থেকে উক্ত বাণীর প্রয়োগের সীমা অনুধাবন করা যায়। এটি একটি জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদ যা অতীতে ছিল না এমন নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে। সুতরাং এর বাস্তবায়নে এমনভাবে ইজতিহাদ করা হবে যা...

(১) দেখুন: মাতালিউত তামাম ১৩৮; আশ-শাম্মা এই বক্তব্যটির সমালোচনা করেছেন, কারণ শরীয়তে এর কোনো মূল ভিত্তি নেই এবং এর কোনো প্রবক্তাও জানা নেই। এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, একে এই ধরনের কোনো সঠিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব।

(২) আল-ফুরুক ৪/২৫১।

শরীয়তের পরিপন্থী হওয়া; আল-কারাফি যেমন বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো—এমন সব কারণ সৃষ্টি করা যা ইতিপূর্বে সেই কারণগুলো বিদ্যমান না থাকার দরুন শরীয়তের বিধিবিধানের দাবি করেনি। এর অর্থ এই নয় যে এটি কোনো নতুন শরীয়ত। এখানেও বিষয়টি তদ্রূপ। এই নীতি অনুযায়ী এই অনুচ্ছেদটি প্রযোজ্য হবে, তবে শর্ত হলো এটি কোনো হারামকে বৈধ করবে না এবং কোনো ওয়াজিবকে বর্জন করবে না।

সুতরাং এই বক্তব্যটি পরিবর্তনশীল বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখে। যদি প্রথম যুগে বিশ্বস্ততা ও সচ্চরিত্রতা বিদ্যমান থাকার কারণে কিছু বিধান প্রয়োগ করার প্রয়োজন না হয়ে থাকে, তবে যখন এর বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন বাতিলের অনুসারীদের তাদের বাতিল কর্ম থেকে বিরত রাখতে সেই বিধান পরিবর্তিত হয়।

এটি বৈধ বিচারিক কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট, যা অবস্থাকে বিবেচনায় রাখে। ফলে এটি মজলুমের ওপর থেকে জুলুম প্রতিহত করে এবং বাতিলপন্থী বিবাদী যে সব কূটকৌশল ব্যবহার করে তার পথ বৈধ উপায়ে রুদ্ধ করে।

যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন এই মূলনীতিটি এমন এক জনস্বার্থের (মাসলাহা) সাথে সম্পৃক্ত যা শরীয়তের পরিপন্থী নয় এবং এমন এক ইজতিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট যা এর বিধানসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা না করে পাপাচার দমনে ইজতিহাদ করা হবে। (এমন নয় যে তাদের জন্য প্রবৃত্তিপ্রসূত নতুন কোনো বিচারিক বিধান উদ্ভাবন করা হবে যা কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত)।

ইবনে হাযম এই বক্তব্যটি অস্বীকার করেছেন এবং অস্বীকারের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করে বলেছেন: **"এটি দ্বীনহীন ব্যক্তিদের উদ্ভাবন। যদি উমর এটি বলতেন, তবে তিনি ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যেতেন। অথচ আল্লাহ তাআলা তাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন এবং মুক্ত রেখেছেন। কেননা কাফের ছাড়া আর কেউ দ্বীনের বিধান পরিবর্তন করা বৈধ মনে করে না।"**

তিনি এর সপক্ষে এই যুক্তি দিয়েছেন যে, (দ্বীনে) নতুন কিছু উদ্ভাবনের ধারণা কেবল তখনই সম্ভব যখন সালাত বা যাকাতের মতো কোনো ফরজ বিলোপ করা হয়, অথবা এই ফরজগুলোতে কোনো কিছু বৃদ্ধি করা হয়, কিংবা নতুন কোনো ফরজ প্রবর্তন করা হয় অথবা কোনো হালালকে হারাম করা হয়।

(১) আল-ফুরুক ৪/২৫১।
(২) দেখুন: আল-ইতিসাম ১/৪৭৭।
(৩) দেখুন: আর-রিসালার ওপর ইবনে নাজির ব্যাখ্যা ২/৩৫১, তুহফাতুল হুক্কামের ওপর মায়ারার ব্যাখ্যা ১/৯৬, মুয়াত্তার ওপর আজ-যুরকানির ব্যাখ্যা ১/৬৭৬।
(৪) মাসায়িল ইবনে রুশদ ১/৬৮২।
(৫) আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম ৬/১০৯।
(৬) দেখুন: আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম ৬/১১০।

সত্য কথা এই যে, বিষয়টি উক্ত উক্তিটি থেকে অনেক দূরে এবং যারা এটি অনুসরণ করাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, সেই ফকিহগণের কারো চিন্তায় এমনটি আসা সম্ভব নয়। কারণ এটি এমন এক বাধ্যবাধকতার সম্প্রসারণ মাত্র, যা থেকে ফকিহগণের দৃষ্টিভঙ্গি যে যোজন যোজন দূরে থাকে তা স্বতস্ফূর্তভাবেই জানা যায়। সুতরাং উদ্দিষ্ট নতুন কিছু উদ্ভাবন করা কোনো শরয়ী বিধানের বিরোধিতা করাকে বৈধ করে না; বরং এটি এমন একটি গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদী ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যা কোনো কোনো মানুষ শরীয়তবিরোধী মনে করতে পারে কারণ তা আগে বিদ্যমান ছিল না, অথচ এটি মূলত মাসলাহাতভিত্তিক এমন এক ইজতিহাদ যা শরীয়তের দলীলসমূহ ধারণ করার সক্ষমতা রাখে।

বস্তুত আমরা এই উক্তিটি বিবেচনার ক্ষেত্রে দুটি ভুল পদ্ধতির সম্মুখীন হই:
প্রথম পদ্ধতি: যারা এটিকে অস্বীকার করেন, কারণ এর ফলে হারামকে হালাল করা এবং ফরজসমূহ বিলুপ্ত করার আবশ্যকতা দেখা দেয়।
দ্বিতীয় পদ্ধতি: যারা শরীয়তবিরোধী মতামতকে বৈধতা দিতে এবং অগ্রহণযোগ্য মাসলাহাতসমূহ সাব্যস্ত করতে এর ওপর নির্ভর করে।

- কাবার অবকাঠামোয় হস্তক্ষেপ না করা:

বিখ্যাত ঘটনাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের পক্ষ থেকে কাবার অবকাঠামো পুনরায় ইব্রাহীম (আ.)-এর ভিত্তির ওপর নির্মাণের বিষয়ে ইমাম মালিকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা। এর কারণ হলো, প্রাক-ইসলামী জাহেলিয়াতের যুগে কাবা নির্মাণের সময় এর কিছু অংশ মূল ভিত থেকে বাদ রাখা হয়েছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা পুনরায় নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে এ ব্যাপারে তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছিলেন। তবে মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশঙ্কায় তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর যখন ইবনে যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসলেন, তিনি কাবাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবেই পুনরায় নির্মাণ করেন। এরপর আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তা ভেঙে ফেলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে কাবা যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন।

এরপর হারুনুর রশীদের যুগে: (হারুনুর রশীদ ইমাম মালিক ইবনে আনাসের নিকট উল্লেখ করেন যে, তিনি হাজ্জাজ কাবার যে অংশটুকু নির্মাণ করেছে তা ভেঙে ইবনে যুবায়েরের নির্মাণের অনুরূপ ফিরিয়ে নিতে চান। তখন তিনি তাকে বললেন: হে আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি এই ঘরকে রাজাদের খেলনার বস্তু বানাবেন না; তাদের যখনই কেউ চাইবে ঘরটি ভাঙবে এবং পুনরায় গড়বে, ফলে মানুষের অন্তর থেকে এর গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বিলীন হয়ে যাবে।)(১)।

(১) শারহু সহীহিল বুখারী, ইবনু বাত্তাল ৪/২৬৪; আত-তামহীদ, ইবনু আবদিল বার ১০/৪৯-৫০। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, ঘটনাটি আল-মাহদী ইবনুল মানসুরের সাথে ঘটেছিল, দেখুন: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১১/৬৯৩।

এটি একটি মহৎ শরয়ী নীতি, যার প্রতি এই ইমামকে পরিচালিত করা হয়েছে। এটি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি উত্তর, যাতে তিনি মানুষের দ্বীন সংরক্ষণ এবং আল্লাহর নিদর্শনের পবিত্রতা রক্ষায় জনস্বার্থের (মাসলাহাত আম্মাহ) দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তিনি কেবল নির্মাণ সংক্রান্ত বিধানের আংশিক গবেষণার দিকে তাকাননি। এর কারণ হলো, এই মাসআলার মূল ভিত্তি উভয় মতেরই অবকাশ রাখে। নির্মাণ কাজ ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো একে নবী করীম (সা.)-এর যুগের অবস্থার ওপর বহাল রাখা, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) বহাল রেখেছিলেন, এতে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তা পরিবর্তন করেননি। আর পুনঃনির্মাণ করা হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, পছন্দ করেছিলেন এবং যার অস্তিত্ব কামনা করেছিলেন তা বাস্তবায়ন করা। সুতরাং উভয় মতই কাছাকাছি। তাই ইমাম এই বিষয়ে তাঁর নিকট কোনটি অগ্রাধিকারযোগ্য বা সঠিক, সেই আংশিক বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করেননি; বরং তিনি এর চেয়েও সুদূরপ্রসারী বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, আর তা হলো কাবার পবিত্রতা রক্ষা করা এবং কাবার আকৃতি পরিবর্তনের এই ধারা অব্যাহত রাখার ফলে যে বিপর্যয়ের পথ উন্মুক্ত হতে পারত তা রুদ্ধ করা। এই বিষয়টি তাঁর কাছে এই মাসআলায় নিজের কাছে যা সঠিক মনে হয়েছে তার ওপর আমল করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল।

এ কারণেই মানুষ ইমাম মালিকের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত সমাদৃত মনে করেছে এবং এর ওপর মুসলিমদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (১)

- যার সাথে পালিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার জন্য সেই নারীকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করা:

মাগরেব (মরক্কো ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল) দেশগুলোতে সংঘটিত ঐতিহাসিক বিশেষ ঘটনাবলি (নাওয়াযিল)-এর মধ্যে একটি হলো—যখন কেউ কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিত এবং পরিবার থেকে প্রত্যাখ্যাত হতো, তখন সে একদল লোক জড়ো করে ওই নারীর ওপর চড়াও হতো এবং তাকে নিয়ে তার পরিবার থেকে পালিয়ে যেত, যতক্ষণ না তার অভিভাবক বাধ্য হয়ে তার সাথে বিয়ে দিত। (২)

মালিকি মাযহাবের নাওয়াযিল শাস্ত্রে এই মাসআলাটিকে 'আল-মুখাল্লিক ওয়াল হারিব' (প্ররোচনাকারী ও পলাতক) বলা হয়। 'মুখাল্লিক' হলো সেই ব্যক্তি যে কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, তাকে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ও অবাধ্যতায় উসকানি দেয় যাতে স্বামী তাকে তালাক দেয় এবং এরপর সে তাকে বিয়ে করতে পারে। হিজরি নবম শতাব্দী থেকে মরক্কোর ফাস নগরীতে এই ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী হারামের (বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার) বিধান কার্যকর রয়েছে। আর 'হারিব' (পলাতক) বিষয়টি এর চেয়েও ব্যাপক; কেননা সে প্ররোচনা দেওয়ার পর তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে, অথবা নারীটি বিবাহিত নাও হতে পারে। (৩)

---

(১) দেখুন: আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিসি মুসলিম ৩/৪৩৯, আল-ফাতাওয়া আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুবরা ১/১৩৭।
(২) দেখুন: আন-নাওয়াযিল, আল-আলামি ১/১০১।
(৩) দেখুন: আল-ফাতওয়া ওয়াল কদা বিমা জারা বিহি আল-আমাল ফি তুরাছিল মালিকিয়া ফিল মাগরিবিল আকসা, তাওফিক

আল-বাদরি ৩৪-৩৫; মাজাল্লাতু আফাকিত সাকাফা ওয়াত তুরাছ, সংখ্যা ১০১, ১৪৩৯ হিজরি।

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ (মাশহুর) মত অনুযায়ী, মুখাল্লিক (যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে) এবং হারিব (যে ব্যক্তি কোনো নারীকে নিয়ে পালিয়ে যায়)-এর ক্ষেত্রে বিবাহ হারাম হওয়া চিরস্থায়ী নয়। তবে ফাস-এর পরবর্তী যুগের একদল আলেম এতে চিরস্থায়ী হারামের ফতোয়া দিয়েছেন (১)।

যে মুখাল্লিক কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উসকে দেয়, তার বিষয়টি মালেকী ফকীহগণ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন (২)। তবে পরবর্তীতে হারিব বা পলায়নকারীর বিষয়ে অভিযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা জটিলতার সৃষ্টি করে। বেশ কিছু মালেকী ফকীহ এই বিবাহ হারাম হওয়া এবং এই নারী-পুরুষের মধ্যে চিরস্থায়ী হারামের ফতোয়া দিয়েছেন। মালেকী ফকীহ ইবনে আরদুন এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ উত্তর লিখেছেন, যেখানে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে: “আমাদের জন্য আবশ্যক হলো ফাসাদের (অকল্যাণ) মূল উপড়ে ফেলা এবং গুনাহের দিকে নিয়ে যায় এমন প্রতিটি পথ বন্ধ করা। অনিষ্টের পথ রুদ্ধ করা (সাদ্দুয যারায়ি) ইমাম মালেক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাযহাবের অন্যতম মূলনীতি। সুতরাং, পুরুষদের নারীদের নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো এই অশ্লীল কাজের পথ বন্ধ করতে আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করা উচিত। একারণেই এই ভূখণ্ডের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল আলেমগণ ফাসাদ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ বন্ধ করার নিমিত্তে পালিয়ে যাওয়া নারী ও পলায়নকারী পুরুষের মধ্যে চিরস্থায়ী হারামের ফতোয়াটি গ্রহণ করেছেন, যদিও তা প্রসিদ্ধ মতের পরিপন্থী” (৩)।

ইবনে আরদুন উল্লেখ করেছেন যে, তার এই ফতোয়া ইমাম মালেকের মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতের বিপরীত। তবে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যদি দলীলের ভিত্তিতে কোনো মতের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়, তবে অপ্রসিদ্ধ মতের ওপর আমল করা জায়েয। এরপর তিনি উল্লেখ করেন যে, এটি আহমাদ বিন মায়সার-এর বক্তব্য, যা ইবনে আরাফাহ এবং তার ছাত্র আবু আব্দুল্লাহ আল-উব্বী অনুসরণ করেছেন এবং ফাস শহরে এর ওপর আমল প্রচলিত ছিল। এটি আল-ওয়ানশারীসী ও অন্যদেরও ফতোয়া। তিনি তার পূর্ববর্তী ও সমসাময়িকদের এই ধরনের বেশ কিছু ফতোয়া উদ্ধৃত করেছেন।

তিনি এই হুকুমের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেছেন:

১. অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায় এমন মাধ্যমগুলো বন্ধ করা (সাদ্দুয যারায়ি) এবং কোনো ব্যক্তিকে তার অসৎ উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল প্রদান করা (যাতে সে তার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতে না পারে); আর এটি মালেকী মাযহাবের অন্যতম মূলনীতি।

(১) দেখুন: মিনাহুল জলীল ৩/২৬৪।
(২) দেখুন: আল-উব্বীর ইকমালু ইকমালিল মুয়াল্লিম ৯/২৬২, আজউইবাতুল হাওযালী ২৬৮ – ২৭০।
(৩) আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আল-ফকীহ আল-হাসান বিন আরদুনের ফতোয়া থেকে। দেখুন: আল-নাওয়াযিল, লিল ইলমী ১/৯১।

২. আর এটি সেই সিয়াসাহ শারইয়্যাহ-এর (শরীয়তসম্মত নীতি) অন্তর্ভুক্ত যা উমর ইবন আব্দুল আযীয-এর এই উক্তির আওতাভুক্ত: "মানুষ যে পরিমাণ পাপাচার উদ্ভাবন করবে, তাদের জন্য সেই পরিমাণ বিচারিক বিধান প্রবর্তন করা হবে।" (১)

এই ফতোয়ার স্বপক্ষে দলীল হিসেবে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত সেই শাস্তির বিধানটি পেশ করা যেতে পারে, যা তিনি ইদ্দত পালনরত কোনো নারীকে বিবাহকারীর ক্ষেত্রে প্রদান করেছিলেন। আর তা হলো—যদি সে তার সাথে সহবাস করে ফেলে, তবে তারা আর কখনোই একত্রে মিলিত হতে পারবে না (২); কারণ এটি মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য এক প্রকার শাস্তি। অতএব, "ইদ্দত চলাকালীন বিবাহকারী ব্যক্তির জন্য সেই নারীকে বিবাহ করা চিরতরে হারাম করে দেওয়া হয়েছে; যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে তাদের কৃত মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা যায়, আর তা হলো ইদ্দতকালীন বিবাহ করা।" (৩)

কতিপয় ফকীহ এর বাহ্যিক অর্থের ওপর ভিত্তি করে এমন ব্যক্তির জন্য ইদ্দতকালীন বিবাহিত নারীকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছেন। (৪) যদিও এখানে প্রেক্ষাপট ভিন্ন হতে পারে, তবুও উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন জনস্বার্থ (মাসলাহাহ) বিদ্যমান, আর তা হলো ফাসাদ বা অকল্যাণের পথ রুদ্ধ করার (সাদ্দুজ যারাই) লক্ষ্যে বিবাহকে চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা।

আপনি যেমনটি দেখছেন, মালিকীগণ ইদ্দত পালনরত নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে 'সাদ্দুজ যারাই' নীতিটি প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু 'মুখাল্লাক' ও 'হারিব'-এর (পলায়নকারী) ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেননি। সম্ভবত এর কারণ হলো, নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে এই চিরস্থায়ী হারামের বিষয়টি উমর (রা.)-এর কথা ও কাজের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়েছে। (৫)

---

(১) দেখুন: আন-নাওয়াযিল, আল-আলামী ১/৯১-১০৭; এবং ইবন আরদুন-এর মাঝে যারা তাদের ওপর নির্ভর করেছেন তাদের দেখুন: ঈজাহুল মাসালিক, আল-ওয়ানশারীসী ১/৩২০।
(২) মালিক এটি আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থে ৩/৭৬৮-এ বর্ণনা করেছেন।
(৩) জামিউল মাসাইল ১/৩২১; এবং দেখুন: আল-কাবাস ফী শারহি মুওয়াত্তা মালিক ইবন আনাস ৩/৬৬।
(৪) হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফকীহগণ এই মত পোষণ করেছেন যে, তাদের মধ্যে বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে হারাম হবে না। আর মালিকীগণ তাদের মধ্যে বিবাহ চিরতরে হারাম হওয়ার দিকে গিয়েছেন, এটি ইমাম শাফেয়ীর একটি পুরাতন মত এবং হাম্বলী মাযহাবের একটি বর্ণনা। দেখুন: আত-তাজরীদ, আল-কুদূরী ১০/৫৩২৭; আল-ইসতিযকার ৫/৪৭৩; আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী ২/১২; আল-মুহাযযাব, আশ-শীরাযী ৩/১৩৩; বাহরুল মাযহাব ১১/৩৫৩; আল-মুগনী ৮/১২৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ৩/২০১।
(৫) ইবনুল আরাবী বলেন: (জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন: এটি চিরস্থায়ী হয় না; আর মালিক (রা.)-এর কথাটি অধিক সুদৃঢ় এবং সঠিক পথের অধিক নিকটবর্তী। কারণ তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর ফয়সালার অনুসারী হয়েছেন। আর উমর (রা.)-এর ফয়সালা দলীল দ্বারা সমর্থিত। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো কাজ সময়ের আগে করার জন্য গুনাহের পথ বেছে নেয়, তাকে তা থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়। যেমন উত্তরাধিকারী যখন তার মুওয়াররিসকে (যার থেকে সম্পদ পাবে) হত্যা করে। আর এটি এমন একটি সুস্পষ্ট বিষয় যাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই)। আল-কাবাস ৩/৬৬।

পৃষ্ঠা 306

স্বামীর সাথে স্ত্রীর ভ্রমণে অস্বীকৃতি:

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে ভ্রমণ করতে চান, তবে স্ত্রীর কি তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার আছে?
ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি হলো, স্বামী যেখানে বসবাস করেন স্ত্রীর জন্য সেখানে তার সাথে বসবাস করা আবশ্যক। অতএব, স্বামী যদি তাকে সাথে নিয়ে ভ্রমণ করতে চান, তবে তা করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক। অধিকাংশ আলেমদের মতে, স্ত্রীর এটি বর্জন করা নিষিদ্ধ 'নুশুয' (অবাধ্যতা) হিসেবে গণ্য হবে (১)।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, স্বামী যদি স্ত্রীকে তার মোহরানা পরিশোধ করে দেয়, তবে স্ত্রীর জন্য তা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই। আর যদি মোহরানা পরিশোধ না করে থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে বাসর সজ্জার পূর্বে তার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে, তবে বাসর সজ্জার পরে নয়। আর সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ)-এর মতে, স্ত্রীর এই অধিকার একেবারেই নেই (২)।

তবে কোনো কোনো হানাফী ফকীহ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, এটি স্ত্রীর জন্য আবশ্যক নয়। এর কারণ হলো যুগের পরিবর্তন ও বিপর্যয় এবং বাপের বাড়ি থেকে দূরে চলে গেলে স্ত্রীর ওপর জুলুম হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাওয়া:

(আবু কাসেম আস-সাফফার বলেছেন: এটি তাদের যুগের কথা ছিল। কিন্তু আমাদের যুগে স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে ভ্রমণ করার অধিকার রাখে না, যদিও সে মোহরানা পূর্ণ পরিশোধ করে দেয়। কেননা তাদের যুগে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা ছিল নেককার ও সৎ, কিন্তু আমাদের যুগের মানুষ কলুষিত হয়ে গেছে। স্ত্রী যতক্ষণ তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ স্বামী তার ওপর জুলুম করতে পারে না। কিন্তু যখন সে তাকে অন্য শহরে নিয়ে যায়, তখন সে তার ওপর জুলুম করে এবং স্ত্রী তখন কারো কাছে সাহায্যও প্রার্থনা করতে পারে না) (৩)।

সুতরাং এটি একটি জনকল্যাণমূলক (মাসলাহী) ইজতিহাদ, যা নারীর অধিকার রক্ষা এবং তার থেকে জুলুম দূর করার বিষয়টিকে বিবেচনা করে। মূল বিধান হলো স্ত্রী তার স্বামীর বসবাসের স্থানে স্বামীর আনুগত্য করতে বাধ্য। কিন্তু যুগের পরিবর্তন, ফিতনা-ফ্যাসাদের আধিক্য এবং নারীর ওপর জুলুম হওয়ার পথ সুগম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, যদি এই ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তবে একে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। এটি 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' (শরয়ি রাজনীতি) এর অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ। আর এই ইজতিহাদকে গ্রহণযোগ্য বলার অর্থ এই নয় যে, একেই চূড়ান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে বা অন্য মতের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে; বরং ইজতিহাদের এই পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য মতপার্থক্যের অবকাশ রাখে।

---

(১) দেখুন: আল-মুগনী ৮/২৩৬।
(২) দেখুন: আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া ১/৫৪৫, আল-মুহিত আল-বুরহানী ৩/৫২৬।
(৩) শারহ আদাব আল-কাদী, আস-সাদর আল-শাহীদের রচিত ৪/১৫১-১৫২, এবং আরও দেখুন: আল-ফাতাওয়া আল-ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ ১/৩৩৩, আদাব আল-কাদা, আস-সুরুজী রচিত ২২৪।

পৃষ্ঠা 307

- অবশিষ্টাংশ সংরক্ষণের জন্য এতিমের মালের কিছু অংশ প্রদান করা:

এটি এমন ক্ষেত্রে হয় যখন এতিমের অভিভাবক (ওসি) এতিমের কিছু মাল কোনো জালিমকে প্রদান করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প খুঁজে পান না—যে জালিম উক্ত মাল দাবি করেছে—যাতে এতিমের অবশিষ্ট মাল রক্ষা পায়। যদি এ পদ্ধতি ছাড়া নিষ্কৃতি পাওয়ার অন্য কোনো পথ না থাকে, তবে অভিভাবকের জন্য এমনটি করা বৈধ। এটি নির্ভরযোগ্য ইজতিহাদের (গবেষণার) অন্তর্ভুক্ত; কারণ তিনি অবশিষ্টাংশ রক্ষার স্বার্থে মালের কিছু অংশ ব্যয় করছেন। সুতরাং এটি একটি সংশোধনমূলক কাজ, কোনো অনিষ্ট নয়। আর আল্লাহ অনিষ্টকারী ও সংশোধনকারীর মধ্যে পার্থক্য অবগত আছেন।

আস-সদর আশ-শহীদ বলেন:
(এর দৃষ্টান্ত হলো: শাসক যখন এতিমের মালের প্রতি লোভ করে, আর অভিভাবক সেই জুলুম প্রতিহত করার জন্য এতিমের মালের কিছু অংশ দিয়ে শাসকের সাথে সমঝোতা করেন, তবে বিষয়টি এভাবে দেখতে হবে: যদি কিছু প্রদান না করেই জুলুম প্রতিহত করা সম্ভব হতো, তবে অভিভাবকের জন্য কোনো কিছু দেওয়া বৈধ নয়; আর যদি তিনি দেন, তবে এর ক্ষতিপূরণ তাকেই বহন করতে হবে। কিন্তু যদি এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব না হয়, তবে এটি বৈধ এবং আমরা যা বলেছি তার ভিত্তিতে তিনি এর জন্য দায়ী হবেন না)।(১)

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন:
(পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সাহায্যকারী সেই ব্যক্তি যে জালিমকে তার জুলুমে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মজলুমকে তার ওপর থেকে জুলুম লাঘব করতে অথবা পাওনা পরিশোধে সাহায্য করে, সে জালিমের প্রতিনিধি নয় বরং মজলুমের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে; তার মর্যাদা অনেকটা সেই ব্যক্তির মতো যে মজলুমকে ঋণ দেয়, অথবা যে মজলুমের মাল বহন করে জালিমের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। এর উদাহরণ হলো এতিম ও ওয়াকফ সম্পত্তির অভিভাবক; যখন কোনো জালিম তার কাছে মাল দাবি করে এবং তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পর দাবি করা মালের চেয়ে কম পরিমাণ প্রদান করে সেই জালিম বা অন্য কারো থেকে জুলুম প্রতিহত করার চেষ্টা করেন, তবে তিনি একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি। আর সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের পথ নেই)।(২)

কুরআনে বর্ণিত খিজির আলাইহিস সালামের কাহিনী এবং মিসকিনদের নৌকা ছিদ্র করার ঘটনা থেকে এর স্বপক্ষে দলিল পেশ করা সম্ভব।(৩)

---

(১) শরহু আদাবিল কাজী ৩/৩৯৩; আরও দেখুন একই বিষয়ে: সিনওয়ানুল কাদা ওয়া উনওয়ানুল ইফতা ৪/২৩৬-২৩৮, আদাবুল কাদা, আস-সারুজী ৫০৩।
(২) আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ৬৭।
(৩) দেখুন: সিনওয়ানুল কাদা ওয়া উনওয়ানুল ইফতা ৪/২৩৭, মুগনিল মুহতাজ ৩/১৫২।

এর ওপর ভিত্তি করে তার জন্য এতিমের কিছু সম্পদ নষ্ট করা বৈধ যদি তাতে তার অবশিষ্ট সম্পদ রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমনটি জানা যায় যে, যদি সে নৌকাটি ছিদ্র করে দেয় তবে জবরদখলকারী তাতে বিমুখ হবে। (১)

অনুরূপভাবে তার জন্য তা প্রদান করাও বৈধ হবে যদি তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় অথবা এমন কিছুর হুমকি দেওয়া হয় যাতে তার কোনো অঙ্গহানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটি ওসীর (অভিভাবকের) জন্য এতিমের সম্পদ ব্যয় করার একটি গ্রহণযোগ্য ওজর হিসেবে গণ্য হবে এবং সে এর জন্য দায়বদ্ধ হবে না। তবে যদি তাকে প্রহার বা কারাবরণের হুমকি দেওয়া হয়, তবে এই জবরদস্তি (সম্পদ প্রদানের জন্য) যথেষ্ট হবে না। (২) তবে এটি একটি ভিন্ন মাসআলা, কারণ এটি ওসীর আমানতদারী এবং

অবহেলার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এটি অপ্রাপ্তবয়স্কের সম্পদ সংরক্ষণের নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

আর এখানে পর্যালোচনার বিষয়টি এমন নয় যে, শাসক বা অন্য কেউ এসে এতিমের সম্পদ জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নিল; এমতাবস্থায় সে অপারগ হিসেবে গণ্য হবে, এর বিধানও স্পষ্ট এবং তার ওপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। বরং এখানে পর্যালোচনার বিষয় হলো ওসী নিজেই এতিমের সম্পদ প্রদান করবে এই ভয়ে যে তার সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এবং যাতে এটি তার সমস্ত সম্পদ কেড়ে নেওয়ার মাধ্যম না হয়। ফলে সে এর মাধ্যমে সম্পদের কিছু অংশ দ্বারা অবশিষ্টাংশ রক্ষা করে। (৩)

আর এটি এতিমের জন্য যা অধিকতর কল্যাণকর তা বিবেচনা করার পর্যায়ভুক্ত। এজন্যই তার পক্ষ থেকে আপস-নিষ্পত্তি করা বৈধ যখন সে দাবিদার অথবা বিবাদী হয়; অর্থাৎ কিছু সম্পদ পরিশোধ করে দেওয়া যদি এই আশঙ্কা থাকে যে তার ওপর পুরো সম্পদটির দাবি সাব্যস্ত হয়ে যাবে, অথবা কিছু সম্পদ ত্যাগ করা যদি এই আশঙ্কা থাকে যে পুরো সম্পদটিই হাতছাড়া হয়ে যাবে। (৪)

আর এই বিষয়টি কেবল সম্পদের ওপর অন্যায্য আক্রমণের আশঙ্কার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সম্পদ বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত: (তুমি কি দেখ না যে, এতিমের সম্পদ কোনো স্থানে থাকলে এবং তা বিনষ্ট হওয়ার ভয় থাকলে তার সুরক্ষার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লোক নিয়োগ করা হয়, যদিও তাতে সম্পদের বড় একটি অংশ ব্যয় হয়ে যায়)। (৫)

(১) দেখুন: আল-কাওয়ায়েদ আল-কুবরা ২/১০৮।
(২) দেখুন: সিনওয়ান আল-কাদা ওয়া উনওয়ান আল-ইফতা ৪/২৩৭-২৩৮, আদাবুল কাদা, সুরূজী ১৫২।
(৩) দেখুন: সিনওয়ান আল-কাদা ওয়া উনওয়ান আল-ইফতা ৪/২৩৮, আদাবুল কাদা, সুরূজী ১৫২।
(৪) দেখুন: তাবসিরাত আল-হুক্কাম ২/৫০।
(৫) মুখতাসার আল-মুযানী ১/৮০৮।

- শরীয়াহ নির্ধারিত দণ্ডবিধি কার্যকর করতে অক্ষমতার ক্ষেত্রে আর্থিক দণ্ডসমূহ:

ফিকহী মাসআলাসমূহের মধ্যে সুপরিচিত একটি বিষয় হলো আর্থিক তা'যীর বা অর্থদণ্ডের বিধান, যে বিষয়ে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ বিদ্যমান। তাদের অধিকাংশ (জুমহুর) এটি নিষিদ্ধ হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন, আবার কেউ কেউ একে বৈধ বলেছেন (১)। যারা এটি নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, তারা আর্থিক দণ্ড সম্পর্কিত দলীলসমূহের উত্তরে বলেছেন যে, সেগুলো রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে (২)।

মালিকী মাযহাবের ফিকহী ইতিহাসে এই মাসআলাটি নিয়ে মালিকী ফকীহ আল-বারযালী (মৃত্যু: ৮৪১ হিজরী), যিনি অর্থদণ্ড বৈধ মনে করতেন, এবং তিউনিসিয়ার দুইজন মালিকী ফকীহ—আবুল কাসিম আল-যুগবী (মৃত্যু: ৮৩৩ হিজরী) ও আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মারযূক (মৃত্যু: ৮২৪ হিজরী)—এর মধ্যে হাফসী সুলতান আবু ফারিস আব্দুল আযীযের উপস্থিতিতে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে আল-বারযালী এর উপর একটি দীর্ঘ জওয়াব লিপিবদ্ধ করেন (৩)।

আল-বারযালীর এই ফতোয়াটি তার সমসাময়িকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তার যুগের আলিমগণ তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং একে ইজমার পরিপন্থী বলে গণ্য করেছিলেন। মালিকী ফকীহগণ একে ভুল হিসেবে বিবেচনা করে আসছেন এবং এ ব্যাপারে তার অনুসরণ থেকে বিরত রয়েছেন (৪)।

---

(১) জুমহুর ফকীহগণ আর্থিক দণ্ড নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে, যা চার মাযহাবেরই নির্ভরযোগ্য মত। ইমাম আবু ইউসুফ থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে এবং এটি ইমাম শাফেঈর পুরাতন মত। তবে একদল ফকীহ এর বৈধতা বেছে নিয়েছেন; দেখুন: আল-বাহরুর রাইক ৫/৪৪, হাশিয়া ইবনে আবিদীন ৪/৬১, আল-মুগনী ৯/১৭৮, কাশশাফুল কিনা' ৬/১২৪, হাশিয়াতুদ দসুতি আলাশ শারহিল কাবীর ৪/৩৫৫, শারহু ইবনি নাজী আলার রিসালাহ পৃ. ২২৫, শারহুন নববী আলা সহীহি মুসলিম ৯/১৩৯, হাশিয়াতু কলয়ূবী ৪/২০৬, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/১০৯, আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ২/৬৮৮, তাবসিরাতুল হুক্কাম ২/২৯৩।
(২) শারহু মাআনিল আসার ৩/১৪৫; বরং ইবনে রুশদ এ ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন, দেখুন: আল-বিয়ান ওয়াত তাহসীল ১৬/২৭৮।
(৩) দেখুন: মাতালেউত তামাম গ্রন্থের মুহাক্কিকের ভূমিকা পৃ. ৫৭; আরও দেখুন: মাতলাউত তামাম, লিশ-শামমা' পৃ. ৮০।
(৪) দেখুন: নাওয়াযিলুল ইলমী ৩/১৫৮, ফাসলুল মাকাল ফী জওয়াবি আন হাদিসাতিস সুয়াল ওয়া নাফয়িল উকুবাহ বিল মাল, মুহাম্মদ আল-আখমীমী পৃ. ১৫, আন-নাওয়াযিলুল জাদীদাতুল কুবরা ১০/২০৪ ও ২১৩।

তবে মালেকী মাযহাবের পরবর্তী ফকীহদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন যারা আর্থিক শাস্তির বৈধতার বিষয়ে আল-বারযালীর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তার সপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। (১)

এই বিষয়ে আল-বারযালীর সাথে বিরোধিতার ঝাণ্ডা বহন করেছিলেন তাঁর সমসাময়িক ফকীহ আবু আব্বাস আশ-শাম্মা আল-হানতাতি (মৃত্যু ৮৩৩ হিজরী)। তিনি আল-বারযালীর ফতোয়া আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেন, যাতে তিনি আল-বারযালীর বক্তব্যগুলোকে শব্দে শব্দে খণ্ডন করেছেন। এটি ছিল একটি অনন্য ইলমী রিসালা যার নাম তিনি দিয়েছেন: 'মাতালিউত তামাম, ওয়া নাসায়িহুল আনাম, ওয়া মানজাতুল খাওয়ারাসসি ওয়াল আওয়াম, ফী রাদ্দিল কাওলি বি-ইবাহাতি ইগরামি যাবিল জিনায়াতি ওয়াল ইজরাম যিয়াদাতান আলা মা শারাআহুল্লাহু মিনাল হুদূদি ওয়াল আহকাম' (অর্থাৎ: অপরাধীদের উপর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হুদূদ ও বিধিবিধানের অতিরিক্ত অর্থদণ্ড আরোপের বৈধতার মত খণ্ডন এবং নিখুঁত উদয়স্থল, সৃষ্টিজগতের জন্য উপদেশ এবং বিশিষ্ট ও সাধারণের মুক্তি)।

তিনি এই রিসালায় সাব্যস্ত করেছেন যে, হদ-এর অতিরিক্ত হিসেবে অর্থ গ্রহণ করা, অথবা হদ-এর পরিবর্তে অর্থদণ্ড প্রদান করা, কিংবা সাধারণভাবে আর্থিক শাস্তি প্রদান করা নিষিদ্ধ। (২)

আশ-শাম্মা তাঁর রিসালায় এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করেছেন যে, আর্থিক শাস্তি এক প্রকার যুলুম এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার শামিল, যা হারাম। আর কুরআন ও সুন্নাহতে যেসব শাস্তির বর্ণনা এসেছে তা-ই যথেষ্ট, এর বাইরে অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। তাই জনস্বার্থ বা 'মাসলাহাত'-এর দোহাই দিয়ে এর বিরোধিতা করা একটি বাতিল দাবি যার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না; কারণ শরীয়ত প্রণেতা এই জাতীয় তথাকথিত স্বার্থগুলোকে বর্জন করেছেন। আর আর্থিক শাস্তিকে বৈধতা প্রদানকারী যেসব বর্ণনা এসেছে, সেগুলো রহিত হয়ে গেছে।

আশ-শাম্মা কেবল এই মূলনীতিগত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং তিনি খোদ 'মাসলাহাত' বা জনস্বার্থের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথমত এই বিষয়ে কোনো মাসলাহাত থাকাকেই অস্বীকার করেছেন। কারণ শাস্তিস্বরূপ অর্থ প্রদান করা ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা দমনের উদ্দেশ্য পূরণ করে না এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়নাকেও রোধ করতে পারে না। বরং দেখা যায় যে, যার ওপর কুপ্রবৃত্তি জয়ী হয়েছে সে তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করে না এবং সে এসবের কোনো পরোয়াও করে না।

---

(১) দেখুন: নাওয়াযিলুল আলামী ৩/১৫৩-১৫৪, আজউবাতুত তাসুলী ১৫৩-১৬১, আন-নাওয়াযিলুল জাদীদাতুল কুবরা ১০/২০৮ ও

২২৭। এই মাসআলায় মতবিরোধ এবং এ ক্ষেত্রে মালেকী ফকীহদের সমর্থন বা প্রত্যাখ্যানের পর্যালোচনার জন্য দেখুন: মাতালিউত তামাম-এর ভূমিকা ১৩-১৬ এবং ৫৬-৫৮, আল-ফাতাওয়া আল-ফিকহিয়্যাহ ফী আহাম্মিল কাদায়া, আল-হাসান আল-ইউবী ৪৯১-৪৯৮।
(২) দেখুন: মাতালিউত তামাম ১৩০, এবং দেখুন: ৮৬।

পৃষ্ঠা 311

অতঃপর তিনি দ্বিতীয়ত ক্ষতিকর বিষয়ের (মাফাসাদা) অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, এটি ক্ষতিকে আরও বৃদ্ধি করে এবং দণ্ডবিধিকে (হুদুদ) ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তুতে পরিণত করে, ঘুষের পথ উন্মোচিত করে এবং শরীআতের পরিবর্তন ও সে বিষয়ে মানুষের আকীদা বিকৃতির দিকে নিয়ে যায় এবং অবাধ্যতার পথকে সুগম করে। ফলে এর মাধ্যমে উদ্ভূত ক্ষতি অধিকতর গুরুতর। তাই একে 'দুটি ক্ষতির মধ্যে লঘুতরটি গ্রহণ' পর্যায়ের বলা যাবে না।

তৃতীয়ত তিনি নির্ধারণ করেছেন যে, জনকল্যাণমূলক (মাসলাহা) প্রতিকার অর্থের মাধ্যমে হয় না; বরং যে কারণে এই অনিষ্টগুলোর সৃষ্টি হয়েছে তার চিকিৎসা করতে হবে। আর তা হলো কর্মকর্তাদের জুলুম, তাদের ঘুষ গ্রহণ এবং আল্লাহর বিধানের (হুদুদ) ব্যাপারে উদাসীনতা। এটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বিষয়াবলির সংশোধন এবং সেগুলোর মূলোৎপাটন দাবি করে। দণ্ডবিধির (হুদুদ) ওপর তুষ্ট না থাকার কারণ হলো সেগুলো কার্যকর করা হয় না, বরং তা কেনা-বেচা করা হয়।

অনুরূপভাবে তিনি অক্ষমতা ও সামর্থ্যহীনতার যুক্তিরও খণ্ডন করেছেন এই বলে যে, যে ব্যক্তি আনুগত্যের (কর্তৃত্বের) অধীনে আছে তার ওপর হদ কার্যকর করা হবে, আর যে ব্যক্তি এর বাইরে আছে তার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। (১)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মালিকীগণ 'মালের মধ্যে শাস্তি' (আল-উকুবাতু ফিল মাল) এবং 'মালের মাধ্যমে শাস্তি' (আল-উকুবাতু বিল মাল)-এর মধ্যে পার্থক্য করেন। 'মালের মধ্যে শাস্তি' হলো অপরাধীর শাস্তি কেবল সেই মালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যার মাধ্যমে বা যে বিষয়ে সে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে। আর 'মালের মাধ্যমে শাস্তি' হলো অপরাধীর এমন মাল গ্রহণ করা যার মাধ্যমে সে অবাধ্যতা করেনি। (২) সুতরাং মালিকী মাযহাবে 'মালের মধ্যে শাস্তি'র বিষয়টি সাব্যস্ত, কিন্তু 'মালের মাধ্যমে শাস্তি' প্রদান নিষিদ্ধ। (৩)

আল-বারযালীর ফতোয়া প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আশ-শাম্মা'র কিতাবের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত উদ্ধৃতিগুলো ছাড়া অন্য কারো নিকট আমি এটি পাইনি। আল-বারযালী ও আশ-শাম্মা'র মধ্যকার মতপার্থক্যকে দুটি বিষয়ে সংক্ষেপ করা যেতে পারে:
প্রথমটি: নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে 'মালের মাধ্যমে শাস্তি' প্রদানের বিধান, তবে তা দণ্ডবিধি (হুদুদ) ও শরয়ী ওয়াজিবসমূহের বিকল্প হিসেবে নয়।

---

(১) দেখুন 'মাতালিউত তামাম' গ্রন্থের নিম্নোক্ত স্থানসমূহ: ৮৪-৮৫, ৯২, ৯৭, ১০০, ১০৬, ১০৯, ১৩২, ১৩৮, ১৪০, ১৪২।
(২) দেখুন: 'নাওয়াযিলুল আলামী' ৩/১৫৯, ১২০ নং প্রশ্নের উত্তরে বিস্তারিত আলোচনা।
(৩) দেখুন: 'মাতালিউত তামাম' ১৫৭, 'নাওয়াযিলুল আলামী' ৩/১৫৮, ১৭ নং প্রশ্নের ঘটনায় বিস্তারিত আলোচনা; এবং দেখুন: 'আল-ইতিসাম' ২/৬২১-৬২২, 'মিনাহুল জলীল' ৪/৫৩৩, 'আন-নাওয়াযিলুল জাদিদাতুল কুবরা' ১০/২২০-২২২।

আল-শাম্মা' আর্থিক দণ্ড নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে জমহুর বা সংখ্যাগুরু উলামায়ে কেরামের মাযহাব অনুসরণ করেন; এটি একটি ফিকহি মাসআলা যা শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে এর গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল।(১)

দ্বিতীয়ত: শারীরিক শাস্তি প্রদানে অক্ষমতার ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে অর্থদণ্ড আরোপের বিধান।

পরবর্তী সময়ে মাসআলাটি নিয়ে এভাবেই আলোচনা এগিয়েছে, যেখানে পরবর্তী মালেকি ফকিহগণ ভিন্ন এক পথ অবলম্বন করেছেন। এটি আর্থিক দণ্ডের মূল বিধানের চেয়ে বরং 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' (শরিয়তসম্মত শাসননীতি)-এর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এটি হলো শারীরিক হদ (নির্ধারিত দণ্ড) কার্যকর করার মতো সক্ষম সুলতান বা শাসকের অনুপস্থিতিতে শারীরিক হদ কায়েম করতে অক্ষমতার সময় আর্থিক জরিমানা আরোপের বিধান। মাগরেব (উত্তর আফ্রিকা) অঞ্চলের দেশগুলো এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।

ফকিহ মুসা আল-ওয়াযানি একটি বিস্তারিত উত্তরে আল-বারযালি এবং তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে যা ঘটেছিল তা উল্লেখ করার পর তাঁর জবাবটি এই কথা দিয়ে শেষ করেন: "শারীরিক শাস্তি অসম্ভব হলে আর্থিক দণ্ড বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তাঁর ফতোয়াটি সুপ্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এটি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরুন।"(২)

ফকিহ মুহাম্মদ ইবনুল আরাবি আল-ফাসি (মৃত্যু: ১০৫২ হিজরি)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—এমন গোত্রগুলো সম্পর্কে যাদের মধ্যে শাসকের অনুপস্থিতির কারণে বর্তমানে বিপর্যয় ও দস্যুতা ছড়িয়ে পড়েছে—যদি তাদেরকে আর্থিক দণ্ডের মাধ্যমে নিবৃত করা সম্ভব হয়, তবে কি তা প্রয়োজনের খাতিরে গ্রহণ করা যাবে? কারণ সেই সময়ে শাসকের অনুপস্থিতিতে অন্য কোনোভাবে তাদের দমন করা সম্ভব ছিল না, এবং অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে তা আরও জঘন্য ও নিকৃষ্ট পরিস্থিতির জন্ম দিত।(৩)

আল-আরাবি আল-ফাসি আর্থিক দণ্ড নিষিদ্ধ হওয়ার মূল নীতি বর্ণনা করে উত্তর দিয়েছিলেন এবং আল-বারযালি ও আল-শাম্মা-এর মধ্যে যা ঘটেছিল তা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আল-বারযালির মতটি ফকিহগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরপর তিনি বলেন: "তবে আল-বারযালির বক্তব্য এবং যারা তাঁর প্রতিবাদ করেছেন তাদের উভয়ের বক্তব্যই ইমাম বা শাসকের উপস্থিতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে শরয়ি হদ কায়েম করা ও শরয়ি বিধানগুলোকে সেগুলোর মূল ধারায় পরিচালনা করার সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তা থেকে বিচ্যুত হওয়া..."

---

(১) আর্থিক দণ্ডের বৈধতার প্রবক্তাদের দলিল দেখতে দেখুন: মাজমু' আল-ফাতাওয়া ২৮/১০৯-১১২, আল-তুরুক আল-হুকমিয়্যাহ ২/৬৮৮-৬৯৮।
(২) দেখুন: নাওয়াযিল আল-ইলমি ৩/১৬২, এবং তাঁর বিস্তারিত উত্তর দেখুন: আল-নাওয়াযিল লিল-আলামি ৩/১৫২-১৬৩।
(৩) দেখুন: আল-আরাবি আল-ফাসি-এর পূর্ণাঙ্গ রিসালাহ (পত্র): আল-নাওয়াযিল আল-জাদিদাহ আল-কুবরা ১০/২১৩-২২৮।

শরয়ী হদসমূহ (শাস্তি) কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা অন্য কিছুতে পরিবর্তন করা হলো মূলত বিধানের রদবদল এবং হদকে বিনষ্ট করার নামান্তর। এর কদর্যতা বা মন্দ হওয়া এতটাই স্পষ্ট যে, এর জন্য কোনো বর্ণনা বা দলিলের প্রয়োজন নেই। আর এখানে যে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, তা এমন সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যখন কোনো ইমাম (শাসক) নেই এবং হদ

কায়েম করা ও বিধানসমূহকে তার মূল পন্থায় কার্যকর করা সম্ভব নয়। ফলে তাদের আলোচিত মাসআলার প্রেক্ষাপট আর বর্তমান জিজ্ঞাসিত মাসআলার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। (১)

এরপর তিনি এই অপরাধীদের শাস্তি প্রদান বর্জন করার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি এবং এর ফলশ্রুতিতে যে বিশাল ফাসাদ বা বিপর্যয় তৈরি হয়—যা শরীয়তের বিবেচিত অপরিহার্য বিষয়সমূহের ওপর প্রভাব ফেলে—তা প্রতিহত করার জন্য এই পদক্ষেপের বৈধতা সাব্যস্ত করেছেন। তিনি এর সপক্ষে দলিল পেশ করেছেন এবং এরপর বলেছেন:

"(এর দাবি হলো, যখন হদ কায়েম করা অসম্ভব হয় এবং তা সক্ষমতার বাইরে চলে যায়, অথচ পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কোনো না কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়, আর যদি এমন পরিমাণ সক্ষমতা থাকে যার মাধ্যমে শাসনের উদ্দেশ্যে 'তা'যীর' (দণ্ড) প্রদান করা যায় যা দ্বারা অপরাধী নিবৃত্ত হবে, তবে সেক্ষেত্রে হদের কারণগুলোকে তা'যীরের স্থলাভিষিক্ত করা হবে। ফলে এতে তা'যীরের পরিচিত বিধানসমূহ কার্যকর হবে। এর অর্থ এই নয় যে, এর মাধ্যমে হদ রহিত হয়ে যাচ্ছে। বরং ফাসাদ যতটুকু সম্ভব প্রতিহত করার জন্য এবং সাধ্য অনুযায়ী অন্যায় পরিবর্তনের প্রচেষ্টাস্বরূপ সেই সময়ের জন্য সক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা এটাই।)" (২)

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কীভাবে সম্পদ গ্রহণ করা বা জরিমানা আরোপ করা সম্ভব হচ্ছে, অথচ শারীরিক দণ্ড কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না?

আল-ফাসি এই সংশয় নিরসন না করে ছাড়েননি। তিনি সেই গোত্রগুলোর অবস্থা এবং সুলতানের (কেন্দ্রীয় শাসন) থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। এরপর তিনি বলেন: **"(তাদের ক্ষেত্রে শারীরিক দণ্ড কার্যকর করা সম্ভব নয়। কারণ, তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তাদের ওপর তা প্রয়োগ করতে চায়, তবে তারা তার আনুগত্য স্বীকার করে না। তারা একে অপরের ওপর হত্যা, অঙ্গচ্ছেদ বা প্রহারের মতো শারীরিক শাসনের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়াকে মানহানিকর মনে করে। তারা জাহেলি আভিজাত্যের কারণে এর বিরুদ্ধাচরণ করে। বিশেষ করে তারা সুলতানের শাসনামলেও শরয়ী পদ্ধতিতে হদ বা তা'যীর কার্যকর হওয়া দেখতে অভ্যস্ত ছিল না। তাদের শাস্তি ছিল কেবল অর্থদণ্ড বা জরিমানা। আর যখন কখনও হত্যাকাণ্ড বা অন্য কিছু ঘটত, তখন তারা সেটিকে নিছক জুলুম হিসেবে গণ্য করত; যেহেতু তা কোনো সঠিক নীতিমালার অনুসারী ছিল না।)"**

(১) আন-নাওয়াযিল আল-জাদিদাহ আল-কুবরা ১০/২১৩ - ২১৪।
(২) আন-নাওয়াযিল আল-জাদিদাহ আল-কুবরা ১০/২১৫ - ২১৬।

শরয়ী [বিধান], ফলে তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় তাদের মধ্যে এখন তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিক বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছে। তারা কল্পনা করে যে, যেহেতু সুলতানের শাসনামলে তাদের ওপর এটি কার্যকর করা হয়নি, তাই এখন তা না হওয়াই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় এখন কে তা বাস্তবায়নের আশা পোষণ করবে? এর ফলে ওইসব বিধান কার্যকর করার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। (১)

সম্ভবত এ ধরণের ফিতনা বা অনিষ্টের আশঙ্কাই আল-বারজালি করেছিলেন। মালিকী ফকিহদের কেউ কেউ বারজালির মুনাজারার পর যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন: **(আমীর তার কথা অনুযায়ী কাজ করলেন এবং বারজালির মত উপেক্ষা করে শারীরিক দণ্ডবিধি কার্যকর করতে শুরু করলেন। ফলে লোকজন চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল এবং আতঙ্ক ও দাঙ্গা দেখা দিল। তখন তিনি পুনরায় আবুল ফজল আল-বারজালির মতের দিকে ফিরে গেলেন)**। (২)

এরপর ফকিহ মুহাম্মদ মায়্যারা (মৃত্যু ১০৭২ হিজরি) আসলেন এবং তিনি আরাবি আল-ফাসি যা উল্লেখ করেছিলেন তারই অনুরূপ সিদ্ধান্ত দিলেন। তিনি বললেন: **(তবে বারজালি এবং যারা তাকে খণ্ডন করেছেন তাদের বক্তব্য - আল্লাহই ভালো জানেন - তা**

মূলত ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতি এবং তার দণ্ডবিধি কার্যকর করার সক্ষমতা ও শরয়ী বিধানসমূহকে তার মূল ভিত্তিতে পরিচালিত করার প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা পরিহার করে অন্য কিছুর দিকে ধাবিত হওয়া বিধানের বিকৃতি এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া বিচার করার নামান্তর, যার কর্তাকে জুলুম ও ফাসিকের সাথে বিশেষিত করা হয়েছে; আর এর কদর্যতা কারো অজানা নয়। কিন্তু ইমামের অনুপস্থিতিতে এবং দণ্ডবিধি কার্যকর করা ও বিধানসমূহকে মূল ভিত্তিতে পরিচালনা করা অসম্ভব হলে - আল্লাহই ভালো জানেন - অবহেলা, শাসনের অভাব এবং শক্তিশালীকে দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে [অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাই] শ্রেয়। কারণ এর অনিষ্ট বা ফিতনা এত বড় যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করার চেয়ে স্বচক্ষে দেখাই যথেষ্ট। আর তা জনবসতি ধ্বংস এবং শৃঙ্খলার বিনাশের দিকে ধাবিত করে। বরং যদি দণ্ডবিধি কায়েম করা অসম্ভব হয় এবং তা সামর্থ্যের বাইরে চলে যায়, অথচ সমাজ সংশোধনের জন্য শাস্তির প্রয়োগ আবশ্যক হয় এবং সামর্থ্য যদি এমন কোনো 'তা'জির' (বিচক্ষণতামূলক শাস্তি) প্রয়োগের পর্যায়ে থাকে যার দ্বারা শাসন সম্ভব হয়, তবে দণ্ডবিধির কারণসমূহ 'তা'জিরের' স্থলাভিষিক্ত হবে। ফলে তাতে তা'জিরের পরিচিত নিয়মাবলি কার্যকর হবে। এর অর্থ এই নয় যে, এর মাধ্যমে শরয়ী দণ্ড রহিত হয়ে যাবে, বরং অনিষ্ট যতটুকু সম্ভব দূর করার নিমিত্তে তৎকালীন সময়ে এটিই হবে সামর্থ্যের শেষ সীমা)। (৩)

---

(১) আন-নাওয়াযিল আল-জাদিদাহ আল-কুবরা ২১৮/১০, আরও দেখুন: আজওয়াবাতুত তাসাউলি ১০৭।
(২) নাওয়াযিল আল-ইলামি ৩/১৫৪।
(৩) ফাতহুল আলিমিল খাল্লাক শারহু লামিয়াতুয যুকাক ৪৩৪, আত-তাউদি এটি লামিয়াতুয যুকাকের শারহে উদ্ধৃত করেছেন ১৫৯-১৬০।

আত-তাসুলি (মৃত ১২৫৮ হিজরি) এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং এতে বিদ্যমান বিভিন্ন মতামত বর্ণনা করার পর তিনি একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছেন। তিনি তাতে বলেছেন:

"(এই সবকিছু থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো: আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়ে নির্দিষ্ট হদ বা দণ্ডবিধি নির্ধারণ করেছেন, যেমন—ব্যভিচার, চুরি, হিরাবাহ (ডাকাতি), অপবাদ এবং এই জাতীয় অপরাধসমূহ, সেগুলোর ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে আর্থিক দণ্ড প্রদান করা জায়েয নেই। কারণ এতে মহান বিধানদাতার নির্ধারিত দণ্ডবিধি পরিবর্তনের বিষয়টি নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: {আর যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।} [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৪]। তবে যদি সেই দণ্ড কার্যকর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, কেবল তখনই আর্থিক জরিমানার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হবে। এটি করা হবে দুটি ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলক কম ক্ষতিটি বরণ করা এবং দুটি মন্দের মধ্যে অধিকতর মন্দটিকে যথাসম্ভব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। আর যদি সেই অপারগতা বা ওযর দূর হয়ে যায়, তবে হদ রহিত হবে না।)" (১)।

- শরয়ী শর্ত ও ওয়াজিবের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম এবং ক্রমান্বয়ে তার নিকটবর্তী বিষয়কে বিবেচনা করা:

আর তা এই কারণে যে, শরয়ীভাবে যা ধর্তব্য, তার কোনো কোনটি নির্দিষ্ট সময়ে বা স্থানে পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করা সম্ভব না-ও হতে পারে। এমতাবস্থায় এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে মূল ওয়াজিবের মাত্রাকেই কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা যাবে না। আবার এর বিপরীতে এই অপারগতার কারণে শরয়ী বিধানটিকে পুরোপুরি বাতিলও করা যাবে না। বরং এই জনকল্যাণমুখী (মাসলাহাহ) ইজতিহাদ সাধ্যানুযায়ী বিধানটি পালনের বিষয়টি বিবেচনা করে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গতার নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াস চালায়।

যেসব ক্ষেত্রে 'সর্বোত্তম এবং ক্রমান্বয়ে তার নিকটবর্তী বিষয়কে' বিবেচনা করার বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, তা হলো: সাক্ষ্য প্রদান এবং প্রশাসনিক পদের (উলায়াত) ক্ষেত্রে শরয়ীভাবে আবশ্যক ন্যায়পরায়ণতার (আদালাত) শর্ত। ফকীহগণ এই শর্তটির আবশ্যিকতার ব্যাপারে একমত হওয়া সত্ত্বেও তারা লক্ষ্য করেছেন যে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা স্থানে এই শর্তটির বাস্তবায়ন

করা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এ কারণেই জনকল্যাণমুখী ইজতিহাদ 'সর্বোত্তম এবং ক্রমান্বয়ে তার নিকটবর্তী বিষয়কে' বিবেচনার নীতি নিয়ে এসেছে। এখানে এই নীতিটি গ্রহণের অন্যতম দিকসমূহ হলো:

---

(১) আজউবাতুত তাসুলি ১৬১ - ১৬২। আত-তাসুলি এরপর এই প্রসঙ্গের আলোচনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন, দেখুন: ১৬৩ - ১৮৫।

পৃষ্ঠা 316

প্রথমত: যদি কোনো জনপদে ন্যায়নিষ্ঠ (আদিল) লোক পাওয়া না যায়, তবে তাদের অবস্থা অনুপাতে যারা তুলনামূলক যোগ্য বা উত্তম, তাদের দ্বারা কাজ চালিয়ে নেওয়া হবে। বিচারকদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ। (১) আর যদি শাসক বা বিচারকদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠতা পাওয়া দুঃসাধ্য হয়, তবে তাদের মধ্যে যার পাপাচারিতা সবচেয়ে কম, তাকেই দায়িত্ব প্রদান করা হবে। (২)

দ্বিতীয়ত: ন্যায়নিষ্ঠতার ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে গ্রহণ করার এই বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হলো: কাল ও স্থান ভেদে ন্যায়নিষ্ঠতার আপেক্ষিকতা বজায় রাখা। কেননা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি মানেই এই নয় যে, সে সকল সময়ে এবং সকল স্থানেই ন্যায়নিষ্ঠ বলে গণ্য হবে। যেমন বলা হয়: "প্রত্যেক জাতির জন্যই তাদের (নিজস্ব মানদণ্ডের) ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি রয়েছে।" (৩)

সুতরাং ন্যায়নিষ্ঠতার মানদণ্ড সকল সময় ও সকল স্থানে এক নয়। বরং "তৎকালীন সময়ে যারা সর্বোত্তম এবং অধিকতর যোগ্য তাদের দিকেই লক্ষ্য করা হয় এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ বৈধ হয়। প্রতিটি সময়ের একটি নিজস্ব অবস্থা থাকে যা বিবেচনা করা আবশ্যক। সুতরাং সমকালীন সময়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এ বিষয়ে ইজতিহাদ করা হবে এবং কাল ও সময়ের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কারণ এটুকুই সাধ্যের অনুকূলে। কেননা আমরা যদি পূর্ববর্তী যুগের ন্যায়নিষ্ঠদের গুণাবলি হুবহু বজায় রাখতে চাই, তবে বিচারব্যবস্থা ও বিধানসমূহ অচল হয়ে পড়বে। সুতরাং যাকে এই বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং যে এ বিষয়ে সক্ষম, সে যেন বিষয়টি বিবেচনা করে।" (৪)

ইমাম শাতবি বলেন: "ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিটি সময়ে তার অধিবাসীদের সাপেক্ষে গণ্য হবে, যদিও এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার ধরনে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, সাহাবায়ে কিরামের ন্যায়নিষ্ঠতা তাবিঈগণের ন্যায়নিষ্ঠতার সমান নয়। আবার তাবিঈগণের ন্যায়নিষ্ঠতা পরবর্তী প্রজন্মের ন্যায়নিষ্ঠতার সমান নয়। অনুরূপভাবে আমাদের কাল পর্যন্ত প্রতিটি যুগ তার পরবর্তী যুগের ক্ষেত্রে একই রূপ... সুতরাং প্রত্যেক যুগের ন্যায়নিষ্ঠদেরকে সেই যুগের অবস্থা অনুপাতে গণ্য করা আবশ্যক। অন্যথায় যে সকল পদের জন্য ন্যায়নিষ্ঠতা শর্ত, সেই সকল কর্তৃত্ব বা পদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।" (৫)

---

(১) দেখুন: আজ-জখিরা ১০/৪৬; আত-তুরুক আল-হুকমিয়্যাহ ১/৪৬৬; তাবসিরাত আল-হুক্কাম ১/৪৮৫, ৪৮৭।
(২) দেখুন: আল-কাওয়াইদ আল-কুবরা ২/৮০ এবং ১/১২১।
(৩) দেখুন: আল-মি’য়ার আল-মু’রাব ১০/১৪৬; আজ-জখিরা ১০/৪৬; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ৩/৫৮৯; আল-মিরকাবাহ আল-উলয়া ফীমান ইয়াসতাহিক্কুল কাজা ওয়াল ফুতয়া, আবু হাসান আন-নুবাহি ৯৮-৯৯।
(৪) ফাতাওয়া আল-বারজুলি ৪/১৯৮।
(৫) আল-মি’য়ার আল-মু’রাব ১০/২০৪; এবং দেখুন: শারহু মিয়্যারা আলা তুহফাতিল হুক্কাম ১/৫৫।

আল-কারাফী ন্যায়পরায়ণতার (আদালাত) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন: (এ কারণে শহর এবং যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এতে ভিন্নতা দেখা দেয়; ফলে আমাদের যুগের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা সাহাবায়ে কেরামের যুগে গ্রহণযোগ্য হতেন না)।(১)

জুমহুর (অধিকাংশ) ফকীহগণের মাযহাব অনুযায়ী এই ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি প্রকট হয়, যারা ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। তাদের মতে, ন্যায়পরায়ণ সেই ব্যক্তি যার দ্বীনদারির ওপর ভরসা করা যায় এবং যার কথা সন্তোষজনক হয়। আর এটি অর্জিত হয় যে কোনো কবিরা গুনাহ বর্জন করার মাধ্যমে অথবা সগিরা গুনাহে অবিচল না থাকার মাধ্যমে।(২) কারণ এটি এমন বিষয় যা কোনো কোনো সময় বা স্থানে দুর্লভ বা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

তবে এই সমস্যাটি হয়তো অন্য একটি মতের ক্ষেত্রে কিছুটা কম হতে পারে। সেই মত অনুযায়ী, আদালাত বা ন্যায়পরায়ণতা হলো যার পুণ্য তার পাপের চেয়ে বেশি হয়। মূল ধর্তব্য বিষয় হলো তার সামগ্রিক অবস্থার প্রাধান্য—পুণ্যের প্রাধান্য নাকি পাপের প্রাধান্য। সুতরাং যার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে, সে-ই ন্যায়পরায়ণ।

ইমাম শাফিঈ বলেন:

(ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং অন্যায্য ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করার মতো কোনো শারীরিক বা বাচনিক চিহ্ন নেই। বরং তার সত্যবাদিতার চিহ্ন হলো তার ব্যক্তিগত অবস্থা পরীক্ষার মাধ্যমে যা প্রকাশ পায়। সুতরাং যখন তার অধিকাংশ বিষয়ে বাহ্যিক কল্যাণ পরিলক্ষিত হবে, তখন তা গ্রহণ করা হবে, যদিও তার কোনো কোনো বিষয়ে ঘাটতি থাকে। কারণ আমাদের দেখা এমন কেউ নেই যে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর যখন সে গুনাহ এবং নেক আমল উভয়টি মিশ্রিত করে ফেলবে, তখন তার ভালো ও মন্দ আমলের মাঝে পার্থক্য করে কোনটি অধিক প্রবল, সেই বিষয়ে ইজতিহাদ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই)।(৩)

এখন দেখার বিষয় হলো, পাপের ওপর পুণ্যের আধিক্যের বিষয়টি কি কবিরা গুনাহ বর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট? অর্থাৎ কোনো কবিরা গুনাহ করার পরও কি এই ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব, নাকি এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সংশ্লিষ্ট...

(১) আল-ফুরূক, ৪/৬৫।

(২) দেখুন: শারহু মুখতাসার আত-তাহাবী, ৮/১২৪-১২৫; আল-বায়ান ওয়াত-তাহসীল, ১০/৮১; রওদাতুত তালিবীন, ১১/২২৫; কাশশাফুল কিনা', ৬/৪১৮-৪১৯।

(৩) আর-রিসালাহ, ৪৮৫-৪৮৬; এবং দেখুন: আল-উম্ম, ৮/৩১০; আদাবুশ শাফিঈ ওয়া মানাকিবুহু লির-রাযী, ৩৪৪।

...কবিরা গুনাহ বর্জন করার পাশাপাশি সগিরা গুনাহ করার ক্ষেত্রে, আর এর মাধ্যমে এটি জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের

নিকটবর্তী হয় **(১)**।

তবে কোনো কোনো ফকিহ এই অর্থটি এমনভাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যা নেক আমলের আধিক্য হওয়ার ভিত্তিতে 'আদালাত' (ন্যায়পরায়ণতা)-এর পরিধিকে প্রশস্ত করার দাবি রাখে; এক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে কোনো কবিরা গুনাহ বর্জন করা কিংবা সগিরা গুনাহর ওপর অবিচল না থাকার শর্তারোপ করা হয়নি। এর উদাহরণ হলো:

যখন কাজি শুরাইহকে জিজ্ঞাসা করা হলো: ন্যায়পরায়ণ (আদল) ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের মজলিসে বসে, তাদের সাথে নামাজে শরিক হয় এবং যার পেট ও লজ্জাস্থানের ব্যাপারে কোনো কলঙ্ক আরোপ করা যায় না" **(২)**।

ইব্রাহিম নাখয়ি বলেছেন: "মুসলিমদের মধ্যে সেই ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ, যতক্ষণ না তার পেট ও লজ্জাস্থানের ব্যাপারে কোনো অপবাদ দেওয়া হয়" **(৩)**।

শাবি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "একজন মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষ্য ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ, যতক্ষণ না সে কোনো হদ (নির্ধারিত শাস্তি) প্রাপ্ত হয় অথবা তার দ্বীনের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি জানা যায়" **(৪)**।

ইবনুল মুবারককে ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "যার মধ্যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকবে: সে জামাতে নামাজ আদায় করবে, এই পানীয় (মদ) পান করবে না, তার দ্বীনের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকবে না, সে মিথ্যা বলবে না এবং তার বিচার-বুদ্ধিতে কোনো সমস্যা থাকবে না" **(৫)**।

(১) ফকিহগণ নেক আমলের আধিক্য শর্ত করার সময় কবিরা গুনাহ বর্জনের শর্তটি উল্লেখ করেন এবং প্রতীয়মান হয় যে এটিই সংখ্যাগুরু মত। তাদের কেউ কেউ কবিরা গুনাহ করার কথা উল্লেখ বা অস্বীকার না করেই এটি বর্ণনা করেন, ফলে তাদের বক্তব্যটি উভয় সম্ভাবনাই রাখে। আবার তাদের কেউ কেউ কবিরা গুনাহ করা সত্ত্বেও এই মূলনীতিটি বিদ্যমান থাকার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তবে এমন মত পোষণকারী সংখ্যায় কম। এ বিষয়ে দেখুন: শারহু মুখতাসারিত তহাবি ৮/১২৫; আল-ফকিহু ওয়াল মুতাফাক্কিহ ৩৬৩; আল-হিদায়া ফি শারহি বিদায়াতিল মুবতাদি ৩/১১০৮; মাহাসিনুশ শরিয়াহ (কাফফাল আশ-শাশী) ৫৬৮; আল-হাভী আল-কাবীর ১৬/১৫০; সিনওয়ানুল কাজা ওয়া উনওয়ানুল ইফতা ২/১২৭-১২৮; রওজাতুল কুজাত ১/২৩৪; রওজাতুত তালিবিন ১১/২২৫; জামিউল মাসাইল ৮/১০১-১০২; মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৫; আদাবুল কাজা (আস-সারুজি) ৩০৯-৩১০; আল-বাহরুল মুহিত ৬/১৪৮; তাবসিরাতুল হুক্কাম ১/২৫৯; আল-ইনসাফ মাআশ শারহিল কাবীর ২৯/৩৪১।
(২) দেখুন: আখবারুল কুজাত (ওয়াকি) ৪৬৫।
(৩) দেখুন: মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ ৪/৪২৮।
(৪) দেখুন: মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ ৪/৪২৮।
(৫) দেখুন: আল-কিফায়াহ ফি মারিফাতি উসুলির রিওয়ায়াহ (খতিব আল-বাগদাদি) ১/২৩১।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: যদি কেউ জামাতের সাথে সংলগ্ন থাকে, ফরজসমূহ পালন করে ও আমানত রক্ষা করে এবং আর্থিক লেনদেনে সততা ও সত্যবাদিতার জন্য লোকসমাজে পরিচিত হয়, তবে সে ন্যায়নিষ্ঠ।(১)

তৃতীয়ত: সর্বোত্তম পন্থা বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হলো এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে, ন্যায়নিষ্ঠতা (আদালাত) বিভাজ্য হতে পারে। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এক ব্যক্তির ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া মানেই এই নয় যে সে সব বিষয়েই ন্যায়নিষ্ঠ হবে। তাই তুচ্ছ বিষয়সমূহে ন্যায়নিষ্ঠতার শর্তে এমন শিথিলতা প্রদর্শন করা হতে পারে যা বড় বড় বিষয়ের ক্ষেত্রে করা হয় না। বিচারক কোনো তুচ্ছ বিষয়ের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে এমন প্রবল ধারণার ওপর নির্ভর করতে পারেন যা অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে করেন না। ঠিক তেমনিভাবে

সাধারণ কারো ন্যায়নিষ্ঠতা কবুল করার অর্থ এই নয় যে, সাক্ষ্যের সত্যতার বিষয়ে বিচারকের প্রবল ধারণা ইলম ও দ্বীনদারিতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ন্যায়নিষ্ঠতার সমপর্যায়ভুক্ত হবে।(২)

চতুর্থত: সর্বোত্তম পন্থা বিবেচনার আরেকটি দিক এবং ন্যায়নিষ্ঠার বিভাজ্যতার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো: ন্যায়নিষ্ঠার বিভিন্ন অধ্যায় বা ক্ষেত্রের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ রাখা। প্রতিটি বিষয়ের ন্যায়নিষ্ঠতা সেই বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। অতএব শর্ত হলো তাকে এমন পাপাচার থেকে মুক্ত হতে হবে যা অভিভাবকত্ব (বিলাওয়াত) এবং যে কার্যে ন্যায়নিষ্ঠতা শর্ত করা হয়েছে তাতে ক্ষতি সাধন করে। সুতরাং সাক্ষীকে অবশ্যই এমন ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে যেন তিনি মিথ্যা ও জালিয়াতি থেকে নিরাপদ থাকেন, তবে সব বিষয়েই তাকে ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে এমনটি জরুরি নয়।(৩)

এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি হলো—সাক্ষ্য গ্রহণ করা সত্যের প্রবল ধারণা ও এর প্রাধান্যের ওপর নির্ভরশীল। এটি এমন কোনো উচ্চ পদমর্যাদা বা সম্মানসূচক পদ নয় যে তারা এর যোগ্য হবে না।(৪)

এরই ওপর ভিত্তি করে বিবাহের অভিভাবকত্বের ন্যায় ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠতা বা আদালাত শর্ত করা হয় না। কারণ স্নেহ-মমতা এবং অভিভাবকের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি তাকে তার অধীনস্থের অধিকারের ক্ষেত্রে অবহেলা করা থেকে বিরত রাখে।(৫)

টীকা:
(১) দেখুন: সিনওয়ানুল কাজা ওয়া উনওয়ানুল ইফতা ২/১৩২।
(২) দেখুন: আদাবুল কাজা, ইবনু আবিল দাম ১/৩৮৩-৩৮৪; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/৪৬৮-৪৬৯; তাবসিরাতুল হুক্কাম ২/১০।
(৩) দেখুন: আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/৪৬৭-৪৬৮; তাবসিরাতুল হুক্কাম ৯/২; আশ-শারহুল মুমতি, ইবনু উসাইমিন ১১/৫৮৫-৫৮৬।
(৪) ইবনুল ওয়াযীর 'আর-রওজুল বাসিম' গ্রন্থে এর বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন: ৪৯৯-৫০২।
(৫) দেখুন: আল-কাওয়াইদুল কুবরা ১/১০৯।

এই কারণেই কোনো কোনো ফকিহ এই মত পোষণ করেছেন যে, ফাসিক (পাপাচারী) ব্যক্তি যদি প্রভাবশালী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ তার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে কেউ তাকে অর্থের বিনিময়ে প্ররোচিত করার সাহস পায় না এবং তার ব্যক্তিত্বের কারণে সে স্বার্থহীনভাবে মিথ্যাচার করে না। ফলে এ ধরনের ব্যক্তির সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জিত হয়। আর ন্যায়নিষ্ঠার (আদালাত) শর্তারোপের মূল উদ্দেশ্য হলো তার সত্যবাদিতার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া, যা এখানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।(১)

পঞ্চম: শাসনের ক্ষেত্রে যোগ্যতমের (আসলহ) শর্তটি বিবেচনা করা। শাসকের অন্যতম দায়িত্ব হলো মুসলমানদের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদের জন্য সময় ও স্থানভেদে বিদ্যমান ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইমামের দায়িত্ব সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন:

“তার দায়িত্ব হলো কেবল বিদ্যমান ব্যক্তিদের মধ্যে যে সবচেয়ে যোগ্য তাকেই নিয়োগ দেওয়া। কখনো হয়তো সংশ্লিষ্ট পদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যাবে না, এমতাবস্থায় প্রতিটি পদের জন্য পর্যায়ক্রমে তুলনামূলক অধিক যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে। পূর্ণ প্রচেষ্টার (ইজতিহাদ) পর যদি তিনি যথাযথভাবে দায়িত্ব অর্পণ করেন, তবে তিনি আমানত রক্ষা করেছেন এবং তার কর্তব্য পালন করেছেন। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর নিকট ন্যায়পরায়ণ ইমামদের অন্তর্ভুক্ত হবেন; যদিও অন্যের কারণে কোনো কোনো বিষয়ে বিচ্যুতি ঘটে থাকে।”(২)

এখানে জোর দিয়ে বলা আবশ্যক যে, এই বিষয়টি বিবেচনা করার অর্থ এই নয় যে, সম্ভব হলে পরিস্থিতি সংশোধনের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা হবে। কারণ, “জরুরি প্রয়োজনে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া বৈধ হলেও (যদি সে বিদ্যমানদের মধ্যে তুলনামূলক

যোগ্য হয়), তবুও পরিস্থিতির উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা ওয়াজিব, যাতে প্রশাসনিক ও নেতৃত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও পূর্ণতা অর্জিত হয়।”(৩)

- অনিষ্ট কমানোর প্রচেষ্টায় জালিম প্রশাসনের অধীনে দায়িত্ব গ্রহণ:

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহর নিকট উপস্থাপিত এবং তার বিভিন্ন লেখনীতে বর্ণিত একটি মাসআলা হলো—যেসব প্রশাসনিক পদে জুলুম এবং অবৈধ সম্পদ বণ্টন বিদ্যমান, সেসব পদের দায়িত্ব গ্রহণ করার বিধান সংক্রান্ত।

(১) এটি ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণিত একটি অভিমত, অন্যরা এটিও বলেছেন। দেখুন: সিনওয়ানুল কাজা ২/১৩৮, ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম ৭/৩৭৫, আদাবুল কাজা, ইবনু আবিল দাম ১/৩৮৪, আর-রওদুল বাসিম ৫০৩-৫০৪।
(২) আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৩।
(৩) আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩।

সংশোধন, ন্যায়বিচার এবং জুলুম লাঘব করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য (পদত্যাগ করা) হারাম। এ বিষয়ে শাইখকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন:

“যদি সে সামর্থ্য অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এবং জুলুম দূর করতে সচেষ্ট হয়, এবং তার শাসনভার অন্যদের তুলনায় মুসলমানদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর ও সংশোধনমূলক হয়, আর জায়গির বা ভূসম্পত্তির (ইকতা) উপর তার নিয়ন্ত্রণ অন্যের নিয়ন্ত্রণের চেয়ে উত্তম হয় যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে—তবে তার জন্য শাসন ক্ষমতা ও জায়গিরের উপর বহাল থাকা জায়েজ এবং এতে তার কোনো গুনাহ হবে না। বরং ক্ষমতা ত্যাগ করে এর চেয়ে উত্তম কোনো কাজে নিয়োজিত না হলে তার পদে বহাল থাকাই শ্রেয়। এমনকি যদি অন্য কোনো সক্ষম ব্যক্তি তা পালনের জন্য না থাকে, তবে তার জন্য পদে থাকা ওয়াজিব বা আবশ্যক হতে পারে। কেননা সাধ্যানুযায়ী ন্যায়বিচার প্রচার করা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী জুলুম দূর করা ফরজে কিফায়া; অন্য কেউ যদি সেই দায়িত্ব পালন না করে, তবে প্রত্যেক মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী তা আঞ্জাম দেবে। এমতাবস্থায়, জুলুম দূর করার ক্ষেত্রে যে বিষয়ে সে অপারগ, সে সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না।” (১)

অন্য এক প্রসঙ্গে শাইখ এই বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন যে, একজন সংশোধনকামী শাসক বা পদাধিকারী হয়তো কিছু হক আদায় করতে অক্ষম হতে পারেন অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলতে পারেন; তবে এটি তাকে বৃহত্তর জনকল্যাণ সাধন থেকে বিরত রাখবে না। তিনি বলেন:

“যদি কেউ সাধারণ রাজক্ষমতা বা এর কোনো শাখা যেমন নেতৃত্ব, শাসনভার, বিচারকার্য বা অনুরূপ কোনো পদের দায়িত্বশীল হয়; এবং তার পক্ষে সকল ওয়াজিব পালন করা এবং সকল হারাম বর্জন করা সম্ভব না হয়, তবে সে যদি এমন ন্যায়বিচার করার সংকল্প করে যা অন্য কোনো সক্ষম ব্যক্তি করবে না—তবে তার জন্য সেই দায়িত্ব গ্রহণ করা জায়েজ, এমনকি কখনো তা ওয়াজিবও হতে পারে। কারণ শাসনকার্য যদি এমন সব ওয়াজিব কাজের অন্তর্ভুক্ত হয় যার মাধ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (ফাই) বণ্টন, দণ্ডবিধি কার্যকর করা এবং জনপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো জনকল্যাণ সাধিত হয়, তবে সেই দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায়, যদি সেই দায়িত্ব পালনের জন্য অযোগ্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া, কিংবা যা জায়েজ নয় তা গ্রহণ করা অথবা যাকে দেওয়া উচিত নয় তাকে কিছু প্রদান করা অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং এগুলো বর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব না হয়—তবে বিষয়টি এমন মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হবে যে, ‘ওয়াজিব বা মুস্তাহাব কাজ যা ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়, তাও (শর্তসাপেক্ষে) ওয়াজিব বা মুস্তাহাব’। সুতরাং এটি ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হবে যদি এর দ্বারা সৃষ্ট অনিষ্ট উক্ত

ওয়াজিব বা মুস্তাহাব কাজের কল্যাণের চেয়ে কম হয়।” (২)

(১) মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩০/৩৫৭; এবং অনুরূপ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৯/৩৫-৩৩।
(২) মাজমুউল ফাতাওয়া, ২০/৫৫; শাইখ এই পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন; দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া, ২০/৪৮-৬১।

এখানে শায়খ শারয়ী বিধানগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, নতুবা তা ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করা বা হারাম কাজ করার কারণ হতে পারে: **(অন্যথায়, যে ব্যক্তি কোনো কাজ করা বা না করার মধ্যে বিদ্যমান শারয়ী কল্যাণ ও শারয়ী অকল্যাণের ভারসাম্য রক্ষা করে না, সে অনেক ওয়াজিব ত্যাগ করতে পারে এবং হারাম কাজ করতে পারে এবং একে তাকওয়া মনে করতে পারে। যেমন কেউ জালেম শাসকদের সাথে জিহাদ বর্জন করে এবং একে তাকওয়া মনে করে, কিংবা বিদআত বা পাপাচার রয়েছে এমন ইমামদের পেছনে জুমুআ ও জামাত ত্যাগ করে এবং একে তাকওয়া মনে করে, এবং সত্যবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণে ও আলিমের কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণে বিরত থাকে তার মধ্যে বিদ্যমান কোনো গোপন বিদআতের কারণে)**(১)।

যখন শায়খকে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যার ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রয়েছে এবং সে তা রক্ষায় সচেষ্ট, কিন্তু যারা এর প্রাপ্য নয় তাদের পেছনে তা ব্যয় করার যে প্রতিকূলতা সামনে আসে তা মোকাবিলা করতে সে অক্ষম; এমতাবস্থায় সে কি নিজেকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে?

শায়খ উত্তর দিলেন: **(কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন শরিয়ত এসেছে দুটি কল্যাণের মধ্যে বৃহত্তরটি অর্জনের জন্য ক্ষুদ্রতরটি হাতছাড়া করার মাধ্যমে, এবং দুটি অকল্যাণের মধ্যে ক্ষুদ্রতরটি বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে বৃহত্তরটি প্রতিহত করার জন্য। সুতরাং, এই ওয়াকফকৃত সম্পদ এবং এর শারয়ী ব্যয়ের খাতসমূহ থেকে বড় ধরনের অকল্যাণ যদি কেবল উল্লেখিত পন্থায়—অর্থাৎ সামান্য অকল্যাণ সহ্য করার মাধ্যমেই—প্রতিহত করা সম্ভব হয়, তবে সেটিই শারয়ীভাবে ওয়াজিব হবে)**(২)।

এখানে কিছু মানুষের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হতে পারে এবং তারা আশ্চর্যান্বিত হতে পারে যে, যুলুমকে মেনে নেওয়া এবং পাপ ও অন্যায়ে সহযোগিতার শামিল হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এই জাতীয় কাজ বৈধ হতে পারে। তাই শায়খ এই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য বলেন:

(পাপ ও অন্যায়ে সহযোগী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে জালেমকে তার যুলুমের কাজে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মাজলুমকে তার ওপর থেকে যুলুম লাঘব করতে সাহায্য করে, অথবা তার পাওনা আদায় করে দিতে সাহায্য করে, সে হচ্ছে মাজলুমের প্রতিনিধি; সে...)

---

(১) মাজমুউল ফাতাওয়া ১০/৫১২, আরও দেখুন: কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে ভারসাম্যের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে 'আল-ইস্তিকামাহ' ২/২১১-২২০। আর যেহেতু এই ভারসাম্যের প্রয়োগ কিছু শারয়ী ওয়াজিব ও হারামের ক্ষেত্রে শিথিলতার অজুহাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাই শায়খ এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যা এই জটিলতা দূর করে, দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ১৪/৪৬৯-৪৭৮।
(২) মাজমুউল ফাতাওয়া ৩১/৯২।

জালিমের উকিল সেই ব্যক্তির সমপর্যায়ের, যে তাকে ঋণ দেয় অথবা জালিমের নিকট অর্থ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর উদাহরণ হলো এতিম বা ওয়াকফ সম্পত্তির অভিভাবক; যখন কোনো জালিম তার কাছে অর্থ দাবি করে, তখন সে সাধ্যমতো তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে—হয়তো তাকে বা অন্য কাউকে দাবিকৃত অর্থের চেয়ে কম দিয়ে—তবে সে একজন মুহসিন (সদাচারী), আর সদাচারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে (অভিযোগের) কোনো পথ নেই।

অনুরূপভাবে মালিকের উকিল—যেমন দালাল, লেখক এবং অন্যান্যরা—যারা চুক্তি সম্পাদন, অর্থ গ্রহণ এবং তাদের নিকট দাবিকৃত অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব পালন করে; তারা জালিমদের পক্ষে অর্থ আদায়ের জন্য উকিল হবে না।

তদ্রূপ যদি কোনো গ্রাম, মহল্লা, বাজার বা শহরের অধিবাসীদের ওপর কোনো জুলুম (অযৌক্তিক কর বা জরিমানা) চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো নেককার ব্যক্তি তা প্রতিহত করার জন্য সাধ্যমতো মধ্যস্থতা করে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তা ইনসাফের সাথে বণ্টন করে দেয়—নিজের বা অন্য কারো প্রতি কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করে এবং কোনো ঘুষ গ্রহণ না করে—তাদের পক্ষ থেকে তা প্রতিহত করার এবং পরিশোধ করার দায়িত্ব পালন করে, তবে সে মুহসিন হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু সাধারণত যারা এই কাজে লিপ্ত হয়, তারা জালিমদের উকিল হয়ে থাকে; তারা পক্ষপাতিত্ব করে, ঘুষ খায়, যাদের ইচ্ছা সুরক্ষা দেয় এবং যাদের ইচ্ছা তাদের থেকে অর্থ গ্রহণ করে (১)।

শাইখ একটি ব্যাপক ফিকহী ও উপদেশমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ করছেন:

(সুতরাং একজন মুসলিমের ওপর আবশ্যক হলো তার সাধ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে চেষ্টা করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য, যথাসাধ্য দ্বীন কায়েম এবং মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সেই দায়িত্বে থেকে সাধ্য অনুযায়ী ওয়াজিবসমূহ পালন করে ও হারাম বিষয়গুলো বর্জন করে, তবে সে যা করতে অক্ষম তার জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। কেননা পাপাচারীদের নিয়োগের চেয়ে পুণ্যবানদের নিয়োগ উম্মাহর জন্য কল্যাণকর। আর যে ব্যক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা ও জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করতে অক্ষম, সে যদি তার সাধ্য অনুযায়ী কাজ করে—যেমন অন্তরে কল্যাণকামনা পোষণ করা, উম্মাহর জন্য দোয়া করা, কল্যাণকে ভালোবাসা এবং সাধ্যমতো ভালো কাজ করা—তবে তাকে তার সাধ্যাতীত বিষয়ের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হবে না। কেননা দ্বীনের ভিত্তি হলো হেদায়েত দানকারী কিতাব এবং সাহায্যকারী লোহা, যেমনটি আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন)(২)।

---

(১) আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ৬৭; এবং অনুরূপ আলোচনার জন্য দেখুন: জামিউল মাসায়িল ৯/৩৪১-৩৪২।
(২) আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ১৯৭; আর শরীয়ত কায়েমে অক্ষম ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ১৯/২১৯-২২৭।

- নফল বা মুস্তাহাব কার্যাবলীতে ইমামের আনুগত্য:

ফকীহগণ এই বিধান নিয়ে আলোচনা করেছেন যে, ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) যদি কোনো মুস্তাহাব বিষয়ের নির্দেশ দেন, তবে আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়ার কারণে তা কি পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে?

হানাফী ফকীহগণ এটি ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। আল-হামাভী বলেন: (গ্রন্থকার—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—'শারহুল কানয' গ্রন্থে আমাদের ইমামগণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: পাপাচার নয় এমন বিষয়ে ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব। সুতরাং ইমাম যদি একদিন রোজা রাখার নির্দেশ দেন, তবে তা পালন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে)(১)।

মালিকীগণও অনুরূপ মত উল্লেখ করেছেন, তবে তাঁরা রোজার পরিবর্তে সদকার মতো কিছু মুস্তাহাব বিষয়ের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং ইমাম যদি তাঁদের সদকা করার নির্দেশ দেন, তবে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে(২)।

শাফিঈগণ এই মাসআলাটি নিয়ে অধিক আলোচনা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁরা ইমামের নির্দেশটি ধর্মীয় নিদর্শনের (শাআইর) সাথে সংশ্লিষ্ট কি না, তার ভিত্তিতে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা নিদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়টিকে অধিক শক্তিশালী ও বাধ্যতামূলক হিসেবে গণ্য করেছেন।

ইমাম যারকাশী এই মতভেদ বর্ণনা করে বলেন: (ইমামের নির্দেশে কি তা ওয়াজিব হবে? বিষয়টি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ: যদি তা প্রকাশ্য ধর্মীয় নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে ওয়াজিব হবে, যেমন অনাবৃষ্টির সময় তিনি যদি তাঁদের 'ইসতিসকা' (বৃষ্টির সালাত) আদায়ের নির্দেশ দেন তবে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যদি তা প্রকাশ্য নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত না হয় তবে ওয়াজিব হবে না, যেমন তিনি যদি তাঁদের দাসমুক্ত করা বা নফল সদকা করার নির্দেশ দেন)(৩)।

শাফিঈ মাযহাবের (অন্যতম) অভিমত হলো এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য না করা এবং নফল বা মুস্তাহাব বিষয়ের ক্ষেত্রে ইমামের নির্দেশ যেকোনো অবস্থাতেই পালন করা ওয়াজিব। ইমাম নববী বলেন: (মুহতাসিব তাঁদের ঈদের সালাতের নির্দেশ দেবেন; এখন প্রশ্ন হলো এটি কি ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব? এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে।)

---

(১) গাময উয়ুনিল বাসাইর ১/৩৭৩, এবং দেখুন: হাশিয়া ইবনে আবিদিন ৫/৪২২।
(২) দেখুন: হাশিয়া আল-আদাবী আলা শারহিল খারাশী ২/১১২।
(৩) আল-বাহরুল মুহীত ১/৩৮৬।

আমি বললাম: সঠিক মত হলো নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব, যদিও আমরা বলি যে ঈদের সালাত সুন্নাত; কারণ সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া মানেই আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া, বিশেষ করে যা একটি প্রকাশ্য নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। (১)

ইমাম নববী রহ. বলেছেন: (যার কাছে নির্দেশ পৌঁছেছে, সে যদি সিয়াম পালনে সক্ষম হয় তবে কি তার ওপর সিয়াম পালন ওয়াজিব হবে? উত্তর: হ্যাঁ! তা ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি এটি লঙ্ঘন করবে সে গুনাহগার হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন: **"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলুল আমর (কর্তৃত্বের অধিকারী) তাদেরও"** [সূরা আন-নিসা: ৫৯]। আর এখানে নির্দেশটি ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে। এছাড়া উলুল আমরের আনুগত্যের ব্যাপারে সহীহ হাদীসসমূহও বিদ্যমান রয়েছে)। (২)

তাঁরা বলেন: যদি তিনি (শাসক) ইস্তিসকার (বৃষ্টি প্রার্থনার) জন্য তিন দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তবে তাদের ওপর সিয়াম

পালন আবশ্যক হয়ে যাবে। (৩) এবং (সিয়ামটি সত্তাগতভাবেই ওয়াজিব হয়ে যায়, শাসকের বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ করার কারণে নয়; কারণ নিয়তের ব্যাপারে শাসকের কোনো অবগতি নেই)। (৪)

কিছু শাফেঈ আলিম এই মত পোষণ করেছেন যে, ইস্তিসকা বা সিয়াম কোনোটিই তাদের ওপর আবশ্যক হয় না। (৫)

তবে আমরা যদি হাম্বলী মাযহাবের দিকে ফিরে তাকাই, তবে দেখব যে চিত্রটি অন্য তিনটি মাযহাবের চেয়ে ভিন্ন। ইবনে মুফলিহ বলেন: (তাঁদের বক্তব্যের প্রকাশ্য দিক হলো: শাসকের নির্দেশে সিয়াম আবশ্যক হয় না)। (৬)

অতঃপর তিনি মুস্তাহাব বিষয়ের নির্দেশকে গুনাহ নয় এমন কাজে আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফকীহদের সাধারণ বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপর তিনি এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলেন: (সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো: রাজনীতি, পরিচালনা এবং ইজতিহাদী বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে, ঢালাওভাবে সব ক্ষেত্রে নয়। এই কারণেই তাঁদের কেউ কেউ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন: আনুগত্যের ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব হবে, সুন্নাত কাজের ক্ষেত্রে সুন্নাত হবে এবং মাকরুহ কাজের ক্ষেত্রে মাকরুহ হবে)। (৭)

---

(১) রওদাতুত তালিবীন ১০/২১৭।
(২) ফাতাওয়া আন-নববী ৬৩।
(৩) দেখুন: তুহফাতুল মুহতাজ ৩/৬৮, নিহায়াতুল মুহতাজ ২/৪১৫, আসনী আল-মাতালিব ১/২৮৯।
(৪) আল-ফাতাওয়া আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুবরা ১/২৭৯; শাফেঈদের নিকট মাসআলাটির শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে দেখুন: ইযহাহুল বুরহান ফী আস-সানা আলা আস-সুলতান, লি-ইলমিদ দ্বীন আল-বালকিনী, রাসায়িল আল-বালকিনিয়্যাহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত, দ্বিতীয় সেট ৫০২-৫০৫।
(৫) দেখুন: কিফায়াতুন নাবীহ ৪/৫১৭, আসনী আল-মাতালিব ১/২৮৯।
(৬) আল-ফুরু ৩/২২৭।
(৭) আল-ফুরু ৩/২২৭।

কতিপয় হাম্বলি আলিম জুমহুর বা সংখ্যাধিক্য আলিমের মতের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন: তা ওয়াজিব (১)।

এখান থেকে আমরা এই সারসংক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি যে, ফিকহি মতামতের দুটি ধারা রয়েছে:

প্রথম: যারা এই মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) আমলগুলো পালন করা ওয়াজিব মনে করেন। এটিই জুমহুর এবং কতিপয় হাম্বলি আলিমের মাযহাব।

দ্বিতীয়: যারা একে ওয়াজিব মনে করেন না। এটি হাম্বলি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত এবং কতিপয় শাফিঈ আলিমের অভিমত।

এই আলোচনার মূল ভিত্তি হলো সুপ্রতিষ্ঠিত একটি মূলনীতি: ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব যতক্ষণ না তিনি কোনো পাপের নির্দেশ দেন। সুতরাং তিনি যদি কোনো পাপের নির্দেশ দেন, তবে সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা অনুযায়ী) তার আনুগত্য করা যাবে না (২)। অনুরূপভাবে তিনি যদি কোনো মাকরুহ (অপছন্দনীয়) কাজের নির্দেশ দেন, তবেও তার আনুগত্য করা হবে না; কারণ এটি 'মারূফ' বা কল্যাণকর কাজের অন্তর্ভুক্ত নয় (৩)।

এই কারণেই আনুগত্যের পরিধি ওয়াজিব, মুস্তাহাব এবং মুবাহ (বৈধ) বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে:

আল-হাত্তাব আর-রুয়াইনি আল-মালিকি বলেন: (এর দ্বারা তিনি সেই বিষয়কে বুঝিয়েছেন যা মন্দ বা পাপের কাজ নয়। ফলে এতে ওয়াজিব আনুগত্য, মুস্তাহাব এবং শরিয়ত সম্মত বৈধ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব শাসক যদি কোনো বৈধ বিষয়ে আদেশ করেন, তবে সে ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং তার বিরোধিতা করা বৈধ থাকে না) (৪)। এটি চার মাযহাবেরই একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয় (৫)।

এখানে এটি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, শাসকের কর্মকাণ্ড জনকল্যাণের (মাসলাহাত) সাথে সম্পৃক্ত এবং তা সাধারণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে দায়বদ্ধ। যারা মুস্তাহাব বিষয়সমূহ (শাসকের আদেশে) ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন, তাদের সেই বক্তব্যের দুটি সম্ভাব্য অর্থ হতে পারে:

---

(১) তিনি ইবনু কাযিল জাবাল; দেখুন: আল-ইনসাফ ২/৪৫৪।
(২) পাপের কাজে আনুগত্য না করার ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্যের বর্ণনার জন্য দেখুন: শারহুস সুন্নাহ, মুজানি-কৃত ৮৬; শারহু সহিহিল বুখারি, ইবনু বাত্তাল-কৃত ৮/২১৫; আত-তামহিদ, ইবনু আবদিল বার-কৃত ২৩/২৭৭; আল-ইকনা ফি মাসাইলিল ইজমা ১/৬১; মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৫৮; আল-ইনসাফ ২/৪৫৪; উমদাতুল কারি ২১/৪৭৪।
(৩) দেখুন: হাশিয়াতুশ শিরওয়ানি ৩/৭১; মাওয়াহিবুল জলিল ৬/২৭৯; শারহু মুখতাসারি খলিল ৮/৬০।
(৪) মাওয়াহিবুল জলিল ৬/২৯৭।
(৫) দেখুন: বাদাউস সানাই ৭/৯৯-১০০; হাশিয়াতু ইবনি আবিদিন ২/১৮৫ ও ৫/১৬৭; আল-ইস্তিজকার ৫/১৩৪; আল-বায়ান ওয়াত তাহসিল ৩/৬৩; আত-তাজ ওয়াল ইকলিল ৮/৯১; শারহু মুখতাসারি খলিল, আল-খারশি-কৃত ২/১১২; রওদাতুত তালিবিন ১০/৪৭; আসনা আল-মাতালিব ১/২৮৯; তুহফাতুল মুহতাজ ৩/৭১; আল-মুগনি ৯/১৬৫।

প্রথম সম্ভাবনা: এটি এমন নির্দিষ্ট নফল (মানদুব) কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট যেগুলোর মধ্যে জনকল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর এখান থেকেই নফল কার্যাবলীর ক্ষেত্রে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। যারা এগুলোকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন, তারা জনকল্যাণের উপস্থিতির পাশাপাশি শাসকের আনুগত্যের আবশ্যকতাকেও বিবেচনায় নিয়েছেন। আর যারা এগুলোকে ওয়াজিব বলেননি, তারা মনে করেছেন যে এগুলো জনকল্যাণের সম্ভাব্য ক্ষেত্র নয়। সুতরাং আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো এমন সব নির্দিষ্ট নফল আমল যা এই ধরনের জনকল্যাণের সম্ভাবনা রাখে, যেমন সেসব নিদর্শন (শাআইর) যেগুলোর জন্য মানুষ সমবেত হয়—উদাহরণস্বরূপ ইস্তিসকা (বৃষ্টির প্রার্থনা), ঈদ এবং এর অনুগামী ইবাদতসমূহ।

অতএব, আলোচনার মূল ক্ষেত্র হলো এমন সব নফল কার্যাবলী যা জনকল্যাণের উপযোগী। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে হাম্বলিদের কর্মপন্থা অধিকতর সূক্ষ্ম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা রোজা ও সদকা হলো নিছক ইবাদত, যা শাসকের রাজনৈতিক পরিচালনা বা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত নয়। এগুলোর ক্ষেত্রে নবী (সা.)-এর যুগে যা বিদ্যমান ছিল—অর্থাৎ মানুষকে এগুলোর প্রতি উৎসাহিত করা এবং এগুলোর ফযিলত স্মরণ করিয়ে দেওয়া—তা-ই যথেষ্ট। মানুষের ওপর এগুলো বাধ্যতামূলক করার মতো কোনো যৌক্তিক দাবি নেই।

আর দায়িত্বশীলদের আনুগত্যের নির্দেশের সাধারণ অর্থ দিয়ে এটিকে ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলিল পেশ করা সঠিক নয়। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: **"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলুল আমর (নেতৃত্বদানকারী) তাদেরও আনুগত্য করো।"** [সূরা আন-নিসা: ৫৯]। কারণ এটি বিরোধপূর্ণ বিষয় দিয়েই দলিল পেশ করার নামান্তর। কেননা আলোচনার মূল বিষয়ই হলো—এই আনুগত্যের নির্দেশ কি এই ক্ষেত্রটিকেও অন্তর্ভুক্ত করে কি না? যদি এটি আনুগত্য হিসেবে স্বীকৃতই হতো, তবে কোনো মতভেদ থাকত না। তবে যদি বলা হয় যে, এটি আনুগত্য সম্পর্কিত সাধারণ দলিলের ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং এটি এই ক্ষেত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করে, তবে এর উত্তর হবে যা ইবনে মুফলিহ উল্লেখ করেছেন—অর্থাৎ এটি মেনে না নেওয়া। কারণ আনুগত্য একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, এটি সবকিছুর ক্ষেত্রে সাধারণ নয়।

তাই এর সপক্ষে স্বতন্ত্র দলিলের প্রয়োজন। সুতরাং আনুগত্য কেবল ন্যায়সঙ্গত (মারুফ) কাজের সাথেই সংশ্লিষ্ট (১)।

আর যেসব ধর্মীয় নিদর্শনের জন্য মানুষ সমবেত হয়, সেগুলোর এমন একটি দিক থাকতে পারে যা রক্ষা করা আবশ্যক। তা হলো, শাসক যদি তাদের এমন কোনো নির্দেশ দেন যাতে জনকল্যাণ নিহিত থাকে, তবে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব। সুতরাং এই নিদর্শনসমূহ কায়েম করার জন্য তাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ হলো সেই সাধারণ জনকল্যাণেরই অংশ যা দ্বীন অপরিহার্য করেছে। অতএব, এটি আনুগত্য পাওয়ার অধিকতর যোগ্য। তাই এক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার মতটির যৌক্তিকতা রয়েছে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এটি ফরজে কিফায়ার (সামষ্টিক আবশ্যকতা) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ব্যক্তিগতভাবে (ফরজে আইন) যেন তা আবশ্যক না হয়।

---

(১) বৈধ বিষয়সমূহে আনুগত্যের সীমা এবং ফরজে কিফায়ার ক্ষেত্রে দেখুন: রাসাইলু আবি আলি আল-ইউসি ১/২২০-২২১ এবং ২২৪-২২৬।

ফকিহগণ এখানে যা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে: যদি মানুষ সালাতকে তার শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে শাসকের পক্ষে তাদেরকে তা দ্রুত আদায়ের নির্দেশ দেওয়ার অবকাশ রয়েছে, যাতে মানুষ বিলম্বে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে এবং ভুলবশত মনে না করে যে এটাই সালাতের ওয়াক্ত (১)।

অনুরূপভাবে, যদি শাসক তাদেরকে জুমার সালাত তার প্রশস্ত ওয়াক্তের শুরুর দিকে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন (২)। এক্ষেত্রে ওয়াজিব বা আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়া সংগত, কারণ এতে সুস্পষ্ট জনস্বার্থ (মাসলাহাহ) বিদ্যমান রয়েছে।

এর চেয়েও জোরালো বিষয় হলো যদি কোনো মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) বিষয়ের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বাস্তবায়িত হয়। যেমন—ইমাম বা শাসক যদি ফরজে কিফায়া পালনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন; মূলত এটি মুস্তাহাব হলেও ইমাম কাউকে নির্দিষ্ট করে দিলে তা উক্ত ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হয়ে যায় (৩)।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা: এটি সমস্ত মুস্তাহাব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে আপত্তি বা জটিলতা আরও প্রবল হবে এবং আনুগত্যের সাধারণ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আরও সুদূরপরাহত হবে। কারণ মুস্তাহাব কার্যের বিধান শরিয়তে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যে বিষয়ে কোনো সাধারণ জনস্বার্থ নেই, সেখানে শুধুমাত্র শাসকের আদেশের কারণে সেটি ওয়াজিব হওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

ইমাম বা শাসকের অনুপস্থিতিতে বিধানাবলি:

শরিয়তের অনেক বিধান ইমাম বা শাসকের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনা তাঁর উপস্থিতির সাথে জড়িত। তবে এই বাস্তবতা সবসময় এবং সব স্থানে সহজলভ্য নাও হতে পারে। এমতাবস্থায় যদি কিছু মুসলিম এমন পরিবেশে বসবাস করে যেখানে কোনো নির্দিষ্ট শাসক তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন না, তবে তারা কী করবে?

এখানে জনৈক ফকিহগণ একটি রাজনৈতিক ফিকহি নীতি নির্ধারণ করেছেন, যা হলো: ইমাম বা শাসকের অনুপস্থিতিতে সাধারণ মুসলিম জামাত তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে (৪)।

ইমাম খলীল তাঁর প্রসিদ্ধ 'মুখতাসার' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করে বলেছেন: (নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য বিষয়টি কাজী, ওয়ালি বা শাসক এবং পানির তত্ত্বাবধায়কের কাছে পেশ করার অধিকার রয়েছে; আর তারা না থাকলে মুসলিম জামাতের কাছে পেশ করবে)। অনেক ব্যাখ্যাকারক এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন...

(১) দেখুন: আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আল-মাওয়ারদী ৩৫৬; আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আল-ফাররা ২৮৮।
(২) তুহফাতুল মুহতাজ ২/৪১৯।
(৩) দেখুন: আহকামুল কুরআন, আল-কিয়া আল-হাররাসী ৪/২০৪; আত-তাওদিহ ফী শারহিত তানকীহ ১/৪২১; আল-বাহরুল মুহীত ১/২৫১।
(৪) দেখুন: আজওয়িবাতুল আবদসী ৪২৫।

পৃষ্ঠা 329

বাক্যটি এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, ইমামের অনুপস্থিতিতে মুসলিম জামাত (জনসমষ্টি) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে (১)।

মালিকী ফকীহগণের নিকট এই পরিভাষাটির ব্যবহার বেশ প্রচলিত। তাঁদের নিকট মূলনীতি হলো: **"সুলতানের অনুপস্থিতিতে যে মুসলিম জামাতের ওপর বিষয়াবলি অর্পিত হয়, সুলতানের শাসনের অধীনে যা কিছু করা বৈধ ছিল, সেই সংক্রান্ত তাদের সঠিক ও সুচারুরূপে সম্পাদিত সকল সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে"** (২)। আর এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা সৃষ্টি না করে হদ (নির্ধারিত দণ্ডবিধি) কায়েম করা সম্ভব হয়। কিন্তু যদি তা বিশৃঙ্খলার দিকে ধাবিত করে, তবে তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই (৩)।

কতিপয় ফকীহ এই মত পোষণ করেছেন যে, শাসকদের অনুপস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জন্য হদ বা শাসকদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো কার্যকর করার অধিকার নেই। আস-সামনানী বলেন:

"যদি কোনো যুগ ইমাম ও বিজয়ী শাসক থেকে শূন্য হয়ে যায়—তর্কের খাতিরে এমনটা ধরে নেওয়া হলে—তবে ইমামের উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষের ওপর যে সকল বিধান আবশ্যক ছিল, তাঁর অনুপস্থিতিতেও সেগুলো তাদের ওপর আবশ্যক থাকবে। আর যে সকল বিধান ইমামের উপস্থিতিতে তাদের ওপর আবশ্যক ছিল না কিংবা তাদের জন্য করা বৈধ ছিল না, ইমামের অনুপস্থিতিতেও সেই কাজগুলো করার ব্যাপারে তারা আদিষ্ট হবে না। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো: জাকাত, সালাত এবং অন্যান্য ইবাদতসমূহ যা তারা এককভাবে আদায় করে, এবং ঐ সকল চুক্তি যা তারা সম্পাদন করে। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো: হদ, চুরির দায়ে হাত কাটা, জিজিয়া ধার্য করা, মৃত ভূমি আবাদ করা এবং ঐ সকল বিষয় যা ইমামের ওপর ন্যস্ত থাকে। কেননা, তারা একে অপরের ওপর এগুলো প্রয়োগ করতে পারে না এবং একে অপরের থেকে তা গ্রহণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে বিচারকার্য পরিচালনা ও এর দায়িত্বভার গ্রহণ করাও এরই অন্তর্ভুক্ত" (৪)।

এর ওপর ভিত্তি করে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা তৈরি হয়েছে, যা কাফেরদের দখলে থাকা দেশগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট; কাফের শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ঐ সকল বিচারকের বিধান কী, যারা মুসলমানদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করেন?

একদল ফকীহ মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় তাঁর (বিচারকের) নিয়োগ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট মত প্রদান করেছেন, যদিও...

(১) দেখুন: আত-তাজ ওয়াল ইকলিল ৫/৪৯৮; শারহুয যুরকানী আলা মুখতাসারি খলিল ৪/৩৭৬; মিনাহুল জলিল ৪/৩১৮।
(২) আল-মি'ইয়ারুল মু'রিব ১০/১০২-১০৩; আরও দেখুন: মাওয়াহিবুল জলিল ৪/১৯৯; আশ-শারহুল কবির লিল-দারদির ২/৪৩৬।
(৩) আহকামুল কুরআন লিল-কিয়া আল-হাররাসী ২/২৯২; আহকামুল কুরআন লি-ইবনিল ফারাস ৩/৩২৯; এই বিষয়ে ইবনে তাইমিয়্যাহর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৪/১৭৫-১৭৬।

(৪) রওদাতুল কুদাত ওয়া তরিকুন নাজাত ১/৭৮।

...এটি কোনো কাফিরের পক্ষ থেকে জারি হয়েছিল যার মুসলিমদের ওপর কোনো অভিভাবকত্ব নেই, কেননা উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

ইমাম আল-মাযিরীকে সিসিলির বিচারকের পক্ষ থেকে আসা বিচারকার্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যেখানে মুসলিমরা কাফিরদের অধীনে বসবাস করছিল। তিনি বললেন: **(মানুষকে একে অপরের থেকে বিরত রাখার জন্য কাফির কর্তৃক বিচারক, আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) ও অন্যদের নিয়োগ করা ওয়াজিব, এমনকি মাযহাবের কোনো কোনো ফকীহ দাবি করেছেন যে এটি যুক্তিগতভাবেও ওয়াজিব। যদিও এই বিচারককে কাফির কর্তৃক নিয়োগ দেওয়াটি বাতিল, কিন্তু যদি প্রজারা তার দাবি জানায় এবং সে প্রয়োজনের খাতিরে তাদের জন্য তাকে নিয়োগ দেয়, তবে তা তার বিচার বা হুকুম কার্যকরের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি করবে না, ঠিক যেমনটি হতো যদি কোনো মুসলিম সুলতান তাকে নিয়োগ দিত)**।(১)

আল-ইযয বিন আব্দুস সালাম বলেন: **(যদি কাফিররা কোনো বিশাল ভূখণ্ড দখল করে নেয় এবং সেখানে এমন কাউকে বিচারকার্যের দায়িত্ব দেয় যে মুসলিমদের সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজগুলো সম্পন্ন করে, তবে বাহ্যত এই সবকিছুই কার্যকর করা হবে জনকল্যাণ সাধন এবং ব্যাপক ফিতনা-ফাসাদ দূর করার লক্ষ্যে। কেননা শরীয়তের রহমত এবং বান্দাদের কল্যাণের প্রতি তার লক্ষ্য রাখার বিষয়টি থেকে এটি অনেক দূরে যে, সাধারণ জনকল্যাণকে অচল করে দেওয়া হবে এবং ব্যাপক ফিতনা-ফাসাদ সহ্য করা হবে কেবল এই কারণে যে, নিয়োগদানকারীর মধ্যে পূর্ণতার অভাব রয়েছে, অথচ যাকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে সে এর যোগ্য; আর এটি একটি দূরবর্তী সম্ভাবনা)**।(২)

আল-কুরতুবী বলেন: **(কোনো কোনো আলিম বলেছেন: এই আয়াতের মধ্যে এমন কিছু আছে যা একজন ফযিলতপূর্ণ ব্যক্তির জন্য কোনো পাপাচারী ব্যক্তি বা কাফির সুলতানের অধীনে কাজ করা বৈধ করে দেয়, এই শর্তে যে সে জানবে যে তাকে এমন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে তাকে বাধা দেওয়া হবে না, ফলে সে যা ইচ্ছা সংশোধন করতে পারবে। আর যদি তার কাজ সেই পাপাচারীর ইচ্ছা ও খেয়ালখুশি অনুযায়ী হয় তবে তা জায়েয নয়। একদল লোক বলেছেন: এটি কেবল ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আর বর্তমানে এটি বৈধ নয়; তবে আমাদের উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী প্রথম মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য)**।(৩)

ইবনে তাইমিয়্যাহ এই জাতীয় অভিভাবকত্বের প্রশংসা করে বলেন:

---

(১) আসনী আল-মাতাাজির, আল-ওয়ানশারীসী ৫০ - ৫১।
(২) আল-কাওয়াইদুল কুবরা ১/১২১ - ১২২।
(৩) আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন ৯/২১৫।

এবং এই পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হলো মিশরের বাদশাহর অধীনে ইউসুফ সিদ্দিকের ভূখণ্ডের ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করা, বরং তাঁর পক্ষ থেকে ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব প্রাপ্তির আবেদন করা; অথচ তখন বাদশাহ ও তাঁর কওম ছিল কাফির। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: **“আর অবশ্যই ইউসুফ ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিলেন, কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন তাতে তোমরা সর্বদা সন্দেহে ছিলে।”** [গাফির: ৩৪]। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে আরও বলেছেন: **“হে আমার কারাসঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক কি উত্তম, নাকি এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছ, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা রেখেছ।”** [ইউসুফ: ৩৯-৪০]। এটি সুবিদিত যে, তাদের কুফর থাকা সত্ত্বেও অর্থ সংগ্রহ এবং তা বাদশাহর পারিষদবর্গ, তাঁর পরিবার, সৈন্যবাহিনী ও প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় করার ক্ষেত্রে তাদের একটি সুনির্দিষ্ট প্রথা ও পদ্ধতি থাকা আবশ্যক ছিল; যা নবীদের তরীকা ও ইনসাফ অনুযায়ী পরিচালিত ছিল না। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর পক্ষে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু করা সম্ভব ছিল না, যা তিনি আল্লাহর দ্বীন হিসেবে মনে করতেন। কারণ সেই কওম তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তবে তিনি ইনসাফ ও ইহসানের মধ্য থেকে যতটুকু সম্ভব ছিল তা সম্পাদন করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে তাঁর পরিবারের মুমিন সদস্যদের জন্য এমন সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছিলেন যা ক্ষমতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব ছিল না। আর এ সবকিছুই আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: **“অতএব তোমরা যথাসধ্য আল্লাহকে ভয় করো।”** [আত-তাগাবুন: ১৬] ।

তবে কোনো কোনো ফকীহ এই ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছেন যে, মুসলিম জামাতকে তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যদি মুসলিম জামাত তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকে, তবে তাঁর বিধান বা ফয়সালা ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত বিচারকের (কাযী) বিধানের ন্যায় গণ্য হবে। আর যদি তারা সন্তুষ্ট না হয়, যেমন যদি খ্রিষ্টানরা কাউকে প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করে, তবে তাঁর বিচারকার্য পরিচালনা বৈধ হবে না। এক্ষেত্রে মুসলিমদের সন্তুষ্টিই বিবেচ্য, তাঁর পদায়ন নয়।

কোনো কোনো হানাফী ফকীহ একে নিষিদ্ধ করেছেন এবং শর্তারোপ করেছেন যে, দায়িত্ব প্রদান যেন মুসলিমদের পক্ষ থেকে হয়, তাদের (কাফিরদের) পক্ষ থেকে নয়। ইবনুল হুমাম বলেন:

(যখন কোনো সুলতান বা রাষ্ট্রপ্রধান থাকবে না এবং এমন কেউও থাকবে না যার পক্ষ থেকে পদ গ্রহণ করা বৈধ—যেমনটি বর্তমানে মুসলিমদের কোনো কোনো ভূখণ্ডে ঘটছে যেখানে কাফিররা তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে, যেমন বর্তমানে মাগরিব ভূখণ্ডের কর্ডোভা, ভ্যালেন্সিয়া এবং হাবশা (আবিসিনিয়া) অঞ্চল; আর তারা মুসলিমদের সেখানে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে এই শর্তে যে তাদের থেকে অর্থ গ্রহণ করা হবে—এমতাবস্থায় তাদের (মুসলিমদের) ওপর ওয়াজিব হলো তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করার ব্যাপারে একমত হবে যাকে তারা ওয়ালী বা অভিভাবক বানাবে। অতঃপর সে বিচারক নিয়োগ করবে অথবা সে নিজেই তাদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে। তেমনিভাবে তারা নিজেদের জন্য একজন ইমামও নিযুক্ত করবে।)

---

(১) মাজমুউল ফাতাওয়া ২০/৫৬ - ৫৭, এবং ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর দায়িত্ব গ্রহণের বিধান সম্পর্কে দেখুন:
আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ১২৭, রুহুল মাআনী ৭/৭।
(২) আজওয়াবাতুল আবদুসী ৪২৫।

(তিনি) তাদের নিয়ে জুমার সালাত আদায় করবেন (১)।

হানাফী মাযহাবের একদল ফকীহ এই মতের ভিন্নতা পোষণ করেছেন এবং তাঁরা এটিকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেননি (২)।

স্বাভাবিক অবস্থায় মুসলিমরা তাদের শাসনকর্তা নির্বাচন করবে—এটিকে শর্ত হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে জরুরি অবস্থা এবং সক্ষমতার অভাবকালে তাদের জন্য এ জাতীয় শর্তের অবকাশ থাকে না। আর এ কারণে মুসলিমদের জনস্বার্থ

বিনষ্ট হওয়া সমীচীন নয় (৩)।

এটি একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ইজতিহাদ; কারণ এতে বিচারকার্যের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি যদি তাদের মধ্যে শরীয়ত মোতাবেক বিচার করেন, তাদের অধিকার রক্ষা করেন, তাদের মাঝে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে ফয়সালা করেন এবং তারা এতে সন্তুষ্ট থাকে, তবে জরুরি অবস্থায় কাফিরদের পক্ষ থেকে তার নিয়োগের বিষয়টি প্রভাব ফেলবে না। আর এর মাধ্যমে শরীয়তের কোনো ওয়াজিব বিধান রহিত হয়ে যাবে না।

— বিদ্রোহীদের বিধানসমূহ কার্যকর রাখা:

জনস্বার্থকে বিবেচনায় রেখে গৃহীত ফিকহী ইজতিহাদসমূহের অন্যতম হলো ফকীহদের নিকট প্রসিদ্ধ এই অভিমতটি যে, বিদ্রোহীদের শাসন চলাকালীন সময়ে প্রদত্ত বিচারিক রায়গুলো কার্যকর রাখা হবে। যদিও বিচারকার্যের মূল নীতি হলো তা শাসকের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে জারি হওয়া, আর বিদ্রোহীরা হলো তার বিরুদ্ধাচরণকারী; ফলে মূল নীতি অনুযায়ী তাদের বিচারিক রায় ধর্তব্য হওয়ার কথা নয়। তবে এই মূল নীতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি, বরং তার চেয়ে শক্তিশালী বিষয়কে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, আর তা হলো অধিকার রক্ষা করা এবং মানুষের ক্ষতি দূর করা।

সুতরাং বিদ্রোহীরা যদি দণ্ডবিধি (হুদুদ) কার্যকর করার ব্যাপারে অথবা যাকাত ও জিযিয়া আদায়ের ব্যাপারে কোনো বিধান কার্যকর করে, তবে অধিকাংশ ফকীহর মতে তা তাদের ওপর পুনরায় আরোপ করা হবে না এবং তাদের বিচারকদের রায়সমূহ বহাল থাকবে (৪)।

(১) ইবনুল হুমাম রচিত ফাতহুল কদীর, ৭/২৬৪; অনুরূপ মতামতের জন্য দেখুন: আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১/১৪৬।
(২) দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক, ৬/২৯৮; আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ৩/৩০৭; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, ২/১৪৪, ৪/১৭৫ এবং ৫/৩৬৮-৩৬৯।
(৩) এই মাসআলাটি সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন: আহমাদ মুহিউদ্দীন সালেহ রচিত 'আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ হালা গিয়াবি হুকমিন ইসলামিয়্যিন আন দিয়ারিল মুসলিমীন', পৃষ্ঠা: ২৫৩-২৫৭ এবং ২৬৮-২৭০। আমি এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো উদ্ধৃতির উৎস খুঁজে পেতে এই কিতাবটি থেকেও সহায়তা নিয়েছি।
(৪) এটি মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাব এবং হানাফী মাযহাবের কতিপয় ফকীহর অভিমত। দেখুন: আল-মুগনী, ৮/৫৩৭; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, ৩/৩৯২; আত-তাওদীহ ফী শারহি মুখতাসার ইবনিল হাজিব, ৮/২১৪; হাশিয়া...

বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো বিচারক যেন এমন একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হন যাকে ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) নিযুক্ত করেছেন। তবে বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি শিথিল করা হয়েছে, ফলে প্রয়োজনীয়তার খাতিরে তাদের দেওয়া রায়গুলো কার্যকর করা হয়েছে। তাদের বিদ্রোহ এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধন তাদের সাক্ষ্য ও বিচারকার্যকে বাতিল করে দেয়নি তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার (তাউইল) প্রেক্ষিতে। কারণ, মানুষের কাছ থেকে পুনরায় অধিকার আদায় করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য এবং ক্ষতিকর হবে। আর এই বিচারকার্য দীর্ঘ সময়ব্যাপী স্থায়ী হতে পারে।(১)

এই চিত্রটি সাধারণ মূলনীতির পরিপন্থী যে, কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা বৈধ নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল। তবে যেমনটি ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম বলেন:

"কখনো কখনো বৈধ নেতৃত্ব ছাড়াই সাধারণ কর্মকাণ্ড কার্যকর হয়ে থাকে, যেমনটি বিদ্রোহী ইমামদের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ঘটে। নিশ্চিতভাবে তাদের কোনো বৈধ নেতৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও তাদের কর্মকাণ্ড কার্যকর হয়। তাদের কর্মকাণ্ড এবং নিয়োগ

কেবলমাত্র প্রজাসাধারণের প্রয়োজনে কার্যকর করা হয়েছে।"(২)

কারণ: **"যদি আমরা তাদের বিচারকার্য প্রত্যাখ্যান করতাম, তবে মুসলিমদের বিষয়াদি অচল হয়ে পড়ত এবং দ্বীনের মূলনীতিসমূহ বাতিল হয়ে যেত।"**(৩)

তবে বিদ্রোহীদের বিচার এবং সাক্ষ্যের এই গ্রহণযোগ্যতা শারয়ী মূলনীতির সাথে শর্তযুক্ত, আর তা হলো বিদ্রোহটি যেন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার (তাউইল) সীমার মধ্যে হয়। কিন্তু বিচারক যদি এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ন্যায়পরায়ণ পক্ষ (আহলুল আদল)-এর রক্ত ও সম্পদ হালাল মনে করে, তবে তার বিচার বৈধ হবে না। কারণ সে ন্যায়পরায়ণ নয়।(৪)

= আদ-দুসুকি ৪/৩০০, রাওদাতুত তালিবিন ১০/৫৩, আল-হাবি আল-কাবির ১৩/১৩৫, আল-মাবসুত ১০/১৩৫। আল-কারাফি বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ড কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন; দেখুন: আল-ফুরুক ৪/৩৫। হানাফিগণও এই বিষয়ে একমত যে, বিদ্রোহীরা যদি নিজেদের পক্ষ থেকে কাউকে বিচারক নিযুক্ত করে এবং সে রায় প্রদান করে, তবে তার রায় কার্যকর হবে। আর তারা যদি সম্পদ গ্রহণ করে এবং তা খরচ করে ফেলে, তবে তাদের দায়মুক্তি ঘটবে। অন্যথা সচ্ছল ব্যক্তির ওপর সেটি ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। দেখুন: ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম ৬/১০৫ এবং ১০৮-১০৯, বাদায়েউস সানায়ে ৭/১৪২, আল-বাহরুর রায়েক ৫/১৫৪, আহকামুল কুরআন (জাসসাস) ৩/৫৩৫। মালিকি মাযহাবের একটি মত অনুসারে তাদের বিচারকদের রায় কার্যকর হবে না এবং তারা যে যাকাত আদায় করেছে তা যথেষ্ট হবে না; দেখুন: আত-তাওদিহ ফি শারহি মুখতাসারিল হাজিব ৮/২১৪। এটিই আল-মুহাল্লা ১১/৩৫১-৩৫৪-এ ইবনে হাজমের অভিমত।

(১) দেখুন: আল-মুগনি ৮/৫৩৭।

(২) আল-কাওয়াইদুল কুবরা ১/১১১।

(৩) গিয়াসুল উমাম ৩৭৪।

(৪) দেখুন: আল-মুগনি ৮/৫৩৭, রাওদাতুত তালিবিন ১০/৫৩, আল-হাবি আল-কাবির ১৩/১৩৪-১৩৫। এখানে উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধের ময়দানের বাইরে সম্পদ হালাল মনে করা, অন্যথা যুদ্ধের সময় তারা সকলেই তা হালাল মনে করে। দেখুন: নিহায়াতুল মুহতাজ ৭/৪০৫।

কিন্তু বিচারক যদি অপব্যাখ্যাকারী না হন, তবে তাঁর রায়সমূহ পর্যালোচনা করা আবশ্যক; এমতাবস্থায় সঠিক রায়গুলো কার্যকর করা হবে এবং ভুলগুলো বর্জন করা হবে। (১)

বিদ্রোহীদের বিচারকদের রায় কার্যকর করা এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের দলিল হলো: সাহাবী এবং তাবিঈগণের যুগে ফিতনা ও যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয়েছিল, অথচ এক পক্ষ অন্য পক্ষের এই বিষয়ে কোনো আপত্তি করেনি এবং তাদের রায়সমূহ বাতিলও করেনি। (২)

যুহরী বলেন: যখন ফিতনা ছড়িয়ে পড়ল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হলো যে, কুরআনের অপব্যাখ্যার কারণে যা কিছু রক্তপাত বা ক্ষতি হয়েছে তার জন্য কিসাস বা রক্তপণ নেওয়া হবে না, কেবল সেই সম্পদ ব্যতীত যা অবিকল বিদ্যমান পাওয়া যায়। (৩)

সুতরাং এটি একটি গবেষণালব্ধ (ইজতিহাদি) দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষের সাধারণ জনস্বার্থ বিবেচনা করে। আর এটিই হলো শরয়ী রাজনীতির দর্শন, যা এমন এক কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা শরীয়তের বিরোধী নয়। এতে বিবেচনা করা হয় যে মানুষের অবস্থা পরিবর্তনশীল, তাই এমন নির্ভরযোগ্য গবেষণার দিকে নজর দেওয়া হয় যা এই পরিবর্তনকে গুরুত্ব দেয়। এই

কারণেই, এমনকি বিদ্রোহীদের কার্যক্রম কার্যকর করার এই বিষয়টি সব সময় জনস্বার্থ পূরণ নাও করতে পারে। একারণেই পরবর্তীকালের আন্দালুসের ফকীহগণ তাঁদের বিচারকদের রায় কার্যকর না করার এবং তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করার ফতোয়া দিয়েছেন (৪), যদিও এটি মালিকি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মতের পরিপন্থী। সম্ভবত তাঁরা এখানে বৃহত্তর জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, ফলে এটি তাঁদের নিষিদ্ধ বিদ্রোহ থেকে বিরত রাখার জন্য এক প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও দণ্ড হিসেবে গণ্য হবে।

- ধর্মত্যাগের আশঙ্কায় পিতার স্ত্রীর সাথে বিবাহকে বৈধতা দান:

ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মধ্যে একটি হলো তাতার সুলতান মুইযযুদ্দীন মাহমুদের সাথে যা ঘটেছিল, যাকে বলা হয়...

---

(১) দেখুন: হাশিয়াতুদ দাসুকি ৪/৩০০।
(২) দেখুন: আল-ইশরাফ আলা নুকাত মাসাইলিল খিলাফ, কাজী আব্দুল ওয়াহহাব ২/৮৫০; এবং এই ক্ষতিপূরণের বিষয়ে উলামাদের মতামত। দেখুন: আত-তাউইল ফি ইবাহাতিদ দিমা ৪৯-৫৫।
(৩) এটি ইবনে আবি শায়বাহ তাঁর মুসান্নাফে (২৭৯৫৩) এবং আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফে (১৮৯০৭) বর্ণনা করেছেন, যার সনদ বিচ্ছিন্ন। দেখুন: আল-মুহাল্লা ১১/৩৪৫, এটি যুহরী পর্যন্ত সহীহ। দেখুন: ইরওয়াউল গালীল ৮/১১৬।
(৪) দেখুন: আসনা আল-মাতাজির ৫১।

গাজান ৬৯৩ হিজরি সনে রাজত্বভার গ্রহণ করেন। এর এক বছর পর তিনি তার নায়েব আমির নওরোজের (১) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার মাধ্যমেই তাতারদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তিনি এক বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী ছিলেন। তিনি তার পিতার এক স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাকে বলা হলো যে, ইসলামে পিতার স্ত্রীদের বিবাহ করা হারাম (২)। এতে তিনি প্রায় ধর্মত্যাগী হওয়ার উপক্রম করেন। তখন তার কিছু ঘনিষ্ঠ সহচর তাকে এই বিবাহের বৈধতার ফতোয়া দিলে তিনি ইসলামের ওপর অবিচল থাকেন।

ইবনে হাজার এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন:
"তার রাজ্যে সমগ্র খোরাসান, ইরাক, পারস্য, রোম, আজারবাইজান ও আল-জাজিরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি শেখ সদরুদ্দিন ইব্রাহিম ইবনে সাদুল্লাহ ইবনে হামুইয়াহ আল-জুয়াইনির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল বিশ বছরের কিছু বেশি। তার ইসলাম গ্রহণের দিনটি ছিল এক মহিমান্বিত দিন। তিনি হাম্মামে প্রবেশ করে গোসল করলেন, এরপর একটি মজলিস আহ্বান করে জনসম্মুখে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করলেন। এতে উপস্থিতদের মাঝে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এটি ৬৯৪ হিজরি সনের শাবান মাসের ঘটনা। নওরোজ তাকে কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত শেখালেন এবং নামাজ শিক্ষা দিলেন। তিনি সেই বছর পূর্ণ রমজান মাসের রোজা পালন করেন। গাজান তার ঘনিষ্ঠদের সাথে ফারসি ভাষায় কথা বলতেন এবং আরবি ভাষায় তাকে যা বলা হতো তার অধিকাংশই বুঝতেন।"

যখন তিনি রাজত্ব লাভ করেন, তখন তিনি তার প্রপিতামহ চেঙ্গিস খানের নীতি অবলম্বন করেন এবং সৈন্যবাহিনী গঠন, সীমান্ত রক্ষা, দেশের উন্নয়ন এবং রক্তপাত বন্ধের দিকে মনোনিবেশ করেন।

যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাকে বলা হলো: ইসলাম ধর্ম পিতার স্ত্রীদের বিবাহ করা হারাম করে। তিনি তার পিতার স্ত্রীদেরকে নিজের স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন বুলঘান খাতুন, যিনি ছিলেন তার পিতার জ্যেষ্ঠ স্ত্রী। তখন তিনি ইসলাম ত্যাগ করার সংকল্প করেন। তার কিছু ঘনিষ্ঠ সহচর তাকে বললেন: আপনার পিতা কাফের ছিলেন এবং বুলঘান তার সাথে কোনো বিবাহ চুক্তিতে ছিলেন না...

---

(১) এই আমিরের জীবনী, তাতারদের ইসলাম গ্রহণের ওপর তার প্রভাব এবং এ বিষয়ে আলেমদের বক্তব্য জানতে দেখুন: ইবনে

তাইমিয়া ওয়াল মোগল, মুহাম্মদ বারা ইয়াসিন, পৃষ্ঠা ২৯ - ৩৬।
(২) কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এমতাবস্থায় যে, তার বিবাহাধীনে তার পিতার স্ত্রী ছিল, যে একজন মাহরাম। তাই তাকে তার সাথে থাকার অনুমতি দেওয়া যাবে না, কারণ ইসলামে এই বিবাহের চুক্তি বৈধ নয়। এটি আলেমদের মাঝে ঐকমত্যপূর্ণ (ইজমা) একটি বিষয়। দেখুন: আল-ইজমা, ইবনুল মুনযির ৮৭; আত-তামহীদ, ইবনে আব্দুল বার ১২/২৩; বিদায়াতুল মুজতাহিদ ৩/৭১; আল-মুগনি ৭/১৫১; আল-ইকনা ফি মাসাইলিল ইজমা, ইবনুল কাত্তান ২/৩২; জাদুল মা'আদ ৫/১২৪; ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম ৩/৪১৫।

পৃষ্ঠা 336

বিবাহটি সহিহ, বরং আপনি তার সাথে সফররত ছিলেন, সুতরাং আপনি তার সাথে বিবাহের আকদ সম্পন্ন করুন কারণ তিনি আপনার জন্য হালাল। অতঃপর তিনি তা-ই করলেন; আর যদি তা না হতো তবে তিনি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যেতেন। যিনি এই মাসলাহাতের (জনকল্যাণ) কারণে তাকে এই ফতোয়া দিয়েছিলেন, তার এই কাজটিকে উত্তম বলে গণ্য করা হয়েছে।(১)

ইমাম আয-যাহাবী মুসলমানদের ওপর এই সুলতানের ইসলামের প্রভাব বর্ণনা করে বলেন: **“অতঃপর নওরোজ বাদশাহ গাজানকে কুরআনের কিছু অংশ শিক্ষা দিতে শুরু করলেন এবং তিনি তা শিখতে সচেষ্ট হলেন। রমজান মাস এলে তিনি রোজা রাখলেন। ইসলামের কারণে তার মধ্যে যতটুকু পরিবর্তন এসেছিল তা যদি না হতো, তবে তিনি সিরিয়া জয় করার পর সেটিকে নিজের জন্য বৈধ করে নিতেন। সুতরাং আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ।”**(২)

আস-সাফাদী এই ঘটনাটি ইরবিলী থেকে বর্ণনা করে উল্লেখ করেছেন এবং তাতে আরও যোগ করেছেন: **“তিনি বলেন: যারা ফতোয়া প্রদানকারীকে তিরস্কার করেছিলেন, তিনি তাদের উত্তরে বললেন: আমি যা বলেছি তা শরীয়তের বাহ্যিক বিধান অনুসারেই বলেছি। আর যদি আমি শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকি, তবে গাজানের জন্য একটি হারামে লিপ্ত হওয়া তার কাফের হয়ে যাওয়া এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার চেয়ে অনেক সহজ। তখন তার এই বক্তব্যকে প্রশংসা করা হলো এবং এতে তার নিয়তের সততা প্রতীয়মান হলো।”**(৩)

ইবনে হাজার এবং আস-সাফাদী এই অভিমতটির সমর্থন বর্ণনা করলেও তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেননি। তবে ইমাম আশ-শাওকানী এই ফতোয়াটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন: **“বরং এটিই উত্তম; এমনকি যদি তার অধীনে ব্যভিচারতুল্য হাজারো নারী থাকত তবুও। কারণ এই সুলতানের ন্যায় ব্যক্তি, যিনি অধিকাংশ মুসলিম ভূখণ্ড শাসন করছেন, তার ইসলামের মধ্যে এমন মাসলাহাত বা কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা এর চেয়েও বড় বিষয়কে বৈধতা দেয়; কেননা তাকে কঠোরভাবে সংকটে ফেললে এবং তার সাথে সত্যের পথে আপসহীন আচরণ করলে তা তাকে ধর্মত্যাগের (মুরতাদ হওয়ার) দিকে ঠেলে দিত। আল্লাহ সেই মুফতির ওপর রহম করুন।”**(৪)

এই প্রশংসিত ঘটনাটি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি জটিল বিষয়, যেখানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হয়:

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি: এটি হলো মাসলাহাত বা কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, যা এই বিবাহে বাধা দিলে যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও ক্ষতির সৃষ্টি হতো তার প্রতি লক্ষ্য রাখে। আর যে ব্যক্তি এই বিষয়টি লক্ষ্য করবেন, তিনি উসূল (মূলনীতি) এবং শরয়ি কায়েদার মাধ্যমে এর সপক্ষে দলিল পেশ করবেন।

(১) আদ-দুরারুল কামিনাহ ফী আয়ানিল মিআতিল সামিনাহ ৪/২৪৮।
(২) তারিখুল ইসলাম ১৫/৬৯০।
(৩) আয়ানুল আসর ওয়া আওয়ানুন নাসর ৯/৪।

(৪) আল-বাদরুত তালি ২/২-৩।

পৃষ্ঠা 337

সাধারণ মূলনীতি হলো, দুইটি অনিষ্টের মধ্যে লঘুতরটি গ্রহণ করা যাতে গুরুতর অনিষ্টটি প্রতিহত করা যায়। বিষয়টি এখানে দুর্বলতা, অক্ষমতা ও সামর্থ্যহীনতার কারণে আরও শক্তিশালী হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এটি মানুষের স্বার্থ রক্ষা এবং ক্ষতি দূর করার ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য ‘সিয়াসাহ শারইয়্যাহ’ (শরয়ি রাজনীতি), যা শরিয়তের পরিপন্থী কোনো রূপ নয়। যদিও বিষয়টি মূলত নিষিদ্ধ ও হারাম ছিল, কিন্তু এই ব্যতিক্রমী অবস্থায় এটি শরিয়তের লঙ্ঘন নয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি: এটি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা শরিয়ত এবং তার সীমানার (হুদুদ) প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই জাতীয় অনিষ্ট দূর করার জন্য কোন হারামগুলোকে বৈধ করা যেতে পারে তার মানদণ্ড কী? হারামসমূহ হলো আইনদাতার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সীমানা। সুতরাং কেবলমাত্র সম্ভাব্য অনিষ্টের আশঙ্কায় আল্লাহর সীমানা পরিবর্তন করার এখতিয়ার ব্যক্তিকে কে দিয়েছে? যদি আমরা এই পথটি উন্মুক্ত করি, তবে এই জটিলতা আরও বাড়বে—এই অনিষ্ট কোথায় গিয়ে থামবে? যদি জানা থাকে যে ব্যভিচার কিংবা মদ্যপান হারাম, তবে কি তার জন্য তা বৈধ হবে? যদি কেউ এটি মেনে নেয়, তবে যদি জানা যায় যে মূর্তিপূজা কুফরি এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দুআ করা শিরক, তবে কি সেই অনিষ্ট দূর করার জন্য তার জন্য তা বৈধ হবে?

আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, এই বিষয়টি ফতোয়া প্রদান বা শরয়ি হুকুম বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত নয়; বরং এটি আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা এবং মুসলিমদের থেকে কষ্ট দূর করার পর্যায়ভুক্ত। এটি অনেকটা এমন ব্যক্তির মতো, যে নিরুপায় হয়ে বা বাধ্য হয়ে কোনো হারাম কথা বা কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে। কারণ এই ধরণের শাসকের মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হওয়া মুসলিমদের জন্য এক বিরাট বিপর্যয়। এর ফলে পবিত্রতা ও মর্যাদার লঙ্ঘন, রক্তপাত এবং অধিকার হরণ হতে পারে। সুতরাং তাকে এমন কথা বলা হবে যার দ্বারা এই অনিষ্ট প্রতিহত হয় এবং এই বিবেচনায় বক্তা প্রশংসিত হবেন। এটি মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের থেকে ক্ষতি দূর করার ক্ষেত্রে একটি ‘সিয়াসাহ শারইয়্যাহ’। কিন্তু এটি ফতোয়া বা ফিকহি পর্যালোচনার বিষয় নয়। এই কারণে, এমন শাসকের জন্য তার স্ত্রীর সাথে বসবাস বৈধ হবে না এবং আল্লাহর নিকট তার কোনো ওজর (অজুহাত) থাকবে না। তার ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান অপরিবর্তিত থাকবে এবং তাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

এই কারণেই, যদি কোনো ব্যক্তি এই ধরণের কোনো হারাম কাজ করতে চায় বা মুরতাদ হতে চায়, তবে আমরা তার মুরতাদ হওয়ার আশঙ্কায় সেই হারাম কাজটিকে তার জন্য বৈধ ঘোষণা করব না। বরং তাকে বাধা দেওয়া হবে, যদিও সে মুরতাদ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না যে, মুরতাদ হওয়ার অনিষ্ট দূর করা অগ্রগণ্য। কারণ এই অনিষ্টটি (শরয়ি দৃষ্টিতে) ধর্তব্য নয়, যেহেতু এর কারণটিই ত্রুটিপূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য। আলোচ্য বিষয়টিও তদ্রূপ। তবে এখানে শুধুমাত্র মুসলিমদের থেকে ক্ষতি দূর করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে হুকুম বর্ণনা করা হয়নি।

পৃষ্ঠা 338

অথবা অন্য ভাষায় এভাবে বলা যেতে পারে: এই ঘটনার ক্ষেত্রে ফতওয়া এবং শরঈ হুকুম হলো, এই তীব্র আবশ্যকতা দূর করার জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা মুখে উচ্চারণ করার বৈধতা প্রদান করা।

- উসমানীয় সুলতানদের নিজেদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের হত্যা:

উসমানীয় সালতানাতে সুলতানদের একটি বহুল পরিচিত প্রথা ছিল যে, সুলতান ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে এই ভয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের হত্যা করতেন যে, তারা পরবর্তীতে রাজত্বের দাবি নিয়ে তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে পারে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সিয়াসাহ শারইয়্যাহর (রাষ্ট্রীয় নীতি) ওপর ভিত্তি করে জনৈক প্রখ্যাত ফকীহ কর্তৃক এই কাজের বৈধতার স্বীকৃতি প্রদান, যিনি হলেন হাম্বলী ফকীহ মারঈ ইবনে ইউসুফ (রহ.)। তিনি এই বিষয়টি উপস্থাপন করে বর্ণনা করেছেন যে: (আমার জানামতে এই কাজে তাদের পূর্বে আর কেউ অগ্রগামী হয়নি। বাহ্যিকভাবে সুস্থ স্বভাবজাত প্রকৃতি এতে ঘৃণা বোধ করলেও, প্রকৃত বিচারে এতে ব্যাপক কল্যাণ ও প্রচুর উপকারিতা নিহিত রয়েছে। তা সত্ত্বেও, ঢালাওভাবে এর বৈধতা আমার কাছে স্পষ্ট নয়; কারণ তারা তো শিশু, আদতে তাদের কোনো অপরাধ নেই। আর ভবিষ্যতে তাদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ বা ফিতনা সৃষ্টি হওয়া একটি অনিশ্চিত বিষয়। এমন ক্ষেত্রে হত্যা পরিত্যাগ করাই অধিকতর সংগত। সম্ভবত যে সকল আলিম বৈধতার ফতওয়া দিয়েছেন, তাদের হত্যা করা বৈধ মনে করেছেন এবং ‘দুই-তৃতীয়াংশের সংশোধনের জন্য এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা জায়েজ’—এই যুক্তিতে এর অনুমতি দিয়েছেন, তারা প্রবল ধারণাকে নিশ্চিত বিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, যদিও তাতে চরম অসংলগ্নতা রয়েছে। আবার এমনটিও বলা সম্ভব যে, তাদের হত্যা করা শরীয়তগতভাবে নয় বরং রাজনৈতিকভাবে জায়েজ, আর রাজনীতির দুয়ার শরীয়তের দুয়ার অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত)। (১)

এরপর তিনি জনকল্যাণ বিবেচনা এবং তা অর্জনে সিয়াসাহ শারইয়্যাহর বিস্তৃতি সম্পর্কে আলিমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, শরীয়তের মানদণ্ড হলো অধিকতর শক্তিশালী জনকল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়া, যদিও তাতে কিছু অনিষ্ট বিদ্যমান থাকে। অতঃপর প্রথম দিকে দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও পরে তিনি দৃঢ়তার সাথে হুকুম প্রদান করে বলেন: (যখন কোনো বালক ফিতনার আলামতসহ বয়ঃসন্ধিকালে পদার্পণ করে, তখন তাকে হত্যা করা জায়েজ বলাই সংগত; কেননা তখন সে বিপর্যয় ও ফিতনার প্রবল উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তবে এর পূর্বে সম্ভবত আল্লাহ নতুন কোনো পথ বের করবেন। কিন্তু ভয়ের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও অবনতি হওয়ার এবং ফিতনা প্রকট রূপ ধারণ করার আগেই আলামত ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এই দিক থেকে হত্যা করা হয়তো বৈধ হতে পারে)।

(১) কালাইদুল উকইয়ান ফী ফাদায়িলি আলি উসমান, পৃষ্ঠা ১৩৫।

...বিষয়টি গুরুতর, এবং অনুশোচনা ও কষ্ট তীব্রতর হয় (১)।

অতঃপর তিনি তার সন্তানদের কয়েকজনকে হত্যার উপযোগিতার পক্ষে কিছু ঘটনা উল্লেখ করেন এবং এ জাতীয় কাজ বর্জন করার ফলে অন্যের ক্ষেত্রে যে অনিষ্ট ও ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার ফলে তাদের মধ্যে যে লড়াই ছড়িয়ে পড়েছিল তা বর্ণনা করেন। আর (তার দাবি অনুযায়ী) একজনের কারণে পঞ্চাশ হাজার মানুষ নিহত হওয়ার চেয়ে সেই একজনকে হত্যা করাই উত্তম (২)।

প্রকৃতপক্ষে এটি একটি নিকৃষ্ট ফতোয়া, যার সাথে শরয়ি শাসননীতির (সিয়াসাতে শারইয়্যাহ) কোনো সম্পর্ক নেই এবং এটি শাসননীতির মূলনীতি বা সীমারেখার সাথেও সংগতিপূর্ণ নয়। শরয়ি শাসননীতির তিনটি কেন্দ্রীয় মূলনীতি পর্যালোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হয়:

প্রথম মূলনীতি: শরয়ি শাসননীতি হলো এমন সব বিষয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইজতিহাদ যেখানে কোনো সুস্পষ্ট ধর্মীয় নির্দেশ (নাস) নেই। সুতরাং এটি শরীয়তের সীমানার ভেতরকার একটি ইজতিহাদ। আর শরয়ি স্বার্থের বিরোধী তথাকথিত জনস্বার্থভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো শরীয়তবিরোধী একটি নীতি, যার সাথে শরয়ি শাসননীতির কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এই বিধানের বিপরীতে জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে দলিল পেশ করা ঠিক তেমনি, যেমন যিনা, মদ ও সুদের মতো অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে বিরোধিতা করা। অতএব, শরয়ি শাসননীতির দোহাই দিয়ে এ জাতীয় বিষয় গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই।

কখনও কখনও কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শরয়ি শাসননীতি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, যেখানে বিষয়টি সুস্পষ্ট ধর্মীয় নির্দেশের আওতাভুক্ত হওয়া না-হওয়ার ব্যাপারে মতভেদের অবকাশ থাকে। এমতাবস্থায় কেউ কেউ ইজতিহাদ করাকে বৈধ মনে করেন, আবার কেউ কেউ তার বিরোধিতা করেন। এটি গ্রহণযোগ্য, কারণ কোনো নির্দেশের পরিধি কতটুকু হবে তা-ও একটি গবেষণালব্ধ (ইজতিহাদি) বিষয়। কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যা নিশ্চিতভাবে এবং সর্বসম্মতভাবে এর বাইরে, যার মধ্যে রয়েছে এই জাতীয় অকাট্য ও অতিপ্রয়োজনীয় নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে বৈধ করা।

দ্বিতীয় মূলনীতি: সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরোধী এই 'স্বার্থ' আইনদাতার নিকট কোনো প্রকৃত স্বার্থ নয় এবং এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। একে 'দুই স্বার্থের মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য' বলা তো দূরের কথা, একে 'দুই অনিষ্টের মধ্যে ক্ষুদ্রতরটি বেছে নেওয়া'র অন্তর্ভুক্ত করাও সম্ভব নয়। এটি শরয়ি বিবেচনার মধ্যেই পড়ে না, আর গ্রহণযোগ্য স্বার্থসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার আলোচনায় স্থান পাওয়া তো সুদূরপরাহত।

(১) কালাইদুল উকইয়ান, ১৩৭।
(২) দেখুন: কালাইদুল উকইয়ান, ১৩৭-১৩৮।

আর এই কারণেই প্রকৃত বিষয়টি হলো, এটি একটি নিশ্চিত ফাসাদ (ক্ষতি), যা কাল্পনিক মাসলাহাতের (স্বার্থ) দোহাই দিয়ে সংঘটিত হয়েছে। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি বাতিল এবং এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যদি কোনো মুসলিম এই জাতীয় কাল্পনিক মাসলাহাতের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করত, তবে কোনো মুসলিমের রক্ত বা সম্পদ সংরক্ষিত থাকত না, এবং কাল্পনিক ধারণা ও সংশয়ের বশবর্তী হয়ে যাবতীয় হারাম কাজ লঙ্ঘন করা সহজ হয়ে যেত।

তৃতীয় নীতি: এই কাল্পনিক ফাসাদ—যা হলো ফিতনায় পতিত হওয়া এবং মুসলিমদের পারস্পরিক মারামারি—তা একটি বড় ফাসাদ। তবে শরীয়ত এই বিষয়টি বর্ণনা করতে অবহেলা করেনি; বরং শরীয়ত মুসলিমদের এর থেকে রক্ষা করার জন্য এবং এটি ঘটে গেলে কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে সে বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মানহাজ (পদ্ধতি) প্রণয়ন করেছে। পক্ষান্তরে, রক্তপাতের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন এবং নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করা তো ফিতনা উস্কে দেওয়ার কারণ, এটি তার প্রতিকার নয়। সুতরাং মাসলাহাতের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, শরীয়তের নীতি অনুযায়ী এগুলোর সমাধানের পথ দেখা, কেবল মাসলাহাতের দোহাই দিয়ে কোনো দৃষ্টিভঙ্গিকে বৈধ করা নয়।

এই কারণেই ফকিহগণ মুসলিমের রক্তের পবিত্রতার ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন এবং তারা সেই আক্রমণকারী মুসলিমের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যাকে হত্যা করা ছাড়া তার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই—তাকে কি 'তা’যির' (শাস্তি) হিসেবে হত্যা করা বৈধ হবে?

শরীয়ত নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেছে, যেমন: কিসাস, হিরাবাহ (ডাকাতি বা সন্ত্রাসবাদ), মুরতাদ হওয়া, বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার এবং শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অনুরূপ বিধানসমূহ। এগুলি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে হত্যা করা জায়েজ নেই, তবে কিছু নির্দিষ্ট অপরাধ ছাড়া যেগুলোর ক্ষেত্রে তা’যির হিসেবে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার ব্যাপারে ফকিহগণের মাঝে মতভেদ

রয়েছে। যেমন: সেই মুসলিম গোয়েন্দা যে হারবি (যুদ্ধরত) কাফেরদের জন্য গোয়েন্দাগিরি করে (১), এবং বিদআতের দিকে আহ্বানকারী (২)।

---

(১) এ বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন: তাকে হত্যা করা হবে—এটি মালিকি এবং কিছু হাম্বলি আলেমের অভিমত, আর ইমাম আহমাদ এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আবার কেউ বলেছেন: তাকে হত্যা করা হবে না—এটি হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের অভিমত, এবং ইমাম নববি একে জমহুর ফকিহগণের অভিমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দেখুন: আল-খারাজ ২০৭; আল-বাহরুর রায়েক ৫/১২৫; আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ২/৫৩৭; শারহু মুখতাসারি খলীল লিল খারশি ৯/৪৯৩; আশ-শারহুল কাবীর লিদ দারদীর ২/১৮২; আল-উম্ম ৫/৬০৯; আল-মুহাযযাব ৩/২৯২; আল-ফুরু ১০/১৬৬; সহিহ মুসলিমের ওপর নববি’র শারহ ১২/৬৭। মতভেদের বর্ণনার জন্য আরও দেখুন: ইবনুল মুনযিরের আল-আওসাত ৩/৪১৬-৪১৭; শারহু ইবনি বাত্তাল ৩/১৬৪; মাজমুউল ফাতাওয়া ২৫/৪০৫।
(২) ইবনে তাইমিয়্যাহ উল্লেখ করেছেন যে, এটি ইমাম মালিক এবং শাফেয়ি ও আহমাদ (রাহ.)-এর কিছু অনুসারীর অভিমত। দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/১০৯ এবং ৩৫/৪০৫। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, এই শাস্তিটি কি মুরতাদ হওয়ার কারণে না কি ফাসাদের কারণে, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে—

পৃষ্ঠা 341

আর অপরাধের পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে তা’জির প্রদানের উদাহরণ হলো—যখন সেই জাতীয় অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড শরিয়তসম্মত করা হয়েছে। যেমন: ভারী নয় এমন বস্তুর মাধ্যমে হত্যা, সমকামিতা কিংবা অর্থ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে চোরাগোপ্তা হত্যা (১)।

ইবনে তাইমিয়্যাহ এ বিষয়ে মতভেদ বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তা’জিরের সর্বোচ্চ সীমার ক্ষেত্রে ফকিহগণের চারটি অভিমত রয়েছে:

প্রথম মত: এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই; বরং এটি জনকল্যাণ বা মাসলাহার ওপর নির্ভরশীল।
দ্বিতীয় মত: যে পাপে হদ বা দণ্ড নির্ধারিত রয়েছে, সেখানে তা’জির সেই দণ্ডের সমপর্যায়ে পৌঁছাবে না।
তৃতীয় মত: তা’জির সর্বনিম্ন হদ—চল্লিশ বা আশি বেত্রাঘাত—পর্যন্ত পৌঁছাবে না।
চতুর্থ মত: তা’জির দশ বেত্রাঘাতের বেশি হবে না।

অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রথম অভিমত অনুযায়ী তা কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে?

তিনি এ বিষয়ে দুটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো—এটি বৈধ; যেমন মুসলিম গুপ্তচরকে হত্যা করা। এটি ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের কিছু অনুসারীর অভিমত এবং ইবনুল আকিল একেই পছন্দ করেছেন।

ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদের কিছু অনুসারী বিদআতের দিকে আহ্বানকারীকে হত্যা এবং যার অনিষ্টতা মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দূর করা সম্ভব নয় তাকে হত্যার বৈধতা উল্লেখ করেছেন। হানাফিগণ ভারী বস্তুর মাধ্যমে হত্যাকারী এবং সমকামীকে হত্যার ব্যাপারে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন (২)।

এগুলো হলো সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধ যেগুলোর ক্ষেত্রে অপরাধী মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কি না সে বিষয়ে ওলামাগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। এর ফলে সেই অনিষ্টকারী অপরাধীর বিধানের ক্ষেত্রেও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যার অনিষ্টতা মৃত্যুদণ্ড ছাড়া প্রতিহত করা সম্ভব নয়। ফলে যারা তাকে হত্যার অনুমতি দিয়েছেন, তারা বলেন: (কেননা অনিষ্টকারী ব্যক্তি আক্রমণকারীর ন্যায়; সুতরাং

আক্রমণকারীকে যদি হত্যা ছাড়া প্রতিহত করা না যায়, তবে তাকে হত্যা করা হবে) (৩)।

= দেখুন: ২৮/৩৪৬; তা'জির হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে যে বিষয়টি দিয়ে দলিল প্রদান করা সম্ভব তা হলো দ্বিতীয় দিকটি, আর তা হলো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে হত্যা; কেননা এটি একটি তা'জিরি শাস্তি। পক্ষান্তরে ধর্মত্যাগ বা রিদ্দার বিষয়টি একটি নির্ধারিত হদ।
(১) এটি হানাফিদের মাজহাব; দেখুন: হাশিয়া ইবনে আবিদিন ৪/৬৩, আল-মাবসুত ২৬/১২৪ এবং মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৪৬ দেখুন।
(২) দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৫/৪০৫-৪০৬ এবং আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ১/২৮২-২৮৫ দেখুন।
(৩) মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৪৭।

এমনকি যে অপরাধী কোনো অপরাধ করেছে এবং তাতে অবিচল রয়েছে, আর যাকে হত্যা করা ছাড়া তার অপরাধ দমন করা সম্ভব নয়, তাদের ক্ষেত্রেও ফকিহদের মাঝে মতভেদ বিদ্যমান; আর এটি করা হয়েছে মাসলাহা বা জনকল্যাণের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে। তাহলে যার কোনো দোষ নেই, তার পক্ষ থেকে কোনো কাল্পনিক অনিষ্ট ঘটার আশঙ্কায় তাকে হত্যা করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে!

এটি শাইখের পক্ষ থেকে এমন এক জঘন্য বিচ্যুতি যা অনুসরণযোগ্য নয়। কেবল একজন বরেণ্য আলিম থেকে এটি প্রকাশ পাওয়ার কারণেই তা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না; বরং এটি তাঁর ভুলসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন।

- অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের সংশোধনের জন্য এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে হত্যা করা:

পূর্বের এই অভিমতটি আমাদের এই বহুল প্রচলিত এবং ইমাম মালিকের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত উক্তিটি পরীক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, সেই অদ্ভুত মতের স্বপক্ষে এটি দিয়ে দলীল পেশ করা হয়েছে। অথচ এই উক্তিটি কোনো আয়াত নয়, কোনো সহিহ হাদীস নয় এবং সালাফদের নির্ভরযোগ্য কোনো বক্তব্যও নয়। যদি এটি সত্য হতো যে এটি এ জাতীয় মতামতের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করে, তবে তা এর অসারতা ও বাতিল হওয়ার বিষয়কেই উন্মোচিত করত। সুতরাং এ জাতীয় বিষয়ের মাধ্যমে এই বক্তব্যের ভ্রান্তিই প্রমাণ করা সমীচীন, এই জঘন্য ভুলগুলোকে বৈধতা দেওয়ার জন্য এর ওপর নির্ভর করা নয়।

ইমাম মালিকের দিকে সম্বন্ধযুক্ত এই উক্তির সূচনা হয় আল-জুওয়াইনি (মৃত: ৪৮৭ হিজরী) থেকে। তিনি বলেন: (মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু শাসনকর্তাদের জন্য গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে হত্যার অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে এই নীতি অনুসরণ করেছেন, এমনকি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: আমি দুই-তৃতীয়াংশ উম্মতকে টিকিয়ে রাখার জন্য এক-তৃতীয়াংশ উম্মতকে হত্যা করব)(১)।

আল-গাযালীও (মৃত: ৫০৫ হিজরী) এই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করেছেন এবং বলেছেন: (মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু মাসলাহা বা জনস্বার্থের ওপর এতটাই গুরুত্বারোপ করেছেন যে, তিনি দুই-তৃতীয়াংশ উম্মতের সংশোধনের জন্য এক-তৃতীয়াংশ উম্মতকে হত্যা করার মত পোষণ করেছেন)(২)।

ইমাম মালিকের দিকে করা এই সম্বন্ধ না তাঁর কোনো কিতাবে পাওয়া যায়, আর না তাঁর মাযহাবের অনুসারীদের কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়। বরং মালিকি ফকিহগণ ধারাবাহিকভাবে এই উক্তিটি অস্বীকার করেছেন এবং ইমাম মালিকের দিকে এর সম্বন্ধ করাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন।

ইবনুল আরাবী (মৃত: ৫৪৩ হিজরী) সেই সব ব্যক্তিদের ভুলের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন যারা মনে করেছিলেন যে এটি ইমাম মালিকের

উক্তি। তিনি বলেন:

---

(১) আল-বুরহান ফী উসুলিল ফিকহ, আল-জুওয়াইনি ২/১৬৯; এবং দেখুন: ২/২০৭, গিয়াসুল উমাম ২১৯।
(২) আল-মানখুল ৪৫৪; এবং দেখুন: শিফাউল গালীল ২৪৭।

খোরাসানের হানাফী ও শাফিয়ীগণ ইমাম মালিকের প্রতি এই মতটি আরোপ করেছেন যে, জনকল্যাণের স্বার্থে উম্মতের একাংশের ধ্বংস সাধন করা আবশ্যক। অথচ তিনি এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা কেবল তাঁর 'মাসলাহাত' বা জনকল্যাণ বিবেচনা করার কথাটি শুনেছিল এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী সেটিকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে শেষ পর্যন্ত এই সীমায় উপনীত হয়েছে। (১)

আল-কারাফী (মৃত্যু ৬৮৪ হি.) এই আরোপকে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন: "অনুরূপভাবে ইমামুল হারামীন তাঁর 'আল-বুরহান' গ্রন্থে ইমাম মালিক থেকে যা বর্ণনা করেছেন যে, মালিক (রহ.) দুই-তৃতীয়াংশের কল্যাণের জন্য উম্মতের এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা বৈধ মনে করেন—মালিকীগণ তা চরমভাবে অস্বীকার করেন। তাদের (মালিকীদের) কিতাবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই; বরং এটি কেবল তাদের বিরোধীদের কিতাবে পাওয়া যায়, যারা তাদের থেকে এটি বর্ণনা করেছে, অথচ তারা নিজেরাও এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পায়নি।" (২)

আশ-শাম্মা' (মৃত্যু ৮৩৩ হি.) ইমাম মালিকের প্রতি এই আরোপের অসারতার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বলেন:

দ্বিতীয়ত: ইমামুল হারামীন যা দাবি করেছেন, তা ইমাম মালিকের অনুসারীদের কেউ তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি এবং কোনো ফিকহী মাসআলাতেও এর উল্লেখ নেই; যা এর অসারতা প্রমাণ করে।

তৃতীয়ত: তিনি ইমাম মালিক সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন, সম্ভবত তিনি একে তাঁর ওপর অনিবার্য হিসেবে চাপিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ এটি ইমাম মালিকের বক্তব্য নয়, বরং তাঁর বক্তব্যের একটি আরোপিত যৌক্তিক ফলাফল)।

চতুর্থত: এটি এমন একটি বিষয় যা বর্ণনা করার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা অনেক বেশি ছিল, তাই এ ক্ষেত্রে কোনো একজন ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়; এমনকি যদি সে এমন কেউ হতো যে ইমাম মালিকের সরাসরি সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং তাঁর থেকে ইলম অর্জন করেছে। এমতাবস্থায়, তাঁর ও ইমাম মালিকের মধ্যে যুগের পর যুগ ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে!

পঞ্চমত: ইমামগণের মাযহাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের বিরোধীদের কিতাবে যা পাওয়া যায় তার ওপর নির্ভর করা চলে না। (৩)

আশ-শাম্মা' এই মতটির অসারতার স্বপক্ষে বিভিন্ন দলিল পেশ করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো: আল্লাহ তাআলা মক্কায় মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন—তাদের কুফরি এবং হত্যার উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও—যাতে সেখানে অবস্থানরত কিছু (অজ্ঞাত) মুসলমান হত্যার শিকার না হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: "যদি এমন কিছু মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী না থাকত যাদের তোমরা চিনতে না, ফলে তোমরা তাদের পদদলিত করতে এবং এতে অজ্ঞাতসারে তাদের পক্ষ হতে তোমাদের ওপর কোনো গ্লানি বা পাপ পৌঁছাত (তবে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হতো)" [সূরা আল-ফাতহ: ২৫]। সুতরাং তিনি কাফেরদের হত্যা থেকেও সুরক্ষা দিয়েছেন (মুসলিমদের জীবন রক্ষার খাতিরে)...

---

(১) আল-ক্বাবাস ফী শারহি মুয়াত্তা মালিক বিন আনাস ৩/৪৬০।
(২) নাফায়িসুল উসুল ৯/৪০৯২, এবং দেখুন: মাওয়াহিবুল জলীল ৫/৪৩০।

(৩) মাতালিউত তামাম ১১৫।

তিনি অল্প সংখ্যক মুসলিমের সুরক্ষার্থে তাদের সংশোধনের বিষয়টি লক্ষ্য করেননি; তাহলে যে ব্যক্তি বলে যে কেবল সংশোধনের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা হবে, তার ব্যাপারে কী বলা যায়! (১)

এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মালিক কাফিরদের জাহাজ বা তাদের দুর্গ পুড়িয়ে দিতে নিষেধ করেছেন যদি সেখানে কোনো মুসলিম অবস্থান করে; তাহলে কীভাবে বলা যেতে পারে যে, তাঁর মাযহাব হলো এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা! (২)

এই বক্তব্যের কদর্যতা ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি তাদের ওপর এই যৌক্তিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন যে, যদি তিনজন ব্যক্তি চরম নিরুপায় অবস্থায় থাকে, তবে প্রয়োজনের খাতিরে তাদের একজনের মাংস ভক্ষণ করা তাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে, অথচ ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে এমন কথা বলার কেউ নেই। (৩)

আবু হামিদ বিন আল-আরাবি আল-ফাসি (১০৫২ হিজরি) ইমাম মালিকের মাযহাবের দিকে সম্বন্ধকৃত এই উক্তিটির খণ্ডনে একটি দীর্ঘ উত্তর লিখেছেন (৪), যার সূচনা করেছেন নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে:

(ইমামুল হারামাইন এটি মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী; তিনি মালিকি মাযহাব চর্চা করেননি এবং এর বর্ণনাকারীদের সাথে কিংবা ইমাম মালিক থেকে তাদের বর্ণনার সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন না। এই কারণেই উলামায়ে কেরামের রীতি হলো যে, তারা বিরুদ্ধবাদীদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করেন না। তদুপরি, তিনি এটি গ্রহণের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেননি এবং মালিকি ফকিহগণ ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত এই বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং তাদের কেউই এটি তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেননি)। (৫)

মুহাম্মদ বিন আব্দুল কাদির আল-ফাসি (১১১৬ হিজরি) বলেছেন:

(এটি কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করা বৈধ নয় যেন দুর্বল ছাত্ররা এর দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়, আর এটি শরয়ি নীতিমালার কোনোটির সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়)। (৬)

---

(১) তিনি এই আয়াত হতে দলিল গ্রহণের পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, দেখুন: মাতালিউত তামাম ১১৮-১২২।
(২) মাতালিউত তামাম ১২২।
(৩) দেখুন: মাতালিউত তামাম ১২৩।
(৪) এই উত্তরটি নিম্নোক্ত শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে: "জনস্বার্থে এক-তৃতীয়াংশ হত্যা জায়েয হওয়া মর্মে ইমাম মালিকের দিকে যা সম্বন্ধ করা হয়েছে তার খণ্ডন", সম্পাদনায়: রশিদ আল-হামদাভি, মাজাল্লাতুল মাযহাবিল মালিকি, দশম সংখ্যা ১১০-১১৫।
(৫) আন-নাওয়াযিলুল জাদিদাতুল কুবরা ৩/১৭; এবং প্রায় একই অর্থে ইবনে শাস ইমাম মালিকের দিকে এই বক্তব্যের সম্বন্ধের বিশুদ্ধতা নাকচ করেছেন, দেখুন: আল-বাহরুল মুহিত ৮/৮৪।
(৬) শারহুয যারকানির ওপর হাশিয়ায়ে বান্নানি ৭/৫৫।

আল-জুরকানি (১০৯৯ হি.) মুখতাসার খলিলের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই উক্তিটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হলো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা, যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ ফাসাদ সৃষ্টিকারীর অনিষ্টতা দূর করা সম্ভব না হয়। এরপর তিনি বলেন:

(পরিশুদ্ধ এক-তৃতীয়াংশ লোককে হত্যা করার মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে সংশোধন করা বৈধ — কিছু মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়া এমন ধারণার বিপরীতে। কেননা এটি একটি জঘন্য ভুল, আল্লাহ রক্ষা করুন এমন কথা বলা থেকে। তদুপরি, ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা সাধারণত ভালো মানুষদের হত্যার মাধ্যমে দমে যায় না; বরং এটি যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয়, তবুও বাহ্যত এটি অবলম্বন করা যাবে না) (১)।

আল-বান্নানি (১১৯৪ হি.) তাঁর সমালোচনা করে বলেছেন:

(আর তিনি [অর্থাৎ আল-জুরকানি] ইমামুল হারামাইনের যে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা যখন তা বাকিদের সংশোধনের একমাত্র পথ হিসেবে নির্ধারিত হয় — তা সঠিক নয়। এমন কথা বলা বৈধ নয়। কেননা শরীয়ত প্রণেতা তো মুসলমানদের সংশোধনের জন্য তখনই 'হদ' বা দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠার বিধান রেখেছেন যখন তার উপযুক্ত কারণগুলো প্রমাণিত হয়। আর যাকে সুন্নাহ সংশোধন করতে পারে না, আল্লাহ তাকে সংশোধন করেন না। এই ধরনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাই অনেক ফাসাদ সৃষ্টিকারী জালেমকে মুসলমানদের রক্ত ঝরাতে প্ররোচিত করে) (২)।

আল-মাহদি আল-ওয়াজানি (১৩৪২ হি.) তাঁর বিশাল বিশ্বকোষ ‘আন-নাওয়াজিল আল-জাদিদাহ আল-কুবরা’, যা ‘আল-মি’য়ার আল-জাদিদ’ (৩) নামেও পরিচিত, তাতে এই উক্তিটি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে মালেকি ফকিহদের বক্তব্যসমূহ একত্রিত করেছেন।

আশ-শানকিতি (১৩৯৩ হি.) বলেছেন:

(লেখক রহমাতুল্লাহি আলাইহি যা উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি দুই-তৃতীয়াংশের সংশোধনের জন্য এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা বৈধ করেছেন — তা ইমাম আল-জুওয়াইনি এবং অন্যান্যরা ইমাম মালেকের বরাতে উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক নয়। ইমাম মালেকের কোনো ছাত্রই তাঁর থেকে এমন কিছু বর্ণনা করেননি এবং ইমাম মালেক নিজেও এমন কথা বলেননি) (৪)।

---

(১) জুরকানি কর্তৃক মুখতাসার খলিলের ব্যাখ্যা ৭/৫৫; মালেকিদের কেউ কেউ তাকে অনুসরণ করেছেন, দেখুন: আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানি ২/১১৮।
(২) জুরকানি কর্তৃক মুখতাসার খলিলের ব্যাখ্যায় আল-বান্নানির টিকা ৭/৫৬।
(৩) দেখুন: আন-নাওয়াজিল আল-জাদিদাহ আল-কুবরা ১২/১১০-১১৩।
(৪) মুজাক্কিরাহ ফি উসুলিল ফিকহ ২০৩।

তিনি বলেন:

"ইমাম মালিকের বিরুদ্ধে তাদের এই দাবি যে, তিনি উম্মতের দুই-তৃতীয়াংশের সংশোধনের জন্য এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা বৈধ মনে করেন এবং তিনি তা'যীর (শাস্তি) হিসেবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা বৈধ মনে করেন—তা একটি বাতিল দাবি। ইমাম মালিক এটি বলেননি এবং তাঁর অনুসারীদের কেউ তাঁর থেকে এটি বর্ণনাও করেননি। আল-কারাফী, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-বান্নানী এবং অন্যান্যরা যেমনটি নিশ্চিত করেছেন, তাঁর মাযহাবের কোনো কিতাবেই এর অস্তিত্ব নেই। আমরা দীর্ঘকাল মালিকী মাযহাব অধ্যয়ন করেছি এবং আমরা জেনেছি যে উক্ত দাবিটি বাতিল।" (১)

আল-মাযিরী থেকে এমন কিছু বর্ণিত হয়েছে যা ইমাম মালিকের প্রতি এই বক্তব্যের সম্বন্ধ নিশ্চিত করার ব্যাপারে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে, যেখানে তিনি বলেছেন: "আবু আল-মা'আলী মালিক থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা সঠিক।"

তবে মালিকী ফকীহগণ এই জটিলতা নিরসন করেছেন এই বলে যে: "আত-তাওদীহ-তে আল-মাযিরী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে—যে তিনি বলেছেন আবু আল-মা'আলী মালিক থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা সঠিক—সেখানে ইঙ্গিতটি বক্তব্যের শুরুর অংশের দিকেই ফিরে যায়, আর তা হলো: ইমাম মালিক (আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর মাযহাবকে 'মাসালিহ' (জনস্বার্থ) এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলেন। এটি পরবর্তী সেই কথার দিকে ফিরে যায় না যেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি দুই-তৃতীয়াংশের সংশোধনের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সাধারণ মানুষকে হত্যা করার কথা বলেছেন।" (২)

মালিকীদের পক্ষ থেকে এই সম্বন্ধের এই অস্বীকৃতি এতোটাই ব্যাপক ছিল যে, অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণও তাদের থেকে তা উদ্ধৃত করেছেন। যেমন আত-তূফী এ সম্পর্কে বলেন: "আমি মালিকী মাযহাবের যেসব কিতাব দেখেছি তাতে এটি বর্ণিত হতে দেখিনি। আমি তাঁদের শ্রেষ্ঠ আলিমদের একটি দলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি এবং তাঁরা বলেছেন: আমরা এটি চিনি না।" (৩)

---

(১) আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ ৩৪, রিহলাহ ইলা ইফরিক্বিয়া কিতাবের সাথে সংযুক্ত লেকচারসমূহের অন্তর্ভুক্ত, শাইখ মুহাম্মাদ আশ-শানক্বিতীর রচনাবলী থেকে, দারু আলমিল ফাওয়াইদ।
(২) শারহুয যারক্বানীর ওপর আল-বান্নানীর হাশিয়া ৭/৫৬; আরও দেখুন: মানহুল জলীল ৭/৫১৩ - ৫১৪। মাওয়াহিবুল জলীল ৫/৪৩০-এ এসেছে (আত-তাওদীহ-এর কিছু পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে, কিন্তু তা তাওদীহুল সুন্নাহ-তে আছে)। আল-আরাবী আল-ফাসী উল্লেখ করেছেন যে, একে তাতররুস (ঢাল হিসেবে ব্যবহার) মাসআলার ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। দেখুন: মাজাল্লাতুল মাযহাব আল-মালিকী, সংখ্যা ১০, পৃষ্ঠা ১১১-তে উত্তরের সম্পাদিত পাঠ।
(৩) শারহু মুখতাসারি রওদাহ ৩/২১১; আরও দেখুন: আল-বাহরুল মুহীত, আয-যারকাশী ৮/৮৪; ঈদ্বাহু তুরুকিল ইস্তিক্বামাহ, ইবনুল মুবাররাদ ৮৮ - ৮৯; ইরশাদুল ফুহুল, আশ-শাওকানী ২/১৮৪।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, এটি এমন একটি উক্তি যা শত শত বছর আগে থেকে শুরু করে আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত মালিকি ফকিহগণ তাদের ইমামের দিকে সম্পর্কিত করাকে নাকচ করে আসছেন এবং তাদের মাযহাবে এর গ্রহণযোগ্যতাকে অস্বীকার করছেন।

মালিকিগণের তাদের মাযহাব থেকে এই উক্তিটি নাকচ করার প্রতি এই বিশেষ মনোযোগ কেবল বাণীর বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নয় এবং কেবল এই কারণেও নয় যে এটি ইমাম মালিক থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়; বরং এটি এই উক্তির ভুল ও ভয়াবহতা অনুধাবনের কারণে এবং এটি তাদের মাযহাবের জন্য অবমাননাকর ও তাদের 'মাসালিহে মুরসালাহ' (জনস্বার্থ) বিষয়ক বক্তব্যকে বিকৃত করার কারণে।

এই কারণে ইবনে হাজম একে ফকিহদের বক্তব্য না বলে বরং ফাসেক ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বক্তব্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন: **"যেমন জালিমদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকে যে, দুই-তৃতীয়াংশের সংশোধনের জন্য এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা মঙ্গলজনক।"**(১)

"আর সেই ফাসেকদের মতানুসারে যারা বলে: দুই-তৃতীয়াংশের কল্যাণের জন্য এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা মঙ্গলজনক; তবে এগুলি অভিশপ্ত শয়তান এবং তার অনুসারীদের বক্তব্য। আল্লাহ তায়ালা কখনোই তাঁর সমস্ত বান্দাকে একজন মুসলমানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেননি যে, তাদের খাতিরে তাকে ধ্বংস করা হবে।"(২)

আর আমরা যদি এই উক্তিটি পরীক্ষা করি, তবে দেখতে পাই যে এটি শরয়ি ও বাস্তব উভয় দিক থেকেই ভুল:

বাস্তবতার নিরিখে: মানুষের এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করার প্রয়োজনীয়তা কল্পনা করা যায় না, যার ফলে বাকি দুই-তৃতীয়াংশের সংশোধন সাধিত হবে—এমনভাবে যে এই হত্যা ছাড়া তাদের সংশোধন সম্ভব নয়। এটি একটি কাল্পনিক মানসিক চিত্র যা বাস্তবে কল্পনা করা অসম্ভব। এমনকি যদি তর্কের খাতিরে একে শরয়িভাবে বৈধ বলাও হয়, তবুও এটি একটি মানসিক চিত্র হিসেবেই থেকে যাবে যা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ এটি কখনোই সম্ভব নয় যে, কোনো কাল বা কোনো স্থানের সমাজের সংশোধন এমন বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে যেখানে অপরাধহীন এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে হত্যা করতে হবে।

এই কারণেই ফকিহ আল-বান্নানি অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে ব্যক্ত করেছেন যখন তিনি বলেন: **"এবং এই ধরনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাই অনেক ফাসাদ সৃষ্টিকারী জালিমকে মুসলমানদের রক্তপাতে লিপ্ত করে।"**(৩)

---

(১) আল-ফাসল ফিল আহওয়াই ওয়ান নিহাল ৩/৯৯।
(২) আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম ৮/১২৯।
(৩) হাশিয়াতুল বান্নানি আলা শারহিজ যারকানি ৭/৫৫।

এটি রক্তপাতের জন্য এবং হারাম বিষয়সমূহকে বৈধ করার জন্য স্রেফ একটি অজুহাত মাত্র। যদিও এর থেকে কিছু উপকার অর্জিত হতে পারে, কিন্তু সেই উপকারসমূহ রক্তপাতের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনের ওপর নির্ভর করে না; বরং এই ফাসাদগুলো না ঘটিয়েও ইনসাফ কায়েম, অধিকার সংরক্ষণ এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

এটি যে একটি অকল্পনীয় মানসিক ধারণা মাত্র, তা আপনার নিকট স্পষ্ট হবে যদি আপনি ইতিহাসে সেই সব শাসকদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেন যারা ব্যাপক রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং মানুষ যাদেরকে জুলুম ও ফাসাদের কারণে স্মরণ করে থাকে; আপনি দেখবেন যে তারা তাদের অপরাধের ক্ষেত্রে এই অনুপাতের দশভাগের একভাগ পর্যন্তও পৌঁছেননি। তাসত্ত্বেও

তারা জগদ্বাসীর নিকট চরম নিন্দা ও তিরস্কারের পাত্র হয়েছেন। এমতাবস্থায়, এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে হত্যা করা—যা জুলুমের এই বিশাল পরিধিকেও অতিক্রম করে যায়—তা কীভাবে সংশোধন হতে পারে? সুতরাং এটি বাস্তবে একটি ভুল এবং কল্যাণের কোনো পথ নয়।

আর শরীয়তের ব্যাপারে ভ্রান্তিটি হলো: কারণ বিধানদাতা রক্তপাতের বিষয়ে অত্যন্ত কড়াকড়ি করেছেন এবং বিষয়টিকে গুরুতর গণ্য করেছেন। ফলে সুনির্দিষ্ট কিছু অবস্থা ব্যতীত এবং নির্দিষ্ট শর্ত ও নিশ্চয়তা ছাড়া তিনি তা বৈধ করেননি। সুতরাং স্রেফ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে এতে কোনো সংস্কার নিহিত আছে—এই যুক্তিতে মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমানের রক্তপাত বৈধ হওয়া শরীয়তের বিধান হওয়া অসম্ভব। আর এই দাবির ভিত্তিতে এক-তৃতীয়াংশকে হত্যার কথা বলা যে, এর দ্বারা—ধারণা প্রসূত—বাকি দুই-তৃতীয়াংশের সংশোধন হবে, তা তো কল্পনাতীত! এটি অত্যন্ত অবান্তর কথা। বরং অন্যের সংশোধনের অজুহাতে একজন মুসলমানের রক্তপাত করাও শরীয়তসম্মতভাবে বৈধ নয়, এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানের কথা তো বলাই বাহুল্য। ইতিপূর্বে আমরা সেই ব্যক্তির বিধান সম্পর্কে ফকিহগণের মতভেদ উল্লেখ করেছি যার অনিষ্ট হত্যাকাণ্ড ব্যতীত অন্য কোনোভাবে দূর করা সম্ভব নয়; অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও এবং তার অপরাধ অত্যন্ত জঘন্য ও পৌনঃপুনিক হওয়া সত্ত্বেও, আর হত্যাকাণ্ড ছাড়া তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার কোনো পথ না থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ফকিহ তাকে হত্যার বৈধতা প্রদানের ক্ষেত্রে বিরত থেকেছেন; অথচ সেখানে এমন অপরাধ বিদ্যমান যা স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডের যোগ্য এবং তার অনিষ্ট থেকে নিবৃত্ত না হওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত। সুতরাং স্রেফ সংস্কার বা এই জাতীয় কোনো দাবির অজুহাতে একজন নিরপরাধ মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কোনো অস্তিত্ব ফিকহী দৃষ্টিকোণে নেই।

দুই-তৃতীয়াংশের সংশোধনের জন্য এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা যে ফিকহশাস্ত্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দলিল, সে বিষয়ে আপনাকে নিশ্চিত করার জন্য আমাকে একটি মাসআলা পেশ করতে দিন এবং ফকিহগণ সেটি কীভাবে বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করতে দিন। মাসআলাটি হলো: যদি কোনো জাহাজের আরোহীদের নিকট নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে তারা সকলেই ডুবে মারা যাবে, যদি না তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, অন্যথায় তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে; তবে তাদের জন্য কি লটারির মাধ্যমে একজনকে ফেলে দেওয়া বৈধ হবে?

আল-গাযালী বলেন:
(আর এর অর্থ এটি নয় যে: একদল লোক একটি নৌকায় আছে, যদি তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে ফেলে দেয় তবে তারা বেঁচে যাবে, অন্যথায় তারা সকলেই ডুবে যাবে। কারণ এটি কোনো সামষ্টিক (কুল্লিয়াহ) স্বার্থ নয়, যেহেতু এর ফলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের ধ্বংস ঘটে, আর এটি সকল মুসলিমকে সমূলে বিনাশ করার মতো বিষয় নয়। তাছাড়া, পানিতে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্ধারিত নেই, যদি না লটারির মাধ্যমে কাউকে নির্ধারণ করা হয়, অথচ এর কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই। তেমনিভাবে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া একদল লোক, যদি তারা একজনকে খেয়ে ফেলে তবে তারা বেঁচে যাবে—এক্ষেত্রেও কোনো অনুমতি নেই, কারণ এই স্বার্থটি সামষ্টিক নয়)। (১)

ইবনুল আরাবী বলেন:
(কোনো মানুষকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার জন্য লটারি করা বৈধ নয়; তাহলে একজন মুসলিমের ক্ষেত্রে তা কীভাবে হতে পারে? এটি কেবল ইউনুস (আ.)-এর ক্ষেত্রে এবং তাঁর সময়ে তাঁর সত্যতার প্রমাণ নিশ্চিতকরণ এবং তাঁর ঈমান বৃদ্ধির ভূমিকা হিসেবে ছিল। কেননা কোনো পাপাচারীকেও হত্যা করা কিংবা আগুন বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা বৈধ নয়; বরং তার ওপর তার অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী হদ ও তা'যীর কার্যকর করা হবে।

যদি বলা হয়: তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছিল কারণ নৌকাটি থেমে গিয়েছিল এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল, তখন তারা বলেছিল: 'এটি আমাদের মাঝে ঘটে যাওয়া কোনো বিষয়ের ফল, সুতরাং তোমরা নিজেদের মধ্যে দেখো।' তখন নির্দিষ্ট কাউকে পাওয়া গেল না, ফলে তারা সমস্যার সমাধান নির্ণায়ক হিসেবে লটারির আশ্রয় নিল। যখন বারবার লটারিতে তাঁর নামই আসতে লাগল, তখন জানা গেল যে তাঁকে নিক্ষেপ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই; ফলে তিনি নিজেই নিজেকে নিক্ষেপ করলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে এটি তাঁর রবের পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা এবং তিনি উত্তম পরিণতির আশা করলেন। এ কারণেই কিছু লোক

মনে করে যে, সমুদ্র যখন উত্তাল হয়ে ওঠে এবং তারা নৌকা হালকা করতে বাধ্য হয়, তখন যাত্রীদের মধ্যে লটারি করা হবে এবং নৌকা হালকা করার জন্য তাদের মধ্য থেকে কাউকে ফেলে দেওয়া হবে। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা; কারণ কিছু মানুষকে ফেলে দিলে নৌকা হালকা হয় না, বরং তা মালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে তারা আল্লাহর ফয়সালার ওপর সবর করবে)। (২)

যিনি এই উক্তিটিকে মালিক (রহ.)-এর দিকে নিসবত করেছেন তিনি ভুল করেছেন, তিনি বলেছেন:
(পর্যালোচনাটি একটি মহা সংকটের দিকে উপনীত হয়েছে, আর তা হলো: নৌকার স্বাধীন ব্যক্তিরা যখন জানতে পারে যে সবার বেঁচে থাকা অসম্ভব এবং তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের রক্ষা পাওয়া নিশ্চিত, তখন খুরাসানি হানাফিরা নিসবত করেছেন...)

(১) আল-মুসতাসফা ১/৪২১।
(২) আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ৪/৩৮।

শাফিয়ীগণ ইমাম মালিকের দিকে এই মতটি নিসবত করেন যে, জনকল্যাণের স্বার্থে উম্মাহর একাংশের বিনাশ সাধন ওয়াজিব; অথচ তিনি এই ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা কেবল জনকল্যাণ (মাসলাহা) বিবেচনায় তাঁর বক্তব্য শুনেছে এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী সেটাকে এই পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। অথচ ইলম ও জ্ঞানের উচ্চমর্যাদা, হিফজের প্রশস্ততা এবং বোধশক্তির প্রখরতার দাবি ছিল যে, তারা মাসলাহার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য অনুধাবন করবে এবং বিষয়টিকে তার সঠিক খাতে পরিচালিত করবে এবং যেখানে এর সীমা শেষ হয়েছে সেখানেই থেমে যাবে। এই মাসআলায় উম্মাহর মাঝে কোনো মতভেদ নেই যে, তারা আল্লাহর ফয়সালার ওপর সবর করবে যতক্ষণ না তাদের ওপর তাঁর হুকুম বাস্তবায়িত হয় (১)।

তিনি আরও বলেন:
(এটি মালিক কখনও বলেননি এবং তাঁর কোনো সঙ্গীও বলেননি। তবে ব্যাপারটি হলো, যখন লোকেরা শুনেছে যে মালিক মাসলাহা বা জনকল্যাণের কথা বলেন, তখন তারা তাঁর ওপর বিষয়টি এভাবে চাপিয়ে দিয়েছে, যা তাঁর ক্ষেত্রে মোটেও প্রযোজ্য নয়। জীবন বাঁচানোর জন্য জাহাজ থেকে কেবল সম্পদই ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু জীবন বাঁচানোর জন্য কোনো মানুষকে ফেলে দেওয়া শরিয়তসম্মত নয়; এক জীবন দিয়ে অন্য জীবন রক্ষা করা যায় না। এই কারণেই আমরা বলেছি: যখন কোনো ব্যক্তিকে (কাউকে হত্যার জন্য) বাধ্য করা হয়, তখন তার জন্য কর্তব্য হলো বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, সে অন্য কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করবে না) (২)।

ইজ্জ বিন আবদুস সালাম বলেন:
(সমুদ্র যদি এমন উত্তাল হয়ে ওঠে যে জাহাজের আরোহীরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে, অর্ধেক আরোহীকে ডুবিয়ে জাহাজ হালকা করা ছাড়া তারা নিস্তার পাবে না, তবুও লটারি বা লটারি ছাড়া তাদের কাউকেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করা জায়েজ নেই। কারণ জীবনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তারা সকলেই সমান। আর নিরপরাধ কাউকে হত্যা করা হারাম। তবে যদি জাহাজে সম্পদ অথবা কোনো সম্মানিত (মুহতারাম) প্রাণী থাকে, তবে সম্পদ এবং তারপর সম্মানিত প্রাণীকে নিক্ষেপ করা ওয়াজিব হবে। কারণ সম্পদ ও সম্মানিত প্রাণীর বিনাশের ক্ষতি মানুষের প্রাণহানির ক্ষতির চেয়ে অনেক হালকা) (৩)।

পাদটীকা:
(১) আল-কাবাস ৩/৪৬০।
(২) আশ-শাম্মা এটি ইবনুল আরাবির 'কিতাবুল ইসতিশফা' থেকে উদ্ধৃত করেছেন, দেখুন: মাতালিউত তামাম ১৪৭।
(৩) আল-কাওয়ায়িদুল কুবরা ১/১৩৪, আরও দেখুন: মুগনীল মুহতাজ ৫/৩৫৩।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন:

(সমুদ্র উত্তাল হওয়ার মাসআলা প্রসঙ্গে: লটারি বা অন্য কোনো উপায়ে তাদের কাউকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা জায়েজ নয়; কারণ জীবন সুরক্ষায় তারা সকলেই সমান। নিজের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্দোষ কাউকে হত্যা করা জায়েজ নয়, আর সে এই বিষয়ের জন্য তার চেয়ে অধিক যোগ্য নয়)(১)।

ইবনুল হাজিব বলেন:

(যখন নৌযানটি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা করা হয়, তখন মানুষ ব্যতীত এমন সব বস্তু ফেলে দেওয়া জায়েজ যার মাধ্যমে তা রক্ষা পাওয়ার আশা করা যায়, চাই তাদের অনুমতি নিয়ে হোক বা অনুমতি ব্যতীত)(২)।

আশ-শাম্মা' এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের অনেকগুলো উক্তি উল্লেখ করেছেন, এরপর তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন:

(শরীয়তে এক বা একাধিক মুসলমানের জীবন বাঁচাতে কোনো একজন মুসলমানকে হত্যা করার কোনো বিধান নেই, এমনকি তারা সংখ্যায় অধিক হলেও তাদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না)(৩)।

মালিকীগণ ফকিহ আল-লাখমি থেকে একটি অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ ক্ষেত্রে এটি বৈধ মনে করেন, কিন্তু তারা এর সমালোচনা করেছেন। আশ-শাম্মা' এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, আল-লাখমি এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো রায় দেননি, বরং তিনি বলেছিলেন 'আমি আশা করি', এবং তিনি এ ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেননি। তিনি এটি মূলত তখন বলেছিলেন যখন শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু বানায় এবং তারা নিজেদের জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়; আর আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ক্ষেত্রে হত্যার বিষয়ে কোনো জটিলতা নেই। এটি আল-লাখমির একটি একক মত, যা মুহাক্কিকগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন(৪)।

আল-বান্নানী বলেন:

(যখন আল-লাখমি উল্লেখ করেছেন যে, নৌযানটি যখন মানুষ দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে যায় এবং ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা করা হয়, তখন কাকে ফেলে দেওয়া হবে সে বিষয়ে তারা লটারি করবে; এ ক্ষেত্রে পুরুষ, নারী, দাস এবং জিম্মি সকলেই সমান, তিনি বলেন...)

(১) মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, ২/৯০৮।
(২) মুখতাসার ইবনিল হাজিব, সাথে তার ব্যাখ্যা আত-তাওজিহ, ৭/২১২।
(৩) মাতালিউত তামাম, ১৪৯।
(৪) দেখুন: মাতালিউত তামাম, ১৪৮; এবং আরও দেখুন: আত-তাওজিহ ফি শারহি মুখতাসারি ইবনিল হাজিব ৭/২১২, আল-মুখতাসারুল ফিকহী, ইবনে আরাফাহ ৩/৩৮, জাওয়াবুল আরবি আল-ফাসি ১১২।

ইবনে আরাফা এর পশ্চাৎ অনুসরণ করেছেন: একাধিক আলেম আল-লাখমি কর্তৃক বর্ণিত অন্যদের জীবন রক্ষার জন্য মুসলিম তো বটেই, এমনকি জিম্মিকেও (অমুসলিম নাগরিক) নিক্ষেপ করার বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ একে ইজমা বা ঐকমত্য লঙ্ঘনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন: অবশিষ্টদের রক্ষার জন্য কোনো মানুষকে নিক্ষেপ করা যাবে না, এমনকি সে জিম্মি হলেও।(১)

সুতরাং, যদি কোনো নৌযানের যাত্রীরা নিশ্চিতভাবে ডুবন্ত অবস্থার সম্মুখীন হয়, তবে বাকিদের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্য থেকে একজনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা শরীয়ত অনুযায়ী তাদের জন্য বৈধ নয়(২); যদিও এই প্রক্রিয়াটি লটারির ন্যায় কোনো ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয় এবং পরিস্থিতিটি এমন নিরুপায় হয় যেখানে তাদের নিকট অন্য কোনো বিকল্প নেই, আর তাকে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে তাদের জন্য একটি সুস্পষ্ট কল্যাণ সাধিত হবে, এবং প্রাণহানি কেবল একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং এটি তাদের দ্বারা সরাসরি হত্যাও নয়, বরং পরোক্ষভাবে মৃত্যুর কারণ হওয়া মাত্র। এতদসত্ত্বেও, আপনি এ বিষয়ে ফকীহগণের অবস্থান প্রত্যক্ষ করেছেন। আপনি যদি বিষয়টি স্মরণে রাখেন, তবে আপনি জানতে পারবেন যে, এই ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি ও গ্রহণযোগ্য শরয়ী ইজতিহাদ এবং এই ভ্রান্ত উক্তির মধ্যবর্তী ব্যবধান পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও অধিক!

---

(১) শারহুজ যারকানির উপর হাশিয়াতুল বান্নানি ৭/৫৬-৫৭।
(২) আল-বুরজুলি আল-লাখমির মতটি মালিকি মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং তাঁর সেই ফতোয়ায় এর স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন যা আশ-শাম্মা' প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেমনটি 'মাতালিউত তামাম' গ্রন্থের ১৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। একইভাবে ইবনে আরাফা তাঁর 'মুখতাসার' গ্রন্থের ৩/৩৯-এ আল-লাখমির মতের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন যে, এটি শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী দুটি মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটটি গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই মতটি বিবেচনাযোগ্য ও এর সপক্ষে যুক্তি প্রদান করা সম্ভব বলে গণ্য হতে পারে, এবং এর উদ্দেশ্য একে চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করা নয়; বরং এটি স্পষ্ট করা যে, সাধারণ ফকীহদের অবস্থান হলো এই ধরণের নিরুপায় অবস্থা, যুক্তি ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যান করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক প্রয়োগসমূহ

বর্তমান সময়ের ব্যাপক পরিবর্তনসমূহ অনেক আলেম ও গবেষককে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা ও জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে, যার অন্যতম হলো 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' (শরীয়তসম্মত রাজনীতি)। এই ক্ষেত্রের প্রতি গুরুত্বারোপ এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এতে প্রচুর গবেষণা ও তাত্ত্বিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এর জন্য স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো এই শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক উদ্ভূত সমস্যা (নাওয়াযিল) ও ফিকহী মাসআলাসমূহের অনেক ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই প্রচেষ্টা সামগ্রিকভাবে প্রশংসনীয় এবং সমসাময়িক প্রভাবকগুলোর প্রতি এটি একটি ইতিবাচক ও

উত্তম সাড়াদান। যদিও এই ইলমী কাজগুলোর ফলাফল, উদ্দেশ্য, তাত্ত্বিক দৃঢ়তা এবং নির্ভরযোগ্য ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির সীমানা অনুসরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে।

সিয়াসাহ শারইয়্যাহর সমসাময়িক প্রয়োগের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। এ কারণে আমরা সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, তার নমুনা স্বরূপ কিছু প্রয়োগ নির্বাচন করব। আমরা এই প্রয়োগগুলোর ক্ষেত্রে বর্ণিত বিভিন্ন মতামত, দলিল ও বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা করব না; কারণ সেগুলো এ বিষয়ক পর্যাপ্ত গবেষণাপত্রগুলোতে পাওয়া সম্ভব। বরং আমরা প্রতিটি মাসআলায় সিয়াসাহ শারইয়্যাহর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য গবেষণার সীমানা উন্মোচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব। এখানে উদ্দেশ্য রাজেহ (অধিকতর শক্তিশালী) বা মনোনীত মত বর্ণনা করা নয়; বরং সেগুলোর ক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক কাঠামো চিত্রিত করা।

- ফরয নামায আদায়ের জন্য দোকানপাট বন্ধ রাখা:

নামায চলাকালীন আইনগতভাবে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার বাধ্যবাধকতা উক্ত নামাযের বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি মূলত দুটি অবস্থার ওপর ভিত্তি করে আবর্তিত হয়:

প্রথমত: জুমার নামাজ, যা মুসলমানদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (ইজমা) অনুযায়ী ফরজ (১)। সুতরাং পবিত্র কুরআনের অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে যার ওপর জুমার নামাজ ওয়াজিব, জুমার দ্বিতীয় আজানের পর তার জন্য ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! যখন জুমার দিনে নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করো।" [সূরা জুমা: ৯]। অতএব, এই সময়ে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ; যদিও এর বৈধতা বা অবৈধতা (চুক্তি বাতিল হওয়া) নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, তবে তারা একমত যে, এই সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা অবশ্যই বর্জনীয়। সুতরাং এই সময়ে দোকানপাট বন্ধ রাখতে বাধ্য করা মূলত ওয়াজিব কাজ পালনের নির্দেশ প্রদান এবং হারাম কাজ থেকে বিরত রাখারই নামান্তর।

দ্বিতীয়ত: অন্যান্য ফরজ নামাজসমূহ। কোনো কোনো শাসনব্যবস্থা—যেমন সৌদি আরব রাজ্যে—নামাজ আদায়ের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। এই সিদ্ধান্তের শরয়ি বিধান কী?

কিছু মানুষ ধারণা করেন যে, এই দোকানপাট বন্ধ রাখা কেবলমাত্র জামাতে নামাজ পড়ার আবশ্যিকতার ওপর নির্ভরশীল। আর এই ধারণাটিই তাদের এর বিরোধিতা করতে প্ররোচিত করে। তারা যুক্তি দেন যে, জামাতে নামাজ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি ফকিহগণের মধ্যে মতভেদপূর্ণ। অথবা নামাজের সময় দীর্ঘ, তাই নামাজের শুরুতেই মানুষকে বাধ্য করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অথবা মসজিদে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা ছাড়াও জামাত কায়েম করা সম্ভব।

কিন্তু বিষয়টি আসলে সেরকম নয়; এখানে আবশ্যকতাটি শরীয়তের মূল বিধানের (আসলুশ শরআ) দিক থেকে নয়। অর্থাৎ এমনটি বলা হবে না যে: আজান শুনলেই প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়া স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিব। বরং এটি হচ্ছে 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' (শরয়ি প্রশাসনিক নীতি) এর অন্তর্ভুক্ত। এটি এমন একটি সিদ্ধান্ত যা মানুষের দ্বীন বা ধর্ম রক্ষায় বৃহত্তর কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে; যেমন জামাতের বিধানটি সুপ্রতিষ্ঠিত করা, মানুষকে এর প্রতি উৎসাহিত করা এবং শ্রমিকের অধিকার রক্ষা করা যাতে সে মুসলমানদের সাথে নামাজ আদায় করতে পারে।

আর এটি একটি গ্রহণযোগ্য জনকল্যাণমূলক নীতি। শরয়ি প্রশাসনিক নীতির জন্য এটি শর্ত নয় যে, তা কেবল পার্থিব কল্যাণ সাধন করবে; বরং দ্বীনি বা ধর্মীয় কল্যাণ সাধন করা আরও বেশি মহান ও মর্যাদাপূর্ণ। সুতরাং এখানে বাধ্যবাধকতাটি এই শরয়ি

প্রশাসনিক নীতির কারণেই অপরিহার্য হয়েছে, কেবল জামাতে নামাজ ওয়াজিব হওয়ার কারণে নয়।

(১) ইজমার বর্ণনার জন্য দেখুন: ইবনে মুনজির কৃত আল-ইশরাফ ২/৮৪, মারাতীবুল ইজমা ৩৩, আল-বায়ান ফি মাজহাবিশ শাফিঈ ২/৫৪২, ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনি ২/২১৮, মাজমুউল ফাতাওয়া ২১/৩৩৯।

পৃষ্ঠা 355

সুতরাং জামাআতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে কিংবা সময় প্রশস্ত—এমন ওজর পেশ করে আপত্তি তোলার কোনো অর্থ হয় না; কারণ এটি সাধারণ শরয়ি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত যা মেনে চলা আবশ্যক।

এজন্য যদি সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয় অথবা কোনো দেশে এমন কোনো সিদ্ধান্ত বিদ্যমান না থাকে, তবে একজন মুসলিমের ওপর কর্তব্য হলো জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা; চাই সে মসজিদে আদায় করুক কিংবা সহজলভ্য একদল মানুষের সাথে। আর যদি কর্মব্যস্ততার কারণে তা তার জন্য সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহ কোনো প্রাণীর ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না; এমতাবস্থায় সে ওয়াক্তের মধ্যেই একাকী সালাত আদায় করবে। তবে এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, মুসলিম সমাজে এই পরিস্থিতির ব্যাপকতা ঘটা কোনোভাবেই সমীচীন নয়। কারণ জামাআতের বিধান পালনে মানুষকে উৎসাহিত করা, এটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ প্রদান এবং এক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারীকে নসিহত করা ওয়াজিব। এমনকি একজন ব্যক্তির অবস্থা যেন এতটা সংকীর্ণ না হয় যে সে জামাআতে সালাত আদায় করতে সক্ষমই না থাকে।

নারী ইসলাম গ্রহণ করলে তার কাফির স্বামীর সাথে অবস্থান করা প্রসঙ্গে:

নব্য মুসলিম নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট সমকালীন সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো, কোনো নারী ইসলাম গ্রহণ করেন অথবা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিন্তু তার কাফির স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার ভয় পান। সম্ভবত ওই স্বামীর পক্ষ থেকে তার সন্তানাদি রয়েছে, ফলে বিষয়টি তাকে ইসলাম থেকে বিমুখ করার অথবা ইসলাম ত্যাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অমুসলিম দেশগুলোতে বসবাসরত মুসলিমদের মাঝে এই বিষয়টি একটি জটিল সমস্যা হিসেবে গণ্য হয়।

এটিই কিছু সমকালীন গবেষককে এ মত দিতে প্ররোচিত করেছে যে, কোনো নারী ইসলাম গ্রহণ করলে তার জন্য শরয়িভাবে তার কাফির স্বামীর সাথে দাম্পত্য জীবন ও উপভোগসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করা জায়েজ। তারা এক্ষেত্রে কিছু ফকিহ-এর সেই মতের ওপর নির্ভর করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও মুসলিম নারী ও তার কাফির স্বামীর মধ্যবর্তী বিবাহ বন্ধন অবশিষ্ট থাকে। তারা মনে করেন এটিও সেই প্রকারের বিষয় এবং এটি ওই নারীর ইসলাম ত্যাগের ক্ষতির তুলনায় কম ক্ষতিকর। ফলে তারা জনস্বার্থ (মাসলাহাত) বিবেচনার খাতিরে 'সিয়াসাহ শরইয়্যাহ' হিসেবে তাকে এর বৈধতার ফতোয়া দেওয়াকে সঠিক মনে করেন।

আমরা একমত যে এটি একটি সমস্যাসংকুল বিষয় এবং এটি এমন এক রূঢ় বাস্তবতা যা এর সাথে সঠিক আচরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞোচিত উপায়ে মাসলাহাত বা জনস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার দাবি রাখে। তবে এটি শরয়ি বিধানকে পুরোপুরি পরিবর্তন করার অবকাশ দেয় না, যাতে করে একজন মুসলিম নারীর তার কাফির স্বামীর সাথে অবস্থান করা মূল শরয়ি বিধানে সঠিক বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। কেননা এটি শরিয়তের ওপর একটি ভ্রান্ত আরোপ, সুনিশ্চিত বিষয়াদির (কাতইয়্যাত) সাথে সংঘাতপূর্ণ এবং মুসলিমদের সর্বসম্মত ঐক্যের (ইজমা) পরিপন্থী।

ফকিহদের মধ্যকার মতভেদের মূল বিষয়টি হলো বিবাহের চুক্তি স্থগিত রাখার সাথে সংশ্লিষ্ট; যেন বিষয়টি মুসলিম স্ত্রীর ইচ্ছাধীন থাকে এবং সে তার স্বামীর ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে পারে, এমনকি যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় (১)। এটি অধিকাংশ ফকিহদের (জমহুর) মতের বিপরীত, যাঁরা একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেন যা ইদ্দত বা প্রতীক্ষাকাল অতিক্রম করে না (২)।

চুক্তি বহাল থাকা বা বাতিল হওয়া নিয়ে মতভেদ থাকলেও, স্বামী তার সাথে সহবাস করবে না এবং সে তার সাথে স্ত্রী হিসেবে অবস্থান করবে না। কারণ এই মতটি এমন সব দ্ব্যর্থহীন দলিলাদির সাথে সাংঘর্ষিক যা কাফিরের জন্য মুসলিম নারীকে হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: **“তারা তাদের জন্য হালাল নয় এবং ওরাও এদের জন্য হালাল নয়।”** [সূরা আল-মুমতাহিনা: ১০]। এটি এমন এক নব-উদ্ভাবিত কথা যা ইসলামের কোনো ফকিহ বলেননি। বরং তাঁরা এ বিষয়ে অকাট্য ঐকমত্য (ইজমা) বর্ণনা করেছেন যে, কোনো কাফির ব্যক্তি মুসলিম নারীকে বিবাহ করতে পারে না; আর এটি এমন এক সুপ্রসিদ্ধ বিষয় যা কারো কাছেই অস্পষ্ট নয়।

ইমাম শাফেয়ি বলেন: **“আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদের কাফিরদের জন্য হারাম করেছেন; তাদের কাউকেই কোনো অবস্থাতেই তাদের জন্য বৈধ করেননি এবং এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোনো মতভেদ নেই।”** (৩)

---

(১) এই মতটি উমর এবং আলী বিন আবি তালিব, আন-নাখায়ি ও আশ-শা’বি থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাম্মাদও এটি বলেছেন। দেখুন: আল-ইসতিযকার ৫/৫২৫, ফাতহুল বারি ৯/৪২৩. এটি ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং ইবনুল কাইয়্যিম-এর পছন্দকৃত মত। তবে কিছু ফকিহ এই মতটিকে ইজমার পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার স্বামীর নিকট ফিরে আসবে না। দেখুন: আহকামুল কুরআন, আল-জাসসাস ৩/৫৮৭, আল-ইসতিযকার ৫/৫২১, আল-মুগনি ৭/১৫৩।

(২) যদি কোনো নারী কাফির স্বামীর অধীনে থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে, অথবা কোনো স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে যার অধীনে কোনো অ-কিতাবি (মুশরিক) স্ত্রী থাকে, তবে শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের মতে, এটি যদি মিলনের পূর্বে হয় তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। আর যদি মিলনের পরে হয় তবে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত থাকবে। মালেকি মাযহাবের মতে, মিলনের পূর্বে হোক বা পরে হোক, ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে; তবে শর্ত হলো যদি স্বামী আগে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ তার থেকে খুব বেশি বিলম্বিত হওয়া যাবে না—এই বিষয়ে তাঁদের মাঝে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইমাম আহমাদ থেকে একটি বর্ণনায় আছে যে, বিচ্ছেদ সরাসরি ঘটে যাবে। আর হানাফিদের মতে, স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করলে অপরজনকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে; সে যদি অস্বীকার করে তবে তাদের বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। আর যদি তারা দারুল ইসলামে না থাকে তবে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। দেখুন: ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম ৩/৪১৯, আল-বাহরুর রাইক ৩/২২৮, আশ-শারহুল কাবির লিত-দারদির ২/২৬৮, শারহু মুখতাসারি খলিল লিল-খারশি ৩/২২৭, আল-হাউয়িল কাবির ৯/২৫৮, আসনিউল মাতালিব ৩/১৬৫, আল-মুগনি ৭/১৫২-১৫৩, আল-ইনসাফ ৮/২১২-২১৩।

(৩) আল-উম্ম ৬/৩৯৭। এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ি থেকে বারবার ইজমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, দেখুন: আল-উম্ম ৬/১৫৫, ৬/৩৮৫, ৬/৩৮৬, ৬/৪০৮ এবং দেখুন: আল-উম্ম ৬/১৫।

যেমন ইবনে আব্দিল বার আলেমদের ঐক্যমত্য (ইজমা) বর্ণনা করেছেন যে, **"একজন মুসলিম নারীর জন্য কোনো কাফিরের স্ত্রী হওয়া বৈধ নয়"** (১)।

কেউ হয়তো বলতে পারেন: এটি বিবাহের সূচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখার (স্থায়িত্বের) ক্ষেত্রে নয়।

এর উত্তর হলো: তাঁরা এমন বিষয়ও বর্ণনা করেছেন যা এই সংশয় দূর করে দেয়, আর তা হলো: একজন কাফির কখনোই কোনো মুসলিমা নারীর সাথে সহবাস করতে পারবে না।

ইবনে আতিয়্যাহ বলেছেন: **"উম্মত এই বিষয়ে একমত হয়েছে যে, কোনো মুশরিক কোনো মুমিন নারীর সাথে কোনোভাবেই সহবাস করতে পারবে না; কারণ এতে ইসলামের অবমাননা নিহিত রয়েছে"** (২)।

সুতরাং এখানে স্থায়িত্ব এবং সূচনার মধ্যে পার্থক্য করা একটি অসার যুক্তি। কারণ দলিলসমূহ (নাসসমূহ) সূচনা এবং স্থায়িত্ব উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। বিবাহের শুরুতে যে নিষেধাজ্ঞার কারণ বিদ্যমান, তা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও পূর্ণরূপে বিদ্যমান; আর তা হলো এই বিবাহের ফলে সৃষ্ট অনিষ্ট এবং মুসলিম নারীর ওপর কাফিরের শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব, স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে এমন কোনো বিষয় নেই যা বিধানকে শিথিল করবে বা একে ভিন্নতর করবে।

আর এই ফিকহি মূলনীতি যে— **"স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে এমন কিছু ক্ষমা করা হয় যা সূচনার ক্ষেত্রে করা হয় না"** অথবা **"স্থায়িত্ব সূচনার চেয়ে সহজতর"** (৩)—এটি নির্দিষ্ট কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যা আনুষঙ্গিকভাবে প্রমাণিত হয় এবং যাতে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়। স্থায়িত্ব কেবল তখনই সূচনার বিধান থেকে ভিন্ন হয় এবং সেক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করা হয়, যখন স্থায়িত্বের অবস্থা সূচনার অবস্থার চেয়ে লঘু বা হালকা হয়।

---

(১) আত-তামহীদ ১২/২১; আরও ইজমা বর্ণনা করেছেন: ইবনুল মুনযির 'আল-আওসাত' ৫/১৮১ তে, আল-জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' ৩/৩৪৬ তে, আল-মাওয়ারদী 'আল-হাভী আল-কাবীর' ৯/১০১ এ, আল-বাগাওয়ী তাঁর তাফসীরে ১/২৫৬ তে, আর-রাযী 'আত-তাফসীর আল-কাবীর' ৬/৪১৩ তে, ইবনে আবি উমর ইবনে কুদামা 'আশ-শারহুল কাবীর' ৭/৫০৭ এ, ইবনে তাইমিয়া 'মাজমুউল ফাতাওয়া' ৩২/৩৬ এ, ইবনুল কাইয়্যিম 'ইলামুল মুওয়াক্কিঈন' ২/২৫৪ এ, ইবনে জুযাই 'আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যাহ' ১৩১ এ এবং 'আত-তাসহীল লি-উলূমিত তানযীল' ১/২৮৬ তে এবং আল-আইনী 'উমদাতুল কারী' ২০/৮৩ তে।
(২) আল-মুহাররার আল-ওয়াজীয় ১/২৯৭; আরও দেখুন: আশ-শারহুল কাবীর, ইবনে আবি উমর ২১/৩০; আহকামুল কুরআন, ইবনে আল-ফারাস ১/২৮৮; আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন ৩/৭২; আল-বাহরুল মুহীত, আবু হাইয়্যান ২/৪১৯; ফাতহুল বারী ৯/১৩২।
(৩) দেখুন: দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম ১/৫৬।

পৃষ্ঠা 358

সূচনা বা শুরুর অবস্থার কারণে কোনো বিষয়ে ছাড় দেওয়া হলে তার অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি স্থায়িত্বই শুরুর অবস্থার মতো নয়। সুতরাং এটি বলা যাবে না যে, চোরের নিকট চুরিকৃত মাল বিদ্যমান থাকা হারাম হওয়া ও ক্ষতিপূরণের দিক থেকে চুরির সূচনার মতো নয়। অথবা মদ পান অব্যাহত রাখা তা শুরু করার মতো নয়; অন্যান্য হারামের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং একজন মুসলিম নারী কোনো কাফিরের জন্য বৈধ নয়, চাই তা নিকাহর শুরুতে হোক বা নিকাহ বলবৎ থাকার ক্ষেত্রে হোক। স্থায়িত্বের মাঝে এমন কোনো অর্থ নেই যা শুরুতে নির্ধারিত বিধানকে পরিবর্তন করার দাবি রাখে।

এই কারণেই ফকীহগণের মধ্যে যারা চুক্তির স্থায়িত্বের কথা বলেছেন, তারা উল্লেখ করেছেন যে, সময়ের শর্ত ব্যতিরেকে চুক্তির স্থায়িত্ব বৈবাহিক সহাবস্থানকে বৈধ করে না। এমনকি সাধারণ ফকীহগণ যারা একটি নির্দিষ্ট সময় (যেমন ইদ্দত) নির্ধারণ করেন, তারাও এই সময়ে উপভোগ (শারীরিক সম্পর্ক) নিষিদ্ধ করেছেন।

ফিকহী গবেষণায় এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আল-বাজী এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন: **(রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত তার এবং তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাননি; এর অর্থ হলো তিনি নিকাহ বাতিল করেননি। আর শারীরিক সম্পর্ক না করার মাধ্যমে যে বিচ্ছেদ, তা সুনিশ্চিত, যদিও বর্ণনাকারী তার হাদীসে এটি উল্লেখ করেননি)**।

ইবনুল কাইয়্যিম ব্যাখ্যা করেন যে, এটি নিকাহর জন্য প্রতীক্ষা করা যা অনিবার্যভাবে জানা যায়: **(এটি সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তিনি কেবল তাকে এই এখতিয়ার দিয়েছিলেন যে, সে তার ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে—ফলে সে পূর্বের ন্যায় তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে—অথবা সে তাকে ত্যাগ করবে)**।

সুতরাং উপভোগ (শারীরিক সম্পর্ক) হালাল হওয়া এবং বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় বহাল থাকার দাবি করা কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুসলিমদের ঐকমত্যের পরিপন্থী বিষয়। বরং তারা চুক্তিটিকে স্থগিত বা মুলতবি রেখেছেন যা ইদ্দতের মতো নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে বাতিল হয় না; বরং স্বামী যখনই ইসলাম গ্রহণ করবে এবং স্ত্রী যদি তার নিকট ফিরে যেতে চায়, তবে তার সেই অধিকার থাকবে।

---

(১) দেখুন: আল-মুহাল্লা ৫/৩৭০-৩৭২।
(২) দেখুন: আহকামু আহলিল মিলাল ১৮৯ ও ১৯১ এবং ৪৩৭-৪৩৮, জাদুল মুসাফির ২/৩৩৪, আল-বাহরুর রায়িক ৩/২২৮, আশ-শারহুল কাবীর, লিত-দারদীর ২/২৬৮।
(৩) আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা ৩/৩৪৩।
(৪) জাদুল মাআদ ৫/১২৭।

পৃষ্ঠা 359

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: (যদি যিম্মি কাফিরের কোনো দাস ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার মালিকানা তার থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় না; বরং তাকে তার মালিকানা অপসারণ করার নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তার ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা থেকে তাকে বিরত রাখা হবে। এছাড়া তার দাসীদের সাথে উপভোগ করা—হোক সে উম্মে ওয়ালাদ বা অন্য কেউ—এবং তাদের দিয়ে কাজ করানো থেকে তাকে বাধা দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে, যখন কোনো নারী ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার এবং তার স্বামীর মাঝে অন্তরায় তৈরি

করা হয়। যদি স্বামী অন্যের হক সংশ্লিষ্ট হওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে তেমনি হবে যেমন কেউ তার দাস বিক্রি হওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করল; সেক্ষেত্রে সে-ই তাদের অধিক হকদার। আর স্থায়ী থাকা আরম্ভ হওয়ার চেয়ে শক্তিশালী।) (১)

ইবনে আল-কাইয়্যিম বলেন: (এর অর্থ এই নয় যে, স্বামী নাসারা থাকা অবস্থায় সে তার অধীনে অবস্থান করবে; বরং সে অপেক্ষা ও ইদ্দত পালন করবে। অতঃপর স্বামী যখনই ইসলাম গ্রহণ করবে, সে তার স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হবে, যদিও সে কয়েক বছর অতিবাহিত করে।) (২)

পূর্ণ অনুমোদনের রূপটির বীভৎসতার কারণে আপনি দেখবেন যে, যারা বিবাহ বন্ধন বহাল রাখার প্রবক্তা তারা এর অসারতা এবং তাদের মতবাদটি এর থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন:

(অধিকন্তু, সহবাসের সুযোগ প্রদান করা ব্যতিরেকে নিছক বিবাহ বন্ধন বহাল রাখা জায়েজ হওয়া কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই বিশুদ্ধ কল্যাণকর বিষয় এবং অনিষ্টহীন মাসলাহাত। কারণ অনিষ্টের কারণ হতে পারে হয় কোনো মুসলিম নারীর ওপর কাফিরের কর্তৃত্বের সূচনা—যা কোনোভাবেই জায়েজ নয়, যেমন মুসলিম নারীর সাথে কাফিরের বিবাহের সূচনা করা জায়েজ নয় যদিও তাতে সহবাস না থাকে; যেমন দাসত্বের মাধ্যমে তার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা জায়েজ নয়। অথবা স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের পর তার সাথে সহবাস করা—যা জায়েজ নয়। অতএব, বিবাহ বন্ধন বহাল রাখা জায়েজ হওয়াতে কোনো প্রকার অনিষ্ট ছাড়াই স্বামী-স্ত্রীর জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য কল্যাণ বিদ্যমান রয়েছে। আর বিষয়টি যখন এমন হয়, তখন শরীয়ত তা হারাম করার বিধান নিয়ে আসে না।) (৩)

সুতরাং এই মাসআলায় সর্বোচ্চ যতটুকু দলিল দেওয়া সম্ভব তা হতে পারে কেবল বিবাহ বন্ধন বহাল রাখার ব্যাপারে; কিন্তু উপভোগ করার সুযোগসহ তা বহাল রাখার বিষয়টি ইসলামের কোনো ফকীহর দিকে নিসবত করা (সম্পর্কিত করা) সম্ভব নয়।

---

(১) মাজমুউল ফাতাওয়া ৩২/৩৩৮।
(২) আহকামু আহলিয যিম্মাহ ২/৬৪৬, এবং অনুরূপ দেখুন: ২/৬৪৮।
(৩) আহকামু আহলিয যিম্মাহ ২/৬৯৫।

এটি ফকিহগণের নিকট একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান এবং মুসলমানদের সমগ্র ইতিহাসের কর্মপন্থা। এমনকি কোনো কোনো ফকিহ বর্ণনা করেছেন যে, এটি অস্তিত্বে থাকা অকল্পনীয়। ইবনুল আরাবি বলেন: "আমরা কাফিরের ‘ঈলা’ (শপথ করে স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার) বৈধতার ফয়সালা দিই না; কারণ তার স্ত্রী হয় মুসলিম হবে—আর এটি এমন একটি বিষয় যার অস্তিত্ব অসম্ভব এবং এতে কোনো ফতোয়া প্রযোজ্য হয় না—অথবা স্ত্রী কাফের হবে, আর সেক্ষেত্রে আমাদের তাদের বিষয়ে কিছু করার নেই।" (১)

সুতরাং, একজন নারী তার কাফের স্বামীর অধীনে পূর্বের ন্যায় থেকে যাওয়ার বৈধতার কথা ‘শরয়ি শাসননীতি’ (সিয়াসাতুশ শারয়িয়্যাহ)-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আর জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদও একে বৈধ করতে পারে না। কারণ এটি একটি প্রতিষ্ঠিত শরয়ি বিধানের পরিবর্তন এবং অকাট্য প্রমাণের (নস) বিপরীতে ইজতিহাদ, যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর শরয়ি শাসননীতির ক্ষেত্রে ফিকহি ইজতিহাদ হলো একটি মধ্যমপন্থা, যা জনকল্যাণকে বিবেচনা করে এবং শরয়ি সীমানা রক্ষা করে।

তাহলে, এই বাস্তব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে শরয়ি শাসননীতির অবস্থান কী হতে পারে?

শাসননীতি যে বিষয়টি গ্রহণ করতে পারে তা হলো, তার সাথে ‘জরুরত’ বা প্রয়োজনের ফিকহ অনুযায়ী আচরণ করা। সুতরাং যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, শরয়ি বিধান প্রকাশ করার ফলে সে ইসলাম ত্যাগ করবে, তবে তার নিকট বিধানটি স্পষ্ট করা থেকে বিরত

থাকা যেতে পারে। এটি ততক্ষণ বিলম্বিত করা হবে যতক্ষণ না তার হৃদয়ে ইসলাম বদ্ধমূল হয় এবং তার মন তার রবের নির্দেশ মেনে নিতে প্রশস্ত হয়—যদিও তা তার প্রবৃত্তির বিপরীত হয় এবং সে এতে কঠোরতা অনুভব করে। তার দ্বীন রক্ষা করার প্রয়োজনে এবং তার ধর্মত্যাগ (মুরতাদ হওয়া) রোধ করার লক্ষ্যে কৌশলী হয়ে তাকে তার স্বামীর অধীনে থাকার কথা বলা যেতে পারে, তবে এটি যে মূল শরয়ি বিধানে বৈধ তা সাব্যস্ত করা ব্যতীতই।

এটি শরয়ি সীমানার ভেতর একটি কল্যাণমূলক ইজতিহাদ, যা ‘জরুরত’ বা বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করে। অর্থাৎ এটি তার দ্বীন রক্ষা করার এবং তার মধ্য থেকে ইসলামের প্রতি অনীহা দূর করার বিষয়টি বিবেচনা করে, তবে তা শরয়ি গ্রহণযোগ্যতার সীমার মধ্যে থেকে।

কিন্তু এই প্রয়োজনের খাতিরে বিধানসমূহ পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হওয়া শরিয়তের ওপর এক ধরণের ভুল আরোপ। এটি প্রকৃত জনকল্যাণ নিশ্চিত করে না। কারণ এটি এই নিষিদ্ধ কাজ লঙ্ঘনে সাহস জোগায়। আর শরিয়ত একে নিষিদ্ধ করেছে কেবল এর অপকারিতা বা ক্ষতির আধিক্যের কারণেই। এই কারণে স্ত্রীর দ্বীন রক্ষার নিমিত্তে তার কাফের স্বামীর সাথে থেকে যাওয়া সর্বদা কল্যাণকর নয়। বরং কখনও কখনও—সম্ভবত এটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—তার দ্বীন রক্ষার বিষয়টি তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমেই অর্জিত হয় এবং তার সাথে অবস্থান করাই তার ধর্মত্যাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(১) আল-কাবাস ফি শারহি মুয়াত্তা ইবন আনাস ৩/১০৭।

- বিবাহের জন্য সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ:

আমাদের বর্তমান যুগে সমস্যামূলক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি হলো বিবাহের জন্য একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত মাসআলা। এর উদ্দেশ্য হলো নাবালিকা মেয়েদের অধিকার রক্ষা করা যাতে তাদের অযোগ্য পাত্রের সাথে বা কোনো কল্যাণ (মাসলাহাত) ব্যতীত বিয়ে দেওয়া না হয়। তবে এই বিষয়টিকে এই মাসলাহাত বা জনকল্যাণ ছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয় প্রভাবিত করছে, আর তা হলো আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবাধিকারের চাপ; যারা আঠারো বছর বা এর কাছাকাছি বয়সের ব্যক্তিদের বিবাহ গ্রহণ করে না, কারণ তাদের মতে এটি বুদ্ধিগত পরিপক্কতার (রুশদ) নিচে।

তাহলে এই বয়সের নিচে বিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা কি শরীয়তসম্মতভাবে বৈধ?

এখানে মাসলাহাত-ভিত্তিক ইজতিহাদের ক্ষেত্র যাচাই করার জন্য আমাদের সেই শরঈ সীমা স্পষ্ট করতে হবে যা এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রভাব ফেলে। যাতে এই ইজতিহাদের বিধান সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় এবং কীভাবে এটিকে শরঈ সীমা লঙ্ঘন থেকে রক্ষা করা যায় তা দেখা যায়।

শরঈ সীমা দুটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত:

প্রথম বিষয়: শরীয়ত দাতা এই বয়সে বিবাহ বৈধ করেছেন। এটিই অধিকাংশ ফকীহগণের অভিমত। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নির্দিষ্ট কোনো বয়স নির্ধারণ ছাড়াই নাবালিকার বিবাহের ওপর ইজমা বা ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেছেন (১)। সুতরাং এটি নিষিদ্ধ করা হবে আল্লাহর হালাল করা বিষয়কে হারাম করার নামান্তর (২)।

---

(১) আল-কাজী ইসমাঈল 'আত-তামহীদ' (১৯/৮৪), আল-কুশায়রী 'আহকামুল কুরআন' (৬/৭৬), ইবনুল মুনযির 'আল-ইশরাফ' (৫/১৯), আল-জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' (২/৬৮), ইবনে আবদিল বার 'আত-তামহীদ' (৯/৯৮), ইবনে বাত্তাল 'শারহু সহীহিল বুখারী' (৭/১৭২), ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআন' (৩/৫০৬), ইবনে রুশদ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' (৩/৩৪), আল-উমরানী

'আল-বায়ান' (৯/১৭৮), ইবনে কুদামা 'আল-মুগনী' (৭/৪০) এবং আন-নববী 'শারহু মুসলিম' (৯/২০৬) গ্রন্থে ফকীহগণের একটি বড় দলের পক্ষ থেকে ইজমা বর্ণনা করেছেন।

(২) ইবনে শুবরুমার মতো কিছু ফকীহ থেকে বিবাহের জন্য বালেগ হওয়ার শর্ত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: 'মুখতাসারু ইখতিলাফিল ফুকাহা' (২/২৫৭), 'আল-মুহাল্লা' (৯/৩৮), যেমনটি আবু দাউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আরও দেখুন: আল-কুশায়রী এর 'আহকামুল কুরআন' (৩/৭৬) এবং উসমান আল-বাত্তী; 'বাদাউস সানায়ি' (২/২৪০)। তবে এটি এখানে বিষয়টি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাঘাত ঘটায় না, কারণ এখানে বয়সের সীমাবদ্ধতা বালেগ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর অন্যদিক থেকে, উম্মতের অধিকাংশ আলিমের বক্তব্যের বিপরীতে এটি একটি একক ফিকহী বর্ণনা। অথচ নির্ভরযোগ্য হলো উম্মাহর অধিকাংশের বক্তব্য এবং চার মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অভিমত যার ওপর আমল চালু রয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়: শরীয়ত প্রণেতা বিবাহের বিধানগুলোকে সেগুলোর কারণসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। ফলে যখন বিবাহ সংঘটিত হয়, তখন তার ফলাফলসমূহ—যেমন ভরণপোষণ, ইদ্দত, উত্তরাধিকার এবং অন্যান্য বিষয়াবলী—চলে আসে। সুতরাং এই কারণগুলোর কার্যকারিতা রোধ করা শরীয়তের বিধানের ওপর সীমালঙ্ঘন হিসেবে গণ্য।

আমরা যদি এই দুটি বিষয় উপলব্ধি করি, তবে দ্বিতীয় দিকটি অত্যন্ত কঠোর। সুতরাং বিবাহের কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; অর্থাৎ এই অর্থে যে, যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট বয়সের নিচে বিবাহ করবে তার বিবাহ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তার ফলাফলগুলো কার্যকর হবে না—এটি 'সিয়াসাহ শরইয়্যাহ' (শরীয়তসম্মত প্রশাসনিক নীতিমালা) অনুযায়ী বৈধ নয়। কারণ এগুলো শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত বিধান (আহকাম ওয়াদইয়াহ), যা অকার্যকর করা বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে প্রথম দিকটির ক্ষেত্রে, এটি বিবাহের ফলাফলের কোনো কার্যকারিতাকে অকার্যকর করবে না, তবে এটি (বিশেষ পরিস্থিতিতে) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে এবং যে ব্যক্তি তা লঙ্ঘন করবে তাকে শাস্তি প্রদান করবে।

এ বিষয়ে বিধান হলো, এটি 'তাকয়ীদ আল-মুবাহ' বা বৈধ বিষয়কে সীমিত করার অন্তর্ভুক্ত। আর কোনো বৈধ বিষয়কে সীমিত করা কেবল তখনই বৈধ হয়, যখন সেখানে কোনো সাধারণ শরীয়তসম্মত জনকল্যাণ (মাসলাহা) বিদ্যমান থাকে যা এই সীমাবদ্ধতার দাবি রাখে। এছাড়া এই সীমাবদ্ধতাকে কেবল প্রয়োজন অনুযায়ী পালন করতে হবে এবং তাতে কোনো অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

অতএব, সর্বাগ্রে প্রয়োজন ও জনকল্যাণের অস্তিত্ব নিরূপণ করা আবশ্যক। যখন এই প্রয়োজন ও জনকল্যাণ প্রমাণিত হবে, তখন কোনো বাড়াবাড়ি ছাড়াই প্রয়োজন অনুসারে তা সীমিত করা বৈধ হবে।

এমতাবস্থায় ঢালাওভাবে নিষিদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহের বিষয়টি বিচারকের (কাজী) নিকট ন্যস্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ অভিভাবক নিজে সরাসরি বিবাহ দেবেন না; বরং তিনি যখন বিবাহ দিতে চাইবেন, তখন বিষয়টি বিচারকের নিকট উত্থাপন করবেন যেন বিচারক ওই মেয়ের বিবাহের স্বার্থ বা কল্যাণ এবং মহিলার পূর্ণ অধিকার আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেন। এরপর তিনি বিবাহ সম্পাদন করবেন। সুতরাং মেয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করার স্বার্থেই এটি সীমিত করা হবে। এক্ষেত্রে সিয়াসাহ শরইয়্যাহ-তে একটি বৈধ অবকাশ রয়েছে।

এর পাশাপাশি বিচারকের নিকট বিবাহের প্রক্রিয়া সহজতর করাও জরুরি, যাতে মহিলার কল্যাণের বিষয়টি নিশ্চিত করা সহজ হয়। এটিই হলো জনকল্যাণমূলক দিক যা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি রাখে। তবে এতে এমন কোনো অতিরিক্ত কড়াকড়ি করা যাবে না যার ফলে এর প্রক্রিয়াগুলো এত জটিল হয়ে পড়ে যে তা ঢালাওভাবে নিষিদ্ধ করার সদৃশ হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষ। এ বিষয়ে ইজমা (ঐক্যমত) বর্ণিত হয়েছে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো নির্ভরযোগ্য সাধারণ জনকল্যাণ ব্যতীত মানুষকে কোনো একটি গ্রহণযোগ্য ফিকহি মতামতের ওপর বাধ্য করা ইমাম বা শাসকের জন্য সঠিক নয়। তাহলে এমন মতামতের ক্ষেত্রে কী হবে যার অবস্থা এই (অর্থাৎ দুর্বল), আর যার বিপরীতে ইজমা বর্ণিত হয়েছে? সুতরাং এর সর্বোচ্চ পর্যায় হলো এটি যে, এ অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া বা আমল করা বৈধ হতে পারে; কিন্তু তা মানুষের ওপর এমনভাবে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না যে তারা অন্য মত গ্রহণ করা থেকে বাধাগ্রস্ত হয়। তবে মুবাহ বা বৈধ বিষয়কে সীমিত করার বিষয়টি ভিন্ন, যা সামনে আলোচিত হবে। সুতরাং এই মতপার্থক্যের বিদ্যমান থাকা মাসআলাটি উপস্থাপনে কোনো প্রভাব ফেলে না।

– বিচারিক পর্যায়ক্রম:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিচার প্রক্রিয়া দুই বা তিন স্তরে পরিচালিত হওয়া। সুতরাং সকল স্তর সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোনো রায় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে না। এটি বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিচারিক ব্যবস্থার একটি সাধারণ পদ্ধতি, যার লক্ষ্য হলো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং ভুলত্রুটি হ্রাস করা। কারণ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে, তবে বিচারিক পর্যায়ক্রম একে কমিয়ে দেয়।

বর্তমান সময়ের এই জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে শরিয়তে কোনো সুস্পষ্ট দলীল (নস) পাওয়া যায় না। এটি সেই বৈধ (মুবাহ) পরিসরের অন্তর্ভুক্ত যেখানে জনকল্যাণ বা মাসলাহাহ ক্রিয়াশীল থাকে। মুসলিমদের বিচারিক ইতিহাসে অতীতে এই রূপটি প্রচলিত ছিল না, তবে এটি এর গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করে না। এরূপ বিষয়কে হারাম বা মাকরুহ প্রমাণের জন্য একে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়; কারণ এটি বৈধ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। কেননা বিচারক হলেন ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি। সুতরাং তাকে যেমন বিচারের পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে, তেমনি এই রায়টি একাধিক ব্যক্তির পর্যালোচনার মাধ্যমে অতিক্রান্ত হওয়ার শর্তারোপ করে তাকে সীমাবদ্ধও করা যেতে পারে। আর এই সকল বিষয়ই হলো পদ্ধতিগত বিষয় যা জনকল্যাণের (মাসলাহাহ) অনুগামী।

সুতরাং এখানে জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি হলো ইজতিহাদের অন্যতম প্রশস্ত ক্ষেত্র, যেহেতু এটি এমন একটি অবস্থানে রয়েছে যেখানে কোনো সুস্পষ্ট দলীল (নস) নেই।

– বিধানসমূহের বিচারিক বিধিবদ্ধকরণ:

সিয়াসা শরইয়াহ (শরয়ি শাসননীতি) সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো ফিকহি বিধানসমূহের বিচারিক বিধিবদ্ধকরণের (তাকনিন) বিধান। এর কারণ হলো, মূলনীতি অনুযায়ী বিচারক তার বিচারে নিজের উদ্ভাবিত বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত (তারজিহ) মত অথবা কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের শরণাপন্ন হন। কিন্তু আমাদের যুগে বিধিবদ্ধকরণের একটি নতুন রূপ সৃষ্টি হয়েছে, যা ফিকহি বিধানগুলোকে এমন বিস্তারিত ধারায় বিন্যস্ত করে দেয় যা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অবকাশ বিচারকের থাকে না।

সমসাময়িক আলিমগণ বিধিবদ্ধকরণের বিধানের ক্ষেত্রে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছেন:

প্রথম ধারা: বৈধতা। তাদের যুক্তি জনকল্যাণের (মাসলাহাহ) বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় ধারা: নিষিদ্ধকরণ। নিষিদ্ধকরণের সপক্ষে তাদের যুক্তি নস (শরয়ি পাঠ) এবং মাসলাহাত (জনকল্যাণ) ভিত্তিক প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

যখন আমরা এ ক্ষেত্রে শরয়ি নসের অস্তিত্ব নিশ্চিত করি, তখন সেখানে সিয়াসাহ শারইয়্যাহর (শরয়ি রাজনীতি) আর কোনো অবকাশ থাকে না। এ কারণেই এই বিষয়টি পর্যালোচনার সময় এই যুক্তিটি পরীক্ষা করা অপরিহার্য; কেননা এর ওপরই মাসলাহাত ভিত্তিক রাজনৈতিক ইজতিহাদ নির্ভর করে।

নিষিদ্ধকরণের সপক্ষে নসের মাধ্যমে যুক্তি প্রদর্শনের ভিত্তি হলো এই যে, বিধানদাতা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি বিচারকের ওপর আবশ্যক করে দেয় যে, তিনি যা সত্য মনে করেন তা দিয়েই ফয়সালা করবেন। সুতরাং তার ওপর যদি এমন কোনো ফিকহি মত চাপিয়ে দেওয়া হয় যা তিনি সঠিক বলে বিশ্বাস করেন না অথবা যা তিনি বাতিল বলে মনে করেন, তবে তা শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করার পরিপন্থী হবে।

তবে এই যুক্তিটি দুই দিক থেকে পর্যালোচনা করা সম্ভব:

প্রথমত: এই বিধানটি মুজতাহিদদের সাথে সংশ্লিষ্ট, যাদের ফিকহি মতভেদের সূক্ষ্ম বিষয়গুলোতে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ ও প্রাধান্য (তারজিহ) দেওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। বিচারিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এটি সর্বদা বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং বিচারক কর্তৃক কোনো আলিমের রায় বা কোনো ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা সত্যবিচ্যুত ফয়সালা নয়।

যারা বিচারকের জন্য মুজতাহিদ হওয়াকে শর্ত করেন না—যেমন হানাফিগণ—তারা উল্লেখ করেছেন যে, বিচারক কর্তৃক অন্যের ফতোয়া অনুযায়ী ফয়সালা করা ইলম বা জ্ঞানের ভিত্তিতেই ফয়সালা করার অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইলম বা জ্ঞান কেবল তা-ই নয় যা নিশ্চিতভাবে সঠিক, বরং যা সঠিক হওয়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি করে; আর এখানে তা বিদ্যমান। (১)

দ্বিতীয়ত: কোনো গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদি মত অনুসরণ করতে বাধ্য করা এবং সেই গ্রহণযোগ্য মতানুসারে ফয়সালা করা শরীয়তের পরিপন্থী নয়, বিশেষত যদি এর মাধ্যমে কোনো অগ্রগণ্য মাসলাহাত বা কল্যাণ সাধিত হয়।

কোনো কোনো ফকিহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুকাল্লিদ বিচারক তার মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুসারে ফয়সালা করলে তা নির্ভরযোগ্য হবে, যদিও তার নিজের নিকট সেটি রাজেহ বা অগ্রগণ্য না হয়। (২)

অতএব, বিষয়টি সিয়াসাহ শারইয়্যাহর সম্ভাব্যতা বজায় রাখে যদি তা মাসলাহাত বা জনকল্যাণ নিশ্চিত করে। একারণেই আইনের বিধিবদ্ধকরণের (তাকনীন) উপকারিতা ও অপকারিতা নিয়ে উভয় পক্ষ মতবিরোধ করেছেন; কারণ উভয় পক্ষই সিয়াসাহ শারইয়্যাহর পথ অনুসরণ করছেন।

(১) দেখুন: ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম ৭/২৫৬।
(২) দেখুন: আল-ইহকাম ফি তামিযিল ফাতাওয়াহ আনিল আহকাম ৯২, তাবসিরাতুল হুক্কাম ১/২৬।

তার মতে, যারা বিধিবদ্ধকরণের (Taqnin) বিপক্ষে, তারা জনকল্যাণমূলক (Maslahah) দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত দেন। তারা মনে করেন যে, বিধিবদ্ধকরণের মধ্যে অপকারিতা (Mafsadah) নিহিত রয়েছে। আর যারা একে বৈধ মনে করেন, তারা বিধিবদ্ধকরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে 'সিয়াসা শারইয়্যাহ' (শরিয়তসম্মত শাসননীতি) প্রয়োগ করার পক্ষপাতী; কেননা এটি জনকল্যাণ সাধন করে এবং অপকারিতা দূর করে। সুতরাং এটি ইজতিহাদের একটি বৈধ ক্ষেত্র। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা স্থানে বিধিবদ্ধকরণের উপকারিতা বা অনুপকারিতা জোরালো হতে পারে, যা তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

- স্বৈরাচারী তালাকের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ:

এর অর্থ হলো, স্বামী যদি কোনো কারণ ছাড়াই তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তালাকের ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে স্ত্রীর যে ক্ষতি হয়েছে, তার ভিত্তিতে স্বামীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা।

তালাকের ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো, শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অধিকারসমূহ যেমন— ভরণপোষণ ও মুতআহ (উপহার)-এর বাইরে কোনো আর্থিক অধিকার এর ওপর বর্তাবে না। এর অতিরিক্ত কিছু প্রদানে স্বামীকে বাধ্য করা হলো অন্যায়ভাবে তার সম্পদ গ্রহণ করা; আর এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে অকাট্য দলিল (Nass) বিদ্যমান, তাই এতে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই।

তবে এই মতটি যেকোনো তালাকের ক্ষেত্রে অর্থ গ্রহণকে বৈধ করে না; বরং এটি মনে করে যে, এই চিত্রটি এমন একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যা মূল দলিলের আওতাভুক্ত নয়। আর তা হলো এমন তালাক যা শরিয়ত পছন্দ করে না এবং যা শরিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করে না। এর ফলে এমন অনেক অপকার ও ক্ষতি সৃষ্টি হয় যা শরিয়ত চায় না। এর কারণে নারী আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ক্ষতি সাধিত হয়, আর ক্ষতি অবশ্যই দূর করতে হবে। সুতরাং স্বামীর এই পন্থায় তালাক প্রদান করা মূলত অধিকারের অপব্যবহার। তাই এই ক্ষতির জন্য স্বামীকে তার স্ত্রীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে এবং এটি বিচার বিভাগীয় আর্থিক দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।(১)

সুতরাং এটি পর্যালোচনার এমন একটি বিশেষ দিক যা এই চিত্রটিকে দলিলের মূল ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তবে এর ওপর কিছু আপত্তি রয়েছে:

১- স্বৈরাচারী তালাক প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল, অথচ মুসলিমরা এর ওপর কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ আরোপ করেননি। সুতরাং এটি আমাদের যুগের বিশেষ কোনো নতুন সমস্যা (Nazilah) নয় যা কোনো নির্দিষ্ট জনকল্যাণ বিবেচনায় ইজতিহাদের দাবি রাখে।

---

(১) দেখুন: আস-সিয়াসা আশ-শাখসিয়্যাহ ফি আল-আহওয়াল আশ-শাখসিয়্যাহ, পৃ. ১৭৮-১৮৫।

এই তালাকের বিধান সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর ফলে যে ক্ষতির কথা বলা হয়েছে, তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের যুগ থেকে ইসলামের সকল যুগে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ ধার্য করেননি এবং এমন কোনো কারণও বিদ্যমান নেই যা এই বিধান পরিবর্তনের দাবি রাখে।

২- স্বামী তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তালাকের ক্ষেত্রে নিজের শরয়ী অধিকার প্রয়োগ করেছেন। আর কোনো ব্যক্তি শরীয়তসম্মত কোনো মুবাহ (বৈধ) কাজ করার কারণে দণ্ডিত হয় না (১)। স্ত্রীর তালাকের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় যে, তিনি এর মাধ্যমে ক্ষতিসাধন বা অন্যায় করতে চেয়েছেন। সুতরাং যদি তার মনের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো কারণ না-ও থাকে, তবুও এর জন্য তাকে আর্থিকভাবে দণ্ডিত করা বৈধ হবে না।

৩- 'স্বেচ্ছাচারী তালাক' একটি অনির্দিষ্ট ধারণা। সুতরাং আর্থিক দণ্ড ওয়াজিব করে এমন স্বেচ্ছাচারী তালাকের মানদণ্ড কী? এর দ্বারা কি কারণবিহীন প্রতিটি তালাকই উদ্দেশ্য? আর এই যৌক্তিক কারণের মানদণ্ডই বা কী? নাকি এমন প্রতিটি তালাক যার ফলে ক্ষতি সাধিত হয়? আর সেই ক্ষতির সীমারেখাই বা কতটুকু?

কেননা তালাকের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ না থাকা। যখন তালাককে 'স্বেচ্ছাচারী' হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন এই কাজটিকে অবশ্যই সুসংজ্ঞায়িত হতে হবে, যাতে এর সেই বিশেষত্ব স্পষ্ট হয় যা একে সাধারণ নসের (মূল পাঠ) বিধান থেকে পৃথক করার দাবি রাখে। এই ধারণাকে ঢালাওভাবে প্রয়োগ করলে মানুষের মধ্যে সংঘটিত অধিকাংশ তালাকই ক্ষতিপূরণযোগ্য হয়ে পড়বে। ফলে ক্ষতিপূরণের পরিধি এতই বিস্তৃত হবে যে তা শরয়ী মূলনীতিকেই সংকুচিত করে ফেলবে। তখন এটি কোনো মূলনীতি থেকে ব্যতিক্রমধর্মী আংশিক কোনো রূপ থাকবে না, বরং এটিই মূলনীতি বা সাধারণ নিয়মে পরিণত হবে। এর ফলে বিষয়টি এমন দাঁড়াবে যে, তালাক এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যা শরয়ী মূলনীতি অনুযায়ী আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণযোগ্য ছিল না, তা বাস্তবে ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ছাড়া আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানকে আবশ্যকীয় করে তুলবে।

---

(১) মালিকী মাযহাব এবং কিছু হানাফী ফকীহগণের মতে এটি মুবাহ। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব মতে এটি মুবাহ, তবে প্রয়োজন ছাড়া তা মাকরূহ। হানাফী মাযহাব মতে এবং হাম্বলী মাযহাবের একটি বর্ণনা অনুযায়ী এটি প্রয়োজন ছাড়া হারাম। তাদের মতে প্রয়োজন বলতে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ না থাকাও অন্তর্ভুক্ত। দেখুন: ফাতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম ৩/৪৬৫; হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন ৩/২২৮; মাজমাউল আনহুর ১/৩৮০; আল-বাহরুর রায়েক ৩/২৫৪; আল-কাফি, ইবনু আবদিল বারর ২/৫৭১; আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানি ২/৩১; হাশিয়াতুদ দিসুকি ২/৩৬১; রওদাতুত তালিবীন ৩/৮; মুগনিউল মুহতাজ ৪/৪৯৭; আল-মুগনি ৭/৩৬৩; কাশশাফুল কিনা ৫/২৩২।

৪- উল্লেখিত এই ক্ষতিগুলো তালাকের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, চাই তা যথেচ্ছভাবে হোক বা অন্যভাবে। এতে ক্ষতি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের ওপরই পতিত হয়, তাই ক্ষতি কেবল নারীর সাথে সুনির্দিষ্ট নয়; বরং স্বামীও এর শিকার হন। সুতরাং স্বামীকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা তার সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করার শামিল। এখানে নারীর প্রতি করুণা ও দয়ার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া সঠিক হবে না; কারণ স্বামী স্ত্রীর চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও অভাবী হতে পারেন। তাই ন্যায়বিচারের দাবি হলো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থার দিকেই নজর দেওয়া, যেন কারো কাছ থেকেই অন্যায়ভাবে অর্থ গ্রহণ করা না হয়।

তালাকপ্রাপ্ত নারীদের যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়, সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত, যা অন্যান্য শরয়ি উপায়ে পূরণ করা আবশ্যক। যেমন: রাষ্ট্র থেকে সরাসরি সহায়তা, অথবা দান-সদকা, জাকাতের খাত, জনকল্যাণমূলক কাজ

ইত্যাদি। এটি অন্যায়ভাবে আর্থিক জরিমানা আরোপের মাধ্যমে হতে পারে না। অনুরূপভাবে, নারী মোহর বৃদ্ধির শর্তারোপ করতে পারে, যা হবে বিলম্বে পরিশোধযোগ্য (মুয়াজ্জাল) এবং কোনো কারণ ছাড়াই তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে।

৫- মূল বিধান হলো মুসলিমের সম্পদ অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং একে বিচারিক আর্থিক দণ্ড হিসেবে গণ্য করে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ এ ধরনের দণ্ডের জন্য শরয়ি দলীল থাকা অপরিহার্য, আর তালাক এর জন্য কোনো বৈধ কারণ নয়। তালাক হলো বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার একটি বৈধ পথ; এমনকি যদি এতে অবহেলা, শিথিলতা বা যথেচ্ছতাও করা হয়, তবুও তালাকের যে ফলাফল এবং স্বামীর ওপর এর যে মানসিক ও আর্থিক প্রভাব পড়ে—যেমন স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ এবং সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া—তা আর্থিক ক্ষতিপূরণের চেয়েও তার জন্য অনেক বেশি কঠিন। সুতরাং তালাকের ক্ষেত্রে অবহেলা রোধে কোনো প্রতিরোধমূলক দণ্ড আরোপের প্রয়োজন নেই।

সুতরাং এটিই প্রতীয়মান হয় যে, 'সিয়াসা শারইয়্যাহ' (শরয়ি প্রশাসনিক নীতি) অনুযায়ী এই ক্ষতিপূরণ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি বিষয়টি কোনো বিশেষ তালাক সংক্রান্ত বিচারিক পর্যালোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, যার ফলে স্ত্রীর ওপর সুনির্দিষ্ট কোনো ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং এমন কিছু পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ও অবস্থা বিদ্যমান থাকে যা প্রমাণ করে যে স্বামী নিছক তালাক প্রদানের বাইরেও অন্য কোনো কারণে এই ক্ষতির সৃষ্টি করেছেন, তবে সেক্ষেত্রে এর অবকাশ থাকতে পারে।

পৃষ্ঠা 368

- ক্ষমতা পৃথকীকরণ:

সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর অন্যতম একটি ভিত্তি হলো তথাকথিত 'ক্ষমতা পৃথকীকরণ'। এর উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা যেন একক কোনো হাতে পুঞ্জীভূত না থাকে; বরং তা কয়েকটি কেন্দ্রে বিভক্ত থাকবে, যা হলো: নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ। এগুলো সামগ্রিকভাবে একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র, তবে এদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু প্রতিটি বিভাগেরই নিজস্ব বিশেষ কিছু ক্ষমতা থাকে যাতে অন্য বিভাগগুলো অংশীদার হয় না।

এই আধুনিক ধারণাটি নিয়ে সমসাময়িক পণ্ডিতদের মাঝে মতভেদ রয়েছে যে, ইসলামের প্রথম যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এটি বিদ্যমান ছিল কি না?

তাদের কেউ কেউ বলেন: এটি বিদ্যমান ছিল, এবং মুসলিমরাই সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনেক আগে এই পৃথকীকরণের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তারা এর সপক্ষে জোরালো ঐতিহাসিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন।

অন্যরা বলেন: বরং এটি বিদ্যমান ছিল না, এটি আমাদের যুগের একটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। এর ওপর ভিত্তি করে তারা একে নিষিদ্ধ মনে করেন এবং মনে করেন যে এটি ইসলামের পরিপন্থী।

সঠিক মতটি এই দুই দলের মাঝামাঝি অবস্থানে। এই পৃথকীকরণ নবী ﷺ-এর যুগে, তাঁর খলিফাদের যুগে বা তাঁদের পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান ছিল না। এই কার্যাবলি বা বিভাগগুলো বিদ্যমান থাকলেও তাদের মধ্যে এমন কোনো বিচ্ছেদ ছিল না যার অর্থ হলো সেগুলো শাসকের কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে। কিন্তু এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় না যে, বিষয়টিকে হারাম বা ইসলামের পরিপন্থী বলা হবে; বরং মানুষের কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। যদি এটি তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর হয়, তবে শরিয়তে একে নিষিদ্ধ করার মতো কোনো কারণ নেই।

- তালাক বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে বিচারিক ফয়সালার শর্তারোপ:

বিবাহের বয়স নির্ধারণের আলোচনায় আমরা যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি, তালাক এমন একটি বিধান যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব

রয়েছে। সুতরাং তালাকের কার্যকরিতা বা এর প্রভাব স্থগিত করার অর্থে তালাককে সীমাবদ্ধ করা বৈধ নয়। জনকল্যাণের দোহাই দিয়ে এই শরয়ী সীমা পরিবর্তন করার অধিকার কারও নেই। মানুষ তালাকের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করছে—এই অজুহাতে তালাককে বাতিল করা সম্ভব নয়, কিংবা তালাক যে...

ব্যক্তি ও সমাজের ওপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে এবং একে স্থগিত করার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ মাসলাহাত (জনস্বার্থ) নিহিত রয়েছে—এই জাতীয় মাসলাহাত-ভিত্তিক পর্যালোচনার কোনো মূল্য নেই। কারণ এই বিধানটি স্বয়ং বিধানদাতা (আল্লাহ) নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এটি যখন সংঘটিত হবে, তখন এর প্রভাব ও ফলাফল অবশ্যই কার্যকর হবে। তাই কোনো মাসলাহাতের দোহাই দিয়ে এই প্রভাব ও ফলাফল কার্যকরের পথ রুদ্ধ করার যেকোনো প্রচেষ্টা ‘সিয়াসাহ শারইয়্যাহ’ (শরয়ি রাজনীতি)-এর দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য; আর তা দুটি কারণে:

প্রথম কারণ: মাসলাহাত বা জনস্বার্থের এমন কোনো সামর্থ্য নেই যা শরয়ি বিধানের সীমানা পরিবর্তন করতে পারে। স্বামী যখন তালাকের শব্দ উচ্চারণ করে, তখন শরয়ি বিধান হলো তা কার্যকর হওয়া এবং এর সংশ্লিষ্ট প্রভাবসমূহ সাব্যস্ত হওয়া। সুতরাং মাসলাহাতের ওপর ভিত্তি করে তালাক সাব্যস্ত না হওয়ার কথা বলা হলো ‘নাস’ বা সুস্পষ্ট দলিলের বিরোধিতা করা এবং স্পষ্ট দলিলের উপস্থিতিতে ইজতিহাদ করা, যা কোনোভাবেই ধর্তব্য নয়।

দ্বিতীয় কারণ: এর মধ্যে প্রকৃত কোনো মাসলাহাত নেই। কোনো শরয়ি বিধান কার্যকরের ক্ষেত্রে কৃত্রিম শর্তারোপ করা ছাড়াই প্রকৃত মাসলাহাত অর্জিত হওয়া সম্ভব।

একইভাবে এই মতটিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য মানুষের তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে শিথিলতা এবং এর ফলে উদ্ভূত ক্ষতির যে বিবরণ দেওয়া হয়, তা তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানদের ইতিহাসে বিদ্যমান। সুতরাং এটি কোনো নতুন উপসর্গ বা আধুনিক কোনো বিশেষ সমস্যা নয় যা বিশেষ কোনো পর্যালোচনার দাবি রাখে; বরং ফুকাহায়ে কেরাম যে ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন এটি ঠিক তারই অনুরূপ। সুতরাং আমাদের বর্তমান সময়ের জন্য এখানে নতুন কোনো পরিবর্তন নেই।

তবে কেউ বলতে পারেন যে: তালাক কার্যকর না হওয়ার বিষয়টি মাসলাহাতের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং তা ‘নস’ বা দলিলের ভিত্তিতে। তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য রাখা সম্পর্কিত মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী থেকে তারা দলিল পেশ করেন: "আর তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো" [আত-তালাক: ২]। এটি তালাককেও অন্তর্ভুক্ত করে। একদল আলেম একে ওয়াজিব (আবশ্যক) বলেছেন, যেমন অন্য আলেমগণ এটি ছাড়া তালাক শুদ্ধ না হওয়ার কথা বলেছেন।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিটিও কয়েকটি কারণে অগ্রহণযোগ্য:

প্রথম কারণ: অধিকাংশ আলেম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মহান আল্লাহর বাণী—"আর তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো"—এর মাধ্যমে সাক্ষ্য রাখার এই নির্দেশটি দ্বারা তালাক এবং রাজআত (স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা) উভয় ক্ষেত্রে সাক্ষ্য রাখাকে ‘মানদুব’ বা উত্তম হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এবং এটি ওয়াজিব নয় (১), আর কোনো কোনো আলিম 'রাজআ' (তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা)-র ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন (২)।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখাকে শর্ত মনে করেন, যেমনটি কিছু লোক ভুল ধারণা করে এবং তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব হওয়ার মতটি তাদের দিকে নিসবত বা আরোপ করে। মূলত মতভেদটি কেবল 'রাজআ'-র ক্ষেত্রে, তালাকের ক্ষেত্রে নয়। একারণেই 'রাজআ'-র ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখাকে মুস্তাহাব মনে করা ফকীহগণ, যারা একে ওয়াজিব বলেন তাদের জবাবে বলেন যে, মহান আল্লাহর বাণী: **"তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো"** তা এসেছে **"সদয়ভাবে তাদের (স্ত্রীদের) আটকে রাখো"** এবং **"সদয়ভাবে তাদের পৃথক করে দাও"**—এর পরে। সুতরাং যখন তালাকের ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব হয়নি—যা কিনা নিকটতম উল্লেখ—তখন 'রাজআ'-র ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব না হওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত (৩)।

একারণে আর-রামলি (রহ.) ওয়াজিব হওয়া থেকে বিমুখ হওয়ার দলিল পেশ করে বলেন: **"(সাক্ষী রাখার নির্দেশটিকে) ওয়াজিব হওয়া থেকে বিমুখ করেছে তালাকের সময় সাক্ষী না রাখার ব্যাপারে তাদের ইজমা বা সর্বসম্মত ঐকমত্য, সুতরাং ফিরিয়ে রাখার বিষয়টিও তেমনই হবে"** (৪)।

সুতরাং এর অর্থ এই যে, তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষী না রাখা বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহদের মধ্যে একটি সর্বসম্মত বিষয়। একারণেই তারা বিরোধীদের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে এটি উল্লেখ করেন। ইমাম আল-জাসসাস এই ঐকমত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

"(ফকীহগণ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি যে, আয়াতে উল্লেখিত 'বিচ্ছেদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে ছেড়ে রাখা। আর বিচ্ছেদ সহীহ হয়ে যায় যদিও তার ওপর কোনো সাক্ষী রাখা না হয় এবং পরবর্তীতে সাক্ষী রাখা হয়। বিচ্ছেদের নির্দেশের পরপরই সাক্ষী রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ তা বিচ্ছেদ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়; তেমনিভাবে 'রাজআ'-র বিষয়টিও। আর যেহেতু বিচ্ছেদ ছিল তার (স্বামীর) একটি অধিকার এবং কোনো সাক্ষী ছাড়াই তা করা বৈধ ছিল—যেহেতু এতে অন্য কারো সম্মতির প্রয়োজন নেই—এবং এটি ছিল...)"

---

(১) দেখুন: বদায়েউস সানায়ে ৩/১৮১; আল-ইখতিয়ার লিতা'লিলিল মুখতার ৩/১৪৮; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল ৫/৪১১; শারহু মুখতাসারি খলীল, লিল-খারশী ৪/৮৭; রওদাতুত তালিবীন ৮/২১৬; আল-হাভি আল-কাবীর ১০/৩১৯; আশ-শারহুল কাবীর, ইবনু আবি উমর ৮/৪৭৩; আল-ইনসাফ ৯/১৫২।
(২) এটি মালিকী ও শাফিঈদের নিকট একটি অভিমত এবং হাম্বলীদের একটি বর্ণনা; দেখুন: আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ৫/৪১৮; আয-যাখীরা ১০/১৫২; আল-হাভি আল-কাবীর ১০/৩১৯; আল-মুগনি ৭/৫২২; এবং দেখুন: আহকামুল কুরআন লিল-বাগাভী ৩২৪।
(৩) এই দলিলের জন্য দেখুন: আহকামুল কুরআন লিত-তাহাভী ২/৩২৯; আল-হাভি আল-কাবীর ১০/৩১৯; আশ-শারহুল কাবীর, ইবনু আবি উমর ৮/৪৭৩।
(৪) নিহায়াতুল মুহতাজ ৫৯/৭।

রাজ’আত (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া) ব্যক্তির একটি অধিকার, তাই সাক্ষী ছাড়াই তা বৈধ হওয়া আবশ্যক।(১)

এ কারণেই আল-মাওয়ায়ী বলেছেন: “লোকেরা একমত পোষণ করেছেন যে, সাক্ষী রাখা ছাড়াই তালাক প্রদান করা বৈধ।”(২) এরপর তিনি রাজ’আতের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মতভেদ উল্লেখ করেছেন।

তার পূর্বে ইমাম শাফেঈ এই ঐকমত্য বর্ণনা করে বলেছেন: “আমি যা বর্ণনা করেছি—অর্থাৎ আমি এমন কোনো ইলমধারী ব্যক্তির দেখা পাইনি যার থেকে এই বিরোধপূর্ণ মতটি সংরক্ষিত আছে যে, সাক্ষী ছাড়া তালাক দেওয়া হারাম—তা এই বিষয়ের প্রমাণ দেয় যে, এটি (সাক্ষ্য রাখা)—আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন—একটি ঐচ্ছিক বিষয়, কোনো ফরয বা আবশ্যিক বিধান নয় যে তা বর্জন করলে কেউ পাপিষ্ঠ হবে এবং নির্দিষ্ট স্থান বা সময় পার হয়ে গেলে তা আদায় করা আবশ্যক হবে। আর রাজ’আতের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টি তালাকের মতোই সম্ভাবনা ও অর্থ বহন করে।”(৩)

সুতরাং যারা রাজ’আতের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদান ওয়াজিব বা আবশ্যক বলেন, তাদের দিকে তালাকের ক্ষেত্রেও সাক্ষ্য প্রদান ওয়াজিব হওয়ার মতটি আরোপ করা সঠিক নয়। কারণ তালাকের ক্ষেত্রে এই মতভেদ রাজ’আতের মতভেদের তুলনায় অনেক দুর্বল, যদিও বেশ কিছু ফকীহ এই মতটি পোষণ করেছেন।(৪)

তদুপরি, অর্থের দিক থেকেও তালাক এবং রাজ’আতের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। রাজ’আত হলো বৈবাহিক সম্পর্ক পুনরায় ফিরিয়ে আনা। তাই এটি কার্যকর হওয়ার জন্য এমন সাক্ষীর শর্তারোপ করা যারা এর সংঘটন প্রমাণ করবে, তা একটি যৌক্তিক বিষয়। পক্ষান্তরে তালাক হলো স্বামীর পক্ষ থেকে উচ্চারিত একটি শব্দ যার ওপর শরয়ি বিধানসমূহ ঝুলে থাকে। সুতরাং এটি সাক্ষ্য দেওয়ার আগ পর্যন্ত স্থগিত থাকার কোনো অর্থ হয় না। কারণ এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, যদি কেউ সাক্ষী ছাড়া তালাক দেয় তবে তার ওপর কোনো কিছুই বর্তাবে না, যেহেতু সেখানে কোনো সাক্ষী ছিল না!

অন্যান্য পার্থক্যের মধ্যে একটি হলো: রাজ’আত একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তা অসম্ভব হয়ে যায়। তাই সময় যেন পার না হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন পড়ে। পক্ষান্তরে তালাক এভাবে কোনো সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।(৫)

(১) আহকামুল কুরআন ৩/৬০৯।
(২) তায়সীরুল বায়ান ৪/২৬৫; আশ-শাওকানীও অনুরূপ করেছেন, তিনি প্রথমে মতভেদ বর্ণনা করে পরে ইজমা (ঐকমত্য) উল্লেখ করেছেন; দেখুন: নাইলুল আওতার ৬/৩০০।
(৩) আল-উম্ম ৮/১৯১।
(৪) দেখুন: আল-মুহাল্লা ১৭/১০, আল-বাহরুল মুহীত ফিত তাফসীর ১০/১৯৮, আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর ২৮/৩০৯।
(৫) দেখুন: আহকামুল কুরআন, আল-কিয়া আল-হাররাসী ৪/৪২০।

দ্বিতীয় বিষয়: আবশ্যকতা (ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি) মেনে নিলেও এর চূড়ান্ত কথা এই যে, এটি কেবল সাক্ষী রাখা ওয়াজিব

হওয়ার মতকেই নির্দেশ করে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সাক্ষী না থাকার কারণে তালাক কার্যকর হবে না; বরং এই ওয়াজিবের দাবি হলো সাক্ষী না রাখার কারণে সে গুনাহগার হবে এবং এরপর তার জন্য সাক্ষী রাখা আবশ্যক হবে। এর ফলে তালাকের দাবি কোনো প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণ করা হবে না, তবে তালাকের প্রভাব বাতিল হয়ে যাবে না। এই কারণেই ইবনে হাজম—যিনি সাক্ষী রাখাকে ওয়াজিব মনে করেন—বলেছেন: "যে মহিলার তালাক বা রাজআতের (প্রত্যাবর্তন) ব্যাপারে স্বামী কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেনি, আমরা তাকে মহান আল্লাহর অবাধ্য সাব্যস্ত করি যদি সে এই জেনেও মিথ্যা শপথ করে যে তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে বা রাজআত করেছে।" তিনি এ বিষয়ে ঐকমত্য বর্ণনা করে বলেন: "যে ব্যক্তি তালাক প্রদান করল কিন্তু সাক্ষী রাখল না, তার জন্য তালাক কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে আমরা কোনো মতভেদ জানি না; তবে আমরা একে চূড়ান্ত ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) হিসেবে সাব্যস্ত করছি না।"

ইবনে আশুর—যিনি সাক্ষী রাখা ওয়াজিব হওয়ার মতের প্রতি অনুরাগী—বলেন: "সকলেই একমত যে, এই সাক্ষী রাখা রাজআত বা বিচ্ছিন্নতা সহীহ হওয়ার জন্য কোনো শর্ত নয়। কারণ এটি কেবল তাদের উভয়ের অধিকার রক্ষার সতর্কতা হিসেবে এবং ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে; যাতে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা নয় বলে দাবি করতে না পারে, অথবা স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তেমন দাবি করতে না পারে। মনে হয় তারা একে এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে বলেছেন যে, কোনো নির্দেশ প্রদানের অর্থই তা অবিলম্বে পালন করা আবশ্যক হওয়া নয়। তাছাড়া কোনো বিষয়কে অন্য কোনো বিষয়ের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করতে হলে সাধারণ ওয়াজিব হওয়ার দলীল ব্যতীত স্বতন্ত্র দলীলের প্রয়োজন হয়। কারণ কোনো কাজ বর্জনের ফলে গুনাহ হতে পারে, কিন্তু সেই বর্জনের কারণে সংশ্লিষ্ট মূল কাজটি বাতিল হয়ে যায় না; যেমন—অবৈধভাবে দখলকৃত জমিতে বা অবৈধভাবে দখলকৃত পোশাক পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করা। যারা সাক্ষী রাখা ওয়াজিব বলেন তারা বলেছেন: যদি কেউ রাজআত করে কিন্তু সাক্ষী না রাখে, অথবা চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা সম্পন্ন করে কিন্তু সাক্ষী না রাখে, তবে তার রাজআত ও বিচ্ছিন্নতা সহীহ হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে তাকে সাক্ষী রাখতে হবে।"

সুতরাং, সাক্ষী রাখা ওয়াজিব হওয়ার মতের ওপর ভিত্তি করে এই বিষয়টি সাব্যস্ত হয় যে, ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামী যদি রাজআতের দাবি করে, তবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না; কারণ সে বিশ্বস্ত বা আমানতদার হিসেবে গণ্য নয়।

---

(১) আল-মুহাল্লা ১০/১৮।
(২) মারাতিবুল ইজমা ৭২।
(৩) আত-তাহরীর ওয়াত-তানবীর ২৮/৩১০।
(৪) দেখুন: আল-বায়ান ওয়াত-তাহসীল ৫/৪১৮; এবং দেখুন: মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক ৬/১৩৭-১৩৮।

তৃতীয় বিষয়: তালাক কার্যকর হওয়া আলেমদের মধ্যে ঐকমত্যের বিষয়। ইবনে তাইমিয়া কতিপয় মানুষের ভুল ধারণা স্পষ্ট করে বলেন: (কিছু মানুষ মনে করেছে যে, সাক্ষী রাখাই হলো তালাক, এবং তারা মনে করেছে যে তালাকের ওপর সাক্ষী না রাখলে তা কার্যকর হয় না। এটি ইজমার পরিপন্থী এবং কুরআন ও সুন্নাহরও পরিপন্থী; আর প্রসিদ্ধ আলেমদের কেউই এমন কথা বলেননি)(১)।

জাসসাস বলেন: (আতা থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনা ব্যতীত আলেমদের মধ্যে সাক্ষী ছাড়াই রাজ’আত (স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা) সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য আমাদের জানা নেই। সুফিয়ান ইবনে জুরাইজ থেকে এবং তিনি আতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: তালাক, নিকাহ ও রাজ’আত প্রমাণের ভিত্তিতে হবে। এটি মূলত অস্বীকারের আশঙ্কায় সতর্কতা হিসেবে সাক্ষী রাখার নির্দেশের ওপর প্রযোজ্য, সাক্ষী ছাড়া রাজ’আত সহীহ না হওয়ার অর্থে নয়। আপনি কি দেখছেন না যে, তিনি এর সাথে তালাকের কথা উল্লেখ করেছেন? অথচ সাক্ষী ছাড়াও তালাক কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করে না)(২)।

চতুর্থ বিষয়: পূর্ববর্তী কিছু আলেমদের থেকে যে মতপার্থক্য বর্ণিত হয়েছে, তা তালাক সহীহ হওয়ার জন্য সাক্ষী রাখার শর্তারোপের ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। বরং এর দ্বারা সর্বোচ্চ তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব হওয়ার মতটিই বুঝায়। এটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে

যায় যখন আমরা তাদের নামগুলো পর্যালোচনা করি যাদের দিকে এই মতটি নিসবত করা হয়, তারা হলেন:

১- ইমরান ইবনে হুসাইন: মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইমরান ইবনে হুসাইনকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, অতঃপর তার সাথে সহবাস করেছে, অথচ সে তার তালাকের ওপর সাক্ষী রাখেনি এবং তার ফিরিয়ে আনার (রাজ'আত) ওপরও সাক্ষী রাখেনি। তিনি বললেন: (তুমি সুন্নাহ পরিপন্থীভাবে তালাক দিয়েছ এবং সুন্নাহ পরিপন্থীভাবে ফিরিয়ে এনেছ। তার তালাক এবং তাকে ফিরিয়ে আনার ওপর সাক্ষী রাখো, আর পুনরায় এমন করো না)(৩)।

এটি তালাক ও রাজ'আত সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট, আর একারণেই তিনি সাক্ষী রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এর সমর্থন মেলে এই যে, রাজ'আতের পর সাক্ষী রাখার বিষয়টি তাবেঈদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাদের অনেকের থেকেই এটি বর্ণিত হয়েছে যেমন: সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, হাসান, যুহরী, তাউস, নাখয়ী, শাবী এবং অন্যান্যরা (৪)।

(১) মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৩/৩৩।
(২) আহকামুল কুরআন ৩/৬১০।
(৩) আবু দাউদ (২১৮৬), ইবনে মাজাহ (২০২৫), আব্দুর রাজ্জাক 'আল-মুসান্নাফ' (১০২৫৫) ও (১০২৫৭) এবং ইবনে আবি শাইবাহ 'আল-মুসান্নাফ' (১৭৭৮৩) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।
(৪) দেখুন: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৬/১৩৭, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ ৪/৫৯-৬০ এবং জাসসাসের আহকামুল কুরআন ৩/৬০৯।

পৃষ্ঠা 374

২- ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা হবে, তিনি বলেন: "যদি সে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে তাকে ফিরিয়ে নিতে চায়, তবে যেন সে দুইজন পুরুষকে সাক্ষী রাখে।" (১)

৩- ইবনে জুরাইজ: ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "দুইজন সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ, তালাক এবং পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। যদি কেউ ফিরিয়ে নেয় এবং সাক্ষী রাখার বিষয়ে অজ্ঞ থাকে, এমতাবস্থায় সে তার সাথে নির্জনে মিলিত হয় ও সহবাস করে, তবে বিষয়টি অবগত হওয়ার পর তার উচিত সুন্নতের দিকে ফিরে আসা এবং দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখা।" (২)

এটিও পূর্বের বর্ণনার ন্যায়। ইবনে জুরাইজ আমর বিন শুআইবের মতামত থেকে এই বিষয়ে যা বর্ণনা করেছেন তা এই অবস্থানকে আরও জোরালো ও বিস্তারিত করে। তিনি বলেন: "বিবাহ বা তালাকের ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তালাক দেয় এবং তার বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় আর সে (স্বামী) তা অস্বীকার করে, তবে তাকে আল্লাহর নামে কসম করানো হবে যে সে তালাক দেয়নি। যদি সে কসম করে তবে সে তার স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হবে। আর যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী তালাক কার্যকর হয়ে যাবে; আর কসম অস্বীকারের ক্ষেত্রে সে নিজেই যেন দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে গণ্য হলো।" (৩)

৪- আতা: আতা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "স্ত্রীর সাথে (স্বামীর) মেলামেশাই পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া হিসেবে গণ্য হবে, কিন্তু বিষয়টি জানার পর যেন সে সাক্ষী রাখে যাতে সে সুন্নতের দিকে ফিরে আসে।" (৪) তার থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন: "বিচ্ছেদ এবং পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া সাক্ষীর মাধ্যমেই হতে হবে।" (৫)

এটিও পূর্বের বর্ণনার ন্যায়, যা (সাক্ষী রাখাকে) অপরিহার্য শর্ত করার প্রতি প্রমাণ বহন করে না।

তবে আতা থেকে এমন একটি পাঠ বর্ণিত হয়েছে যাতে তালাকের বৈধতাকে সাক্ষীর উপস্থিতির সাথে শর্তযুক্ত করার সম্ভাবনা

রয়েছে। ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আতা-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে একজন ব্যক্তির সামনে (একবার) তালাক দিয়েছে এবং অন্য একজন ব্যক্তির সামনে (আরেকবার) তালাক দিয়েছে। তিনি বললেন: 'এগুলো কিছুই নয়; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল একটি করে তালাকের সাক্ষী হয়েছে'।" (৬)

এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, এটি তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার শর্ত হওয়ার স্বপক্ষে একটি উক্তি। তবে বিষয়টি নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা যায় না; বরং নিকটতর কথা হলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাই যা এই বর্ণনাটি সংকলনকারী অর্থাৎ আব্দুর রাজ্জাক বুঝেছেন—

---

(১) আত-তাবারী এটি তার তাফসিরে উদ্ধৃত করেছেন, ২৩/৪৪৪।
(২) দেখুন: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৬/১৩৫।
(৩) দেখুন: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৬/১৩৮।
(৪) দেখুন: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৬/১৩৭।
(৫) দেখুন: মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, ৪/৬০।
(৬) দেখুন: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৬/৩৭৪।

গ্রন্থকার (যে ব্যক্তি দুই জন পুরুষের উপস্থিতিতে তালাক দেয়) পরিচ্ছেদের অধীনে এই বর্ণনাটি ছাড়াও আরো দুটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি হলো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের ভিন্নতা নিয়ে; যেমন একজন ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে এক হাজার (দিরহামের) সাক্ষ্য দিল এবং অপরজন পাঁচ শতর সাক্ষ্য দিল, সেক্ষেত্রে কম পরিমাণটি গ্রহণ করা হয়। আবার কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে তিন তালাকের সাক্ষ্য দেয় এবং অন্যজন এক তালাকের সাক্ষ্য দেয়, তবে এক তালাক গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হলো: তার ওপর তালাক পতিত হবে না কারণ দুই জন সাক্ষীর মাধ্যমে তা তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়নি; এমন নয় যে, সাক্ষ্য না থাকার কারণে সে তালাক কার্যকর করছে না।

বিষয়টি এভাবে গ্রহণ করাই অধিকতর উত্তম, কারণ এই মাসআলায় ঐক্যমত্য বর্ণিত হয়েছে। আর যারা এটি বর্ণনা করেছেন তাদের কাছে এই ধরণের মত গোপন থাকার কথা নয়।

পঞ্চম বিষয়: সালাফদের পূর্ববর্তীদের কারো দিকে কোনো উক্তি সম্বন্ধিত হওয়াই সেটি দ্বারা দলিল পেশ করা বা সেই উক্তিটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে এমন মাসআলায় যেখানে উম্মতের আলেমগণ এর বিপরীত অবস্থানের ওপর একমত হয়েছেন। সুতরাং যদি এই বিষয়ে আতা-এর দিকে নিসবত সহীহও হয়, তবে সেটি এমন সব বিচ্ছিন্ন উক্তিগুলোর অন্তর্ভুক্ত যার ওপর আমল করা বৈধ নয়। কারণ আলেমগণ এই বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করেননি এবং আল্লাহর কিতাবেও এর কোনো প্রমাণ নেই। বড়জোর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে আয়াতে তালাককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবে তার অর্থ হলো সাক্ষ্য রাখা ওয়াজিব হওয়া। আর সাক্ষ্য রাখা হয় এমন বিষয়ের ওপর যা কার্যকর ও সঠিক হয়েছে। এমন নয় যে, সাক্ষ্য না থাকার কারণে মূল তালাক বাতিল হয়ে যাবে। বরং স্বামীর ওপর সাক্ষ্য রাখা ওয়াজিব এবং প্রমাণের অভাব হেতু স্ত্রী যদি তার বিরুদ্ধে তালাকের দাবি করে তবে স্বামীর জন্য তালাক অস্বীকার করা জায়েয হবে না। কারণ এটি স্বীকার করা তার ওপর ধর্মীয়ভাবে আবশ্যক।

ষষ্ঠ বিষয়: সাক্ষ্য রাখার শর্ত হওয়ার অর্থ বিচারিক ফয়সালার শর্ত হওয়া নয়। বিচারালয় ছাড়াও সাক্ষ্য রাখা সম্ভব। সুতরাং তর্কের খাতিরে যদি আমরা এতে কোনো সঠিক মতভেদ মেনেও নিই, তবে সেই মতভেদটি হলো সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকলে তালাক কার্যকর হবে, তালাকের জন্য বিচারালয়ের বৈঠক শর্ত হওয়া নয়।

পূর্বোল্লেখিত আলোচনার ভিত্তিতে, তালাক কার্যকর হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন শর্তারোপ করা—যেমন বিচারকের

কাছে নিবন্ধনের শর্ত দেওয়া, অথবা সাক্ষীর উপস্থিতি, কিংবা গ্রহণযোগ্য স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্যকে গণ্য না করা—এই সবগুলোর কোনোটিই গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এটি নির্ভরযোগ্য শরয়ি রাজনীতির অংশও নয়।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, তালাকের বিষয়ে বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি শর্তই অগ্রহণযোগ্য হবে। বরং নথিভুক্তকরণ ও অধিকার সংরক্ষণের খাতিরে বিচারিক সংশ্লিষ্টতাকে শর্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালতে তালাক সত্যায়ন করা আবশ্যক করা হবে এবং এতে অবহেলার জন্য দায়বদ্ধ করা হবে। অথবা বিরোধের ক্ষেত্রে প্রমাণ পেশ করা ব্যতীত তালাকের দাবিকে গণ্য করা হবে না। অথবা বিবাহবিচ্ছেদের আইনি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হবে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ই আদালতে উপস্থিত হয়ে তালাক পরবর্তী সকল অধিকারের বিষয়ে ঐকমত্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত তা সম্পন্ন হবে না; এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়। এসবই জনকল্যাণমূলক ইজতিহাদের একটি গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্র। এটি শরীয়তের কোনো বিধানের কার্যকারিতা ব্যাহত করে না, বরং মানুষের অধিকার যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য কেবল নথিভুক্তকরণকে আবশ্যক করে।

""

""